বিশ্বসাহিত্যের রূপরেখা

দ্বিতীয় পর্ব

প্রাচীন ও আধুনিক কালের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য

নির্মলেন্দু রায় চৌধুরী

এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং (প্রাইভেট) লিঃ

BISWASAHITYER RUPREKHA, Vol. 2
[Collection of world's best literature, in short story form : Classic & Modern]
BY NIRMALENDU ROY CHAUDHURI (1924)
Price : Rs. 12·00 (Rupees Twelve only).

Published by A. R. Mukherjee
Managing Director, A. Mukherjee & Co. Pr. Ltd.
2, Bankim Chatterji Street, Calcutta 12.
First Published : October, 1967

প্রকাশক :
শ্রীঅমিয়রঞ্জন মুখোপাধ্যায়
ম্যানেজিং ডিরেক্টার
এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড
২ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

প্রথম প্রকাশ : আশ্বিন, ১৩৭৪

প্রচ্ছদপট :
শিল্পী : ও. সি. গাঙ্গুলী

মুদ্রক :
শ্রীসৌরেন্দ্রনাথ মিত্র, এম-এ
বোধি প্রেস
৫, শঙ্কর ঘোষ লেন
কলিকাতা ৬

প্রস্তাবনা

'বিশ্বসাহিত্যের রূপরেখা'র প্রথম পর্বটিতে নোবেল পুরস্কার-প্রাপ্ত ছত্রিশ জন সাহিত্যিকের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস ও নাটক সংকলিত হয়েছিল। মূল গ্রন্থের বক্তব্য এবং উল্লেখযোগ্য চরিত্রগুলি অক্ষুণ্ণ রেখে উক্ত কাহিনী-গুলিকে সরস গল্প-রূপে পরিবেশন করতে প্রয়াস পেয়েছিলাম।

আলোচ্য পর্বটি প্রাচীন বা ক্লাসিক ও আধুনিক কালের আটত্রিশ জন শ্রেষ্ঠ লেখকের শ্রেষ্ঠ রচনার (সংক্ষিপ্তসার) সংকলন। এ ক্ষেত্রে প্রাচীন লেখকগণ গ্রীস দেশের মধ্যে সীমিত।

সংকলিত গ্রন্থগুলোকে লেখকগণের আবির্ভাবের কালানুক্রমে বিন্যস্ত করা হয়েছে। তবে অনিবার্য কারণে **সফোক্লেস** রচিত 'আন্তিগোনে' গল্পটির বেলায় সেই পারম্পর্য রক্ষা করা সম্ভব হয়নি। এ ত্রুটির জন্যে আমরা দুঃখিত।

এ পর্বটিতেও গল্পের শেষে সচিত্র **লেখক-পরিচিতি** যুক্ত করা হয়েছে। লেখকগণের সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত লিখতে যে-সব নির্ভরযোগ্য গ্রন্থের সাহায্য নিয়েছি উৎসাহী পাঠক-পাঠিকাদের সুবিধার জন্য সেগুলির নাম **'গ্রন্থ-পঞ্জী'**তে উল্লেখিত হয়েছে। সবশেষে, **লেখক গ্রন্থসূচীটি (Author-Title Index)** দেওয়া হয়েছে।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য আধুনিক কালে নোবেল পুরস্কার-প্রাপ্ত সাহিত্যিকগণই বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক বলে স্বীকৃত। নিঃসন্দেহেই এঁরা শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক। কিন্তু এমন অনেক দিক্‌পাল লেখকের নাম আমরা জানি, যাঁরা উক্ত পুরস্কার লাভ না করেও বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকের গৌরব অর্জন করেছেন। তলস্তয়, গোর্কি, টমাস্ হারডি, এইচ জি ওয়েলস্ এবং আরও অনেকে ঐ পুরস্কার থেকে বঞ্চিত হয়েও বিশ্বসাহিত্যের দরবারে কোন নোবেল পুরস্কার-প্রাপ্ত লেখকের চেয়ে নিশ্চয়ই কম 'শ্রেষ্ঠ' নন!

আর একটি নিবেদন। শ্রেষ্ঠত্বের প্রশ্নটা চিরকাল বিতর্কমূলক। তবুও আলোচ্য পর্বটির জন্য লেখক ও তাঁদের রচনাগুলি নির্বাচন করবার পূর্বে

একাধিক প্রখ্যাত সমালোচকের সিদ্ধান্ত এবং নির্ভরযোগ্য 'শ্রেষ্ঠ-তালিকা'র সাহায্য নিয়েছি। কোথাও ব্যক্তিগত খেয়াল-খুশিকে প্রশ্রয় দিইনি।

অবশ্য আমার এ নির্বাচন স্বয়ংসম্পূর্ণ বলে দাবী করি না। এ সংকলনে অন্তর্ভুক্ত হয়নি এমন আরও কয়েকজন শ্রেষ্ঠ লেখক থাকা অস্বাভাবিক নয়। তবে বর্তমান গ্রন্থে সংকলিত সাহিত্যিকগণকে বিশ্বের 'শ্রেষ্ঠ' বলে স্বীকার করতে কোন পাঠক-পাঠিকা কুণ্ঠিত হবেন না বলেই আমার বিশ্বাস।

প্রথম পর্বটিকে কেন্দ্র করে পাঠক-পাঠিকা এবং সুধী সমালোচকগণের কাছ থেকে উৎসাহ ও প্রেরণা পেয়ে দ্বিতীয় পর্বটি তাঁদের হাতে তুলে দিতে সাহসী হ'লাম।

গ্রন্থটির সংকলনে যাঁদের কাছ থেকে আমি আন্তরিক উৎসাহে ও প্রেরণা পেয়েছি—তাঁদের সকলকে আমি কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি। এ প্রসঙ্গে প্রীতি-ভাজন শ্রীপ্রদ্যোৎ কর-এর সক্রিয় সহায়তার কথা ভোলবার নয়।

গুজরাট-নিবাসী সহৃদয় সাহিত্যসেবী শ্রীকৃষ্ণভাদন জেট্‌লি এম-এ, বি-টি (Krishnavadan Jetley) এ পর্বটিতেও চোদ্দজন লেখকের (ইস্কাইলাস, সফোক্লেস, এউরিপিদেস, আরিস্তোফানেস, সাভাদ্রা, মলিয়ের, সুইফট, গ্যেটে, দুমা, তুর্গেনেভ, জোলা, বোয়ার, মম এবং ৎসভাইক-এর) আলোকচিত্র দিয়ে সাহায্য করেছেন। অন্য আলোকচিত্রগুলি যথাক্রমে ব্রিটিশ ইনফরমেশন সার্ভিস, ইউ এস আই এস, কলকাতা এবং গ্রীস, ইতালি, ফ্রান্স, রাশিয়া, জার্মানি ও নরওয়ে'র দূতাবাসের সৌজন্যে পেয়েছি। এ জন্য তাঁদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ।

সবশেষে, গ্রন্থটির প্রকাশনে শ্রদ্ধেয় শ্রীঅমিয়রঞ্জন মুখোপাধ্যায় যে গভীর উৎসাহ এবং আগ্রহ দেখিয়েছেন সেজন্য আমি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। ইতি—

নির্মলেন্দু রায় চৌধুরী

সূচী

ইলিঅ্যাড

[মহাকবি হোমর্ (Homer) বিরচিত **'ইলিঅ্যাড'** (**Iliad**), খ্রীঃ পূঃ ৬ শতাব্দী, গ্রীক মহাকাব্যটির সারাংশ।]

সেদিন নগরের অদূরে পাহাড়ের এক কোণে বসে রাজকুমার প্যারিস তাঁর পিতা ট্রয়-অধিপতি প্রিয়াম-এর একপাল মেষ পাহারা দিচ্ছিলেন। সূর্য ডুবে গিয়ে ক্রমে পৃথিবীর বুকে রাতের ছায়া নেমে আসে। রাজকুমারের সেদিকে খেয়াল থাকে না। কি এক গভীর চিন্তায় তিনি মগ্ন। মেষগুলোরও যেন ঘরে ফেরার গরজ থাকে না। তারা ইতস্তত চরে বেড়ায়।

হঠাৎ এক অলৌকিক আলোয় বনভূমিটি আলোময় হয়ে ওঠে। সেই অপূর্ব আলোর ছটায় প্যারিসের সম্বিৎ ফিরে আসে। ভাল করে তাকাতে প্যারিস দেখেন,—মাত্র কয়েক হাত দূরে ঐ আলো থেকে আবির্ভূত হন তিনটি অনিন্দ্যসুন্দর দেবীমূর্তি। প্যারিস বিস্ফারিত নয়নে মূর্তি-তিনটির দিকে তাকিয়ে থাকেন। ভাবেন, এ কি স্বপ্ন!

দেবী তিনজন প্যারিসের কাছে এগিয়ে এসে আপন আপন পরিচয় দেন,—হীরা, আথেনা এবং আফ্রোডাইটি।

স্মিতমুখে হীরা দেবী প্যারিসকে তাঁদের আকস্মিক অবির্ভাবের উদ্দেশ্য জানান ঃ

প্যারিস, পৃথিবীতে তোমা অপেক্ষা সুন্দর পুরুষ নেই। তাই তোমার কাছেই আমরা এক বিচারের কামনা নিয়ে এসেছি।—আমাদের তিন জনের মধ্যে যাকে তুমি সর্বাপেক্ষা সুন্দরী বলে বিচার করবে তাকে এই আপেলটি তোমার হাত দিয়ে দাও।

এই বলে দেবী একটি সোনার আপেল প্যারিসের হাতে গুঁজে দেন। একটু থেমে হীরা দেবী আবার বলেন,—আপেলটি আমাকে দিলে বিনিময়ে আমার বরে তুমি হবে এক বিরাট সাম্রাজ্যের অধীশ্বর। সেই-সঙ্গে পাবে তুমি আশাতীত নাম, যশ এবং অর্থ।

আথেনা দেবী এগিয়ে এসে প্যারিসকে জানান, তাঁকে আপেলটি দিলে তাঁর বরে প্যারিস হবে দেবতাদের মতই জ্ঞানী; দুনিয়ায় তার অসাধ্য কিছুই থাকবে না।

সর্বশেষে আফ্রোডাইটি নিজের পরিচয় দেন, ভালবাসার দেবী বলে। স্মিতমুখে বলেন,—কি জান, দুনিয়াতে প্রেমহীন জীবন অর্থহীন। আমার বরে তুমি সহজেই পেতে পারো পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সুন্দরীকে, তোমার পত্নী হিসাবে।

প্যারিস মুস্কিলে পড়েন। ভাবেন, এ কি কঠিন পরীক্ষা! খানিকক্ষণ ইতস্তত করে প্যারিস্ আপেলটি আফ্রোডাইটি দেবীর হাতে তুলে দেন। ফলে, অন্য দুই দেবী প্যারিসের ওপর চটে যান। তাঁরা প্রতিজ্ঞা করেন, এ অপমানের প্রতিশোধ নেবেন; যাতে শুধু প্যারিস নয়, সকল ট্রয়বাসীকেই চরম দুর্গতি ভুগতে হবে।

তাঁদের সর্বনাশা উক্তি শুনে প্যারিস্ আঁৎকে ওঠেন। বেগতিক বুঝে আফ্রোডাইটি দেবী প্যারিসকে নিয়ে ক'দিন বাদে চলে যান সুদূর গ্রীস দেশের স্পার্টা নগরে।

সুদর্শন রাজ-অতিথির আদর যত্নের ত্রুটি হয় না। ক্রমে অপরূপ রূপবতী পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সুন্দরী রাণী হেলেনের সঙ্গে রাজ-অতিথির আলাপ হয়। তাঁরা পরস্পর পরস্পরের রূপে মুগ্ধ হন। তারপর একদিন হেলেন স্বামী ও কন্যাকে ভুলে গিয়ে প্যারিসকে স্বামীরূপে বরণ করে চুপি চুপি তাঁর সঙ্গে পালিয়ে যান প্যারিসের দেশে, ট্রয় নগরে।

প্রিয়তমা পত্নী অপহরণের অপমানের জ্বালায় মেনেলাস জ্বলে ওঠেন। প্রতিকারের জন্য তিনি উন্মাদের মত ছুটে যান প্রবল পরাক্রান্ত অগ্রজ—মাইসিনি-অধিপতি আগামেমননের কাছে।

ঘটনা শুনে আগামেমনন ভাবেন, এতবড় স্পর্ধা! এ তো শুধু তাঁর অনুজের ব্যক্তিগত অসম্মান নয়, এ যে গ্রীক জাতির অপমান। তিনি দৃঢ় সঙ্কল্প করেন, ট্রোজানদের উচিত শিক্ষা দেবেন।

সম্রাট আগামেমননের আহ্বানে রণং দেহি রবে গ্রীস দেশের আকাশ বাতাস মুখরিত হয়ে ওঠে। কাতারে কাতারে গ্রীসের বীর যোদ্ধারা এসে জড়ো হয়। লক্ষাধিক সৈন্য নিয়ে সহস্রাধিক রণতরী তরতর করে এগিয়ে যায় ট্রয় রাজ্য আক্রমণ করতে। ট্রয় নগরে পেঁৗছে তারা নগর-প্রাচীরের বাইরে শিবির স্থাপন করে।

চতুর্দিকে গ্রীক সৈন্য। ট্রয় নগরী অবরুদ্ধ। নগরবাসীদের ঐ প্রাচীরের বাইরে বেরোবার উপায় থাকে না।

গ্রীকদের তুলনায় ট্রোজানরাও রণবিদ্যায় কম পারদর্শী ছিল না। অল্প সময়ের মধ্যে তারা তৈরী হয়ে নেয়। তারপর তারাও সিংহবিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়ে শত্রুদের ওপর। কখনও তারা জয়লাভ করে কখনও বা তাদের পরাজয় হয়। দেখতে দেখতে ন'বছর যুদ্ধ গড়িয়ে যায়। তবুও যুদ্ধ থামে না।

এমন সময় গ্রীক বাহিনীর মধ্যে এক অঘটন ঘটে। একদিন গ্রীক সৈন্যেরা ট্রয়ের অনতিদূরে ক্রাইসি সহর লুঠ করে প্রচুর ধনরত্নের সঙ্গে নিয়ে আসে স্থানীয় পুরোহিত-কন্যা পরমাসুন্দরী ক্রাইসাইসকেও। তাঁর বখরা হিসাবে লালসাতুর আগামেমনন শ্রীমতী ক্রাইসাইসকে বেছে নেন—ক্রীতদাসী হিসাবে।

বন্দিনীর বৃদ্ধ পিতা উন্মাদের মত ছুটে যান আদরিণী কন্যাকে উদ্ধার করতে। প্রচুর মূল্যবান উপঢৌকন সঙ্গে নিয়ে তিনি গিয়ে আছড়ে পড়েন সম্রাট আগামেমননের কাছে। কাতর ভাবে মিনতি করেন,

তাঁর একমাত্র কন্যাটিকে ফিরিয়ে দিতে। কোন ফল হয় না। অপমানিত হয়ে তাঁকে সেখান থেকে ফিরে আসতে হয়।

শ্রীমতী ক্রাইসাইসের পিতা ছিলেন দেবতা অ্যাপলোর পরম ভক্ত-পূজারী। অগত্যা বৃদ্ধ স্মরণ নেন তাঁর আরাধ্য দেবতার। ভক্তের আকুল আহ্বানে অ্যাপলো দেব ছুটে আসেন ট্রয় নগরে।

অলক্ষিতে অ্যাপলো দেব প্রবল বেগে অজস্র বাণ নিক্ষেপ করতে শুরু করেন গ্রীকসৈন্যদের বিরুদ্ধে। এই অতর্কিত আক্রমণের ফলে গ্রীকসৈন্যেরা দিশেহারা হয়ে পড়ে। তাদের আর্তনাদে গোটা শিবিরটায় শোকের ছায়া নেমে আসে। অ্যাপলো দেবের অব্যর্থ বাণ-বৃষ্টির বিরাম হয় না—ন'দিন ধরে চলে। ফলে, স্তূপীকৃত গ্রীকসৈন্যের মৃতদেহে সমুদ্রতীর ভরে ওঠে। তবুও দেবতার রোষের নিবৃত্তি হয় না।

গ্রীকসেনাপতিদের মন্ত্রণাসভা বসে। বিভ্রান্ত সভ্যেরা অ্যাপলো দেবের এ আকস্মিক রোষের কারণ বুঝতে পারেন না। তখন গ্রীকদের প্রবীণ দৈবজ্ঞ তাদের সে-রোষের কারণ জানিয়ে পরামর্শ দেন, অবিলম্বে শ্রীমতী ক্রাইসাইসকে তার পিতার কাছে ফিরিয়ে দিতে। আর, দেবতার মন্দিরে শত পশুবলির ব্যবস্থা করতে।

দৈবজ্ঞের বিধি শুনে সকলে যেন হাতে স্বর্গ পায়। কিন্তু আগামেমনন তীব্রভাবে প্রতিবাদ জানান। অবশেষে গ্রীকদের শ্রেষ্ঠ বীর যোদ্ধা অ্যাকিলিস্ এবং উপস্থিত সকলের চাপে পড়ে আগামেমনন সে-বিধি মেনে নেন।

ক্রাইসাইস্ তাঁর হাতছাড়া হতে আগামেমননের সব আক্রোশ গিয়ে পড়ে অ্যাকিলিসের ওপর। তিনি ভুলে যান অ্যাকিলিসের অসাধারণ বীরত্বের কথা, ভুলে যান তাঁকে বাদ দিয়ে এ যুদ্ধে জয় লাভ করা অসম্ভব। আগামেমনন তাঁর শ্রেষ্ঠ সেনাপতিকে অপমান করতেও দ্বিধা করেন না। তিনি অ্যাকিলিসকে তাঁর প্রিয় সুন্দরী ক্রীতদাসী ব্রাইসিসকে নিজের প্রয়োজনে কেড়ে নেবার সিদ্ধান্ত জানান।

রাগে অন্ধ হয়ে অ্যাকিলিস হয়ত সেদিন আগামেমননকে মেরেই ফেলতেন যদি না আথেনা দেবী তখন অ্যাকিলিসের সামনে এসে দাঁড়াতেন। উত্তেজিত কণ্ঠে অ্যাকিলিস আগামেমননকে জানান,—

বরাতের জোরে আজ তুমি বেঁচে গেলে। কিন্তু আজ থেকে আমি তোমাকে সম্রাট বলে আর সম্মান করবো না, জেনো। মনে রেখো, এ যুদ্ধে আমি ছাড়া তোমার গতি নেই।

তাঁর উক্তি শুনে সম্রাটের মুখে বিদ্রূপের হাসি ফুটে ওঠে। তারপর আগামেমননের নির্দেশে অ্যাকিলিসের শিবির থেকে সুন্দরী ব্রাইসিসকে নিয়ে আসা হয়। অ্যাকিলিস বাধা দেন না।

এ ঘটনার পর রাগে দুঃখে অপমানে অ্যাকিলিস তাঁর গর্ভধারিণী দেবী থেটিসকে স্মরণ করেন। পুত্রের আকুল আহ্বানে দেবী ছুটে আসেন। পুত্রকে আশ্বাস দিয়ে তিনি গিয়ে হাজির হন দেবরাজ জেউস-এর সম্মুখে—পুত্রের অপমানের প্রতিবিধানের জন্য। দেবী দেবরাজকে অনুরোধ করেন,—যতদিন না অ্যাকিলিস গ্রীকদের হয়ে আবার অস্ত্র ধরে ততদিন আপনি ট্রোজানদের জিতিয়ে দিন। দাম্ভিক আগামেমননকে হেনস্থা করুন।

দেবরাজ বলেন—তথাস্তু।

থেটিস দেবীর প্রার্থনা দেবরাজ জেউস ভোলেন না। গভীর রাত্রে জেউসের আদেশে স্বপ্নদেবতা দেবরাজের নাম করে আগামেমননকে বলেন,—আর সময় নষ্ট করো না। এইবার তোমার বাহিনী নিয়ে ট্রয় আক্রমণ কর। তোমার জয় নিশ্চিত।

গ্রীক শিবিরে সাজ সাজ রব পড়ে যায়। অগণিত সৈন্য রণহুঙ্কার তুলে ছুটে চলে ট্রয়ের দিকে। ওদিকে অ্যাকিলিস তাঁর সঙ্কল্পে অটল থাকেন। তিনি এ অভিযানে অংশ গ্রহণ করেন না; নির্বিকার ভাবে বন্ধু পেট্রোক্লুসকে নিয়ে বসে থাকেন নিজের শিবিরে।

আগামেমনন জেউসের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা জানিয়ে যাত্রা করেন। সে প্রার্থনা শুনে অলক্ষিতে জেউস্ হাসেন।

খবর পেয়ে ট্রোজান সৈন্যরাও তৈরী হয়ে নেয়। দু'দল মুখোমুখি এসে দাঁড়ায়। পরিস্থিতি এক ভয়াবহ রূপ নেয়। দেবতারাও পিছিয়ে থাকেন না। তাঁরা ছদ্মবেশে মর্তলোকে নেমে এসে উভয় পক্ষেই যোগ দেন।

ট্রোজান বাহিনীর পুরোভাগে ছিলেন রাজকুমার প্যারিস। মেনেলাসের ওপর নজর পড়তে প্যারিস তাঁকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করেন। প্যারিস প্রস্তাব করেন,—আমরা দু'জন লড়ব, বাকি সব ট্রোজান আর গ্রীকরা তা বন্ধুভাবে দেখবে। যে জিতবে সে-ই সুন্দরী হেলেন এবং তাঁর সম্পত্তি লাভ করবে। এ অশান্তির শেষ হোক; দু'পক্ষ শান্তিতে বাস করুক।

উভয় পক্ষই সে-প্রস্তাব মেনে নেয়।

মেনেলাস গর্জন করে তাঁর শত্রুর সামনে এসে দাঁড়ান। যেন ক্ষুধার্ত শার্দূল ঝাঁপিয়ে পড়ে অসহায় হরিণ-শিশুর ওপর। তাঁর ভয়ঙ্কর মূর্তি দেখে প্যারিসের অন্তরাত্মা কেঁপে ওঠে। কিন্তু প্যারিসও দমবার পাত্র নন। সাধ্যমত লড়ে যান। প্যারিসের অবস্থা বেগতিক বুঝে দেবী অ্যাফ্রোডাইটি ছুটে এসে কৌশলে আহত প্যারিসকে মেনেলাসের কবল থেকে উদ্ধার করে নিরাপদ আশ্রয়ে পৌঁছে দেন। প্যারিস নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পান। হাতের মুঠো থেকে শিকার অদৃশ্য হতে মেনেলাসের ক্ষোভের সীমা থাকে না।

গ্রীকদের ভাগ্যে যখন জয় নিশ্চিত, হীরা আর আথেনা দেবী তখন ভাবেন, এত সহজেই যুদ্ধটা মিটে যাবে! প্যারিস সাজা না পেয়েই পার পাবে? তাঁদের মাথায় কূটবুদ্ধি খেলে যায়।

দেবী আথেনা ট্রোজান সৈনিকের ছদ্মবেশে উল্কার মত ছুটে গিয়ে ট্রোজানদের ওস্তাদ তীরন্দাজ পাণ্ডারাসকে উস্কিয়ে দেন: এ সুযোগ নষ্ট করো না। এক্ষুনি তোমার অব্যর্থ তীর মেরে মেনেলাসকে শেষ করে দাও। তোমার জয়জয়কার হোক।

দেবীর যাদুর স্পর্শে সে তীরের আঘাত মারাত্মক না হলেও মেনেলাস আহত হন। দেবীর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়।

ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে আগামেমনন তাঁর বাহিনীকে জানান,—বিশ্বাসঘাতকদের উপযুক্ত শাস্তি চাই, চাই। তিনি তাঁর বাহিনীকে যুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করেন।

দেখতে দেখতে প্রবল বেগে যুদ্ধ শুরু হয়। উভয় পক্ষের যেন একই লক্ষ্য—হয় জয় নয় ক্ষয়। যুদ্ধক্ষেত্রে রক্তনদী বয়ে যায়। তবুও যুদ্ধ চলে অবিরাম গতিতে।

দেবতারাও এ যুদ্ধে যোগ দেন। স্বয়ং যুদ্ধ-দেবতা মার্স ট্রোজানদের দলে যোগ দেন। আথেনা আর হীরা দেবী তো গোড়া থেকেই গ্রীকদের পক্ষে ছিলেন।

বেগতিক বুঝে ছলনাময়ী দেবী আথেনা—কৌশলে মার্সকে যুদ্ধ থেকে নিবৃত্ত করেন। কিন্তু ক্ষণিকের জন্য। তাঁকে পুনরায় যুদ্ধক্ষেত্রে দেখে আথেনা প্রকাশ্যে মার্সের বিরুদ্ধে গ্রীকবীর ডায়োমেডিসকে উত্তেজিত করেন। তিনি ডায়োমেডিসের রথের ঘোড়ার রাশ ধরে মার্সের দিকে দ্রুত এগিয়ে যান। আথেনার চক্রান্তে মার্স আহত হয়ে তাঁর পিতা দেবরাজ জেউসের কাছে গিয়ে নালিশ করেন। দেবরাজ পুত্রকে জানান, এ জন্য তার মা হীরাদেবী দায়ী। দেবরাজ দেবীর আচরণে বিরক্তি প্রকাশ করেন।

যুদ্ধের ভয়াবহ রূপ দেখে দেবতারাও চঞ্চল হয়ে ওঠেন। ট্রোজান-দের শ্রেষ্ঠ বীর হেক্টর প্রমাদ গণেন। যুদ্ধক্ষেত্রের কোথাও অনুজ প্যারিস তাঁর নজরে পড়ে না। তাঁর মনে সন্দেহ জাগে। অনুজের খোঁজে তিনি রাজপুরীর দিকে পা বাড়ান।

হেক্টরের অনুমান মিথ্যা হয়নি। রাজপুরীতে গিয়ে দেখেন, প্যারিস যুদ্ধের বেশ খুলে ফেলে হেলেনের পাশে চুপটি করে বসে আছে। সে-দৃশ্য দেখে রাগে এবং ঘৃণায় প্রথমে হেক্টর কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে

ফেটে পড়েন। বজ্রকঠিন কণ্ঠে অনুজকে তিরস্কার করেন,—তোমার মূর্খতার জন্য গোটা ট্রয় আজ বিপন্ন, হাজার হাজার দেশবাসী তোমারই জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দিচ্ছে। আর তুমি চোরের মতো সেখান থেকে পালিয়ে এখানে বসে প্রেম করছো!

লজ্জিত প্যারিস তৎক্ষণাৎ যুদ্ধক্ষেত্রে যাবেন বলে ঘোষণা করেন। হেক্টর খুশীতে উচ্ছল হয়ে বলেন,—এই তো আমার ভাইয়ের মতো কথা।

হঠাৎ হেক্টরের মনে পড়ে যায় তাঁর স্ত্রী আর শিশুপুত্রের কথা। ভাবেন, কে জানে জীবনে হয়ত তাদের সঙ্গে আর দেখাই হবে না। তাদের কাছ থেকে বিদায় নিতে তিনি দ্রুত এগিয়ে যান।

অপ্রত্যাশিত ভাবে স্বামীকে পেয়ে শ্রীমতী অ্যানড্রোম্যাকির সংযমের বাঁধ ভেঙ্গে যায়। অশ্রুসিক্ত মুখে হেক্টরকে জানান,—আমি তোমাকে আর এ কাল-যুদ্ধে যেতে দেবো না। কিছুতেই নয়।—তাঁর কণ্ঠরোধ হয়ে আসে।

তবুও হেক্টরকে স্ত্রীর আলিঙ্গন থেকে মুক্ত হতে হয়। বীরদর্পে হেক্টর ছুটে যান রণক্ষেত্রের দিকে। পথে তিনি প্যারিসের সঙ্গে মিলিত হন।

সেদিন দু'ভাইর প্রচণ্ড রণহুঙ্কারে ধরণী কেঁপে ওঠে। সিংহবিক্রমে তাঁরা শত্রুদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। তাঁদের অব্যর্থ বর্শার গতিবেগ দেখে গ্রীক সৈন্যেরা হতভম্ব হয়ে পড়ে। তারা পিছু হঠতে থাকে।

অল্প সময়ের মধ্যে অসংখ্য গ্রীক সৈন্য হেক্টর এবং প্যারিসের হাতে প্রাণ হারায়। পরিস্থিতির গুরুত্ব উপলব্ধি করে আথেনা দেবী বিশেষ বিচলিত হয়ে পড়েন। ভাবেন, কি করে দুই ভাইকে, বিশেষ করে ঐ অসাধারণ বীর হেক্টরকে যুদ্ধ থেকে নিবৃত্ত করা যায়।

পরের দিন উভয় পক্ষের স্তূপীকৃত মৃতদেহ সৎকারের জন্য যুদ্ধ স্থগিত থাকে। অবস্থা বেগতিক বুঝে সেই ফাঁকে আগামেমননের

নির্দেশে রাতের অন্ধকারে গ্রীকবাহিনীর নিরাপত্তার জন্য শিবিরের চারদিক দিয়ে পরিখা কেটে একটি সুদৃঢ় উঁচু দেওয়ালও গেঁথে ফেলা হয়।

এতক্ষণ দেবরাজ জেউস যুদ্ধের গতি নিজের চোখে লক্ষ্য করছিলেন। এবার তিনি সকল দেবদেবীকে ডেকে আদেশ দেন—তাঁরা যেন কেউ কোন দলে যোগ না দেন।

পরের দিন যুদ্ধের গতি ঘুরে যায়। ট্রোজান সৈন্যেরা শত্রুদের সঙ্গে এঁটে উঠতে পারে না। গ্রীক সেনাপতিরা মহা উল্লাসে এগিয়ে চলে। এমন সময় স্বয়ং দেবরাজ জেউস অলক্ষ্যে ট্রোজানদের পক্ষ নেন।

দুর্ধর্ষ গ্রীক সেনাপতিদের অগ্রগতির মুখে হঠাৎ ঘন ঘন বজ্রাঘাত হতে দেখে তাঁদেরও বুঝতে অসুবিধা হয় না যে স্বয়ং দেবরাজ তাঁদের বিপক্ষে নেমেছেন। ফলে, অল্পক্ষণের মধ্যেই তাঁরা হতোদ্যম হয়ে পড়েন। গ্রীকসৈন্যেরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পালাবার পথ খোঁজে।

মহাবীর হেক্টর এ সুযোগ থেকে নিজেকে বঞ্চিত করেন না। শত্রুদের তাড়া করে তাদের জাহাজের কাছে নিয়ে যান। ট্রোজান সৈন্যেরা গ্রীক জাহাজগুলিতে আগুন লাগিয়ে দেয় আর কি!

গ্রীকদের সাহায্য করবার জন্য হীরা আর আথেনা দেবী আসছিলেন কিন্তু দেবরাজের ধমক খেয়ে তাঁরা নিবৃত্ত হন।

গ্রীকদের বরাত ভালো। খানিক বাদে পৃথিবীর বুকে রাতের অন্ধকার নেমে আসতে সেদিনের মত যুদ্ধ স্থগিত থাকে। গ্রীকরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে।

ট্রোজান সৈন্যেরা সে-রাত্রে আর নগরে ফিরে যায় না। সেই বিস্তৃত মাঠের মধ্যে থেকে ভোরের প্রতীক্ষা করে। সেই সঙ্গে তারা শত্রুদের ওপর সতর্ক দৃষ্টি রাখে যাতে তারা পালিয়ে না যায়।

আগামেমনন উপলব্ধি করেন, বীর অ্যাকিলিসকে যুদ্ধে নামাতে না পারলে জয়ের সম্ভাবনা নেই। তাঁর প্রতি সেদিন অকারণ রূঢ়

আচরণ করার কথা মনে পড়তে অনুশোচনায় আগামেমননের মন ভরে ওঠে।

আগামেমননের নির্দেশে তিনজন সেনাপতি সম্রাটের লোভনীয় উপঢৌকন নিয়ে অ্যাকিলিসের কাছে ছুটে যায়; তারা তাঁকে যুদ্ধে নামতে অনুরোধ করে। কোন ফল হয় না।

শত্রুদের যুদ্ধের পরিকল্পনা জানতে সেই রাত্রে ছ'জন গ্রীকবীর ছদ্মবেশে ট্রোজানদের শিবিরে যায়। কৌশলে এই গুপ্তচর ছ'টি ট্রোজানদের মিত্র থ্রেস-অধিপতির শিবিরে ঢুকে ঘুমন্ত সৈনিকদের নির্মমভাবে হত্যা করে তাঁর বিখ্যাত ঘোড়া ছ'টি সঙ্গে নিয়ে রাতের অন্ধকারেই ফিরে আসে।

ভোরের আলো ফুটে উঠতে আবার প্রবল বেগে যুদ্ধ শুরু হয়। আগামেমনন এবং তাঁর চিকিৎসক গুরুতর ভাবে আহত হলেন। গ্রীকদের দুর্ধর্ষ সেনাপতি অ্যাজাক্সও হেক্টরের সামনে দাঁড়াতে না পেরে—গা ঢাকা দেন। গ্রীক সৈন্যদের মর্মান্তিক হাহাকার ধ্বনি অ্যাকিলিসের কানে পৌঁছুতে তিনি বন্ধু পেট্রোক্লুসকে পরিস্থিতিটা দেখে আসতে অনুরোধ করেন।

ততক্ষণে ট্রোজানরা গ্রীকদের পরিখা পার হয়ে দুর্গের প্রাচীরের ওপর এসে পৌঁছায়। তারপর হেক্টর ঐ দুর্গের বিরাট ফটকটি ধূলিসাৎ করে শত্রুব্যূহ ভেদ করে বাহিনী নিয়ে এগিয়ে যান। অবস্থা বেগতিক বুঝে আগামেমননকে পালিয়ে যাবার কথা ভাবতে হয়।

গ্রীকদের শোচনীয় অবস্থা উপলব্ধি করে হীরা দেবী চঞ্চল হয়ে ওঠেন। তাঁর চক্রান্তে দেবরাজ ঘুমিয়ে পড়েন। তখন জলদেবতা পডিসন গ্রীকদের সাহায্য করেন।

ঘুম থেকে উঠে দেবরাজ জেউস দেখেন, হেক্টর গুরুতর ভাবে আহত। তাঁর আদেশে অ্যাপলো দেব হেক্টরকে সুস্থ করে তোলেন। এবার দশগুণ শক্তি নিয়ে হেক্টর শত্রুদের ওপর আবার ঝাঁপিয়ে

পড়েন। দলে দলে ট্রোজান সৈন্য শত্রুব্যূহ ভেদ করে তাদের জাহাজে উঠে পড়ে।

অ্যাকিলিসের অভিমান তখনও যায়নি। অথচ সে দৃশ্য তিনি সহ্য করতেও পারছিলেন না। এমন সময় বন্ধু পেট্রোক্লুস ছুটে এসে তাঁকে জানায়,—একান্তই যদি তুমি যুদ্ধ না করো তবে তোমার বর্ম আর অস্ত্র আমাকে দাও ; এ দৃশ্য অসহ্য।

পেট্রোক্লুসের প্রচণ্ড আক্রমণের ফলে ট্রোজানরা ক্রমে নগরের প্রাচীরের কাছে হটে আসে। ওদিকে অ্যাপলো দেব কখন তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধে নেমেছেন তিনি টের পাননি। দেবতার চক্রান্তে হেক্টরের হাতে পেট্রোক্লুসের জীবনদীপটি নিভে যায়। ফলে, গ্রীক বাহিনীর মধ্যে আবার হাহাকার রব ওঠে।

গ্রীকদের প্রায় নিশ্চিত পরাজয়ের লক্ষণ দেখা যায়। তবুও কিন্তু সন্ধির নিশান ওড়ে না, থামে না সে কাল-যুদ্ধ। অলিম্পাস পর্বতে বসে দেবরাজ জেউস ভাবেন, আগামেমননের যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে…… . …

এদিকে প্রিয়তম বন্ধু পেট্রোক্লুসের মৃত্যুসংবাদে অ্যাকিলিস ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে উঠেন। প্রতিহিংসার আগুনে তিনি জ্বলে ওঠেন। দেব-নির্মিত নতুন রণসাজে সজ্জিত হয়ে অ্যাকিলিস গ্রীক সৈন্যদের উদ্দেশ্যে হুঙ্কার ছাড়েন। তারপর অ্যাকিলিস একের পর এক শত্রুবাহিনী ধ্বংস করে এগিয়ে চলেন। যেন দাবানল বায়ুবেগে এগিয়ে যায়।

দিশেহারা ট্রোজান সৈন্যরা নগরের প্রাচীরের কাছে পিছু হটে ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। শুধু হেক্টর নির্ভীকভাবে তাঁর পরম শত্রুর জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করেন।

দুই শ্রেষ্ঠ বীর এক সময় মুখোমুখি দাঁড়ান। দু'জনেরই চোখ থেকে প্রতিহিংসার আগুন ঠিকরে বেরোয়।

হেক্টর তাঁর শাণিত বর্শা ভীমবেগে শত্রুর প্রতি ছুঁড়ে মারেন।

অব্যর্থ তাঁর লক্ষ্য। কিন্তু দেবতার হাতে গড়া ঢালে হেক্টরের বর্শা প্রতিহত হয়ে ছিটকে পড়ে। আর একটি বর্শার জন্য হেক্টর ইতস্তত: খোঁজেন। ততক্ষণে অ্যাকিলিসের হাতের বর্শা হেক্টরের বর্ম ভেদ করে তাঁর কণ্ঠনালীতে বিদ্ধ হয়। মহাবীর হেক্টরের রক্তাক্ত দেহটি মাটিতে লুটিয়ে পড়ে।

দ্বাদশ দিন ধরে অ্যাকিলিস শত্রুর শবদেহটি রথের পেছনে বেঁধে সমাধির চারিদিক প্রদক্ষিণ করেন। তবুও যেন তাঁর প্রতিহিংসার আগুন নেভে না।

ললাটের লিখন! যে স্থানটিতে অ্যাকিলিস্ হেক্টরকে বধ করেছিলেন ত্ব'দিন বাদে সেই স্থানেই প্যারিসের তীরে তিনি প্রাণ হারালেন।

ত্ব'পক্ষের শ্রেষ্ঠ ত্ব'বীর গত হলেন। তবুও কিন্তু যুদ্ধ থামে না।

আরও ক'দিন পরের কথা। একদিন গভীর রাত্রে কোথা থেকে একটি বিষমাখানো তীর উড়ে এসে প্যারিসের জীবনদীপটি নিভিয়ে দেয়।

এ ঘটনার পর হঠাৎ একদিন গ্রীকরা তাদের শিবির পুড়িয়ে তাদের জাহাজে পাল তুলে দেয়। সেখানে পড়ে থাকে একটি বিরাট কাঠের ঘোড়া।

অবরোধমুক্ত ট্রয়বাসীরা বিজয় চিহ্ন হিসাবে ঘোড়াটিকে নগরের মধ্যে নিয়ে মহা উৎসব আর পান-ভোজে মেতে ওঠে।

ক্লান্ত নগরবাসী যখন গভীর নিদ্রায় মগ্ন চতুর গ্রীক সৈন্যরা তখন ঐ ঘোড়াটির ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে নগরের প্রধান ফটকটি খুলে দেয়।

গ্রীক বাহিনী অদূরে গা ঢাকা দিয়ে সুযোগের অপেক্ষা করছিল। সংকেত পেয়ে তারা ছুটে এসে নগরের মধ্যে প্রবেশ করে। তারপর মুহূর্তের মধ্যে তাদের তরবারির আঘাতে নিহত ঘুমন্ত নগরবাসীর রক্তে নগর ভেসে যায়। ট্রয় নগরের পতন হয়।

এত কাণ্ডের মধ্যেও সুন্দরী হেলেন বেঁচে থাকেন।

যাঁর রূপের আলোয় একদিন ট্রয় ঝলমল করে উঠেছিল—সেই আলোই ডেকে আনে অভিশাপ। ট্রয় নগর মহাশ্মশানে পরিণত হয়। সুন্দরী হেলেনের তখন সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। তিনি হাসিমুখে বিজয়ী মেনেলাসের হাতে হাত মিলিয়ে ফিরে যান স্পার্টা নগরে আবার তাঁর ঘরণী হয়ে, রাণীর সম্মান নিয়ে।

অভিশপ্ত রাজপুরী

[গ্রীক নাট্যকার ইস্কাইলাস্ (Aeschylus)-এর **'দি হাউস্ অব্ অ্যাট্রিয়াস্'** (**The House of Atreus**), খ্রীঃ পূঃ ৪৫৮, নাটকটির ছায়া অবলম্বনে]

আরগসের রাজপ্রাসাদে দেবতার অভিশাপ নেমে আসে। এ অভিশাপের মূলে ছিল আরগস-অধিপতি অ্যাট্রিয়াসের দুষ্কৃতি......

অ্যাট্রিয়াস আর থিয়েসস্টিস ছিলেন সহোদর ভাই—মহারাজ পিলোপস-এর সন্তান। কি কারণে দু' ভাইয়ের মধ্যে মনোমালিন্য হয়, ক্রমে তা শত্রুতায় পরিণত হয়। ভ্রাতৃজায়ার প্রতি থিয়েসস্টিসের অবাঞ্ছিত আচরণ হয়ত এর মূলে ছিল।

অ্যাট্রিয়াস প্রতিহিংসার আগুনে জ্বলেন। ভ্রাতৃরূপী শত্রুকে উচিত শিক্ষা দেবার জন্য তিনি সুযোগ খোঁজেন। ধূর্ত অ্যাট্রিয়াসের আচরণে থিয়েসস্টিসের কোন সন্দেহের অবকাশ হয় না।

একদিন অ্যাট্রিয়াস কৌশলে থিয়েসস্টিসের শিশুপুত্র দু'টিকে অপহরণ করেন। তারপর রাজপুরীতে এক বিরাট ভোজসভার আয়োজন হয়। সে ভোজসভায় নিমন্ত্রিত বিশেষ অতিথি হয়ে আসেন থিয়েসস্টিস। অগ্রজ অনুজকে সাদর অভ্যর্থনা জানান। অ্যাট্রিয়াস্ নিজে দাঁড়িয়ে থেকে পরিপাটি করে খাবার পরিবেশনের ব্যবস্থা করেন।

পরম তৃপ্তিতে থিয়েসস্টিস খেয়ে চলেন। পাশে দাঁড়িয়ে অ্যাট্রিয়াস রুদ্ধশ্বাসে তাঁর খাওয়া পর্যবেক্ষণ করেন। আর মাঝে মাঝে এটা সেটা তাঁকে মামুলি প্রশ্ন করেন।

অ্যাট্রিয়াস দেখেন, অতিথি সবকটা পদই তৃপ্তি সহকারে খেয়েছেন।

তবুও তরল কণ্ঠে তিনি বলেন,—আয়োজন সামান্য, কিছু মনে ক'রো না। তা ঐ বিশেষ মাংসটি কেমন খেলে?

চমৎকার।

অতিথির উক্তি শুনে অ্যাট্রিয়াসের সংযমের বাঁধ ভেঙ্গে যায়। খুশির উচ্ছ্বাসে তিনি অট্টহাসিতে ফেটে পড়েন। তাঁর হাসি আর থামতে চায় না।

চমৎকার? তা হবে না কেন। নিজের ছেলের মাংস যে ......হা হা হা!

অ্যাট্রিয়াস যে এই ভাবে চরম প্রতিশোধ নেবে—থিয়েসস্টিস তা কল্পনাও করতে পারেন নি। তাই তিনি স্তব্ধ হয়ে অসহায় ভাবে অগ্রজের দিকে তাকিয়ে থাকেন। কিছুক্ষণ বাদে তিনি জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন।

অ্যাট্রিয়াসের এই পাপের ফলে পরবর্তী কালে রাজপ্রাসাদে নেমে আসে দেবতার অমোঘ অভিশাপ। তারপর বহু বছর কেটে গেছে। অ্যাট্রিয়াস এবং থিয়েসস্টিস দু'জনই গত হয়েছেন। কালের স্রোতে ঐ অঘটনের স্মৃতি আরগস অধিবাসীদের মন থেকে মুছে যায়।

মাইসিনি-অধিপতি গ্রীসদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পরাক্রান্ত রাজা আগামেমনন ছিলেন অ্যাট্রিয়াসের জ্যেষ্ঠপুত্র। আর, স্পার্টা নগরের অধিপতি মেনেলাস ছিলেন আগামেমননেরই অনুজ।

দু'ভাই সুখেই রাজত্ব করছিলেন। তখনও পিতার পাপ পুত্রদের স্পর্শ করেনি। কিন্তু সে-সুখ তাঁদের বরাতে বেশীদিন সইল না। পিতার পাপ থেকে পুত্র কি করে নিষ্কৃতি পাবে? দেবতার অভিশাপ! ট্রয় নগরের যুবরাজ প্যারিসের সঙ্গে ভ্রাতৃজায়া সুন্দরী হেলেন পালিয়ে যেতে আগামেমননের ভাগ্যাকাশে কাল মেঘ দেখা দেয়।

আগামেমনন স্থির করেন, ট্রোজানদের উচিত শিক্ষা দিয়ে হেলেনকে

উদ্ধার করবেন। ট্রয়ের বিরুদ্ধে অভিযানের জন্য তিনি গ্রীকবাসীদের আহ্বান করেন।

পরাক্রমশালী অধিপতির আহ্বানে ছুটে আসেন গ্রীসের শ্রেষ্ঠ সেনাপতিগণ, আসে লক্ষ লক্ষ বীর সৈনিক; সহস্রাধিক রণতরী সাজান হয়। সকলে এসে মিলিত হয় অভিযান কেন্দ্রে, অলিস নগরে। অভিযানের সর্বাধিনায়ক হন স্বয়ং আগামেমনন। আয়োজনের ত্রুটি হয় না। আগামেমননের নেতৃত্বে বিশাল বাহিনীটি যাত্রার অপেক্ষা করে।

হঠাৎ সমুদ্র ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে। প্রবল বেগে ঝড় বইতে থাকে। সে প্রতিকূল অবস্থায় জাহাজের নোঙর তোলা সম্ভব হয় না। দিনের পর দিন গড়িয়ে যায় তবুও সমুদ্রের রোষ নিবৃত্ত হয় না—হাওয়া অনুকূলে বয় না।

এই অনিশ্চিত পরিস্থিতিকে কেন্দ্র করে বাহিনীর মধ্যে এক চাপা অসন্তোষ আর বিক্ষোভের গুঞ্জন ওঠে। সেনাপতিদের মধ্যে কেউ কেউ বা অভিযানের সংকল্প ত্যাগ করে ঘরে ফিরে যাবার জন্য তাগিদ দেন। আগামেমনন প্রমাদ গণেন।

অগত্যা আগামেমনন তাঁর দৈবজ্ঞের শরণাপন্ন হন। দৈবজ্ঞ জানান, সমুদ্রের ক্রোধ এবং প্রতিকূল হাওয়া দেবী আর্তেমিস-এর রোষের অভিব্যক্তি। তাঁর রোষ শান্ত না হলে জাহাজের নোঙ্গর তোলা সম্ভব হবে না। একমাত্র উপায়ঃ আগামেমননের কন্যা কুমারী ঈফিজেনিয়াকে দেবীর রোষানলে আহুতি দেওয়া।

দৈবজ্ঞের সর্বনাশা বিধান শুনে আগামেমনন চমকে ওঠেন। ভাবেন, পিতা হয়ে কি করে কন্যাকে এমনি ভাবে আহুতি দেবেন, বিশেষ করে কন্যার স্নেহময়ী জননীর অজ্ঞাতে।

আগামেমননের মন দ্বন্দ্ব-বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। অবশেষে এক সময় তাঁর এ অন্তর্দ্বন্দ্বের অবসান ঘটে। নিজ হাতে তিনি দেবীর নামে আদরিণী কন্যাকে সাগরে উৎসর্গ করেন। আশ্চর্য, সঙ্গে সঙ্গে অশান্ত সাগর শান্ত হয়ে যায়—হাওয়া অনুকূলে বইতে সুরু করে। অন্য

সকলের মুখে হাসি ফুটে ওঠে। কেবল আগামেমননের বুক থেকে একটি চাপা দীর্ঘনিঃশ্বাস বেরিয়ে এসে অনন্ত শূন্যে মিশে যায়।

এবার জাহাজের নোঙ্গর তুলতে আর দেরী হয় না। পাল তুলে দিয়ে জাহাজগুলি তরতর করে এগিয়ে চলে ট্রয় নগরের অভিমুখে। উত্তেজিত বিপুল বাহিনীটি অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে কতক্ষণে তারা ট্রয় নগরের জমিতে পা দেবে।

কথাটা কিন্তু চাপা থাকে না। কন্যা ঈফিজেনিয়ার এই মর্মান্তিক পরিণতির খবর মহারাণী ক্লাইটীমেস্ট্রার কানে পৌঁছুতে স্বামীর প্রতি প্রতিহিংসার আগুনে তিনি জ্বলে ওঠেন।

ক'দিন বাদেই ক্লাইটীমেস্ট্রা ষড়যন্ত্র করে তাঁদের একমাত্র পুত্র ওরেস্টেসকে পোছিস অধিপতির কাছে পাঠিয়ে দেশান্তরিত করেন। ওরেস্টেস সুদূর অচেনা রাজপুরীতে বন্দী হয়। রাজপুরীর সেই অন্ধকার কারাকক্ষে মায়ের ঘৃণার উত্তাপে ওরেস্টেসের দিন কাটে।

তবুও মহারাণীর প্রতিহিংসার আগুন নেভে না। এমন সময় স্বর্গত থিয়েসর্স্টিসের একমাত্র জীবিত পুত্র এজিস্থাস দীর্ঘকাল দেশান্তরিত জীবন কাটিয়ে স্বদেশে ফিরে আসেন। দু'ভাইকে নির্মমভাবে হত্যা করার কথা তিনি ভোলেন নি। তাই ভ্রাতৃহন্তার আত্মজ আগামেমননের ওপর এজিস্থাসের আক্রোশ ছিল। আগামেমননের বিরুদ্ধে প্রতিহিংসা নেবার উদ্দেশ্যেই তাঁর এই আগমন।

ক্লাইটীমেস্ট্রা এজিস্থাসের সঙ্গে শুধু হাতই মেলালেন না, তাঁর কাছে হৃদয়টিও উন্মুক্ত করলেন। এজিস্থাস এ অভাবিত সুযোগ থেকে নিজেকে বঞ্চিত করলেন না। তিনি সুন্দরী ক্লাইটীমেস্ট্রাকে বুকে তুলে নিলেন। দু'জনেরই লক্ষ্য এক। এবার তাঁরা উভয়ে আগামেমননকে হত্যা করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। তখনও আগামেমনন ট্রয়ের যুদ্ধ থেকে ফেরেন নি। প্রেমিক-যুগল প্রতিহিংসা বুকে নিয়ে তাঁর প্রত্যাবর্তনের প্রতীক্ষা করেন।

দীর্ঘ দশ বছর অক্লান্ত সংগ্রামের পর একদিন ট্রয় নগরের পতন হয়। তারপর সুন্দরী হেলেনকে সঙ্গে নিয়ে আগামেমননের বাহিনী দেশের অভিমুখে যাত্রা করে। এ খবর তখনও আরগসে পৌঁছয় নি। প্রেমিক এজিস্থাসের অন্তরঙ্গ সাহচর্যে মহারাণী ক্লাইটীম্নেস্ট্রার দিনগুলি সুখেই কাটছিল।

অনুজ মেনেলাসের জাহাজ ঝড়ের মুখে পড়ায় আগামেমননের জাহাজই আগে এসে আরগসে পৌঁছল। জাহাজটির সঙ্গে আর কোন জাহাজ ছিল না। এবং সেটি এসে পৌঁছল অপ্রত্যাশিত ভাবেই।

দূর থেকে আগামেমননের জাহাজের তীব্র আলোর ছটা নগর-প্রহরীর নজরে পড়তে সে ছুটে গিয়ে রাজপুরীতে খবর দেয়। ট্রয়-বিজয়ী বীর আগামেমননের অভ্যর্থনার জন্য ছলনাময়ী ক্লাইটীম্নেস্ট্রা ব্যস্ত হয়ে ওঠেন।

অত রাত্রে এমনি ভাবে পৌঁছতে আগামেমনন বিনা আড়ম্বরেই রাজপুরীতে যাওয়া স্থির করেন। শুধু বন্দিনী ট্রয়রাজকন্যা ক্যাসাণ্ড্রাকে সঙ্গে নিয়ে আগামেমনন রথে উঠে বসেন। দেহরক্ষী এবং পরিচারকবর্গ রাতের জন্য নগরের উপকণ্ঠে থেকে যায়।

রাজকুমারী ক্যাসাণ্ড্রা ছিলেন দৈবশক্তির অধিকারিণী, ভবিষ্যৎ-দর্শী। তিনি আসন্ন বিপদ দিব্যদৃষ্টিতে দেখতে পেতেন। রাজপুরীর উদ্দেশে আগামেমননের সঙ্গে রথে উঠতে গিয়ে ক্যাসাণ্ড্রা ভয়ে শিউরে ওঠেন। তিনি আগামেমননকে তাঁর সমূহ বিপদ সম্বন্ধে সতর্ক করেন। অত রাত্রে এমনি ভাবে রাজপুরীতে যাবার সংকল্প হতে আগামেমননকে নিবৃত্ত হতে ক্যাসাণ্ড্রা অনুরোধ করতেও দ্বিধা করেন না। আগামেমনন প্রিয় সঙ্গিনীর অহেতুক ভয়ের উক্তি হেসে উড়িয়ে দেন। রথ প্রাসাদের দিকে দ্রুত এগিয়ে যায়।

রথ প্রাসাদের সদরে পৌঁছুতে আগামেমনন লক্ষ্য করেন—

স্বয়ং ক্লাইটীমেস্ট্রা তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা জানাবার জন্য অপেক্ষা করছেন। একই সঙ্গে বিস্ময় আর আনন্দে আগামেমনন অভিভূত হন। এক ফাঁকে ক্যাসাণ্ড্রার অহেতুক আশংকার জন্য তাকে ব্যঙ্গ করতেও তিনি ছাড়েন না।

ক্লাইটীমেস্ট্রার নির্দেশে ট্রয়-বিজয়ী বীরকে সাদর অভ্যর্থনা জানাতে রথ থেকে প্রাসাদের অন্তঃপুর পর্যন্ত একটি অত্যন্ত মূল্যবান এবং দুর্লভ কার্পেট বিছান হয়। অভ্যর্থনার ঘটা দেখে আগামেমনন তাঁর এই অমিতব্যয়িতার জন্য ক্লাইটীমেস্ট্রাকে একবার সস্নেহ-তিরস্কার করেন।

দীর্ঘ দশ বছর বাদে আগামেমনন রাজপুরীতে ফিরে এসে প্রাণ ভরে তৃপ্তির নিঃশ্বাস নেন। তাঁর দেহমন তখন ক্লান্তিতে অবসন্ন। ভাবেন, কতক্ষণে সুখশয্যায় গা এলিয়ে দেবেন। শুতে যাবার আগে ক্যাসাণ্ড্রার প্রতি সদয় ব্যবহার করতে তিান ক্লাইটীমেস্ট্রাকে বিশেষ ভাবে অনুরোধ করতে ভুল করেন না।

সে অনুরোধ শুনে আগামেমননের অলক্ষিতে ক্লাইটীমেস্ট্রার মুখে ক্রূর হাসি ফুটে ওঠে। মুখে বলেন,—সেজন্য তোমাকে আর অত করে বলতে হবে না ; নিশ্চিন্ত মনে তুমি বিশ্রাম কর।

প্রিয়ার আশ্বাসে আগামেমনন স্বস্তি পান। মুহূর্তের মধ্যে তাঁর চোখে ঘুম নেমে আসে।

আগামেমনন প্রাসাদে প্রবেশ করার পর শ্রীমতী ক্যাসাণ্ড্রাকেও অন্তঃপুরে যাবার জন্য অনুরোধ করা হয়েছিল। কিন্তু তিনি রথ থেকে নামেননি।

আগামেমনন গভীর নিদ্রায় মগ্ন হলে ক্লাইটীমেস্ট্রা ফিরে এসে দেখেন তখনও ক্যাসাণ্ড্রা স্থির অবিচল ভাবে বসে আছেন রথের ওপর। তাঁকে রথ থেকে নেমে আসবার জন্য ক্লাইটীমেস্ট্রা কঠিন সুরে আদেশ করেন। কোন ফল হয় না। তখন তাঁকে রূঢ় ভাষায় তিরস্কার করে মহারাণী প্রাসাদে ফিরে যান।

খানিক বাদে ক্যাসাণ্ড্রাকেও অবশ্য প্রাসাদে প্রবেশ করতে হয়। কিন্তু যাবার আগে তিনি আকাশের দিকে মুখ তুলে সূর্যদেবের উদ্দেশে অস্ফুট স্বরে বলেন,—প্রভু, কেন তুমি আমাকে এই অভিশপ্ত রাজপুরীতে নিয়ে এলে, কেনই বা ট্রয়নগরের পতন হল ? তারপর উপস্থিত জনতার দিকে ফিরে আপন মনে বলে যান, কি নির্মমভাবে থিয়েসস্টিসের সন্তানদের এই প্রাসাদে সেদিন হত্যা করা হয়েছিল এবং পিতার ওই পাপের প্রায়শ্চিত্ত হিসাবে কেমনভাবে আগামেমনন তাঁর স্ত্রীর ষড়যন্ত্রে হত হবেন। সেই পাপের ভয়াবহ পরিণতি বর্ণনা করতে করতে ক্যাসাণ্ড্রার কণ্ঠরোধ হয়ে আসে···। এবার তিনি ধীর পায়ে প্রাসাদের দিকে পা বাড়ান। তাঁর উক্তি শুনে জনতা চমকে ওঠে।

ক্যাসাণ্ড্রা অন্তঃপুরে প্রবেশ করবার অল্প সময়ের মধ্যেই আগামেমননের মর্মান্তিক আর্তনাদের শব্দ বাইরে ভেসে আসে। তা শুনে জনতা বিচলিত হয়ে ওঠে। কিন্তু ততক্ষণে সব শেষ।

মুহূর্তের মধ্যে আগামেমননের রক্তাক্ত খণ্ডিত দেহটি নিয়ে এজিস্থাসের সঙ্গে ক্লাইটীম্নেস্ট্রা জনতার সামনে হাজির হন। রক্তরাঙা তরবারিটি তখন ক্লাইটীম্নেস্ট্রার শক্ত মুঠিতে থাকলেও জনতার বুঝতে অসুবিধা হয় না—আসলে এজিস্থাসই হত্যাকারী। জনতার মাঝে এক অখণ্ড স্তব্ধতা নেমে আসে।

ক্লাইটীম্নেস্ট্রা সেই স্তব্ধতা ভাঙলেন। তিনি মুক্তকণ্ঠে জানালেন, নিরপরাধ ঈফিজিনিয়াকে তার পিতার হাতে সেদিন অহেতুক বলি হতে হয়েছিল। সেই অপরাধের জন্য আগামেমননকে হত্যা করা হল। আর কলঙ্কিনী ক্যাসাণ্ড্রা রাজপরিবারের মর্যাদা কলুষিত করেছে, তাই আগামেমননের সঙ্গে সেই ভ্রষ্টা বন্দিনীকেও প্রাণ দিতে হল।

দ্বিধাহীন কণ্ঠে তিনি বলে চলেন,—আপনারা জেনে রাখুন, এদের দু'জনের রক্তে প্রাসাদের রক্তপিপাসা মিটেছে। আজ থেকে এজিস্থাস আগামেমননের স্থানে অভিষিক্ত হল। আপনারা ওকে বরণ করে নিন।

ক্লাইটীম্নেস্ট্রার উক্তি শেষ হ'তে জনতার চোখে মুখে ঘৃণা ফুটে

ওঠে। কিছু লোক সরবে প্রতিবাদ জানায়। আবার কেউ কেউ বা চিৎকার করে জানায়,—ভুলে যেও না, তোমাদের বধিবে যে গোকুলে বাড়িছে সে ঃ ওরেস্টেস তার পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নিতে ছাড়বে না।

বিক্ষুব্ধ জনতার প্রতিবাদে অপরাধী ক্লাইটীম্নেস্ট্রা এবং এজিস্থাস দিশেহারা হয়ে ওঠেন। মরিয়া হয়ে তাঁরা জনতাকে লক্ষ্য করে বলেন,—আমরা যা করেছি, তা দেশের মঙ্গলের জন্যই। তা কিছু অপরাধ বা অন্যায় হয় নি। মহাকাল একদিন সেকথা প্রমাণ করবে।

ওদিকে ক্রমে ক্রমে ওরেস্টেস একজন বলিষ্ঠ যুবক হয়ে ওঠে। দীর্ঘকাল দেশান্তরে থেকে পিতামাতা এবং দেশের খবর জানবার জন্য তার মন কৌতূহলী হয়।

একদিন ছদ্মবেশে ওরেস্টেস এসে হাজির হয় আরগস নগরে। নগরে পা দিয়ে সে মাতৃদেবীর সব কুকীর্তির খবরই জানতে পারে। পিতার নিষ্ঠুর হত্যার কথা শুনে প্রতিহিংসার আগুনে সে জ্বলে ওঠে। সংকল্প সিদ্ধির জন্য সে দেবরাজের কাছে শক্তি প্রার্থনা করে।

ঘটনাচক্রে ওরেস্টেস এবং তার ভগ্নী ইলেক্ট্রার মধ্যে পরিচয় ঘটে আগামেমননের সমাধিস্তম্ভে। উভয়ে পিতৃহত্যাকারীদের হত্যা করতে সংকল্পবদ্ধ হয়।

ক'দিন বাদে ওরেস্টেস কৌশলে রাতের অন্ধকারে প্রাসাদের অন্তঃপুরে প্রবেশ করে দেখতে পায় এজিস্থাসকে। এজিস্থাস তাকে দেখে চমকে ওঠে। ওরেস্টেস তাকে আক্রমণ করে বসে। এজিস্থাস আত্মরক্ষার কথা ভাববারও অবকাশ পায় না—মুহূর্তের মধ্যে আগন্তুকের শাণিত তরবারির আঘাতে এজিস্থাসের রক্তাক্ত দেহ লুটিয়ে পড়ে।

ওরেস্টেস সেখানে আর দাঁড়ায় না, উন্মাদের মত ছুটে যায় ক্লাইটীম্নেস্ট্রার শয়নকক্ষে। ওরেস্টেস গিয়ে তাঁর মুখোমুখি দাঁড়ায়; শাণিত তরবারি তার শক্ত মুঠিতে ধরা, সে তরবারি থেকে তখনও এজিস্থাসের তাজা রক্ত টপ্‌টপ্‌ করে ঝরে পড়ছে। ক্রোধে ওরেস্টেসের

নাসারন্ধ্র স্ফীত, তার চোখ থেকে আগুন ঠিকরে পড়ে, মুখে প্রতিহিংসার সুস্পষ্ট ছাপ।

ছদ্মবেশী এই ভীষণমূর্তি আগন্তুকটিকে ক্লাইটীম্নেস্ট্রার চিনতে বিলম্ব হয় না। কাতরকণ্ঠে তিনি বলেন,—

আমি যে তোমার মা।

ওয়েস্টেস দৃঢ়কণ্ঠে জানায়,—

তুমি ডাইনী, বংশের কলঙ্ক, পাতকিনী।

—তবুও আমি তোমার মা। আমার এ স্তন্য খেয়েই তুমি বড় হয়েছো। আমাকে প্রাণে মেরো না। —এ যেন ক্লাইটীম্নেস্ট্রার জীবনের শেষ মিনতি ঃ প্রাণভিক্ষা।

তাঁর উক্তি শুনে ওয়েস্টেস ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নিয়ে, বজ্রকঠিন কণ্ঠে গর্জন করে ওঠে,—

তুমি কালসাপ, পরম শত্রু। পিতৃহন্তার কোন ক্ষমা নেই।

ক্লাইটীম্নেস্ট্রা আরও কি যেন বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু সুযোগ পেলেন না। ওয়েস্টেস হাতের শাণিত তরবারিটি তাঁর বুকে আমূল বসিয়ে দেয়। পিতৃহন্ত্রীর রক্তধারা দেখে আত্মজের রোষ প্রশমিত হয়।

এবার ওয়েস্টেস দুই শত্রুর ছিন্ন মস্তক দু'হাতে তুলে নিয়ে রাজপ্রাসাদের বাইরে এসে সূর্যদেব অ্যাপলোকে প্রণাম জানায়। বলে,—প্রভু, আপনার জন্য দুঃসাধ্য কাজ সুষ্ঠুভাবে সমাপ্ত করতে পেরে আমি ধন্য।

কিন্তু মুহূর্তের মধ্যে ওয়েস্টেস তার পাপের গভীরতা উপলব্ধি করে চমকে ওঠে। তার অন্তরে বিবেক-দংশনের তীব্র জ্বালা শুরু হয়। সেই সঙ্গে তার মা-র আত্মার নির্দেশে 'ছায়া-বৈরী'র দল প্রতিহিংসা নিতে ওয়েস্টেসের মুখোমুখি এসে দাঁড়ায়। বিভ্রান্ত ওয়েস্টেস দিশেহারা হয়ে ওঠে।

ছায়া-বৈরীদের নির্মম তাড়নায় উত্ত্যক্ত হয়ে ওয়েস্টেস উন্মাদের মত দেশ থেকে দেশান্তরে নিরন্তর ঘুরে বেড়ায়। কোথাও ক্ষণিকের জন্য সে

শান্তি পায় না। আশ্রয়ের জন্য অসহায় ওরেস্টেস এক সময় কোন একটি মন্দিরে প্রবেশ করে।

পুণ্যস্থানের সেই স্নিগ্ধ, শান্ত পরিবেশে তার ক্লান্ত চোখ দু'টিতে বুঝি একটু তন্দ্রা নেমে আসে। এমন সময় মন্দিরের পুরোহিত তার দিকে হা-হা করে ছুটে আসেন। চিৎকার করে তিনি জানান, আগন্তুকের সঙ্গের ছায়া-বৈরীরূপী অপদেবতাদের আবির্ভাবে মন্দিরের পবিত্রতা কলুষিত হচ্ছে।

ওরেস্টেস ধড়মড় করে উঠে বসে। ভাবে,—আশ্চর্য, মন্দিরে এসেও স্বস্তি নেই, সর্বনাশা ছায়া-বৈরীদের হাত থেকে ক্ষণিকের জন্যও মুক্তি নেই। অগত্যা সে অ্যাপলো দেবের শরণাপন্ন হয়। ভক্তের আকুল আহ্বানে দেবতা এসে তাকে জানান,—বৎস, আমি তোমার শত্রুদের ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছি। এই ফাঁকে তুমি একটু বিশ্রাম করে নাও। তারপর তুমি দেবী আথেনার মন্দিরে গিয়ে তাঁর আরাধনা করে পাপের কবল থেকে মুক্তিলাভ কর।

অ্যাপলো দেবের বাণী তখনও শেষ হয়নি। ক্লাইটীমেস্ট্রার আত্মার নির্দেশে ছায়া-বৈরীর দল ছুটে এসে ওরেস্টেসকে আবার উত্ত্যক্ত করতে শুরু করে। অ্যাপলো দেব অপদেবতাদের ওই স্থান পরিত্যাগ করতে আদেশ করেন।

সে আদেশ শুনে অপদেবতারা সূর্যদেবতার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তাঁকে অনুযোগ করে: যত নষ্টের গোড়া আপনি। ক্লাইটীমেস্ট্রা এবং এজিস্থাসের অপমৃত্যুর জন্য আপনিই দায়ী। তারা জানায়, তাদের দু'জনের অপরাধের তুলনায় মাতৃহত্যার অপরাধে ওরেস্টেস অনেক বেশী অপরাধী।

বজ্রকঠিন কণ্ঠে অ্যাপলো দেব ছায়া-বৈরীদের জানান,—তোমাদের এ অভিযোগ মিথ্যা নয়। ওরেস্টেস আমার ইচ্ছায় তার মাকে হত্যা করেছে। তবে কার পাপ বেশী সে অনধিকার চর্চা তোমরা করো না। সে বিচার করবেন দেবী আথেনা।

অ্যাপলো দেবের নির্দেশে ওরেস্টেস গিয়ে হাজির হয় আথেনা দেবীর মন্দিরে। সে আকুলভাবে দেবীর করুণা প্রার্থনা করে। দেবী একসময় ওরেস্টেসকে দর্শন দিয়ে জানান,—ঘটনাচক্রে বিষয়টি অত্যন্ত জটিল রূপ নিয়েছে। তাঁর একার পক্ষে ওরেস্টেসের অপরাধ বিচার করা সম্ভব নয়। সুবিচারের জন্য এক বিচারকমণ্ডলীর প্রয়োজন।

নির্ধারিত দিনে আসামী ওরেস্টেসের অপরাধের বিচারের জন্য অ্যাথেন্স নগরে দেবী আথেনার নেতৃত্বে বিচারকমণ্ডলীর সভা বসে। সাক্ষী হিসাবে অ্যাপলো দেবও সে সভায় উপস্থিত থাকেন।

আসামীর অপরাধের গুরুত্ব সম্বন্ধে অনেকেই বললেন। তার বিরুদ্ধে অভিযোগই বেশী শোনা গেল। তবুও তাঁরা চাইলেন ওরেস্টেসের বক্তব্য শুনতে।

বলবার সুযোগ পেয়ে ওরেস্টেস বিচারকমণ্ডলীকে সম্বোধন করে বলে—

আমার অপরাধ স্বীকার করছি। কিন্তু আমি ভেবে পাই না, আমার মাতা স্বামী-হত্যার অপরাধ থেকে কি করে বিনা বিচারে মুক্তি পেয়েছিলেন?

তাঁরা জানান,—তোমার পিতামাতার মধ্যে কোন রক্তের সম্বন্ধ ছিল না। কিন্তু তোমার ক্ষেত্রে সে সম্বন্ধ অস্বীকার করতে পার না। তুমি আত্মজ হয়ে ক্লাইটামেস্ট্রাকে হত্যা করেছো। তাই তাঁর অপরাধের তুলনায় তোমার অপরাধ গুরুতর।

বিচারকদের উক্তি শুনে অ্যাপলো দেব এগিয়ে আসেন ওরেস্টেসের স্বপক্ষে কিছু বলতে। বিচারকদের সম্বোধন করে তিনি বলেন,—দুঃখের বিষয়, আপনাদের অভিযোগে ত্রুটি থাকছে। ভেবে দেখুন, আগামেমননের ঔরসেই ওরেস্টেসের জন্ম। সে ক্লাইটামেস্ট্রার গর্ভজাত মাত্র। স্বর্গত আগামেমননের পরিচয়ই ওরেস্টেসের আসল বংশ-পরিচয়। সুতরাং, ওরেস্টেস তার বংশের কাউকে হত্যা করার

অপরাধে অপরাধী নয়। ওর বিরুদ্ধে অভিযোগ ভিত্তিহীন, তা সম্পূর্ণ মিথ্যা।

বিচারকমণ্ডলী অ্যাপলো দেবের যুক্তি শুনে বিচলিত হন। বুঝতে পারেন, তাঁরা এদিকটা ভেবে দেখেন নি। অ্যাপলো দেবের যুক্তি সমর্থন করতে তাঁদের মনে দ্বিধা থাকে না। দেবী আথেনা ওয়েস্টেসের স্বপক্ষেই রায় দেন।

দেবী আথেনার এ বিচারের পর ছায়া-বৈরীদের আর সাহস হয় না ওয়েস্টেসের কাছে যেতে। ওয়েস্টেস নিশ্চিন্ত হয়। দেবীর আশীর্বাদে সে ছায়া-বৈরীদের কবল থেকে মুক্তি পায়···সে মুক্তিলাভ করে তার অভিশপ্ত জীবন থেকে।

মিডিয়া

[গ্রীক নাট্যকার এউরিপিদেস্ (Euripides)-এর **'মিডিয়া'** (Medea), খ্রীঃ পূঃ ৪৩১, নাটকের গল্প।]

মিডিয়া অপরূপ রূপবতী, তন্বী তরুণী। সুদর্শন যুবক য়াসোন মিডিয়ার রূপে মুগ্ধ। সে ভাবে, নাই বা হোল মিডিয়া সম্ভ্রান্ত বংশের মেয়ে কিন্তু তার রূপের তুলনা কোথায়? তারা পরস্পর পরস্পরের প্রতি গভীর আকর্ষণ বোধ করে। য়াসোন একদিন মিডিয়াকে প্রেম নিবেদন করে। মিডিয়া দয়িতকে আত্মদান করে তৃপ্তির নিঃশ্বাস নেয়।

কিছুদিন যেতে কুমারী মিডিয়া তার প্রেমিককে পরপর তু'টি পুত্র-সন্তান উপহার দেয়। প্রেমিক-যুগল মুগ্ধদৃষ্টিতে সুন্দর শিশু তু'টির দিকে তাকিয়ে থাকে। ভাবে, তাদের প্রেম সার্থক—তাদের জীবন ধন্য।

আরও কিছুদিন পরের কথা। মিডিয়ার প্রতি য়াসোনের প্রেম কি জানি কেন শ্লথ হয়। মাঝে মাঝে সে কেমন আনমনা থাকে। মিডিয়া প্রেমিকের এ ভাবান্তরের কারণ বুঝতে পারে না, বোঝবার চেষ্টাও করে না। ভাবে, ও কিছু নয়, হয়ত এ ওঁর ভাবুক-মনের ব্যঞ্জনা।

একদিন য়াসোন তার প্রাণপ্রতিম আত্মজ তু'টি আর মিডিয়াকে ছেড়ে হঠাৎ কোথায় উধাও হয়ে যায়। মিডিয়া তবুও কিন্তু বিচলিত হয় না।

দিন যায়। ক্রমে মাসের পর মাস গড়িয়ে যায়। য়াসোন ফিরে আসে না। মিডিয়া চিন্তিত হয়। এবার তার মনে সন্দেহ উঁকি দেয়।

একাকী বসে সেদিনও সে চিন্তায় মগ্ন। এমন সময় তার পরিচারিকা ঘরে ঢোকে।

পরিচারিকাটি মিডিয়ার প্রিয় সঙ্গিনীও ছিল। সে মিডিয়ার সব খবরই জানত ; মনের হদিসও রাখত।

পরিচারিকার ডাকে মিডিয়ার চমক ভাঙ্গে।

—বসে বসে অত কি ভাবছো, ঠাকরুণ ? দরদী কণ্ঠে পরিচারিকা প্রশ্ন করে।

না কিছু নয়।

তুমি মিছে লুকোবার চেষ্টা করছো ! আমি কিন্তু জানি। মনে হয়, কিছু একটা ঘটেছে···তাই তিনি ফিরে আসছেন না।

পরিচারিকার উক্তি শুনে মিডিয়া হঠাৎ ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। যেন সে এতদিনে তার সমস্যার সমাধান খুঁজে পায়। উত্তেজিত কণ্ঠে সে জানায়,—আমি মানবী, তাই মনটাকে চট্ করে অস্বীকার করতে পারি না। কিন্তু ভুলে যেও না,—আমি একজন যাদুকরী, ইন্দ্রজালে সিদ্ধহস্ত। ওঁর ফিরে না-আসবার কারণ আমি খুঁজে বার করবই। আর, সে-কারণ জানবার পর স্থির করব তার প্রতিকারের যোগ্য ব্যবস্থা। আমার নাম—মিডিয়া।

পরিচারিকা ঠাকরুণের ভয়ঙ্কর রূপ দেখে ভয় পায়। সে তাঁকে শান্ত করবার ব্যর্থ চেষ্টা ক'রে একসময় ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

আরও কিছুদিন গড়িয়ে যায়। মিডিয়ার কাছে য়াসোন ফিরে আসে না। তার ফিরে না-আসবার কারণটা আর চাপা থাকে না। মিডিয়াও একসময় জানতে পারে,—য়াসোন কোরিন্থ-এর সুন্দরী রাজ-কন্যা গ্লসকে বিয়ে করে সুখে ঘর করছে···

খবরটা শুনে মিডিয়া প্রথমে মর্মাহত হয়েছিল বৈকি কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সে জ্বলে ওঠে। প্রেমিকের এই প্রতারণার মারাত্মক প্রতিশোধ নেবার জন্য সে দৃঢ় সংকল্প করে।

মিডিয়ার স্বরূপ পরিচারিকার অজানা ছিল না। ঠাকরুণের এ-সংকল্পের পরিণামের বিভীষিকা মানশ্চক্ষে দেখে সে চমকে ওঠে।

বুঝতে পারে তার এ রোষানলে শুধু য়াসোনই দগ্ধ হবে না—কোরিন্থ সাম্রাজ্যও নিষ্কৃতি পাবে না ; হয়ত সেই সঙ্গে তার গর্ভজাত নিরপরাধ শিশু দু'টিও। কারণ, মিডিয়ার চোখে শিশু দু'টি এখন ঘৃণ্য য়াসোনের আত্মজ—তার মাতৃত্বের প্রশ্নটা গৌণ, অবান্তর। বিমূঢ় পরিচারিকা শিশু দু'টির নিরাপত্তার কথা ভেবে শঙ্কিত হয়ে ওঠে।

ক্রিয়োন শুধু কোরিন্থের অধিপতি-ই ছিলেন না, গ্লস-এর স্নেহশীল পিতাও বটে। মিডিয়ার এই সর্বনাশা প্রতিজ্ঞার কথা তাঁর কানে পৌঁছুতে সঙ্গে সঙ্গে তিনি মিডিয়াকে তার সন্তান দু'টিকে নিয়ে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে তাঁর সাম্রাজ্য ছেড়ে চলে যেতে আদেশ দেন।

সম্রাটের এ-আদেশ যেন আগুনে ঘি ঢালে। তাঁর হুকুম শুনে মিডিয়া জ্বলে ওঠে। ভাবে, এত বড় স্পর্ধা! এ অপমান সে কিছুতেই সহ্য করবে না।

ধূর্তা নারীর মাথায় কূট বুদ্ধি খেলে যায়। তার মুখে ফুটে ওঠে ক্রূর হাসি। ছলনাময়ী মহা-অপরাধিনীর মুখোস প'রে বিনম্র পায়ে এগিয়ে যায় সরাসরি সম্রাটের কাছে। ভাবখানা দেখায়, সে যেন মহাপাতকিনী, অনুতাপে দগ্ধ। করজোড়ে, আনতমুখে মিডিয়া দাঁড়িয়ে থাকে সম্রাটের কাছে।

—বল, কি বলতে চাও।

সম্রাটের কণ্ঠস্বরে মিডিয়া আরও নুয়ে পড়ে। আর্দ্র কণ্ঠে বলে,—সম্রাট, জানি আমার অপরাধের সীমা নেই। তবুও যাবার আগে অভাগীর একটি মাত্র নিবেদন···

বল।

আপনার এ রাজ্য ছেড়ে হতভাগা শিশুদু'টিকে নিয়ে কোথায় ঠাঁই পাবো জানি না। ভেবেও কোন কূল পাচ্ছি না। আপনি করুণাময়। দয়া করে যদি আপনার এ রাজ্যে মাত্র আর একটি দিন আমাকে আশ্রয় দেন!

তথাস্তু।

এত সহজে কার্যসিদ্ধি হবে মিডিয়া ভাবেনি। সে খুশিমনে বাড়ি ফিরে আসে। প্রতিহিংসার ষড়যন্ত্র সে আগে থেকেই করছিল। তার পরিকল্পনার সূচীও ছকে আঁটা ছিল। শুধু একটি মাত্র সমস্যা ছিল,—সে-রাজ্য ছাড়বার পর একটি নিরাপদ আশ্রয়ের আশ্বাস। মিডিয়া ভেবে পাচ্ছিল না, কি করে তা সম্ভব হবে। তাই আরও একদিন সেখানে থাকবার জন্য সম্রাটের কাছে ঐ আকূতির ছলনা।

এথেন্স-এর অধিপতি এজিয়াস ঐ সময় কোথা থেকে সফর সেরে কোরিন্থ হয়ে দেশে ফিরছিলেন। তিনি ছিলেন মিডিয়ার একজন হিতৈষী বন্ধু। মিডিয়া হাতে স্বর্গ পায়। সে বন্ধুকে তার বিপদের কথা খুলে বলে। প্রতিহিংসার পরিকল্পনাটিও এজিয়াসকে জানাতে মিডিয়া দ্বিধা করে না।

সব শুনে এজিয়াস বান্ধবীর দুঃখে বেদনা বোধ করেন। তিনি তাকে সমবেদনা জানান। নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য মিডিয়াকে তিনি তাঁর রাজ্যে সাদর অভ্যর্থনা জানান। বন্ধুর কাছে আশ্রয়ের আশ্বাস পেয়ে মিডিয়া স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে।

গোড়াতে মিডিয়া ভেবেছিল,—য়াসোন, রাজকুমারী গ্লস এবং তার পিতাকে কৌশলে হত্যা করে সে তার অপমানের যোগ্য প্রতিশোধ নেবে। কিন্তু সে আবার ভাবে, য়াসোন তার জীবনের বড় শত্রু—তাকে এক্ষুনি মেরে ফেললে শত্রুর উপকারই করা হবে। সেক্ষেত্রে সে পাবে মুক্তি। এমন কিছু করা দরকার যাতে ক'রে সে বৃদ্ধকালে চরম লাঞ্ছনা ভোগ ক'রে তিলে তিলে দগ্ধে মরে।

মিডিয়া তাই স্থির করে, য়াসোনকে হত্যা করা চলবে না। তাকে স্পর্শ না করে তার কাছ থেকে চিরকালের মত সরিয়ে নিতে হবে প্রেয়সী রাজকুমারীকে, সম্রাট ক্রিয়োনকে এবং য়াসোনের আত্মজ দু'টিকেও।

মিডিয়া কৌশলে য়াসোনকে একবার তার সঙ্গে দেখা করবার জন্য বিশেষ অনুরোধ জানায়। সে অনুরোধ রাখতে য়াসোন ছুটে আসে। ছলনাময়ী নারী তার মনোমোহিনী রূপ ধ'রে এগিয়ে গিয়ে সাদর অভ্যর্থনা জানায় পুরনো দয়িতকে। কোমল কণ্ঠে বলে,—

বিশ্বাস করো, আমার অপরাধের জন্য আমি অনুতপ্ত। আমি ভুল বুঝে তোমার বিরুদ্ধ সমালোচনা করেছিলাম। তুমি গ্লসকে বিয়ে করে এতটুকুও অন্যায় করোনি। দয়া করে তুমি আমাকে ক্ষমা করো। এ রাজ্য ছেড়ে যাবার আগে এই একটি মাত্র মিনতি তোমার কাছে।

নারীর ছলনা বুঝতে পারে পুরুষের সাধ্য কি? য়াসোন তখনও মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে মিডিয়ার দিকে। তার উক্তি শুনে সে স্তম্ভিত হয়।

আসোন তার উত্তরের ভাষা খুঁজে পায় না। আবেগ-জড়ান কণ্ঠে বলে,—এসব তুমি কি বলছো? কেন তুমি আমাকে অপরাধী করছো, প্রিয়তমে?

চতুর মিডিয়া বুঝতে পারে, তার ওষুধে কাজ হয়েছে। এবার সে এগিয়ে গিয়ে য়াসোনের গা-ঘেঁসে দাঁড়ায়। বলে,—তুমি যদি অনুমতি দাও তো যাবার আগে আমার অনুতাপের নিদর্শন স্বরূপ তোমার স্ত্রী রাজকুমারীকে একটি উপহার পাঠাতে ইচ্ছা করি। ভয় নেই, আমি নিজে যাবার স্পর্ধা করি না। উপহারটি তোমার পুত্র দু'টির হাত দিয়েই পাঠাবো।

য়াসোন মিডিয়ার নবরূপ আর তার অদ্ভুত প্রীতিপূর্ণ আচরণে মুগ্ধ হয়। খুশির উচ্ছ্বাসে য়াসোন তাকে জানায়,—এ তো আনন্দের কথা। আচ্ছা, এবার তোমার অনুমতি পেলে আমি উঠি। রাজকুমারীকে সুখের খবরটা দেবার জন্য য়াসোন তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে।

য়াসোনের সামনে নিজের নিখুঁত অভিনয়ের কৃতিত্ব উপলব্ধি করে মিডিয়া ক্ষণিকের জন্য আত্মহারা হয়ে পড়ে। কিন্তু আসল কাজের কথা মনে পড়তে তার সম্বিৎ ফিরে আসে। ভাবে, সময় আর খুব বেশি নেই। এ অল্প সময়ের মধ্যেই তার কাজ হাঁসিল করতে

হবে। সে ব্যস্ত হয়ে উঠে দাঁড়ায়। তার মুখে ফুটে ওঠে দৃঢ় সংকল্পের ব্যঞ্জনা।

মিডিয়া তার বাক্স খুলে বহু যত্নে রক্ষিত একটি মনোরম রাজপোষাক এবং একটি সোনার মুকুট বার করে। এ'দুটি একসময় তার পিতামহ সূর্যদেবতা তাকে উপহার দিয়েছিলেন।

মিডিয়া জানে, এ উপহার পেয়ে রাজকুমারী আনন্দে নেচে উঠবে। উপহার দু'টি পুত্রদের হাতে তুলে দেবার আগে মিডিয়া তাতে কি এক মারাত্মক বিষ মিশিয়ে মন্ত্র পড়ে দেয়! সরল শিশু দু'টি মা'র নির্দেশ মত উপহার নিয়ে রাজকুমারীর হাতে পৌঁছে দিতে চলে যায়।

সত্যিসত্যি উপহার দেখে রাজকুমারীর চক্ষুস্থির। খুশিতে গ্লস আত্মহারা হয়ে পড়ে। সে মুগ্ধদৃষ্টিতে উপহার দু'টির দিকে তাকিয়ে থাকে।

গ্লস-এর আর তর সয় না। ছেলে দু'টি এবং য়াসোন তার ঘর থেকে বেরিয়ে যেতেই গ্লস ঐ পোষাক আর মুকুট নিয়ে সাজতে বসে। ঐ অপূর্ব সুন্দর পোষাকে রাজকুমারীর রূপ যেন ফেটে পড়ে। মনে মনে হয়তো সে ক'বার মিডিয়াকে ধন্যবাদ জানিয়েছে, তারিফ করেছে তার রুচির।

নিয়তির লিখন। বেশীক্ষণ গেল না। অল্পসময়ের মধ্যেই যাদুকরীর বিষের প্রতিক্রিয়া শুরু হয়।

নতুন পোষাকটি পরে রাজকুমারী অন্তঃপুরে একটু পায়চারী করছিল। হঠাৎ সে কেমন গরম বোধ করে, কেমন এক অস্বস্তি। তার গা থেকে অনর্গল ধারায় ঘাম বেরুতে থাকে। গরমের জ্বালা বেড়ে যায়। ক্রমে গ্লস বুঝতে পারে, তার অসহ্য জ্বালার উৎস—পোষাক এবং মুকুটটি। সে ওদু'টি থেকে নিজেকে মুক্ত করতে প্রাণপণে চেষ্টা করে। কিন্তু পারে না।

দেখতে দেখতে পোষাক এবং মুকুটটি গ্লস-এর অঙ্গে বসে যায়। অসহ্য জ্বালা-যন্ত্রণায় রাজকুমারী আর্তনাদ করে ওঠে। ঐ অভিশপ্ত ভূষণ থেকে নিজেকে মুক্ত করতে সে শুধু ব্যর্থ চেষ্টা করে। তারপর অসহায় ভাবে কিছুক্ষণ দাপাদাপি করে তার নিস্পন্দ দেহ মাটিতে লুটিয়ে পড়ে।

কন্যার মর্মান্তিক আর্তনাদ শুনতে পেয়ে স্বয়ং সম্রাট ছুটে আসেন ঘটনাস্থলে। ততক্ষণে গ্লস মুক্তি পেয়েছে। কন্যাকে স্পর্শ করতে পিতারও ঐ একই পরিণাম হয়। নিমেষে পিতা এবং কন্যার ভয়াবহ মৃত্যুতে রাজপুরীতে নেমে আসে এক অখণ্ড শোকের ছায়া।

কিছু পরে অবোধ শিশু দু'টি মার কাছে ফিরে আসে। আনন্দে তারা দু'জন একসঙ্গে মিডিয়াকে জড়িয়ে ধরে। তাদের নিবিড় স্পর্শে একই সঙ্গে স্নেহ আর ঘৃণার আবর্তে পড়ে মিডিয়া দিশেহারা হয়ে ওঠে।

একসময় মিডিয়ার অন্তরের পশুসত্তা তার মাতৃসত্তাকে নির্মম ভাবে পায়ে দলে মাথা উঁচু করে সামনে এসে দাঁড়ায়। সঙ্গে সঙ্গে মিডিয়ার মনে জেগে ওঠে য়াসোনের আত্মজ দু'টির প্রতি গভীর ঘৃণা আর বিদ্বেষ। নিষ্পাপ শিশু দু'টি চিরতরে হারিয়ে যায় তাদের মা'র মন থেকে। অবাক বিস্ময়ে শিশু দু'টি চেয়ে থাকে মা'র সেই অদ্ভুত দৃষ্টির দিকে।

এমন সময় কে একজন ছুটে এসে মিডিয়াকে রাজা এবং রাজকন্যার মৃত্যুসংবাদ জানাতে তার সম্বিৎ ফিরে আসে। তখন তার মুখে ফুটে ওঠে ক্রূর হাসি। সে ভাবে, না আর একটুও দেরী নয়। মিডয়া এবার হতভাগ্য ছেলে দু'টির হাত ধরে নিজের ঘরে ঢুকে ভেতর থেকে শক্ত করে দরজা এঁটে দেয়।

খানিক বাদে সেই বদ্ধ ঘর থেকে শিশুপুত্র দুটির মর্মান্তিক আর্তনাদ ভেসে আসে। সে কান্না শুনে আশপাশ থেকে নারী-পুরুষ ছুটে এসে ভীড় জমায় ঘরের দরজার সামনে। সেই আর্তনাদের রেশ যেন তখনও তাদের কানে ভেসে আসে। বিভ্রান্ত জনতা অসহায় ভাবে বাইরে দাঁড়িয়ে শুধু ভীড় জমায়। ততক্ষণে মিডিয়া শিশু দুটিকে শাণিত অস্ত্রের দ্বারা শেষ করে দিয়েছে।

গ্লস এবং তার পিতার মৃত্যুসংবাদ য়াসোনের কানে পৌঁছুতে সে চমকে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে সেই সর্বনাশা উপহারের কথা তার মনে পড়ে যায়। অমনি সে আত্মজ দু'টির নিরাপত্তার চিন্তায় অস্থির হয়ে ওঠে। তাদের সন্ধানে সে ছুটে যায় মিডিয়ার বাড়ির দিকে।

বাড়ির সামনে জনতার ভীড় দেখে য়াসোন প্রথমে থমকে দাঁড়ায়। এগিয়ে গিয়ে সব কিছু শুনে সে উন্মাদের মত বদ্ধ দরজায় ঘা দেয়। মিডিয়ার কাছে করুণ ভাবে মিনতি করে,—তোমার পায়ে পড়ি, দরজা খোল, আমার ছেলে দু'টিকে দয়া করে ভিক্ষা দাও।

কোন ফল হয় না। মিডিয়া দরজা খোলে না। হঠাৎ সেই দরজার ওপর থেকে এক বিকট অট্টহাসি শুনতে পেয়ে য়াসোন চমকে ওঠে। দেখে, ভয়ঙ্করী মিডিয়া নিহত শিশু দু'টিকে দু'হাতে নিয়ে বসে আছে এক রথে।

য়াসোন কত অনুনয় করে,—দয়া করে ফিরিয়ে দাও পুত্র দুটিকে। অন্ততঃ শেষ বারের মত ওদের আর একবার ভাল করে আমাকে দেখতে দাও।

তার উক্তি শুনে মিডিয়া ব্যঙ্গ করে বলে ওঠে,—তোমার শাস্তির সবে শুরু হ'ল। সারা জীবন একাকিত্বের বেদনার দহনে জ্বলে মরবে। অশান্তির বোঝা বয়ে তিল তিল করে মরবে। একটু থেমে মিডিয়া জানায়,—আমারও কষ্ট বড় কম হবে না। তবে আমি যোগ্য প্রতিশোধ নিয়েছি তোমার ওপর। সেটাই হবে আমার দুঃখের প্রলেপ, একমাত্র সান্ত্বনা।

মিডিয়ার কথা শেষ হ'তেই তার রথের ড্রাগন দু'টি পাখা মেলে দেয় আকাশ-পথে। নিমেষে তা অন্তর্হিত হয়। রথটি প্রথমে হেরা দেবীর পাহাড়ে থামে। সেখানে শিশু দুটিকে কবর দেওয়া হ'লে, মিডিয়ার নির্দেশে রথটি এথেন্সের দিকে দ্রুত এগিয়ে যায়।

শত্রুর ওপর এরকম প্রতিশোধ নিয়ে তার আকাঙ্ক্ষিত এথেন্স নগরে এসে মিডিয়ার মনেও শান্তি থাকে না। তার মনের মধ্যে অহরহ আগুন জ্বলতে থাকে। সেখানে দুঃখে কষ্টে—লতা-পাতা আর গাছের পোকা-মাকড় খেয়ে তার অভিশপ্ত জীবনের বাকী দিনগুলি কাটে।

মেঘ

[গ্রীক নাট্যকার আরিস্তোফানেস্ (Aristophanes)-এর **'দি ক্লাউডস্'** (The Clouds), খ্রীঃ পূঃ ৪২৩, নাটকটির গল্পরূপ।]

সেদিন এথেন্স নগরের আকাশটি ছিল নির্মল, নির্মেঘ—প্রকৃতি ছিল মনোরম, খুশিতে উচ্ছল। কিন্তু স্ট্রীপিয়েডস-এর মন ছিল মেঘাচ্ছন্ন, দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন।

একাকী বসে স্ট্রীপিয়েডস ভাবছিলেন,—একদিন তো তাঁর কোন কিছুরই অভাব ছিল না। তাঁর ছিল নাম, যশ, মান, অর্থ, প্রতিপত্তি; ছিল তাঁর সুখের সংসার। চোখের ওপর সব উবে গেল। তাঁর সাজান বাগান শুকিয়ে গেল। আজ পাওনাদারদের অজস্র তাগাদা আর নিষ্ঠুর অভাবের তাড়নায় তিনি দিশেহারা। অসহ্য এ লাঞ্ছিত জীবন। তিনি ভাবেন,—কেন? কেন তাঁর আজ এই দুর্দশা!

হঠাৎ তাঁর ছেলের কথা মনে হতে স্ট্রীপিয়েডস-এর মনটা বিতৃষ্ণায় ভরে ওঠে। তাঁর কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে পড়ে। নতুন করে তিনি উপলব্ধি করেন, তাঁর এই চরম দুর্দশার জন্য উচ্ছৃঙ্খল বাউণ্ডুলে ছেলেই দায়ী। ছেলে নয়তো যেন পরম শত্রু। ছেলের কথা তিনি আর ভাবতে চান না। আসলে তিনি ভাবছিলেন, কি করে এই অভিশপ্ত জীবন থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব, সংসারটিকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচান যায়। কে শোনাবে তাঁকে আশার বাণী, কোথায় পাবেন তিনি বাঁচার আশ্বাস? এমন সময় সোফিস্টদের তর্কবিদ্যার কথা মনে পড়ায় তিনি সোজা হয়ে উঠে বসেন। মরুভূমির ভেতর তিনি যেন মরীচিকার ঝিলিক দেখেন।

স্ট্রীপিয়েডস-এর মনে পড়ে, কোন এক সময় কার কাছে তিনি শুনেছিলেন—সোফিস্ট তর্কবিদ্যার বলে নাকি পাওনাদারদেরও সহজেই বিভ্রান্ত করা সম্ভব। দেনদার সে-বিদ্যায় পারদর্শী হলে তার যুক্তিপূর্ণ তর্কের জালের ফাঁদে পড়ে দুর্ধর্ষ পাওনাদারও তার পাওনার কথা ভুলে গিয়ে পালাবার পথ পায় না। এমনি নাকি সে-বিদ্যার মাহাত্ম্য!

এ বিদ্যার কথা সেদিন যখন স্ট্রীপিয়েডস শুনেছিলেন তখন তার ওপর তিনি অত গুরুত্ব দেন নি। কিন্তু আজ অভাব-সমুদ্রে পড়ে ঐ তত্ত্বটি তিনি তৃণখণ্ডের মত আঁকড়ে ধরেন। তিনি ধরে নেন, এ বিদ্যাই তাঁর মুস্কিল আসান করবে।

স্ট্রীপিয়েডস তাঁর ছেলেকে সোফিস্টদের বিদ্যালয়ে অবিলম্বে ভর্তি হয়ে তাদের তর্ক-বিদ্যায় পারদর্শী হবার জন্য বলেন।

ছেলে তখন ঘোড়দৌড়-বিদ্যায় মশগুল, ঘোড়ার ওপর গবেষণায় মগ্ন। অন্য কোন লেখাপড়ার কথা ভাববার তার সময় কোথায়? শ্রীমান এ প্রস্তাবে বিরক্তি বোধ করে। তার মনোভাব মুক্তকণ্ঠে পিতাকে জানাতে সে এতটুকুও দ্বিধা করে না।

পিতা বুঝলেন, তাঁর সাধের ছেলেটি একেবারে উচ্ছন্নে গেছে। ওর পেছনে সময় নষ্ট করা বৃথা। অগত্যা ঐ বৃদ্ধ বয়সে তিনি নিজেই সে-বিদ্যালয়ে ভর্তি হবেন স্থির করেন।

স্ট্রীপিয়েডস সোফিস্টদের বিদ্যালয়ে গিয়ে হাজির হন। অধ্যক্ষের সঙ্গে দেখা করে তাঁর কাছে নিজের কঠিন সমস্যার কথা খুলে বলে তিনি অধ্যক্ষের সাহায্য প্রার্থনা করেন।

স্ট্রীপিয়েডস-এর সমস্যাকে কেন্দ্র করে অধ্যক্ষ জটিল তর্কের অবতারণা করেন। ঐ কুশলী-তর্ক শুনে স্ট্রীপিয়েডস মুগ্ধ হন। ভাবেন, এ বিদ্যার প্রসাদে তাঁর সমস্যার সমাধান হবে। তিনি পাবেন বিপদ থেকে মুক্তি। মনে মনে তিনি ঈশ্বরকে কৃতজ্ঞতা জানান। তাঁর মুখে ফুটে ওঠে স্বস্তির ছাপ।

বিদ্যালয়ে ভর্তি হবার জন্য তিনি অধ্যক্ষের কাছে প্রস্তাব করেন।

তাঁর প্রস্তাব শুনে অধ্যক্ষ ইতস্তত ক'রে স্ট্রীপিয়েডস-এর বয়সের প্রতি ইঙ্গিত করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁর ঐকান্তিক আগ্রহে অধ্যক্ষ সম্মত হন।

স্ট্রীপিয়েডস-এর অনুশীলন বা চেষ্টার কোন ত্রুটি ছিল না। কিন্তু গোল বাধায় তাঁর বয়সটা। শিক্ষকেরও সে কথা বুঝতে অসুবিধা হয় না। তিনি উপলব্ধি করেন, স্ট্রীপিয়েডস-এর এ বিদ্যা আয়ত্ত করা সাধ্যাতীত। ছাত্র তবুও তাঁর সংকল্পে অটল থাকেন।

ছাত্রের নিষ্ঠা দেখে অধ্যক্ষ মুগ্ধ হন। অথচ অনর্থক তাঁকে বিদ্যালয়ে রাখতে অধ্যক্ষের আর ইচ্ছা করে না। তাই স্ট্রীপিয়েডসকে একদিন আড়ালে ডেকে তিনি বলেন,—

দেখুন, কিছু মনে করবেন না। আপনার স্বার্থের খাতিরেই আমি বলছি। দয়া করে ভুল বুঝবেন না। বলছিলাম,—ঐসব অল্পবয়সী ছাত্রদের সঙ্গে সমান তালে পা ফেলে আপনি চলতে পারবেন না। তাতে আপনার উপকার হবে বলে মনে করি না; লাভের মধ্যে নিজেকে হাস্যাস্পদ করবেন। তাই ক্লাসে যাওয়া আপনি ছেড়ে দিন। কথা দিচ্ছি, বিদ্যালয়ের বাইরে আপনার জন্য একবার আমি নিজে শেষ চেষ্টা ক'রে দেখবো।

অধ্যক্ষের প্রস্তাবিত ব্যবস্থা স্ট্রীপিয়েডস মেনে নেন। নিয়মিতভাবে তিনি পাঠ নিতে থাকেন। দিনের পর দিন গড়িয়ে যায়। ছাত্রের কোন উন্নতির লক্ষণ দেখা যায় না। অধ্যক্ষ হার মানেন। সে কথা তিনি ছাত্রকে জানাতে দ্বিধা করেন না। ছাত্রও নিজের অক্ষমতায় বিরক্ত হয়ে এক সময় বাড়ি ফিরে আসেন।

বাড়ি ফিরে এলেন বটে, স্ট্রীপিয়েডস কিন্তু দমবার পাত্র নন। ভেবে চিন্তে তিনি স্থির করেন, শেষবারের মত ছেলেকে ঐ স্কুলে পাঠাবার চেষ্টা করে দেখবেন। সে হতভাগা রাজী হয়ত ভাল, বেয়াড়াপনা করলে তিনি তাকে বাড়ী থেকে দূর করে তাড়িয়ে দেবেন। জীবনে আর কোনদিন ওর মুখ দেখবেন না।

শুভস্য শীঘ্রম্। আর কালবিলম্ব না করে স্ট্রীপিয়েডস পরের দিন ছেলেকে ডেকে পাঠান। তিনি তাকে অবিলম্বে সোফিস্টদের বিদ্যালয়ে ভর্তি হ'তে আদেশ করেন। নানা অজুহাত দেখিয়ে ছেলে এড়াবার চেষ্টা করে। পিতার কণ্ঠস্বর কঠিন হয়। কি ভেবে অবাধ্য ছেলে এবার পিতার বাধ্য হয়। স্ট্রীপিয়েডস স্বস্তির নিঃশ্বাস নেন।

স্ট্রীপিয়েডস-এর আর ত্বর সয় না। ক'দিন যেতেই তিনি ছুটে যান বিদ্যালয়ে। তিনি প্রত্যক্ষ করতে চান ছেলের শিক্ষার অগ্রগতি। অধ্যক্ষের মুখে ছেলের তারিফ শুনে খুশিতে তিনি প্রায় লাফিয়ে ওঠেন। তাঁর মুখে ফুটে ওঠে আত্মপ্রসাদের ছাপ। ভাবেন পুত্রের অর্জিত বিদ্যার কল্যাণে তিনি নিষ্ঠুর পাওনাদারদের কবল থেকে শীঘ্রই মুক্তি পাবেন; জব্দ হবে ঐ শকুনের দল। আনন্দে স্ট্রীপিয়েডস-এর মনটা উচ্ছল হয়ে ওঠে।

ইতস্ততঃ করে তিনি অধ্যক্ষকে বলেন,—অনেক আশা নিয়ে এতদূর পথ ছুটে এসেছিলাম। আমার পরিশ্রম সার্থক হয়েছে। আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ। একটি অনুরোধঃ ফিরে যাবার আগে যদি একবার ছেলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার অনুমতি পাই।

ছেলের সামনে উপস্থিত হলে আনন্দে স্ট্রীপিয়েডস-এর অশ্রুধারা নেমে আসে। ছেলেকে অভিনন্দন জানাবার ভাষা খুঁজে পান না। উচ্ছ্বাসে তিনি ছেলেকে জড়িয়ে ধরেন।

আত্মস্থ হয়ে ছেলেকে উদ্দেশ করে স্ট্রীপিয়েডস বলেন,—তোমার জন্যই সংসারটা একদিন ডুবেছিল; আশার কথা, তোমার কল্যাণেই আমি পুরোনো সুখের দিন আবার শীঘ্রই ফিরে পাবো।—ভাবতেও আমার কি যে আনন্দ হচ্ছে! একটু থেমে গদগদ কণ্ঠে তিনি আবার বলেন, হ্যাঁরে, তুই নাকি অনেক কিছু এরই মধ্যে শিখেছিস্? তোর বিদ্যের কিছু নিদর্শন দেখা না?

ছেলের তর্ক-যুক্তির অবতারণা দেখে স্ট্রীপিয়েডস আনন্দে বিহ্বল

হয়ে পড়েন। তাঁর স্থির বিশ্বাস হয়, এ বিত্মার মাহাত্ম্যে পাওনাদারদের কবল থেকে তিনি নিশ্চয়ই মুক্তি পাবেন।

ছেলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সবে স্ট্রীপিয়েডস রাস্তায় পা বাড়িয়েছেন, এমন সময় একজন পাওনাদার এসে তাঁর মুখোমুখি দাঁড়ায়। বলে, কিগো কত্তা, ছেলের জন্য যে ঘোড়াটি কিনেছিলে সেটি হয়ত এতদিনে তোমার হাতে অনাহারে পঞ্চত্ব পেয়ে মুক্তি পেয়েছে! কিন্তু আজ পর্যন্ত আমার প্রাপ্য একটি কাণাকড়িও তো দিলে না! এমান ভাবে তোমার পেছনে আর ক'দিন ঘুরবো বলতো? সব কিছুরই একটা সীমা আছে। তোমার মত.........

—খবরদার, মুখ সামলে কথা বলবি ব্যাটা। যতবড় মুখ নয় ততোবড় কথা?

—বুঝতে পাচ্ছি সোজা আঙুলে ঘি উঠবে না। আচ্ছা, এবার আদালতে দেখা হবে।

—যা যা, আদালত দেখাস নি।

রাগে গরগর করতে করতে পাওনাদার চলে যায়। স্ট্রীপিয়েডস সবে একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস নিয়েছেন, এমন সময় আর একজন পাওনাদার কোথা থেকে এসে তাঁকে আক্রমণ করে। তাকেও তিনি প্রথম জনের মত যাচ্ছেতাই বলে অপমান করে তাড়িয়ে দেন।

বাড়ি ফেরবার পথে আদালতের কথাটা দু'একবার তাঁর মনে উঁকি দেয়। কিন্তু তা তিনি হেসে উড়িয়ে দেন। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস: ছেলের অর্জিত বিত্মার কৌশলে কোন পাওনাদারের দাবীই টিকতে পারবে না।

স্ট্রীপিয়েডস দিন গোণেন—কবে তাঁর ছেলে বাড়ি ফিরে আসবে? ছেলে একদিন ফিরে আসে। পিতার আনন্দ ধরে না। এবার তিনি ছেলেকে বিশেষ খাতির করে কথা বলেন। ছেলের সঙ্গে এক সময় বিরূপ আচরণ করায় মনে মনে হয়ত তিনি একটু অনুতপ্ত হন। তিনি আত্মজের সঙ্গে সহজ হ'তে চেষ্টা করেন।

কিছু দিন পরের কথা। সেদিন কি এক তুচ্ছ কারণে পারিবারিক কলহ হয়। অভাবের সংসারে ওরকম কলহ নতুন কিছু নয়। তবে সেদিনের স্বামী-স্ত্রীর কলহে শ্রীমানও জড়িত ছিল এবং এ কলহ-ই নিয়ে এলো বিপর্যয়।

মামুলি ঝগড়া। হঠাৎ পণ্ডিত-ছেলে অগ্নিমূর্তি হয়ে পিতাকে প্রহার করতে উদ্যত হ'লে স্ট্রীপিয়েডস বিস্ময়ে হতবাক্ হন। আত্মস্থ হতে তিনি বাধা দেন। বলেন,—

তুমি এই বিদ্যা শিখেছো?

কেন? এ তো মহাবিদ্যা।

মহাবিদ্যা সে কেমন?

আমার ছেলেবেলার কথা আপনি ভুলে গেছেন?—যে সময় আপনি আমার মঙ্গলের নামে আমাকে প্রহার করতেন আপনার ব্যক্তিগত স্বার্থের খাতিরে! আজ ঠিক সেই কারণেই আমি আপনাকে শায়েস্তা করবো।

ছেলে জানাতে এতটুকুও দ্বিধা করে না যে ঐ একই যুক্তিতে তার মা-ও তার হাত থেকে নিস্তার পাবে না।

ছেলে তার সদ্য-অর্জিত তর্ক-বিদ্যার অবতারণা করে।

পিতা অসহায় ভাবে ছেলের সে যুক্তির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে চেষ্টা করেন। কোন ফল হয় না। তিনি পণ্ডিত-মূর্খ ছেলের অদ্ভুত যুক্তির সঙ্গে এঁটে উঠবেন কি করে?

করুণাময়ী জননী তাঁর পুত্রের উক্তির তাৎপর্য বোঝেন না। শুধু ফ্যাল ফ্যাল করে অবোধ সন্তানের দিকে তাকিয়ে থাকেন।

ততক্ষণে পাষণ্ড ছেলে পিতাকে দু'এক ঘা লাগিয়ে সত্যিসত্যি মা-র দিকে তেড়ে যায়।

স্ট্রীপিয়েডস উপলব্ধি করেন, সোফিস্ট-বিদ্যার প্রসাদে সবই সম্ভব। সে শিক্ষাবিদ্দের চোখে কোন ন্যায়-নীতির বালাই নেই। তাদের কূট তর্কবিদ্যার মহিমায় যে কোন গর্হিত কাজই যুক্তিসঙ্গত।

এথেন্স নগরের তরুণদের ওপর এ বিদ্যার মারাত্মক প্রতিক্রিয়ার কথা ভেবে স্ট্রীপিয়েডস শিউরে ওঠেন। তিনি আর ভাবতে পারেন না। রাতের অন্ধকার নেমে আসতে তিনি একটি জ্বলন্ত মশাল নিয়ে ছুটে যান সোফিস্ট বিদ্যালয়টির দিকে।

আগুনের গন্ধ পেয়ে বিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং ছাত্রবৃন্দ বাইরে ছুটে আসেন। সকলে হৈ হৈ করে ওঠেন। কিন্তু ততক্ষণে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠে বিদ্যালয়টিকে পুরোপুরি গ্রাস করে।

অদূরে দাঁড়িয়ে স্ট্রীপিয়েডস জ্বলন্ত বিদ্যালয়টির দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকেন। নিমেষে তাঁর চোখের ওপর অত বড় বিদ্যালয়টি নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। সেখানে পড়ে থাকে শুধু একটি ভস্মস্তূপ। স্ট্রীপিয়েডসের মন মেঘমুক্ত হয়। পরম তৃপ্তিতে তিনি নিঃশ্বাস নেন।

সেই ভস্মস্তূপের দিকে তাকিয়ে স্ট্রীপিয়েডস ভাবেন, ব্যক্তিগত ভাবে নাই বা তিনি পেলেন এ লাঞ্ছিত জীবন থেকে মুক্তি। আর কদিনই বা তিনি বাঁচবেন? কিন্তু বিদ্যালয়টি ভস্মীভূত হ'তে আজ তাঁর প্রিয় এথেন্স নগরটি একটি বড় দুষ্ট গ্রহের হাত থেকে মুক্তি পেলো। আনন্দে তাঁর চোখে মুখে ফুটে ওঠে পরম তৃপ্তির আভাস

ত্রয়ী

[ইতালির অমর সাহিত্যিক গিওভান্নি বোক্কাচ্চো (Giovanni Boccaccio)-র বিখ্যাত গল্পশতক **'ডেকামেরন'** (Decameron), ১৩৫৩ খ্রীষ্টাব্দ, থেকে তিনটি নির্বাচিত কাহিনীর সারাংশ।]

॥ এক ॥

সম্রাট সালাদ্দিন অকারণ যুদ্ধবিগ্রহ করে তাঁর রাজকোষ শূন্য করেছেন। ফলে, টাকার অভাবে তিনি এখন মুস্কিলে পড়েছেন। রাজ্য যায় যায়। ভেবে পান না—কি করে এখন অর্থ সংগ্রহ করা যায়। কে দেবে তাঁকে সে আশ্বাস!

এমন সময় হঠাৎ তাঁর মনে পড়ে যায় প্রচুর বিত্তশালী এক ইহুদীর কথা—থাকেন তিনি আলেকজেন্দ্রিয়ায়। একমাত্র সেই ইহুদী-ই এই মুস্কিল আসান করতে পারেন। সঙ্গে সঙ্গে সম্রাট ইহুদীকে ডেকে পাঠালেন।

খবর পেয়ে বৃদ্ধ ইহুদী মনে মনে প্রমাদ গোণেন। তবুও মুখে হাসি টেনে এসে তাঁকে বলতে হয়,—হুকুম করুন, বাদশা।

সম্রাট ইহুদীকে সাদর অভ্যর্থনা জানান। বলেন,—

এই যে আসুন। আজ আমার কি পরম সৌভাগ্য! খোদা আপনার মঙ্গল করুন। হুকুম নয় বন্ধু, দয়া করে আপনি আমাকে সাহায্য করুন। আজ ক'দিন থেকে আমি একটি জটিল সমস্যায় পড়েছি। সে বিষয়ে আপনার বিচক্ষণ অভিমত পেলে খুশি হবো। সেজন্যই আজ আমি আপনাকে একটু কষ্ট দিলাম।

বৃদ্ধ ইহুদী ভীতকণ্ঠে জবাব দেন,—কি যে বলেন! এতো আমার সৌভাগ্য। এবার হুকুম করুন, বাদশা।

—দেখুন, ইসলাম, খ্রীষ্ট এবং ইহুদী এই তিন ধর্মের মধ্যে কোন্‌টিকে আপনি শ্রেষ্ঠ ধর্ম বলে মনে করেন ?

সর্বনাশ! এ কি কঠিন প্রশ্ন! ইহুদীর শুধু মুখ নয়, বুক পর্যন্ত শুকিয়ে যায়। তিনি ভেবে পান না, এ কূট প্রশ্নের কী জবাব দেবেন ? সম্রাট নিজে ইসলাম-ধর্মী। যদি খ্রীষ্ট বা ইহুদী ধর্মকে বড় বলা হয়, বলা বাহুল্য, সঙ্গে সঙ্গে শিরশ্ছেদের হুকুম হবে। অন্য-দিকে ইসলাম ধর্মকে শ্রেষ্ঠ বললে বাদশা বলবেন—বিলক্ষণ, সেই ইসলাম ধর্মের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্যই তিনি যুদ্ধ করতে বাধ্য হয়েছেন। সেই কারণেই রাজকোষ শূন্য হয়েছে। তাই এখন অর্থের প্রয়োজন। আপনি সেই অর্থ দিয়ে সাহায্য করে শ্রেষ্ঠ ধর্মের সম্মান রক্ষা করুন।

কিছুক্ষণ ভেবে ইহুদী দ্বিধাজড়িত কণ্ঠে বললেন,—জাঁহাপনা, আপনার প্রশ্নে আমার একটি গল্প মনে পড়ে; অভয় দিলে নিবেদন করি—

সম্রাটের আশ্বাস পেয়ে ইহুদী তাঁর গল্পের ঝুলি খুলতে শুরু করেন,—

সে অনেকদিন আগেকার কথা। একটি লোকের একটি হীরের আংটি ছিল। সেটি শুধু দেখতেই চমৎকার ছিল না, অত্যন্ত দামীও ছিল।—মরবার আগে লোকটি তাঁর বিশেষ প্রিয় ছেলেটিকে চুপি চুপি আংটিটি দিয়ে গেলেন। আর তাঁর শেষ ইচ্ছা জানিয়ে গেলেন, বংশপরম্পরায় আংটিটি যার কাছে থাকবে সে-ই সংসারের সর্বময় কর্তা হবে।

সেই নিয়মেই উত্তরাধিকারের পরম্পরা চলতে থাকে। ক্রমে এক সময় এই আংটিটি এমন একজন কর্তার হাতে এসে পড়ে যাঁর কাছে তাঁর তিনটি ছেলেই সমান প্রিয়। তাই সেই আংটিটি নিয়ে তিনি মহামুস্কিলে পড়েন। শেষে অনেক ভেবে চিন্তে লোকটি এক সময় একটি মণিকারকে গোপনে ডেকে আংটিটি তাকে দিয়ে চুপি চুপি অনুরোধ করেন,—

যেমন ক'রে হোক এবং যত টাকা লাগে ঠিক এই রকম আরও ছ'টি হীরের আংটি তৈরী করে দিতে হবে।

মণিকার অনেক কষ্টে কর্তার সে অনুরোধ রক্ষা করলো। এবার কর্তা তিনটি ছেলেকে এক এক করে ডেকে প্রত্যেককে একটি করে আংটি দিয়ে চুপি চুপি বললেন,—তোমাকেই আসল আংটিটি দিয়ে যাচ্ছি; সাবধান, ভাইদের সে কথা কখনও বলো না কিন্তু।

কিন্তু গোল বাধে কর্তা মারা যাবার পর। পিতার মৃত্যুর পর আংটি দেখিয়ে, নিয়ম মত, তিন ভাই-ই কর্তা পদটি দাবী করতে থাকে। কেউ-ই ছাড়বার পাত্র নয়।

বহুদিন ধরে চলল তাদের সে বিবাদ। বংশপরম্পরায় সে বিবাদের জের গড়িয়ে চলে। তবুও তিনটির মধ্যে কোন্‌টি আসল আংটি সে মীমাংসা হয় না। আজও সে বিবাদ মেটেনি।

এবার বৃদ্ধ ইহুদী একটু ইতস্ততঃ করে বলেন, জাঁহাপনা, ক্ষমা করবেন, আমাদের তিনটি ধর্মও ঐ তিনটি আংটির মত। তবে এ ধর্ম তিনটিই খোদার কাছ থেকে এসেছে।

সম্রাট বৃদ্ধ ইহুদীর গল্প শুনে মুগ্ধ হলেন। তিনি ওঁর কাছ থেকে অর্থ চাইবার কথা পর্যন্ত ভুলে গেলেন। উল্টে ওঁকে পুরস্কার দিয়ে বিদায় দিলেন। কৃপণ ইহুদী খুশি মনে বাড়ী ফিরে এসে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন।

॥ দুই ॥

সেলার্নোর রাজা ট্যাংক্রেড-এর একটি মাত্র মেয়ে সিগিসমণ্ডা। প্রতাপশালী রাজার মেয়ে-অন্ত প্রাণ। সেই প্রাণপ্রতিম মেয়ে বিয়ের অল্পদিনের মধ্যেই তার স্বামীকে হারাল। জামাতার মৃত্যুর পর স্নেহাতুর পিতা স্থির করলেন, তিনি মেয়ের আর বিয়ে দেবেন না—তাকে নিজের কাছেই রাখবেন। রাজা মেয়ের মনের কথা ভাববার অবকাশ

পেলেন না। লাজুক মেয়েও মুখ ফুটে তার পিতার ইচ্ছার বিরুদ্ধে এ বিষয়ে ব্যক্তিগত মতামত ব্যক্ত করলে না।

প্রাণবন্ত যৌবনদীপ্ত মেয়েটি পিতার ইচ্ছা নীরবে মেনে নিলেও তার মন কিন্তু সে-কথা মানলো না। ক'দিন বাদেই তার হৃদয় বিদ্রোহ করে ওঠে।

সিগিসমণ্ডা এক সময় এক বীর্যবান সুদর্শন অমাত্যকে মনে মনে ভালবেসে ফেলল। নাই বা থাকল তার কোন বংশমর্যাদা, রূপে গুণে কিন্তু সে আদর্শ পুরুষ।

দিন যায়। সিগিসমণ্ডা একদিন অবাক বিস্ময়ে লক্ষ্য করে—অদূরে একটি সুদর্শন যুবক তার দিকে কেমন অদ্ভুত ভাবে তাকিয়ে আছে। তার সে দৃষ্টি সিগিসমণ্ডার মনে শিহরণ জাগায়। সে আবার ভালো করে লক্ষ্য করে। না, তার ভুল হয়নি। এ তো সেই দৃষ্টি। আশ্চর্য, এ যে সেই পুরুষ। সে ভাবে, এও কি সম্ভব!

সিগিসমণ্ডা এ সুযোগ থেকে নিজেকে বঞ্চিত করে না। লাজুক পায়ে আনত মুখে সে আস্তে আস্তে এগিয়ে যায় তার প্রেমাস্পদ গিসকার্ডোর কাছে। সেই নির্জন প্রান্তরে বিনিময় হ'ল ওদের পরস্পরের হৃদয়। অন্য কেউ কিছু টের পেল না।

রাজপুরীর অদূরে ছিল একটি পুরোনো গুহা। সিগিসমণ্ডার শোবার ঘরের মধ্য দিয়ে সেই গুহায় যাওয়া-আসা করবার একটি গুপ্ত পথ ছিল। পরের দিন ওরা দু'জন গোপনে সেই নিভৃত গুহায় মিলিত হল। সেখান থেকে স্বচ্ছন্দেই প্রেমিক-যুগল চলে আসে সিগিসমণ্ডার শয়ন কক্ষে। এ ভাবেই ওদের এই শয়ন-কক্ষে আসা-যাওয়া চলতে থাকে। পরম আনন্দে ওরা দু'জন গোপনে প্রেমে ডুবে যায়।

একদিন এলো সেই বিপর্যয়। রাজার একটি বদ অভ্যাস ছিল।

যখন তখন তিনি গিয়ে হাজির হতেন মেয়ের ঘরে। এমনি ভাবে সেদিন তিনি মেয়ের ঘরে গিয়ে দেখলেন, ঘর শূন্য। তবুও তিনি এক কোণে বসে মেয়ের জন্য অপেক্ষা করেন। দৈবক্রমে তিনি পর্দার আড়ালে পড়ে গেলেন! খানিক বাদেই সিগিসমণ্ডা তার প্রেমিককে সঙ্গে করে ঘরে ঢুকে দু'জনে বিছানার দিকে এগিয়ে যায়। ওরা কিন্তু কেউই ঘরের ভেতর রাজার উপস্থিতি কিছুমাত্র টের পায় না। রাজা পর্দার আড়াল থেকে সব কিছুই লক্ষ্য করে নিঃশব্দে এক সময় ঘর থেকে বেরিয়ে যান।

সেই রাত্রেই রাজার আদেশে গিসকার্ডোকে গ্রেপ্তার করা হল। এ রকম একটি নীচ জাতের লোকের সঙ্গে প্রেম করার অপরাধে রাজা মেয়েকে রূঢ় ভাবে তিরস্কার করেন। লোকটির সঙ্গে ভবিষ্যতে আর কোনদিন মেলামেশা না করবার জন্য তিনি মেয়েকে কঠোর আদেশ দেন। মেয়ে পিতাকে বিনম্র প্রতিবাদ জানায়,—

মাপ করবেন, বাবা। এ আপনার কি বিচার? এ রকম একজন শক্তিমান কর্মঠ পুরুষকে দরবারে ছোট করে রাখা আপনার পক্ষে কিছু গৌরবের কথা নয়। নীচ কুলে জন্ম—সে তার অপরাধ নয়। হাঁ, আমি তাকে ভালবাসি। সেজন্য ইচ্ছা হলে আপনি ঐ তরবারির এক ঘা'য়ে আমাদের দু'জনকে একসঙ্গে মেরে কবর দিন। আপনার কাছে এই আমার শেষ মিনতি।

রাজা মেয়ের আচরণে ব্যথিত হয়ে ফিরে এলেন। মনে মনে ভাবলেন, এ তাঁর মেয়ের সাময়িক মানসিক উত্তেজনা মাত্র। গিসকার্ডোকে চিরতরে সরিয়ে দিলে আবার সব ঠিক হয়ে যাবে।

পরের দিন সকালবেলা রাজার আদেশে গিসকার্ডোকে হত্যা করে তার হৃৎপিণ্ডটি একটি সোনার বাটিতে করে রাজকুমারীকে উপহার হিসাবে পাঠিয়ে দেওয়া হল।

কিন্তু, আশ্চর্য, পিতাকে ধন্যবাদ জানিয়ে সিগিসমণ্ডা সেই বিশেষ

উপহারটি সাদরে গ্রহণ করে। এ তো নিছক একটি হৃৎপিণ্ড নয়, এ যে তার প্রিয়তমের গোটা হৃদয়!

খানিক বাদে সিগিসমণ্ডা উন্মত্তের মত হৃৎপিণ্ডটিকে প্রাণ ভরে চুমু খায়। তারপর পাত্রটির মধ্যে খানিক বিষ ঢেলে নিয়ে পরম তৃপ্তিতে প্রিয়তমের সেই "হৃদয়-সুধা" পান করে। এবার হৃৎপিণ্ডটিকে বুকের ওপর রেখে সিগিসমণ্ডা বিছানায় এলিয়ে পড়ে। খানিক বাদে তার সব জ্বালা জুড়িয়ে যায়। অস্ফুট স্বরে তার মুখ থেকে বেরিয়ে আসে,—আঃ, কি শান্তি! কিছুক্ষণের মধ্যেই তার চোখ দু'টি চিরতরে বুজে যায়।

এদিকে তাঁর কৌশল সফল হয়েছে ভেবে উল্লসিত হয়ে রাজা মেয়ের ঘরে ঢুকে তাকে ঐ অবস্থায় দেখে প্রথমে ভেবেছিলেন, হয়ত মেয়ে তাঁর ঘুমিয়ে আছে। কিন্তু আসল ব্যাপারটা বুঝতে তাঁর দেরী হয় না। সঙ্গে সঙ্গে তিনি শোকে ভেঙ্গে পড়েন।

মেয়ের শেষ ইচ্ছার কথা কিন্তু রাজা ভোলেন না। তাঁর আদেশে এই প্রেমিক-যুগলকে এক সঙ্গেই কবর দেওয়া হয়।

॥ তিন ॥

সালুজ্জোর মার্কুইসের বড় ছেলে গুলটিয়ারী স্বভাবে ছিলেন খামখেয়ালী, বিশেষ করে বিয়ের প্রতি অত্যন্ত বীতরাগ।

শেষ পর্যন্ত প্রজাদের একান্ত অনুরোধ-উপরোধে উত্ত্যক্ত হয়ে একসময় তিনি বিয়ে করতে রাজী হলেন। কিন্তু কোন সম্ভ্রান্ত বংশের মেয়েকে নয়—এক সাধারণ গরীব চাষীর মেয়ে গ্রীসেলভা-কে তিনি পছন্দ করলেন। বিয়ে করতে রাজী হলেন বটে, কিন্তু একটি সর্তেঃ তিনি যখন যা বলবেন, বিনা প্রতিবাদে বা কোনো দ্বিধা না ক'রে গ্রীসেলভাকে তা মেনে নিতে হবে। মেয়েটি প্রতিশ্রুত হয়—বিয়ের

পর সব সময় সব ব্যাপারে সে স্বামীর অনুগত থাকবে। তাঁকে খুশি করবার জন্য তাঁর সব ইচ্ছা শ্রীমতী গ্রীসেলভা নীরবে মেনে নেবে।

একদিন ওঁদের বিয়ে হয়ে গেল।

বিয়ের ক'বছরের মধ্যে শ্রীমতী গ্রীসেলভা স্বামীকে একটি পুত্র এবং একটি কন্যা সন্তান উপহার দিলেন। প্রজারা সকলেই খুব খুশি। রাজপুরী আনন্দে মুখরিত। কিন্তু খামখেয়ালী গুলটিয়ারী সেই আনন্দের মুহূর্তে পর পর দু'টি শিশুকেই তাদের মা-র কোল থেকে কেড়ে নিয়ে গেলেন।

শ্রীমতী গ্রীসেলভা কিন্তু এতটুকুও প্রতিবাদ জানালেন না। গুলটিয়ারী তাঁর মধ্যে একটুও চঞ্চলতা লক্ষ্য করলেন না। শ্রীমতী ধরে নিলেন গুলটিয়ারী সন্তান দু'টিকে নিশ্চয়ই মেরে ফেলেছেন। অন্য সকলেরও সেই বিশ্বাস হল। প্রজারা হাহাকার করে ওঠে। আড়ালে তারা গুলটিয়ারীকে গালমন্দ করতেও ছাড়ে না।

সন্তান দু'টির মা হয়েও শ্রীমতী গ্রীসেলভা কিন্তু অবিচলিত থাকেন। স্বামীর প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ভালবাসা কিছুমাত্র শিথিল হয় না—তাঁর প্রতি ব্যবহারেও শ্রীমতীর কোন ত্রুটি হয় না।

তবুও গুলটিয়ারী তৃপ্ত হন না।

একদিন স্ত্রীকে আড়ালে ডেকে তিনি বললেন,—শুনছ, আমি স্থির করেছি, সমপর্যায়ের কোন মেয়েকে আবার বিয়ে করব। তুমি কাল-ই তোমার আগের বেশে তোমার বাপের বাড়ি চলে যাও।

তথাস্তু!

কিন্তু ক'দিন বাদে তিনি আবার শ্রীমতা গ্রীসেলভাকে সেখান থেকে ডেকে পাঠালেন। শ্রীমতীকে তিনি জানালেন,—

দেখ, আমি দু'চার দিনের ভেতর নতুন বৌকে এ বাড়িতে নিয়ে আসছি। ভেবে দেখলাম, তুমি এতদিন এ বাড়ির গিন্নী ছিলে—এ আনন্দ উৎসবের উপযুক্ত আয়োজন করা একমাত্র তোমার পক্ষেই

সম্ভব। আমার ইচ্ছা, তুমি দেখে শুনে নিজ হাতে প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থা কর। এ ঝামেলা মিটে গেলে তুমি আবার চলে যেও।

শ্রীমতী গ্রীসেলভা ভাবেন, এ কি কঠিন আদেশ! কি নির্মম পরিহাস! অগত্যা শ্রীমতী গ্রাসেলভা তাঁর সেই চাষীর বেশেই হাসিমুখে কোমর বেঁধে কাজে লেগে গেলেন। আয়োজনের কোন ত্রুটি হ'ল না।

উৎসবের দিন সেই পরমক্ষণে শ্রীমতী গ্রীসেলভা এগিয়ে গিয়ে একটি পরমা-সুন্দরী ষোড়শী মেয়েকে সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে বরণ করে ঘরে নিয়ে এলেন। তিনি মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন তরুণীটির দিকে।—বাঃ, কি সুন্দর এ মেয়েটি! মনে মনে তিনি ঈশ্বরের কাছে ওর মঙ্গল কামনা করেন।

এতক্ষণ আড়াল থেকে গুলটিয়ারী সব কিছুই লক্ষ্য করছিলেন। শ্রীমতী গ্রীসেলভার ব্যবহারে তিনি মুগ্ধ হয়েছিলেন। সেই সঙ্গে নিজের খামখেয়ালি আচরণে বুঝিবা একটু অনুতপ্তও। তবুও শ্রীমতীকে শেষ বারের মত আর একবার পরীক্ষা করবার জন্য আস্তে আস্তে তাঁর কাছে এগিয়ে গেলেন।

হাসিমুখে শ্রীমতী গ্রীসেলভাকে একটু আড়ালে ডেকে তাঁকে শুধালেন—নতুন বৌকে কেমন দেখলে?

—চমৎকার। প্রার্থনা করি ওকে নিয়ে আপনি সুখী হোন, সংসারী হোন। আপনাদের দু'জনের মঙ্গল হোক্। এবার দয়া করে আমাকে বিদায় দিন, প্রভু।

তাঁর উক্তি শুনে গুলটিয়ারী সঙ্গে সঙ্গে শ্রীমতীর হাত দু'টি ধরে কম্পিত কণ্ঠে বললেন,—আমায় তুমি ক্ষমা কর। তোমাকে অনেক কষ্ট দিয়েছি। সত্যিই তুমি অসাধারণ, তুমি অনন্যা। আমি এতদিন তোমাকে শুধু নিষ্ঠুর পরীক্ষা করছিলাম। কনের সাজে এই নাও তোমার মেয়ে আর ওর সঙ্গে ঐ তোমার ছেলে।

শ্রীমতী গ্রীসেলভা ছেলেমেয়েকে বুকে চেপে ধরলেন। আনন্দে তাঁর দু'চোখ বেয়ে অবিরাম ধারায় অশ্রু ঝরতে থাকে। ভাবেন, এ কি অসহ্য সুখ!

ততক্ষণে রাজপুরী আনন্দে মুখর হয়ে ওঠে—ক্রমে সে আনন্দের ঢেউ রাজ্যের চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে।

গার্গাণ্টুয়া ও প্যাণ্টাগ্রুয়েল

[ফরাসী সাহিত্যিক ফ্রাঁসোয়া রাবেলে (Francois Rabelais)-এর **'গার্গাণ্টুয়া অ্যাণ্ড প্যাণ্টাগ্রুয়েল'** (Gargantua and Pantagruel), ১৫৩৩-৬৭ খ্রীঃ, গ্রন্থটির সংক্ষিপ্তসার ।]

স্ত্রী সন্তানসম্ভবা হ'তে দৈত্যরাজ গ্রান্সগোসিয়ার আনন্দ আর ধরে না। দৈত্যরাজ-দম্পতি দিন গোনে, কবে সেই অনাগত এসে তাদের রাজপুরী আলো করবে, তাদের জীবন সার্থক হবে।

ক্রমে দশ মাস গড়িয়ে এগারো মাস হয়ে যায়। তারা অধৈর্য হয়ে ওঠে। সেদিন দৈত্যরাজ কি এক কাজে বেরিয়ে যেতে দৈত্যরাণী গার্গামেলি প্রাসাদ-সংলগ্ন সুবিস্তৃত বাগানটিতে বেড়াতে যায়।

সেখানে পা ছড়িয়ে বসে পেট ভরে কিসের নাড়িভুঁড়ি সে খায়। তারপর আনন্দে বাগানের সবুজ ঘাসের ওপর নাচতে থাকে।

বেলা গড়িয়ে সূর্য অস্ত যায়। বাগানের ঘাসের ওপর বসে দৈত্যরাণী তখন বিশ্রাম করছিল। হঠাৎ অসহ্য যন্ত্রণায় কাতর হয়ে পড়ে। প্রসব বেদনা। খানিক বাদে তার সন্তানটি ভূমিষ্ঠ হয়। শিশুটি বেরিয়ে আসে তার গর্ভধারিণীর বাঁ কান থেকে।

মাতৃগর্ভ থেকে বেরিয়ে এসে বাইরের জগতের আলো বাতাসের স্পর্শ পেয়ে অল্প সময়ের মধ্যেই শিশুটির আকার অদ্ভুত ভাবে বেড়ে ওঠে। দৈত্যরাজের সন্তান তো! শুধু আকৃতিই নয়—তার প্রকৃতিও অনুরূপ অদ্ভুত হয়।

প্রথম নিঃশ্বাস নিতেই খাবার জন্য শিশুটি হাঁ হাঁ করে ওঠে। অনন্ত ক্ষুধা। যেন বিশ্বব্রহ্মাণ্ড গিলে খাবে!

ক্ষুদ্র দৈত্যের ক্ষুধা মেটাবার জন্য দৈত্যকুল ব্যস্ত হয়ে ওঠে।

দৈত্যরাজের নির্দেশে সহস্রাধিক অনুচর তক্ষুনি চারিদিকে ছোটে দুগ্ধবতী গাভীর সন্ধানে। শিশু গার্গাণ্টুয়ার ক্ষুন্নিবারণের জন্য সাত হাজারেরও বেশী দুগ্ধবতী গাভী সংগ্রহ করা হয়।

ক'দিন বাদে শিশুটির পরিচ্ছদের জন্য তোড়জোড় শুরু হয়। চারি-দিক থেকে দর্জিরা এসে ভীড় করে। এলে কি হবে? তার মাপ নেওয়া কি সোজা হাঙ্গামা! ন'শ গজ কাপড় কেটে একটি জামা এবং এগার শ' গজ কাপড় দিয়ে একটি প্যাণ্ট তারা যা-হোক ক'রে তৈরী করে। তারপর বহুলোকের প্রাণপণ চেষ্টায় সে জামা-প্যাণ্ট দৈত্য-তনয়কে পরিয়ে দর্জিরা সে যাত্রায় প্রাণে বাঁচে।

পরিচ্ছদের পাট শেষ হবার পর তার পাদুকার জন্য রাজ্যের মুচিদের তলব পড়ে। বেচারীরা প্রমাদ গোনে। প্রাণের দায়ে দিবারাত্র অক্লান্ত পরিশ্রম করে মুচিকুল সহস্রাধিক গরুর চামড়া দিয়ে একসময় শ্রীমানের জন্য এক জোড়া পাদুকা তৈরী করে হাঁফ ছেড়ে বাঁচে।

দিন যায়। গার্গাণ্টুয়া ক্রমে বড় হয়। এবার তার শিক্ষার জন্যও দৈত্যরাজকে ভাবতে হয়। অবশেষে দু'জন পণ্ডিত পুত্রের গৃহশিক্ষক হিসাবে নিযুক্ত হন।

পণ্ডিত দু'জন চেষ্টার ত্রুটি করেন না। কিন্তু তাঁদের সাধ্য কি অমন ছাত্রকে শিক্ষা দেন! উল্টে মাঝে মাঝে তাঁদেরই ঐ দানব-শিশুর হাতে শিক্ষা পেতে হয়, নানা ভাবে লাঞ্ছিত হন তাঁরা। তবু প্রাণের ভয়ে ছাত্রের সব দৌরাত্ম্য তাঁরা মুখ বুজে সহ্য করেন।

কিছুদিন যেতে দৈত্যরাজের মনে সন্দেহ জাগে, পুত্রের শিক্ষা বুঝি ঠিকমত হচ্ছে না। তিনি স্থির করেন, গার্গাণ্টুয়াকে সভ্যজগতের কোন শিক্ষানিকেতনে পাঠাবেন। পিতার নির্দেশে গার্গাণ্টুয়াকে শিক্ষার জন্য প্যারিস সহরে যেতে হয়।

প্যারিস সহর। ভিন্ন জগৎ, নতুন পরিবেশ। সেখানকার সব কিছুতেই গার্গাণ্টুয়া কৌতুক বোধ করে। তার সে অদম্য কৌতুক

মেটাতে কখনও সে নোৎরদাম গির্জার সুউচ্চ স্তম্ভ থেকে বিরাট ঘণ্টাটি খুলে নিয়ে নিজের ঘোড়ার গলায় ঝুলিয়ে দেয়। তার এমনি ধারা অস্বাভাবিক কাণ্ডকারখানা দেখে নগরবাসীরা স্তম্ভিত হয়। তারা বিরক্ত বোধ করে। কিন্তু প্রাণের ভয়ে কেউ গার্গাণ্টুয়াকে বাধা দিতে সাহস করে না। তারা মুখ বুজে তার সব অত্যাচার সহ্য করে।

প্যারিসে লেখাপড়ার পাট চুকিয়ে গার্গাণ্টুয়া আবার একসময় দেশে ফিরে যায়। প্যারিসবাসী স্বস্তির নিঃশ্বাস নেয়।

গার্গাণ্টুয়া দেশে ফিরে আসার ক'দিন পরে দেশে এক অঘটন ঘটে—

প্রতিবেশী লার্নে নগরের রুটিওয়ালাদের কাছে একদিন দৈত্যরাজ্যের মেষপালকরা কেক কিনতে গিয়েছিল। মেষপালকদের তারা অপমান করে তাড়িয়ে দেয়। ফলে, দু'দলের মধ্যে হয় ঝগড়ার সৃষ্টি; ঝগড়া থেকে লাঠালাঠি।

ঐ কলহে রুটিওয়ালাদের একজন নিহত হ'তে লার্নে-অধিপতি দৈত্যদের ওপর প্রতিশোধ নিতে সংকল্প করেন। তিনি দৈত্যরাজ্য আক্রমণ করতে উদ্যোগী হন।

লার্নে-অধিপতির বিক্রমের কথা দৈত্যরাজ গ্রান্সগোসিয়ার অজানা ছিল না। তাই তাঁর আক্রমণের খবর জেনে দৈত্যরাজ রীতিমত ঘাবড়ে যান।

লার্নে-অধিপতির রোষ নিবৃত্ত করতে দৈত্যরাজ গাড়ী গাড়ী কেক্ এবং নানা উপঢৌকন তাঁকে পাঠিয়ে দেন। কিন্তু কোন ফল হয় না। তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন।

গার্গাণ্টুয়া তখন নবীন যুবক। কিন্তু পুত্রের শক্তি ও সাহসের পরিচয় তখনও পিতার জানবার অবকাশ হয়নি। অগত্যা দৈত্যরাজ তাঁর আসন্ন বিপদে পুত্রকে সংগ্রামের জন্য তৈরী হতে আদেশ করেন।

পিতার আদেশ পেয়ে পুত্র মা ভৈঃ বলে রণহুংকার ছাড়ে। তার

গর্জনে গোটা রাজ্যটা কেঁপে ওঠে। পুত্রের বিক্রম দেখে পিতার মুখে হাসি দেখা দেয়।

গার্গাণ্টুয়া প্রবল বিক্রমে যুদ্ধ করে। কামানের গোলাও এই শক্তিধরকে আঘাত করতে পারে না। তার সেই অসাধারণ বীরত্ব দেখে দৈত্যসৈন্যরা মুগ্ধ হয়। শত্রুরা তার সামনে এগুতে পারে না। তারা পালাবার পথ খোঁজে।

পরাজিত শত্রুবাহিনী গার্গাণ্টুয়ার হাতে বন্দী হয়। কিন্তু তার বিরাট দেহটার মত গার্গাণ্টুয়ার মনটাও ছিল উদার। বন্দী শত্রুদের সকলকে সে মুক্ত করে দেয়। আর যারা তাকে সাহায্য করেছিল তারা গার্গাণ্টুয়ার কাছ থেকে পায় আশাতীত উপহার।

কিছুদিন পরে গার্গাণ্টুয়ার নির্দেশে থিলেমী নগরে গড়ে ওঠে এক বিরাট মঠ। সেখানে নারী পুরুষ অবাধ মিলনের সুযোগ পায়। তাদের সেখানে সম্পত্তি সঞ্চয়েরও কোন বাধা নিষেধ থাকে না। উত্তরকালে এই মঠটিই 'অ্যাবে অব্ থিলেমী' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে।

* * *

গার্গাণ্টুয়ার বয়স তখন চারশ'র কম নয়। ঐ বয়সে সে একটি পুত্র সন্তান লাভ করে। পিতার যোগ্য পুত্র। যেমনি আকারে বড় তেমনি দেখতেও অদ্ভুত। ভাল্লুকের মত লোমশ দেহ নিয়ে শিশুটি ভূমিষ্ঠ হয়। এই অসাধারণ শিশুটিকে জন্ম দিতে গিয়ে তার গর্ভধারিণী কিন্তু প্রাণ হারায়।

স্ত্রী-বিয়োগে গার্গাণ্টুয়া মর্মাহত হয়। কিন্তু সেই দুর্লভ সন্তানটির দিকে তাকিয়ে স্ত্রী-বিয়োগের বেদনা সে ভুলে যায়। গার্গাণ্টুয়া শিশুটিকে বুকে তুলে নেয়।

শিশুটির নামকরণ হয়: প্যাণ্টাগ্রুয়েল। মাতৃহারা শিশুটির দুধের জন্য ছ'হাজারেরও বেশী দুগ্ধবতী গাভী সংগ্রহ করা হয়। কিন্তু তার ক্ষুধা অনন্ত।

তখন প্যাণ্টাগ্রুয়েলের বয়স মাত্র ক'মাস। ঐ বয়সেই তার বিক্রম

কতো! একদিন একটি গরু তাকে দুধ খাওয়াচ্ছিল। কি করে আচ্ছাদন বস্ত্র থেকে শিশু প্যাণ্টাগ্রুয়েলের একটি হাত বাইরে বেরিয়ে আসে। সঙ্গে সঙ্গে সে ঐ গরুর গলা সজোরে আঁকড়ে ধরে। গরুটি দু'একবার মাত্র দাপাদাপি করার সুযোগ পায়। অল্প সময়ের মধ্যেই ক্ষুদ্র দৈত্য গরুটিকে পুরোপুরি খেয়ে ফেলে।

এ ঘটনার পর থেকে প্যাণ্টাগ্রুয়েলের হাত শক্ত করে বেঁধে রাখা হয়। কিন্তু হলে কি হবে?

কদিন পর আবার ঘটে অনুরূপ এক অঘটন। সেদিন শ্রীমানের দুধ খাবার পর ঝি তার মুখটি মুছিয়ে দিতে ভুলে যায়। তার মুখের ওপর দুধ লেগে থাকে।

টাটকা দুধের গন্ধ পেয়ে কোথা থেকে এক ভাল্লুক এসে প্যাণ্টাগ্রুয়েলের গাল চাটতে শুরু করে। ভাল্লুকটির স্পর্শ পেয়ে এক ঝটকায় নিজেকে সেই শক্ত বাঁধন থেকে মুক্ত করে প্যাণ্টাগ্রুয়েল সেটিকে গলা টিপে মেরে পরম তৃপ্তিতে ক্ষুন্নিবারণ করে।

এবার চারটি লোহার শেকল দিয়ে প্যাণ্টাগ্রুয়েলকে তার দোলনাটির সঙ্গে বাঁধা হয়—যাতে সে দোলনা থেকে বেরুতে না পারে। কিন্তু দু'দিন বাদে যে আড়-কাঠটির ওপর দোলনাটি বসানো ছিল, সেটিকে ভেঙ্গে দোলনাটিকে পিঠে করে ঘরের মধ্যে ছুটে সে মজার খেলা শুরু করে দেয়।

অল্প বয়সেই অসাধারণ শক্তির সঙ্গে এক সৃষ্টিছাড়া লক্ষণ প্যাণ্টাগ্রুয়েলের মধ্যে দেখা যায়—তীক্ষ্ণ ধী। সকলে ধরে নেয় ভাবীকালে সে একজন পণ্ডিত হিসেবে খ্যাতি অর্জন করবে।[1]

সত্যিসত্যি বড় হতে প্যাণ্টাগ্রুয়েল জ্ঞানের পিপাসা নিয়ে এদিক ওদিক নানা জায়গায় ঘুরে বেড়ায়। তার তৃষ্ণা মেটে না। ঘুরতে ঘুরতে এক সময় সে প্যারিস নগরে এসে আস্তানা নেয়।

অল্পদিনের মধ্যেই প্যাণ্টাগ্রুয়েলের জ্ঞান এবং বিচারবুদ্ধির খ্যাতি

চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। বিশিষ্ট আইনজ্ঞরাও জটিল সমস্যা নিয়ে ছুটে আসেন প্যাণ্টাগ্রুয়েলের পরামর্শের জন্য, তার উপদেশ-নির্দেশ নিতে।

দিন যায়। একদিন রাজপথে একটি অদ্ভুত ভিক্ষুক প্যাণ্টাগ্রুয়েলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ভিখারীটির বেশবাস শতছিন্ন কিন্তু তার চেহারা আশ্চর্য রকমের বুদ্ধিদীপ্ত।

কৌতূহলী প্যাণ্টাগ্রুয়েল এগিয়ে গিয়ে তাকে কি একটা প্রশ্ন করে। ভিখারী তাকে বারোটি ভাষায় জবাব দেয়। ভিখারী প্যানার্জের জ্ঞানে মুগ্ধ হয়ে প্যাণ্টাগ্রুয়েল তার সঙ্গে হাত মেলায়। ক্রমে তাদের দু'জনের মধ্যে বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে।

প্যানার্জ ছিল উচ্ছৃঙ্খল স্বভাবের একজন চতুর বাউণ্ডুলে। নানা উপায়ে সে প্রচুর উপার্জন করতো কিন্তু তার সেই উপার্জন কর্পূরের মতো উবে যেতে দেরী হ'ত না। তাই তার ঐ ভিখারী বেশ।

বন্ধুর সঙ্গে প্যারিস নগরে প্যাণ্টাগ্রুয়েলের দিনগুলি ভালই কাটছিল। এমন সময় খবর এলো ডিপসোডিস দৈত্যরা 'স্বপ্নরাজ্য' আক্রমণ করেছে। তাদের অতর্কিত আক্রমণে স্বপ্নরাজ্যের নিরীহ অধিবাসীরা দিশেহারা।

প্যাণ্টাগ্রুয়েল চঞ্চল হয়ে ওঠে। বন্ধু প্যানার্জকে সঙ্গে নিয়ে প্যাণ্টাগ্রুয়েল ছুটে যায় ডিপসোডিস দৈত্যদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে।

ছোট্ট একটি বাহিনী নিয়ে প্যাণ্টাগ্রুয়েল ডিপসোডিস দৈত্যদের পরাজিত করে। তারপর তার অপরাধের শাস্তি হিসাবে একটি কুৎসিত বুড়ি ফেরিওয়ালীর সঙ্গে ডিপসোডিস-রাজ আর্নাকাসের বিয়ের ব্যবস্থা করে প্যাণ্টাগ্রুয়েল। তারই আদেশে ঐ দৈত্যরাজকে দেশান্তরিতও হতে হয়।

এমনি ভাবে ডিপসোডিস-রাজ্য তার অধিকারে এলে স্বপ্নরাজ্য থেকে বহু নারী পুরুষ এবং শিশুকে প্যাণ্টাগ্রুয়েল সেখানে পাঠিয়ে দেয়। এই আগন্তুক নারীরা প্রত্যেকে প্রতি ন' মাসে সাতটি করে সন্তানের জন্ম দেয়। ফলে, অল্পদিনের মধ্যেই স্বপ্নরাজ্যের অধিবাসীরা

ডিপসোডিস রাজ্যে প্রভাব বিস্তার করে। কালে দৈত্যরা সে-দেশ থেকে মুছে যায়।

আরও কিছুদিন পরের কথা। প্যাণ্টাগ্রুয়েল বন্ধু প্যানার্জকে সালমিগণ্ডিন রাজ্যের অধিপতি করে দেয়।

সালমিগণ্ডিন রাজ্যটির আয় ছিল প্রচুর। এত প্রচুর যে প্যানার্জ-এর মত অমিতব্যয়ী বাউণ্ডুলেরও কল্পনাতীত। কিন্তু হলে কি হবে? এই আশাতীত আয়ের গন্ধ পেতে প্যানার্জের খরচের পরিমাণ বেড়ে যায় শতগুণ। তখনও তার আয়ের চেয়ে ব্যয়ের মাত্রা থাকে চতুর্গুণ বেশী। বন্ধুর খরচের বহর দেখে গৌরীসেন প্যাণ্টাগ্রুয়েল চিন্তিত হয়।

প্যানার্জও এক সময় চিন্তিত হয়। ভাবে, লক্ষ্মীহীন গৃহে ভাগ্যলক্ষ্মীকে বেঁধে রাখা বুঝি অসম্ভব হয়! তাছাড়া ঐ বাউণ্ডুলে জীবনও তার আর ভাল লাগে না। সে স্থির করে, বিয়ে করবে।

শুভস্য শীঘ্রম্। মনের কথাটা সহৃদয় বন্ধুকে জানাবার জন্য প্যানার্জ ছুটে যায়। তাকে সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে প্যাণ্টাগ্রুয়েল বলে, —হ্যাঁ, টাকা ধার করা এবং ধার দেওয়ার কথা ক'দিন থেকে ভাবছিলাম। এ সম্বন্ধে তোমার মতামত শুনতে চাই। বলো।

প্যানার্জের আসল বক্তব্য এ আলোচনার অতলে তলিয়ে যায়। সে তার বিয়ের প্রস্তাবটা প্যাণ্টাগ্রুয়েলকে জানাবার অবকাশ পায় না। সে ফিরে আসে।

প্যানার্জ কিন্তু চুপ করে থাকে না। পরামর্শের জন্য সে নানা জায়গার নামকরা সব দার্শনিক, কবি, ফকির এবং গণৎকারের কাছে গিয়ে হাজির হয়। তাঁরা কেউ প্যানার্জের বিয়ের প্রস্তাব সমর্থন করেন না।

প্যানার্জ নিজেও কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে পারে না। ভাবনাটা তাকে পীড়া দেয়, কিন্তু সে দমবার পাত্র নয়। হঠাৎ তার 'পবিত্র

ঝর্ণা'র দৈববাণীর কথা মনে পড়ে। পবিত্র ঝর্ণাটি ছিল সুদূর ভারতের উত্তর সীমান্তের কোন জায়গায়। সেখানে যাবার জন্য সে বন্ধু প্যাণ্টাগ্রুয়েলের শরণাপন্ন হয়।

বন্ধুর ইচ্ছা পূর্ণ করতে প্যাণ্টাগ্রুয়েল শক্তিমান ফকির ফ্রায়ার এবং প্যানার্জকে নিয়ে সেণ্ট মার্লো থেকে বারোটি জাহাজ নিয়ে পবিত্র ঝর্ণার উদ্দেশে একদিন যাত্রা করে।

পথ সুদীর্ঘ তায় দুর্গম। চলার পথে এই দুঃসাহসিক অভিযাত্রী দলের বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতা হয়। সেখানে পৌঁছুতে তাদের বহু বিপদের ঝুঁকি নিতে হয়।

এনান্সীন দ্বীপে পৌঁছে তারা জাহাজের নোঙর ফেলে। সেখানকার অধিবাসীদের সকলের নাক চিড়িতনের টেক্কার মতো দেখে প্যাণ্টা-গ্রুয়েলের দল বিস্ময়ে অবাক হয়।

আরও এগিয়ে যেতে তারা লক্ষ্য করে, রচ-দ্বীপবাসীরা শুধু হাওয়া খেয়ে বেঁচে থাকে। তাদের জলেরও প্রয়োজন হয় না।

অভিযাত্রীরা আরও এগিয়ে গিয়ে হাজির হয় রিংগিং দ্বীপে। দ্বীপটিতে শুধু পাখী আর পাখী। সেখানে একটি জনপ্রাণীও তাদের নজরে পড়ে না। তারা কৌতূহলী হয়। ক্রমে তারা জানতে পারে, দ্বীপটির ঐ পাখীগুলি বহুকাল পূর্বে সিটিসাইনস্ জাতি নামে পরিচিত ছিল।

সবশেষে তারা গিয়ে হাজির হয় কুখ্যাত অভিশপ্ত দ্বীপটিতে। দ্বীপটি ছিল ভীষণাকৃতি লোমশদেহী নরখাদক দৈত্যদের রাজ্য। তারা সেখানে পৌঁছুতে মানুষের গন্ধ পেয়ে দৈত্যরা কোথা থেকে ছুটে এসে তাদের ধরে বেঁধে নিয়ে গিয়ে হাজির করে দৈত্যরাজের কাছে।

বন্দীদের ভেতর বিরাট আকৃতি প্যাণ্টাগ্রুয়েলকে দেখে দৈত্যরাজের মনে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়। তাদের হত্যা করার আদেশ দিতে সে ভুলে যায়। রসিকতা করে প্যানার্জকে একটি ধাঁধাঁর উত্তর দিতে বলে।

চতুর প্যানার্জ সে-ধাঁধাঁর সঠিক উত্তর দিতে তারা দৈত্যদের কবল থেকে মুক্তি পায়। তারা আবার এগিয়ে যায়—

একসময় প্যান্টাগ্রুয়েল সদলে পবিত্র ঝর্ণাদ্বীপে পৌঁছোয়। কিন্তু ঝর্ণাতে যাবার রাস্তাটি খুঁজে পায় না। তারা দিশেহারা হয়। বিভ্রান্ত যাত্রীরা ইতস্ততঃ ঘুরে বেড়ায়।

সেই সময় কাছের লণ্ঠন-দ্বীপ থেকে একটি লণ্ঠন এগিয়ে আসে অসহায় যাত্রীদের সাহায্য করতে। লণ্ঠনটি তাদের বলে,—ভয় কি? আমার সঙ্গে এসো, তোমাদের পথ দেখিয়ে দিচ্ছি।

লণ্ঠনটির পিছু পিছু অভিযাত্রীরা এগিয়ে যায় একটি অন্ধকার ভূগর্ভ-পথের দিকে। সেই সুরঙ্গ পথে কিছুদূর এগিয়ে যেতে একটি মার্বেল পাথরের সিঁড়ির স্পর্শ পায় তারা। সেই সিঁড়ি বেয়ে অনুমান একশত ধাপ নেমে প্যানার্জ ভয় পেয়ে থমকে দাঁড়ায়।

প্যানার্জ আর এক পাও বাড়াতে চায় না। বলে, বিয়ে আমার মাথায় থাক্। চলো আমরা ফিরে যাই। প্যানার্জ সত্যি সত্যি পালাবার জন্য পিছন দিকে পা বাড়ায়।

প্যানার্জের মতলব বুঝতে পেরে ফকির ফ্রায়ার ফস্ করে শক্ত মুঠিতে তার জামার কলার ধরে ফেলে। ফকিরের উৎসাহে সে আবার এগিয়ে যায়।

তারা আরও খানিক এগুতে সুন্দর বাঁধান একটি চত্বরে এসে পৌঁছোয়। চারিদিকের মনোরম পরিবেশে তারা মুগ্ধ।

অভিযাত্রীরা বুঝতে পারে এবার তারা পবিত্র ঝর্ণাটির কাছে পৌঁছে গেছে। কিন্তু সেটি ঠিক কোথায় তারা বুঝতে পারে না। তারা অধৈর্য ভাবে পথ খোঁজে। এমন সময় এক পূজারিণী এগিয়ে আসেন তাদের পবিত্র ঝর্ণাটির কাছে নিয়ে যেতে।

ঝর্ণায় পৌঁছে প্যানার্জ নতজানু হয়ে তার অন্তরের শ্রদ্ধা জানায়। পূজারিণী কি একটা জিনিস ঝর্ণার জলে ছুঁড়ে দিতে জলটা টগবগ করে ফুটতে সুরু করে। তারপর তাঁর নির্দেশে প্যানার্জ মন্ত্র পড়ে।

প্যানার্জের মন্ত্র পড়া তখনও শেষ হয় নি। পবিত্র ঝর্ণা থেকে দৈববাণী ধ্বনিত হয়—'ট্রিঙ্ক'। আশ্চর্য, পূজারিণী পেছন দিকের বড় রূপোর পাত্রটির দিকে তাকাতে লক্ষ্য করেন, দৈববাণীটি সেটির ওপর স্পষ্ট ফুটে উঠেছে।

ঐ দৈববাণীর অর্থ অভিযাত্রীরা কেউ বুঝতে পারে না। তারা হতভম্ব হয়ে পরস্পর পরস্পরের দিকে অসহায় ভাবে তাকায়।

সে বাণী শুনে পূজারিণীর কিন্তু আনন্দ ধরে না। জানান, এমন স্পষ্ট এবং করুণাময় দৈববাণী তিনি আর কোনদিন শোনেন নি। পূজারিণী তাদের বুঝিয়ে দেন, 'ট্রিঙ্ক'-এর অর্থ পান করো।

প্যানার্জ ধরে নেয়, তার বিয়ের প্রস্তাবে দেবতার অনুমোদন আছে। দৈববাণীকে দেবতার আশীর্বাদ বলে মেনে নিয়ে তারা সেখান থেকে প্রফুল্ল মনে ফিরে আসে।

ডন্ কুইক্সোট্

[স্প্যানিস সাহিত্যের দিক্‌পাল স্থ কারভান্‌টেস [থেরভান্‌তেস্] সাভেদ্রা (Cervantes Saavedra)-এর 'ডন্ কুইক্‌সোট্ [কিখোতে] দ্য লা মাঞ্চা' (Don Quixote de la Mancha), ১৬০৫ খ্রীঃ, বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থটির গল্পরূপ।]

চাকুরি থেকে অবসর গ্রহণ করে অ্যালঞ্জো কুইক্সানো লা মাঞ্চা পল্লীর শান্ত স্নিগ্ধ অঞ্চলে স্থায়ীভাবে বাস করবেন বলে স্থির করেন।

সংসারে কোন ঝামেলা নেই। হাতে অফুরন্ত সময়। ভদ্রলোক বই প'ড়েই সময় কাটান।

একদিন কোন এক 'নাইট'-এর রোমাঞ্চকর জীবনী তাঁর মনে গভীরভাবে রেখাপাত করে। ক্রমে নাইট্‌দের জীবনী পড়া তাঁর নেশায় দাঁড়ায়। একটির পর একটি করে বাড়ির প্রায় সব জিনিস বিক্রী করে তিনি ছুনিয়ার নাইটদের জীবনী এবং তাঁদের কাহিনীগুলি কিনে পড়তে থাকেন।

এই পড়ার ফলে কুইক্সানোর মনে প্রতিক্রিয়া শুরু হয়। তিনিও একজন নাইট হবার স্বপ্ন দেখেন।

দিন যায়। সত্যিসত্যিই হঠাৎ একদিন তাঁর ধারণা হয়, তিনিই বা নাইটদের চেয়ে কম কিসে ? উপাধিটা-ই যা শুধু পাননি ! আসলে সেটা তাঁর কুঁড়েমির জন্য—একটু চেষ্টা করলেই উপাধিটা পাওয়া এমন কিছু শক্ত নয় !

ব্যস্! তিনি তোড়-জোড় শুরু করেন। কোথা থেকে খুঁজেপেতে তাঁর প্রপিতামহের আমলের একটি ভাঙা বর্ম আর মরচে-ধরা বল্লমটি টেনে বার করেন। তারপর সে-ছুটো ঘষে-মেজে নিতে দেরী হয় না। শিরস্ত্রাণও একটি তিনি তৈরী ক'রে নেন। বেতো-বুড়ো ঘোড়াটার কথা

এতদিন তিনি প্রায় ভুলেই গেছলেন—ছুটে গিয়ে ঘোড়াটাকে দু'টো চাপড় মেরে আদর করেন।

সাজপোষাকের ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে কুইক্‌সানো ভাবেন,—না, অনুষ্ঠানের কোন ত্রুটি নেই। এবার যতো শীঘ্র হোক্ দিগ্বিজয়ে তিনি বেরিয়ে পড়বেন। চলার পথে যে-সব অত্যাচার অনাচার তাঁর নজরে পড়বে, সঙ্গে সঙ্গে প্রতিকার ক'রে ঐ সব আর্ত নিপীড়িতদের তিনি ত্রাণ করবেন। নিজের অসাধারণ শৌর্য দেখিয়ে তিনি অক্ষয় যশ লাভ করবেন।

কিন্তু গোল বাধে নিজের নামটি নিয়ে। তাঁর মনে হয়, এতবড় একজন বীরের পক্ষে সেকেলে পৈতৃক নামটা মোটেই উপযোগী নয়, বরং হাস্যাস্পদ। অনেক ভেবে চিন্তে তিনি স্থির করেন, এখন থেকে 'ডন্ কুইক্‌সোট্‌ দ্য লা মাঞ্চা' নামে তিনি নিজেকে জাহির করবেন।

সত্যিসত্যিই সেই অদ্ভুত বর্ম ও শিরস্ত্রাণ প'রে বেতো ঘোড়াটিতে চেপে চুপি চুপি বাড়ির পিছন দিয়ে 'জয় মা মেরী' ব'লে বীরপুরুষটি একদিন বেরিয়ে পড়েন।

সন্ধ্যা নাগাদ তিনি একটি সরাইখানার সামনে উপস্থিত হন। হঠাৎ তাঁর মনে হয়, সরাইখানাটি নিশ্চয়ই কোন প্রাচীন জমিদারের দুর্গ। কুইক্‌সোটের আনন্দ ধরে না। তিনি তাঁর ক্লান্তি ভুলে যান।

সদরে কোলাহল শুনতে পেয়ে সরাইখানার মালিক ছুটে আসেন। কিম্ভূতকিমাকার মানুষটির আসল স্বরূপ বুঝতে অভিজ্ঞ মালিকের দেরী হয় না। মুচকি হেসে তিনি কুইক্‌সোট্‌কে ভেতরে এনে কিছু খেতে দেন।

ডন্ কুইক্‌সোটের তখনও বিশ্বাস—ইনিই দুর্গস্বামী আর সরাইখানাটি একটা দুর্গ।

খাওয়া-দাওয়ার পর তিনি সরাইওয়ালাকে নির্জনে ডেকে হাঁটু গেড়ে বসে তাঁকে মিনতি করেন,—আপনি দয়া করে যদি ঐ তলোয়ারটা আমার কাঁধে ঠেকিয়ে আমাকে 'নাইট' ক'রে দেন তো উপকৃত হই।

সরাইওয়ালা মুস্কিলে পড়েন। ডন্ এবার তাঁকে ভয় দেখান,—'নাইট' না হ'য়ে আমি কিন্তু এখান থেকে নড়ছি না।

অগত্যা সরাইওয়ালাকে সেই অভিনয় করতে হয়—

মনের পুলকে ঐ রাত্রে কুইক্‌সোটের আর ঘুম হয় না। সারা রাত্রি জেগে থাকেন।

শেষ রাত্রির দিকে একজন যাত্রী যখন আস্তাবলে ঢুকছিল তখন মাঝ-পথে ডন্ কুইক্‌সোটের বর্মটা তার নজরে পড়ে। সেটাকে সরিয়ে রাখবার জন্য যাত্রীটি হাত বাড়াতেই কুইক্‌সোট্ সবেগে ছুটে এসে লোকটির পিঠে বসিয়ে দেন বর্শার ডাণ্ডি দিয়ে এক ঘা। লোকটি মাটিতে পড়ে যায়। গোলমাল শুনে আহত লোকটির সঙ্গীরা মারমুখী হয়ে ছুটে আসে। বীরপুরুষটি ধরাশায়ী হন।

ভোর হ'তে সরাইওয়ালা তাঁর এই বিশিষ্ট অতিথিকে বিদায় দিয়ে স্বস্তি পান। যাবার আগে তিনি কুইক্‌সোট্‌কে আর একবার স্মরণ করিয়ে দেন,—ভবিষ্যতে দিগ্বিজয়ে বেরুবার আগে পয়সাকড়ি সঙ্গে নিতে ভুলবেন না যেন।

ডন্ কুইক্‌সোট্ ঘোড়াটির ওপর চেপে আবার চলতে সুরু করেন। খানিকটা এগিয়ে যেতে সহসা তাঁর নজরে পড়ে, একদল বণিক্ সেই পথে আসছে। তিনি ছুটে গিয়ে তাদের সঙ্গে গায়ে পড়ে ঝগড়া বাধান। সদম্ভে বলেন,—মনে রেখো, আমি লা মাঞ্চার সেই দুর্ধর্ষ বীর, যাঁর নামে বাঘে-গরুতে এক ঘাটে জল খায়!

এতেও তাঁর আত্মতুষ্টি হয় না। তিনি বণিকদের আক্রমণ করতে উদ্যত হন। হঠাৎ ঘোড়াটির পা হড়কে যেতে ডন্ কুইক্‌সোট্ মাটিতে পড়ে যান। বর্মের ভারে তিনি আর নড়তে পারেন না। অসহায় ভাবে সেখানেই পড়ে থাকেন। বণিকরা তাঁর বল্লমটি ভেঙ্গে দু' টুকরো করে গালমন্দ দিয়ে সেটিকে তাঁর ওপর ছুঁড়ে ফেলে চলে যায়।

তখন লা মাঞ্চা গাঁয়ের একটি লোক সেই পথে ফিরছিল। সহৃদয় পড়শীটির সাহায্যে সংজ্ঞাহীন ডন্ কুইক্‌সোট্ বাড়ি ফিরে আসেন।

এমনি ভাবে ওঁর মাথাটা বিগড়ে যেতে পাড়ার লোকরা দুঃখিত হন। তাঁরা ভেবে পান না, কি করে কুইক্‌সোটের ঘাড় থেকে নাইট-ভূতটা তাড়ান যায়।

তখনও ওঁর জ্ঞান ফিরে আসেনি। স্থানীয় পুরোহিত আর নাপিত দু'জনে ষড়যন্ত্র করে কুইক্‌সোটের প্রাণপ্রতিম পুস্তকগুলি পুড়িয়ে ফেলে। জ্ঞান ফিরে আসতে তাঁকে দুঃখের সঙ্গে জানানো হয়, হঠাৎ এক মায়াবী এসে নিমেষে সেগুলি সব উধাও করে দিয়েছে।

কথাটা ডন্ কুইক্‌সোট্ নীরবে মেনে নেন। কিন্তু তাঁর উৎসাহ এতটুকুও কমে না। সুস্থ হয়ে উঠতে তিনি আবার বেরিয়ে পড়বার জন্য তোড়-জোড় করেন।

ডন্ কুইক্‌সোট্ স্থির করেন, এবার সঙ্গে একজন অনুচর নেবেন— নইলে নাইটের মর্যাদা থাকে না। সেই উদ্দেশ্যে ঐ পল্লীর একজন সরল চাষীকে তিনি প্রলুব্ধ করেনঃ ভাল করে ভেবে দেখো, আমি যে-সব রাজ্য জয় করবো—সেগুলি সবই তোমাকে দিয়ে দেবো। এমন সুযোগ জীবনে আর পাবে না কিন্তু।

চাষীটি তাঁর প্রস্তাবে রাজী হয়ে যায়।

তা তো হ'লো। এবার তিনি ভাবেন, সত্যিকারের আপনজন বলতে সংসারে তাঁর কেউ নেই। তাহলে দুনিয়াটা জয় করে তাঁর নাম-যশের মুকুটটি কার হাতে তুলে দেবেন? কে হবে তাঁর সুখের সঙ্গিনী? নাইটের একজন বিশ্বস্ত সঙ্গিনীও তো থাকা চাই!

ভেবেচিন্তে ডন্ কুইক্‌সোট্ গাঁয়ের মাঝবয়সী স্থূলাঙ্গিনী ডুলচিনিকে তাঁর সেই মানস-সঙ্গিনীর আসনে বসান। বেচারী ডুলচিনি কিন্তু তার এ সৌভাগ্যের কথা জানল না।

তারপর একদিন রাতের অন্ধকারে ডন্ কুইক্‌সোট্ অনুচরটিকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েন। বুড়ো ঘোড়াটির পিঠে নাইট

মহাশয় আর তাঁর পিছনে গাধার পিঠে যায় অনুচর সাঙ্কো পাঞ্জা। এবার কুইক্‌সোটের উৎসাহটা যেন অনেক বেশী।

কর্তার খুশ মেজাজটা লক্ষ্য করে সাঙ্কো ভয়ে ভয়ে তাঁকে স্মরণ করিয়ে দেয়,—হুজুর, দেখবেন আমার রাজ্যের কথাটা যেন ভুলবেন না।

—আরে রামচন্দ্র! রাজ্য কি একটা! কতো চাই তোমার বল? ডন্ কুইক্‌সোট্ তাকে অভয় দেন।

সরল চাষীর মনে আনন্দ ধরে না। তারা দু'জনে এগিয়ে যায়। আরও খানিকটা এগুতে তাদের সামনে পড়ে গোটাকতক হাওয়া-কল —বড় বড় ডানা মেলে দাঁড়িয়ে আছে।

সেগুলি নজরে পড়তে ডনের ধারণা হয়, ওগুলো নিশ্চয়ই দৈত্যগোছের কিছু হবে; ওদের মেরে ফেলতে পারলে তাঁর বীরত্বের কথা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়বে।

যেমনি ভাবা অমনি তিনি তাঁর অস্ত্র নিয়ে একটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। সাঙ্কো বেচারী অনেক করে প্রভুকে বোঝাবার চেষ্টা করলে। কিন্তু কে কার কথা শোনে!

ঠিক সেই সময় জোরে হাওয়া বইতে শুরু করায় আক্রান্ত পাখাটা প্রবল বেগে ঘুরে যায়। ফলে, বীরপুরুষটি শুধু ছিটকেই পড়লেন না— তাঁর সাধের বল্লমটাও টুক্‌রো টুক্‌রো হয়ে ভেঙ্গে গেল।

সাঙ্কো ছুটে গিয়ে প্রভুকে তুলে তাঁর ক্ষত স্থানগুলিতে হাত বুলোতে থাকে। কুইক্‌সোটের কিন্তু সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। তিনি অনুচরটিকে বোঝাবার চেষ্টা করেন: কি জান, ওগুলো যে দৈত্য তাতে কোন সন্দেহই নেই। তবে মায়াবলে নিমেষে ওরা হাওয়া-কল হ'য়ে আমার হাত থেকে ফস্‌কে গেল। প্রভুর কণ্ঠে আফশোষ।

দু'জন আবার চলতে শুরু করেন। কিছুদূর যেতে তাঁরা দেখতে পান—পাল্কীর ভেতরে একজন সম্ভ্রান্ত মহিলা বসে আছেন। পাল্কীর সামনে কয়েকজন অশ্বারোহী ভিক্ষু-সন্ন্যাসী, পেছনে দু'জন অনুচর।

ডন্ কুইক্‌সোটের মনে হয়, ভদ্রমহিলা বন্দী। তিনি মহিলার সঙ্গীদের হুকুম করেন—শীঘ্র এঁকে ছেড়ে দাও। তারপর একজন ভিক্ষুকে আচমকা ধাক্কা দিয়ে ঘোড়ার পিঠ থেকে ফেলে দেন। ততক্ষণে পেছন থেকে একজন অনুচর ছুটে এসে বেচারী সাঙ্কোর ওপর চড়াও হয়।

ব্যাপারটা অবশ্য বেশীদূর গড়ায় না। তবে যেতে যেতে ডন্ কুইক্‌সোট্ তাঁদের উদ্দেশে বলতে ছাড়েন না,—এ যাত্রায় ছেড়ে দিলাম। যাবার পথে ডুলচিনি দেবীকে তোমাদের এ মুক্তির জন্য কৃতজ্ঞতা জানাতে ভুলো না যেন।

সাঙ্কো বেচারীর রাজ্য লাভের সাধ মিটে গেছে। সে ঘরে ফেরবার জন্য প্রভুকে তাগিদ দেয়। কোন ফল হয় না। অগত্যা তাকে আবার চলতে হয়।

দীর্ঘ পথ চলায় দু'জনে ক্লান্ত, ক্ষুধার্ত। তাঁরা গিয়ে হাজির হন অদূরের সরাইখানাটিতে। আপ্যায়নের কোন ত্রুটি হয় না। কিন্তু দক্ষিণা চাইতেই বাধে গোল। তাঁর পকেট যে শূন্য।

অপমানিত হ'য়ে ডন্ কুইক্‌সোট্ এক ফাঁকে রাস্তায় বেরিয়ে আসেন। সাঙ্কো কিন্তু সহজে মুক্তি পায় না। বেচারীকে কম্বলের মধ্যে বন্দী করে কিছু উত্তম মধ্যম দিয়ে সরাইখানার মালিক মনের ঝাল মিটিয়ে নেন।

চোখের জল মুছতে মুছতে সে আবার প্রভুর সঙ্গে রাস্তায় মিলিত হয়। প্রভু তাকে সমবেদনা জানান।

তাঁরা এগিয়ে চলেন। হঠাৎ দূরে ধুলো উড়তে দেখে বীরবর মনে করেন, অশ্বারোহী শত্রুরা তাঁদের আক্রমণ করতে আসছে। সঙ্গে সঙ্গে তিনিও তেড়ে যান। কাছে যেতে দেখা যায়, একপাল নিরীহ ভেড়া।

কিন্তু ডনের মাথায় তখন খুন চেপে গেছে। লক্ষ্য করে দেখবার তাঁর অবকাশ কোথায়। তিনি ঐ ভেড়াগুলোকেই মারতে শুরু করেন।

কাণ্ড দেখে ভেড়াওয়ালা তো স্তম্ভিত। কিছুক্ষণের মধ্যেই সম্বিৎ ফিরে আসতে সে-ও তার প্রকাণ্ড লাঠি আর পাথরের টুকরো দিয়ে

এতদিনে তাঁর যোগ্য সম্মান পেয়ে ডন্ কুইক্সোট্ তো আনন্দে অধীর!

অনুচর সাঙ্কোর গোপন আকাঙ্ক্ষার কথাটিও ডিউকের অ-জানা ছিল না। তাই রহস্যচ্ছলে তাঁরই একটি তালুকের শাসনকর্তা করে সাঙ্কোকে তিনি সেখানে পাঠিয়ে দেন।

ডন্ কুইক্সোট্ গুরুগম্ভীর উপদেশ-নির্দেশ দিয়ে তারপর সস্নেহে আলিঙ্গন করে অনুচরটিকে বিদায় দেন।

তালুকে পৌঁছোবার পর সাঙ্কোর প্রথমে গোল বাধে খাবার সময়—

ভাল ভাল সব রাজভোগ। দেখেই তো সাঙ্কোর...

কিন্তু যেমনি একটি ধরে মুখে তুলতে যায়, অমনি উপস্থিত রাজ-চিকিৎসকের ইশারায় ভৃত্য সেটি তার হাত থেকে সরিয়ে রাখে। ভৃত্যটি জানায়, হুজুর আপনার শরীরটা আগে পরীক্ষা করা দরকার।

সাঙ্কো বেচারী ততক্ষণে কাঁদো-কাঁদো! এমন সময় আবার ডিউকের দূত এসে জানায়, শত্রুরা এ-রাজ্য আক্রমণ করতে এগিয়ে আসছে!

খাবার পর্ব মাথায় ওঠে। সাঙ্কোকে উঠে পড়তে হয়। আক্রমণ প্রতিরোধের ব্যবস্থাটা তক্ষুনি তাকে করতে হবে তো!

এমনি করে একটা না একটা ঝামেলা রোজই দেখা দেয়। সাতদিন যেতে না যেতেই বেচারীর রাজা হবার শখ মিটে যায়। সাঙ্কো তখন তার প্রভুকে জরুরী চিঠি দেয়ঃ এ রাজকার্য থেকে মুক্তি পেয়ে আবার রাস্তায় বেরুতে পারলে আমি বাঁচি!

তারপর একদিন খুব সকালে উঠে রাজবেশ ত্যাগ করে আস্তাবল থেকে প্রিয় গাধাটিকে বার করে সাঙ্কো একেবারে চোঁচাঁ দৌড়।

ডন্ কুইক্সোটের অবস্থাও তখন 'ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি' গোছের। ঘটনাচক্রে তিনিও ঐ সময় রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছিলেন।

এতদিন বাদে প্রিয় সঙ্গীটিকে পেয়ে তিনি হাঁপ ছেড়ে বাঁচেন। দু'জনে আবার এগিয়ে চলেন।

এরপর আরও কিছু অঘটন ঘটবার পর কুইক্‌সোটের সঙ্গে আর এক নাইটের লড়াই বাধে। আসলে এই দ্বিতীয় নাইটটি ছিলেন ডন্ কুইক্‌সোটের একজন হিতৈষী বন্ধু। ওঁর কাঁধ থেকে নাইট-ভূতটা তাড়াবার জন্য ছদ্মবেশী বন্ধুটির এই প্রচেষ্টা।

তাঁর কাছে শোচনীয় ভাবে পরাজিত হ'য়ে তাঁরই হুকুমে ডন্ কুইক্‌সোট্‌কে স্বদেশে ফিরে আসতে হয়।

দেশে ফিরে এসে ডন্ কুইক্‌সোটের চৈতন্য হয়। এতদিনকার তাঁর স্বপ্নকে তিনি অর্থহীন বলে উপলব্ধি করেন। বাস্তবজ্ঞান ফিরে আসতে ঐ-পাগলামির জন্য অনুশোচনায় তাঁর মন ভরে ওঠে।

কিন্তু তখন বড্ড দেরী হয়ে গেছে। তাঁর জীবনের বেলা গড়িয়ে গেছে। সে-কথা ডন্ কুইক্‌সোট্‌ও উপলব্ধি করেন। তাই আত্মস্থ হ'য়ে নীরবে তিনি পরলোকে যাবার দিন গুনতে থাকেন।

হ্যামলেট

[ইংরেজী সাহিত্যের দিকপাল উইলিয়াম সেক্‌স্‌পীয়ার [William Shakespeare]-এর **'হ্যামলেট'** (Hamlet), ১৬০২ খ্রীঃ, নাটকটির গল্পরূপ।

নিশুতি রাত। নীরন্ধ্র অন্ধকার। চারিদিক নিস্তব্ধ। মাঝে মাঝে শুধু রাজপ্রাসাদের সশস্ত্র প্রহরীদের পায়ের ভারী বুটের শব্দ শোনা যায়। হঠাৎ প্রাসাদের প্রাচীরের ওপর একটি ছায়ামূর্তি ভেসে ওঠে। প্রহরীরা সচকিত হয়ে ওঠে। তাদের মধ্যে একজন আগন্তুকের পরিচয় জানতে চায়। ছায়ামূর্তিটি ভ্রূক্ষেপ করে না—সদম্ভে প্রাচীরের ওপর দিয়ে হাঁটতে থাকে। প্রহরীটি এবার কঠিন স্বরে ছায়ামূর্তিটিকে থামতে আদেশ করে। কোন ফল হয় না। মূর্তিটি আপন মনেই হাঁটতে থাকে।

ভয় পেয়ে প্রহরীটি দু'জন সঙ্গীকে তাড়াতাড়ি ডেকে আনে। সঙ্গীরাও দূর থেকে ছায়ামূর্তিটি প্রত্যক্ষ করে। তখন রাতের শেষ প্রহর। ছায়ামূর্তিটি প্রহরীদের চোখের সামনে একসময় মিলিয়ে যায়। প্রহরীরা স্তম্ভিত।

পর পর তিন দিন অমনি ভাবে ছায়ামূর্তিটির আবির্ভাব হ'তে প্রহরীরা তাদের সন্দেহবাদী সঙ্গী হোরেসিও-কে ডেকে আনে। ভীতকণ্ঠে সঙ্গীকে লক্ষ্য করে তারা বলে,—নিজের চোখেই দেখ!

হোরেসিও পায়ে পায়ে ছায়ামূর্তিটির কাছে এগিয়ে গিয়ে চমকে ওঠে। সে অবাক-বিস্ময়ে তার দিকে তাকিয়ে থাকে—এ যে সদ্য-স্বর্গত সম্রাটের প্রতিমূর্তি!

আশ্বস্থ হ'তে, হোরেসিও ছায়াটির সঙ্গে কথা বলবার চেষ্টা করে। ছায়মূর্তিটি কিন্তু তার দিকে ফিরে তাকায় না, কোন জবাবও দেয় না।

আপন মনে তেমনি ভাবেই হাঁটতে থাকে। তারপর ভোরের আলো পূবদিকে উঁকি দিতে সে যথারীতি অদৃশ্য হয়ে যায়।

হোরেসিও চিন্তিত হয়। তার বিমূঢ় সঙ্গীরাও ঐ ছায়ামূর্তিটিকে কেন্দ্র করে নিজেদের মধ্যে নানা জল্পনা-কল্পনার জাল বুনতে শুরু করে। তারা ভাবে, এ নিশ্চয়ই দেশের কোন আসন্ন অমঙ্গলের সংকেত।

হোরেসিও ছিল যুবরাজ হ্যামলেটের অন্তরঙ্গ বন্ধু। সে চুপ করে বসে থাকতে পারে না। স্থির করে, ব্যাপারটা যুবরাজকে গোপনে জানাতে হবে।

এদিকে পিতার আকস্মিক মৃত্যু-সংবাদ পেয়ে হুইটেনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রাজপ্রাসাদে ফিরে এসে যুবরাজ হ্যামলেট সর্বদা ম্রিয়মাণ হয়ে থাকেন। সব কিছুতেই তিনি থাকেন উদাসীন, নির্লিপ্ত।

ঐ দুঃখের মধ্যে হ্যামলেট মাঝে মাঝে ভাবেন, যে-পিতা মা-কে অত গভীর ভাবে ভালবাসতেন—সেই দেবতুল্য স্বর্গত স্বামীর কাল-অশৌচ না পেরোতেই মা কি করে তাঁকে ভুলে অপদার্থ খুল্লতাত ক্লডিয়াসের গলায় মালা পরালেন! তিনি ভাবতে পারেন না, তাঁর গর্ভধারিণী এত হীন, এত অকৃতজ্ঞ!

মা-র এ অবাঞ্ছিত আচরণ হ্যামলেটের মনে গভীর ভাবে আঘাত করে। ক্লডিয়াস তাঁকে সিংহাসন থেকে বঞ্চিত করাতেও তিনি অত আঘাত পাননি! দারুণ মনস্তাপে যুবরাজ হ্যামলেটের দিন কাটতে থাকে।

মহারাণী গারট্রুড পুত্রকে সান্ত্বনা দেন,—তোমার মনের গ্লানি দূর কর, হ্যামলেট। পৃথিবীতে অমর কে কোথায় আছে বল। তাঁর কথার খেই ধরে খুল্লতাত-সম্রাট ক্লডিয়াসও হ্যামলেটকে আশ্বাস দেন,—তুমি শান্ত হও। আর পাঁচ জনের মতো তোমার পিতারও স্বাভাবিক মৃত্যুই হয়েছে। তা, তোমার কষ্ট কিসের? আমার কাছ থেকেও তুমি সেই পিতৃ-স্নেহই পাবে।

কিন্তু এঁদের কারুর কথাই যুবরাজের মন স্পর্শ করে না। তিনি একাকী নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করতে থাকেন। এদিকে নানা কথা তাঁর কানে ভেসে আসে। সে-সব কথা শুনে মাঝে মাঝে পিতার মৃত্যুটাকে রহস্যময় বলে তাঁর মনে হয়। কখনও বা তাঁর মনে সন্দেহ জাগে : কে জানে হয়তো সিংহাসনের লোভে ক্লডিয়াস তাঁর পিতাকে হত্যা করেছে। হয়তো এ জঘন্য কাজে মা-রও মৌন সম্মতি ছিল!

শোকের পোষাক পরে সেদিনও হ্যামলেট বিষণ্ণ মনে একাকী বসে ছিলেন। এমন সময় বন্ধু হোরেসিও উত্তেজিত ভাবে উপস্থিত হয় তাঁর সামনে। বন্ধুর মুখে ছায়ামূর্তির কথা শুনে হ্যামলেট সচকিত হন।

চতুর্থ রাত্রি। হোরেসিও এবং তার সঙ্গীদের সঙ্গে হ্যামলেট অধীর আগ্রহে ছায়ামূর্তির জন্য প্রতীক্ষা করেন। যথাসময়ে ছায়ামূর্তি তাঁদের সামনে স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

হ্যামলেট কি একটা প্রশ্ন করতে ছায়ামূর্তি তাঁকে এক নির্জন কোণের দিকে যেতে ইঙ্গিত করে। বন্ধুদের বাধা-নিষেধ অগ্রাহ্য করে হ্যামলেট ছায়াটিকে অনুসরণ করেন।

এবার ছায়ামূর্তি গম্ভীর কণ্ঠে হ্যামলেটকে বলে,—আমি তোমার স্বর্গত পিতার আত্মা। সাপের কামড়ে আমার মৃত্যু হয়নি, জেনো ; ঘুমন্ত অবস্থায় ক্লডিয়াস আমার কানে বিষ ঢেলে নিষ্ঠুরভাবে আমাকে হত্যা করেছে। তুমি তোমার পিতৃহন্তার ওপর প্রতিশোধ নাও।

একটু থেমে ছায়া আবার বলে,—তোমার মা-র বিশ্বাসঘাতকতায়ও আমি ক্ষুব্ধ। কিন্তু খবরদার, মা-কে লাঞ্ছিত করো না। তার অপরাধের বিচার ঈশ্বর করবেন।

এ ঘটনার পর যুবরাজ বুঝতে পারেন, কেন তিনি মা-র চোখে কোন দুঃখের আভাস লক্ষ্য করেন নি। কেনই বা ক্লডিয়াস তাঁর সঙ্গে সহজ ভাবে কথা বলতে পারেন না। প্রতিহিংসার আগুনে হ্যামলেট জ্বলে ওঠেন।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মনে সন্দেহ উঁকি দেয় : সত্যসত্যই কি তা

তাঁর স্বর্গত পিতার আত্মার উক্তি? না, ছদ্মবেশী কোন শয়তানের প্রেতাত্মা তাঁর দুঃসময়ের সুযোগ নিয়ে তাঁকে অপদস্থ করতে চায়!

হ্যামলেট দ্রুত কোন সিদ্ধান্ত নেন না। তবে ক্লডিয়াসের ওপর বিশ্রী সন্দেহটা তাঁর মনে থেকেই যায়। তিনি আরও স্পষ্ট প্রমাণের জন্য অপেক্ষা করেন।

ছায়ামূর্তির আবির্ভাবের কথাটি বন্ধুদের গোপন রাখতে হ্যামলেট অনুরোধ করেন। সেই সঙ্গে তাদের জানান, এবার থেকে তাঁর আচরণে পাগলামির লক্ষণ দেখা গেলে বন্ধুরা যেন তাঁকে ভুল না বোঝেন।

বন্ধুরা হ্যামলেটকে কোন প্রশ্ন করেন না। তাঁর অনুরোধ পালন করবার জন্য তাঁরা প্রতিশ্রুতি দেন।

পরদিন থেকে হ্যামলেট সত্যিসত্যি পাগলের মতো ব্যবহার করেন। তাঁর অস্বাভাবিক আচরণে ক্লডিয়াস এবং মা গারট্রুড চিন্তিত হন।

ক্লডিয়াসের মনে তখন নানা কারণে শান্তি ছিল না: নরওয়ে সে-সময় ডেনমার্ক আক্রমণ করতে উদ্যত। ঐ দুশ্চিন্তার মধ্যে ভ্রাতৃহত্যার জন্য বিবেক-দংশনের জ্বালাও মাঝে মাঝে তাঁকে সইতে হচ্ছিল। গারট্রুডের সঙ্গে তিনিও উপলব্ধি করেছিলেন—তাঁদের বিয়েটা হ্যামলেট সহ্য করতে পারেনি, হয়তো কাজটা তাঁদের উচিতও হয়নি।

ঠিক সেই সময় হ্যামলেটের আচরণে নানা অসঙ্গতি লক্ষ্য করে ক্লডিয়াসের অপরাধী মনে সন্দেহ জাগে,—কে জানে হয়তো হ্যামলেট তাঁর বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে!

দিন যায়। ক্লডিয়াস চিন্তিত হন, সত্যিই কি হ্যামলেটের মস্তিষ্ক-বিকৃতি ঘটেছে, না এ তার মুখোশ মাত্র! তাঁর সন্দেহ দূর করতে চতুর ক্লডিয়াস হ্যামলেটের দু'জন বাল্য-বন্ধুকে তার ওপর গোপনে নজর রাখবার জন্য নিয়োগ করেন।

বন্ধু দু'টি কিন্তু হ্যামলেটের কাছে প্রতি পদেই অপদস্থ হয়। তারা হালে পানি পায় না। হ্যামলেট মনে মনে হাসেন।

ক্লডিয়াস মুস্কিলে পড়েন। এমন সময় প্রবীণ মুখ্য-মন্ত্রী পোলোনিয়স্ পুলকিত হ'য়ে একদিন ছুটে আসেন। বলেন,—সম্রাট, চিন্তার কোন কারণ নেই। যুবরাজের পাগলামির কারণ খুঁজে পেয়েছি। আপনি নিশ্চিন্ত হোন। এ নিছক প্রেমঘটিত। আমার কন্যা কুমারী ওফেলিয়ার প্রেমে আশাহত হয়ে হ্যামলেটের এই শোচনীয় পরিণাম! তারপর ওফেলিয়ার কাছে হ্যামলেটের লিখিত একটি আবেগময় প্রেম-পত্র তিনি ক্লডিয়াসের হাতে তুলে দেন।

এমন সময় উদ্‌ভ্রান্ত হ্যামলেট ঐ কক্ষে ঢুকতে তাঁদের রসভঙ্গ হয়।

সুন্দরী ওফেলিয়াকে তরুণ হ্যামলেট একদিন সত্যিসত্যিই ভালবেসেছিলেন। তাঁর প্রেমে ওফেলিয়ারও কোন সন্দেহ ছিল না। কিন্তু পিতার মৃত্যুর পর নানা ঘটনা-চক্রের আবর্তে পড়ে তাঁর অন্তরের প্রেমের ফুলটি কখন যে শুকিয়ে গেছে হ্যামলেট তা টের পান নি। তিনি জানতেন, বেচারী ওফেলিয়ারও দৃঢ় ধারণা ঃ তাঁর প্রেমাস্পদটি মানসিক রোগগ্রস্ত!

ঐ কঠিন পরিস্থিতিতেও মাঝে মাঝে প্রেয়সী ওফেলিয়ার কথা মনে হতে হ্যামলেট বেদনা বোধ করেন। কখনও বা অসহায় ভাবে তিনি উপলব্ধি করেন, ওফেলিয়ার প্রতি তিনি অবিচার করছেন। তাই দু'দিন আগে হঠাৎ উচ্ছ্বসিত ভাষায় ওফেলিয়াকে হ্যামলেট ঐ দীর্ঘ চিঠিটি লিখেছিলেন। বেচারী ওফেলিয়া!

ছায়ামূর্তির উক্তি হ্যামলেট কিন্তু মুহূর্তের জন্যও ভুলতে পারেন না। ভুলতে পারেন না তার করুণ মিনতি—পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নাও! কিন্তু তখনও পর্যন্ত একদিকে যেমন তিনি ক্লডিয়াসের বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট কোন প্রমাণ পাননি অন্যদিকে ছায়ামূর্তিটির সম্বন্ধেও তিনি নিঃসন্দেহ হ'তে পারছিলেন না—সত্যিই কি সেটি তাঁর স্বর্গত পিতার বিক্ষুব্ধ আত্মা! তাই তিনি ক্লডিয়াসের বিরুদ্ধে প্রতিহিংসা নিতে ইতস্ততঃ করছিলেন।

হ্যামলেটের মন যখন এমনি দ্বন্দ্ব-বিক্ষুব্ধ—ঠিক সেই সময় বাইরে থেকে এলসিনো নগরে একটি নাট্যসঙ্ঘ এসে হাজির হয়।

নাট্যসঙ্ঘটিকে কেন্দ্র করে হ্যামলেটের মাথায় বিদ্যুদ্‌বেগে কূটবুদ্ধি খেলে যায়। তিনি ভাবেন, ছায়ামূর্তির উক্তি সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হবার এ এক অপূর্ব সুযোগ!

হ্যামলেট স্থির করেন, তথাকথিত পিতৃহত্যার ঘটনাটিকে পটভূমিকা করে তিনি গোপনে একটি নাটক রচনা করবেন। তারপর নাট্যসঙ্ঘের উদ্যোগে সেটি পরিবেশনের ব্যবস্থা করবেন।

অভিনয় শুরু হতে ক্লডিয়াসের মনের প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করবার জন্য হ্যামলেট অপলক দৃষ্টিতে তাঁর মুখের দিকে আড় চোখে তাকিয়ে থাকেন। প্রথম অঙ্ক শেষ হতে ক্লডিয়াসের মধ্যে কেমন এক অস্থিরতা শুরু হয়। তারপর 'চরম মুহূর্ত'টির পূর্বাভাস পেতে তিনি আর স্থির হয়ে বসে থাকতে পারেন না। টলতে টলতে ক্লডিয়াস উঠে পড়েন।

সম্রাট হঠাৎ এমনি ভাবে অসুস্থ হয়ে পড়াতে গারট্রুড এবং অন্য সকলে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। শুধু হ্যামলেটের মুখে ফুটে ওঠে খুশির আভাস। প্রাণভরে তিনি স্বস্তির নিঃশ্বাস নেন।

এবার হ্যামলেটের মনে আর কোন সন্দেহের অবকাশ থাকে না। প্রতিহিংসার আগুনে তিনি জ্বলে ওঠেন। ভাবেন, আর দেরী নয়। পিতৃহন্তার বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেবার ষড়যন্ত্রের কথা সবে বন্ধু হোরেসিও-র সঙ্গে আলোচনা করতে যাবেন, এমন সময় ক্লডিয়াসের নির্দেশে গারট্রুড পুত্র হ্যামলেটকে তাঁর নিজ কক্ষে ডেকে পাঠান।

ক্লডিয়াসের মনেও তখন ঝড় বইছিল। কিন্তু সিংহাসন আর সুন্দরী গারট্রুডের মোহ দুর্জয়। তাই মনের অনুশোচনাকে প্রশ্রয় দিতে তিনি নারাজ। ঐ দুর্বলতাকে চাপবার জন্য তিনি প্রাণপণ চেষ্টা করেন। তবুও এক সময় তিনি খোলা-দরজার দিকে পেছন ফিরে প্রার্থনার ভঙ্গিতে হাঁটু গেড়ে বসেন।

মা-র ঘরে যাবার পথে হঠাৎ পিতৃহন্তার ওপর নজর পড়তে হ্যামলেট

থমকে দাঁড়ান। শাণিত তরবারিটিকে কোষমুক্ত করে তিনি শক্ত-মুঠিতে ধরেন। ভাবেন, এই তো অপূর্ব সুযোগ!

সহসা বিবেক তাঁকে বাধা দেয়। হ্যামলেটের মন বলে,—ছিঃ ছিঃ এমন অবস্থায় নয়। তাহলে শয়তান ক্লডিয়াস মরেও অমর হবে। কেউ তাঁর পাপের কথা জানবে না। আর, তুমি হবে কাপুরুষ বলে কুখ্যাত।

হ্যামলেট সেখানে আর দাঁড়ান না। তরবারি কোষবদ্ধ করে মা'র ঘরের দিকে দ্রুত এগিয়ে যান।

হ্যামলেট ঘরে ঢুকতে গার্‌ট্রুড তাঁকে তীব্র ভাষায় তিরস্কার করেন। বলেন, তোমার পিতা অর্থাৎ সম্রাট ক্লডিয়াসের প্রতি তোমার ঔদ্ধত্য এবং অবাঞ্ছিত আচরণ লক্ষ্য করে আমি মর্মাহত, তিনিও ক্ষুব্ধ...।

ঐটুকুই হ্যামলেটকে উত্তেজিত করবার পক্ষে যথেষ্ট। গার্‌ট্রুড তাঁর বক্তব্য শেষ করতে পারেন না। হ্যামলেট তীব্র ভাষায় প্রতিবাদ জানান। দেবতুল্য পিতার মৃত্যুর পর মা-র অবাঞ্ছিত আচরণের প্রতি কটাক্ষ করতেও তিনি দ্বিধা করেন না।

পুত্রের রুদ্রমূর্তি দেখে গার্‌ট্রুড কক্ষ থেকে প্রস্থান করতে উদ্যত হলে হ্যামলেট তাঁর হাত ধরে বসিয়ে দেন। ভয় পেয়ে গার্‌ট্রুড চীৎকার করে ওঠেন।

ক্লডিয়াসের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে মুখ্যমন্ত্রী পোলোনিয়স্‌ তখন পর্দার আড়ালে আত্মগোপন করে মা ও ছেলের কথাবার্তা আড়ি পেতে শুনছিলেন।

গার্‌ট্রুড-এর চিৎকার শুনে পোলোনিয়স চঞ্চল হয়ে ওঠেন। হঠাৎ পর্দাটা নড়ে উঠতে দেখে হ্যামলেট ধরে নেন, নিশ্চয়ই তাঁর পরম শত্রু ক্লডিয়াস পর্দার পেছনে লুকিয়ে আছে। সঙ্গে সঙ্গে হ্যামলেট পর্দার এপার থেকে অদৃশ্য লোকটির উদ্দেশে শাণিত তরবারিটি চালিয়ে দেন।

আর্তনাদ করে বৃদ্ধ পোলোনিয়স মাটিতে লুটিয়ে পড়তে তাঁর হঠকারিতার জন্য অনুশোচনায় হ্যামলেটের মন ভরে ওঠে। গার্‌ট্রুড স্তম্ভিত।

এ দুর্ঘটনার পর ক্লডিয়াস হ্যামলেটকে আর কাছে রাখতে ভরসা পান না। ষড়যন্ত্র করে তিনি তাঁকে দুজন সঙ্গী দিয়ে ইংলণ্ডে পাঠান। সঙ্গীদের কাছে একটা গোপন-চিঠিতে লেখা ছিল যে ইংলণ্ডে পৌঁছন মাত্র হ্যামলেটকে যেন হত্যা করা হয়।

সঙ্গীদের হাতের ঐ সীলমোহর-করা চিঠিটি গোড়া থেকেই হ্যামলেটের মনে সন্দেহ জাগিয়েছিল। এক ফাঁকে তিনি ক্লডিয়াসের লেখা সেই গোপন চিঠিটি খুলে দেখেন.—সর্বনাশ, এ যে তাঁর মৃত্যু-পরোয়ানা! সঙ্গে সঙ্গে নিজের নামটি মুছে হ্যামলেট সেখানে সঙ্গী দু'জনের নাম বসিয়ে দেন—যাতে করে তাঁর বদলে সঙ্গী দু'টিই বলি হয়।

ইংলণ্ড পর্যন্ত অবশ্য তাঁকে আর যেতে হলো না। মাঝপথে ঘটনা-চক্রে একদল জলদস্যুর সাহায্যে হ্যামলেট অপ্রত্যাশিত ভাবে ডেনমার্কে ফিরে আসেন।

এদিকে হ্যামলেটের প্রেমে আশাহত হয়ে ওফেলিয়া প্রায় উন্মাদ হয়ে গেছে। তার ওপর পিতা পোলোনিয়সের অপমৃত্যুর আঘাত সে সইতে পারেনি। কিছুদিনের মধ্যেই সে সম্পূর্ণ উন্মাদ হয়ে যায়। তারপর সহসা একদিন আকস্মিকভাবে জলে ডুবে অভাগী জীবন-যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পায়।

স্বদেশে ফিরে হ্যামলেট প্রণয়িনীর এই মর্মান্তিক পরিণতির কথা জেনে প্রচণ্ড আঘাত পান। কিন্তু তাঁর শোক করবার অবকাশ কোথায়? তখন তাঁর একমাত্র লক্ষ্য—কতক্ষণে পিতৃহন্তার ওপর প্রতিশোধ নেবেন!

ওদিকে পোলোনিয়সের মৃত্যু-সংবাদ পেয়ে তাঁর পুত্র লারটেস ছুটে আসে। সে মারমুখী হয়ে সরাসরি রাজপ্রাসাদে গিয়ে ক্লডিয়াসের মুখোমুখি দাঁড়ায়। ক্লডিয়াস তাকে অনেক কষ্টে বোঝান, তার পিতার হত্যাকারী হ্যামলেট, তিনি নন। তিনি লারটেসকে জানান, হ্যামলেট সম্রাটেরও পরমশত্রু।

এমনি ভাবে ক্লডিয়াস যখন হ্যামলেটের বিরুদ্ধে লারটেসের মন

বিষাক্ত করছিলেন—দূত এসে অপ্রত্যাশিত খবরটি ক্লডিয়াসকে জানায়ঃ যুবরাজ হ্যামলেট ফিরে এসেছেন। শুনে ক্লডিয়াস আঁৎকে ওঠেন। কিন্তু ক্ষণিকের মধ্যে চতুর ক্লডিয়াস নিজেকে সামলে নেন। তাঁর মুখে ফুটে ওঠে ক্রূর হাসি।

ক্লডিয়াস লারটেসকে হ্যামলেটের বিরুদ্ধে দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে নামতে প্ররোচিত করেন। বলেন, দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে তোমার সু-নামের কথা কে না জানে? হ্যামলেট'ও তোমাকে ঈর্ষা করে। ভয় কি তোমার? তোমার তরবারির মুখে মারাত্মক বিষ থাকবে—কেউ জানবে না। ঐ মুখটি দিয়ে তোমার শত্রুর দেহ শুধু একবার স্পর্শ করলেই হবে।

লারটেস ক্ষণিকের জন্য কি চিন্তা করে। তারপর ভাবে, হ্যামলেট শুধু তার পিতৃহন্তাই নয়, বোন ওফেলিয়ার মৃত্যুর কারণও সে। লারটেস সম্রাট ক্লডিয়াসের সে-প্রস্তাব লুফে নেয়।

হ্যামলেট কিন্তু সরল বিশ্বাসে এটিকে নিছক বাজির খেলা বলেই গ্রহণ করেন।

নির্ধারিত সময়ে ক্লডিয়াসের সঙ্গে গারট্রুড্‌ও উপস্থিত হন এই দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ দেখবার জন্য। উপস্থিত থাকেন অনেক বিশিষ্ট এবং সাধারণ দর্শকবৃন্দ, হ্যামলেটের বন্ধু হোরেসিও-ও।

হ্যামলেটের বিরুদ্ধে শুধু বিষাক্ত তরবারির ব্যবস্থা করেই ক্লডিয়াস ক্ষান্ত হননি; হ্যামলেটের হাতের কাছে এক বাটি বিষাক্ত পানীয়ও তিনি রেখে দেন।

খেলা শুরু হবার আগে হ্যামলেট লারটেসকে তার দুঃখে সমবেদনা জানাতে ভোলেন না। যথাসময়ে দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ শুরু হয়। পর পর দু' দফায় হ্যামলেট লারটেসকে মৃদু আঘাত করেন—নেহাত খেলার ছলেই।

পুত্রের সাফল্যে উল্লসিত হয়ে গারট্রুড এক ফাঁকে হ্যামলেটের জন্য রাখা সেই বিষাক্ত পানীয়ের বাটিটি তুলে কিছুটা পান করেন।

তৃতীয় দফা খেলাটি অমীমাংসিত হয়। হ্যামলেট এই সময় একটু

অসতর্ক হ'তে লারটেস তাঁকে আচমকা প্রচণ্ড আঘাত করে। সেই বিষ-মাখানো তরবারির খোঁচায় হ্যামলেটের গা থেকে রক্ত বেরুতে থাকে। কিন্তু সেদিকে তিনি ভ্রূক্ষেপ করেন না। সিংহবিক্রমে শত্রুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন।

ধস্তাধস্তির ফলে এক সময় দু'জনের হাতের তরবারি বদলে যায়। এবার হ্যামলেট ঐ তরবারিটি প্রায় আমূল বসিয়ে দেন লারটেসের দেহে। বিষাক্ত তরবারির আঘাত খেয়ে লারটেসের সম্বিৎ ফিরে আসে। খেলার নামে দুষ্ট সম্রাটের প্ররোচনায় এই হীন পন্থার আশ্রয় নেবার জন্য আত্মগ্লানিতে লারটেসের মন ভরে ওঠে।

ঠিক সেই সময় 'বিষ' 'বিষ' ব'লে দু'বার আর্তনাদ করে গারট্রুডের নিস্পন্দ দেহ ঢলে পড়ে। উপস্থিত জনতা চমকে ওঠে।

অনুতপ্ত লারটেস আর দেরী করে না। হ্যামলেটকে হত্যা করার হীন ষড়যন্ত্রের কথা খুলে বলে। ক্লান্ত কণ্ঠে লারটেস জানায়,—আমার হয়ে এলো। ক্ষমা করো, বন্ধু। তোমারও আর বেশী দেরী নেই...।

লারটেসের নিস্পন্দ দেহটির ওপর নজর পড়তে হ্যামলেট বুঝতে পারেন, এই শেষ সুযোগ। তিনি আর সময় নষ্ট করেন না। উন্মাদের মতো ছুটে গিয়ে সেই বিষাক্ত শাণিত তরবারিটি শয়তান ক্লডিয়াসের বুকে আমূল বসিয়ে দেন। তবুও যেন তাঁর আশ মেটে না—বাটির বিষাক্ত পানীয়টুকুও ক্লডিয়াসের মুখে হ্যামলেট ঢেলে দেন।

কিন্তু এতদিনে পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নিয়ে তৃপ্তির নিঃশ্বাসটুকুও নেবার অবকাশ পান না হতভাগ্য হ্যামলেট। তিনিও মাটিতে লুটিয়ে পড়েন—আর ওঠেন না।

বিড়াল-তপস্বী

[ফরাসী সাহিত্যের দিক্‌পাল মলিয়ের (Moliere)-এর 'তারতিফ' (Tartuffe), ১৬৬৪ খ্রীঃ, নাটকটির গল্পরূপ।]

অকস্মাৎ ভদ্রমহিলা একদিন গত হলেন।

পুত্র ডামিস এবং কন্যা মারিয়ানি দু'জনেই বড় হয়েছে। তাঁর নিজের বয়সও কম হয়নি—প্রৌঢ়ত্বের দিকে পা বাড়িয়েছেন। বৃদ্ধা মা তখনও বেঁচে আছেন। তবুও স্ত্রী-বিয়োগের ক'দিন বাদে অরগন আবার বিয়ে করলেন। তিনি বিয়ে করলেন প্রায় তাঁর আধ-বয়সী সুন্দরী তরুণী এলমারকে।

এ পরিবর্তনে অরগনের পারিবারিক সুখ-শান্তি কিন্তু নষ্ট হয় না। পুত্র কন্যা দু'জনেই তাদের নতুন মা-কে ভালবাসে। শ্রীমতী এলমারও স্বামার সঙ্গে সৎ-সন্তান দু'টিকে সহজ ভাবেই গ্রহণ করেন। দু'দিনেই পুত্র কন্যা তাঁর একান্ত প্রিয় হ'য়ে ওঠে, তাঁদের মধ্যে এক মধুর সম্পর্ক গড়ে ওঠে। তা লক্ষ্য করে অরগন স্বস্তির নিঃশ্বাস নেন।

সংসারের সকলেই জানেন, মারিয়ানি সুদর্শন যুবক ভ্যালরের বাগ্‌দত্তা এবং শ্রীমান ডামিস ভ্যালরের বোনের প্রতি অনুরক্ত—তার পাণিপ্রার্থী।—একথা অরগনও বিলক্ষণ জানেন।

অরগন অবসরপ্রাপ্ত রাজপুরুষ, বিত্তবান। তিনি ছিলেন শান্তিপ্রিয় ধার্মিক, গির্জার প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাশীল। তাঁর মনটি ছিল কোমল, দীনের প্রতি অনুকম্পায় ভরা।

সেদিন গির্জার প্রার্থনাসভায় উপস্থিত জনতার মধ্যে একটি যুবক অরগনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ধর্মের প্রতি যুবকটির গভীর শ্রদ্ধা লক্ষ্য করে অরগন তার দিকে মুগ্ধ-বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকেন। ক্রমে তিনি ঐ

অপরিচিত যুবকটির সম্বন্ধে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। সভা শেষে অরগন পায়ে পায়ে যুবকটির কাছে এগিয়ে যান।

কাছে পৌঁছুতে যুবকটির বেশবাস দেখে অরগন বুঝতে পারেন, বেচারী নিতান্ত গরীব। গির্জায় তাকে কোনদিন দেখেছেন বলে অরগনের মনে পড়ে না। তা হোক্। আগন্তুকটির প্রতি তাঁর মনে মায়া জাগে। ভাবেন, আ-হা এমন একটি ধার্মিক যুবকের এই দুরবস্থা! ঈশ্বরের মহিমা কে জানে!

একটু ইতস্ততঃ করে অরগন যুবকটিকে ধর্মবিষয়ে দু' একটি মামুলি প্রশ্ন করেন।

চতুর তারতিফ্ এক পলকে প্রশ্নকর্তার ওপর নজর বুলিয়ে কি যেন বুঝে ফেলে। তারপর মহাবিজ্ঞের মতো সে চট্‌পট্ ঐ প্রশ্নের জবাব দেয়।

আগন্তুকের উত্তর শুনে অরগন চমৎকৃত হন। ভাবেন, এ যে হীরের টুকরো! সুযোগের অভাবেই অজ্ঞাত সে, জীবন তার লাঞ্ছিত। এমন একটি ভক্তের দীন অবস্থা দেখে অরগন মনে মনে গভীর বেদনা অনুভব করেন।

অরগন তারতিফকে তাঁর বাড়িতে থাকবার জন্য অনুরোধ জানান। রাস্তার ভিখারী তারতিফ এতদিন যেন এমনি একটি সুযোগের প্রতীক্ষায় ছিল। মনে মনে সে এ প্রস্তাব লুফে নেয়। কিন্তু মুখে সে তা প্রকাশ করে না। ভণ্ডামির মুখোশটি ভাল করে এঁটে নিয়ে সে বিনম্র কণ্ঠে জানায়,—না না, আমার মতো একজন সাধারণ লোকের জন্য অকারণ আপনি কেন এত ব্যস্ত হচ্ছেন…? লজ্জায় সঙ্কোচে তারতিফ যেন নুয়ে পড়ে।

তারতিফের বিনম্র-মধুর আচরণে সহৃদয় অরগনের হৃদয় আর্দ্র হয়ে ওঠে। তাকে বাধা দিয়ে তিনি বলেন, অহেতুক আপনার এই সঙ্কোচ। আসলে আপনার মতো একজন মহান্ ব্যক্তিকে অতিথি হিসেবে পেলে আমি নিজেকে ধন্য বলে মনে করবো।—দয়া করে আপনি সম্মতি দিন।

এই দুর্লভ সুযোগ থেকে তারতিফ নিজেকে বঞ্চিত করে না। তার অভিনয়ের সফলতার জন্য তারতিফ নিজেকে বারংবার তারিফ করে।

লম্পট তারতিফ ধর্মের মুখোশ প'রে এবং অরগনের সরলতার সুযোগ নিয়ে তাঁর প্রাসাদে এসে বিশিষ্ট অতিথির আসনটিতে জাঁকিয়ে বসে। অতিথির আচরণে অরগনের মনে কোন সন্দেহের অবকাশ হয় না। ফলে, নিশ্চিন্ত আরামে পরম সুখে তারতিফের দিন কাটে।

দিন যায়। তারতিফের ওপর গৃহকর্তার বিশ্বাস এবং শ্রদ্ধা গভীর হয়। তিনি অতিথিকে তাঁর একজন পরম হিতৈষী বন্ধু বলে মনে করেন।

গৃহকর্তার এই সরল বিশ্বাসের সুযোগ নিতে প্রতারক তারাতফ এতটুকুও দ্বিধা করে না। অল্পদিনের মধ্যে সে দুষ্টগ্রহের মতো গৃহকর্তাকে গ্রাস করে। অরগনের ওপর তারতিফ এক অদ্ভুত প্রভাব বিস্তার করে। ক্রমে সে হ'য়ে ওঠে বাড়ির সর্বময় কর্তা। আর, অরগন হন অতিথি তারতিফের আজ্ঞাবহ সেবক—তার পরমভক্ত। অতিথির সামান্যতম ইচ্ছা পূরণ করতে তিনি থাকেন সদাজাগ্রত; তার উপদেশ নির্দেশ ছাড়া অরগন এক পা-ও নড়েন না, কোন কাজের কথা ভাবতেই পারেন না।

ধর্মের নামে অসৎ তারতিফ অল্প ক'দিনের মধ্যে সংসারের নিয়ম-শৃঙ্খলা পাল্টে দেয়। ফলে, সুখী পরিবারটির জীবনের স্বচ্ছন্দ গতিটা নষ্ট হয়ে যায়।

তারতিফের কঠিন অনুশাসনের বেড়াজালে আবদ্ধ হয়ে সকলের প্রাণ অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। তবুও তারতিফের বিরুদ্ধে কোন সরব প্রতিবাদ ওঠে না। ফলে, তারতিফের প্রতিপত্তি বেড়েই চলে।

কুমারী মারিয়ানির রূপ-যৌবন তখন পূর্ণ বিকশিত। অরগন জানেন, কন্যার প্রেমাস্পদটি বিয়ের জন্য ব্যস্ত, তাঁর লাজুক কন্যাটি শুধু মুখ ফুটে কিছু বলে না। তিনি ভাবেন, পাত্রটি যখন উপযুক্ত—আর দেরী নয়। অরগন কন্যার বিবাহের জন্য উদ্যোগী হন।

খবরটি কানে পৌঁছুতে তারতিফ চঞ্চল হয়ে ওঠে। অরগনকে আড়ালে ডেকে উপদেশ দেয়,—

কথাটা যদি সত্যি হয়, তাহলে সেটা মোটেই ভাল কথা নয়। এ ধরণের নৈতিক উচ্ছৃঙ্খলতা মেনে নেওয়া উচিত হবে না। জেনে রাখুন, ওদের এ বিয়ে সুখের হ'তে পারে না। আপনি এ প্রস্তাব ভেঙ্গে দিন।

অরগন চিন্তিত হন।

একটু থেমে তারতিফ আবার বলে,—আপনার মেয়ের জন্য চাই একজন সৎপাত্র যিনি হবেন ধার্মিক।—যিনি বিপথগামিনী মারিয়ানিকে সৎপথে চালিয়ে নিতে সক্ষম। একমাত্র সেরকম বিয়েতেই মারিয়ানি জীবনে সুখী হবে। অন্যথায় বিপর্যয় হবে।

এবার একটু ঢোক গিলে ভণ্ড তার বক্তব্য শেষ করে ঃ...সেই কারণে বলছিলাম, আপনি ওকে আমার হাতে সঁপে দেবার কথা বিবেচনা করে দেখুন।

তার উক্তি শুনে অরগন স্তম্ভিত। কিন্তু প্রতিবাদ জানাতেও তাঁর সাহস হয় না। অগত্যা তারতিফের সেই অসম্ভব প্রস্তাবে অরগনকে মৌন সম্মতি জানাতে হয়।

পিতার কাছ থেকে সেই কঠিন প্রস্তাব শুনে মারিয়ানির মাথায় যেন বিনা মেঘে বজ্রাঘাত হয়। সে বোবা কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে। তার মন বিদ্রোহ করে ওঠে। একসময় সে অস্ফুট প্রতিবাদও জানায়। কিন্তু তার সে প্রতিবাদ এতই ক্ষীণ যে তার পিতার কানে পৌঁছোয় না।

এ ঘটনার পর পরিবারের সকলেই তারতিফকে বিশেষ ঘৃণার চোখে দেখতে থাকে। এমনকি পুরনো দাসীটিও তারতিফের উদ্দেশ্যে তার অনুচরটির কাছে প্রকাশ্য কটূক্তি করতে এতটুকুও দ্বিধা করে না।

তার বিরুদ্ধে রূঢ় সমালোচনার কথা তারতিফের কানে পৌঁছুলেও সে গায়ে মাখে না, গ্রাহ্যও করে না। কারণ, ততদিনে সে বিলক্ষণ জানে, শুধু অরগনই নয় তার বৃদ্ধা মা-ও তার চাটুকারিতায় মুগ্ধ—উভয়েই তার হাতের মুঠোর মধ্যে।

অরগনের বৃদ্ধা মা মাদাম পারনেশী তখন ওপারে যাবার দিন গুনছিলেন। সংসারের ভোগ বিলাস উপভোগ করবার ক্ষমতা তাঁর ছিল না। অথচ অন্য কারুর ভোগ করাও তিনি সইতে পারতেন না।

তাঁর পুত্রবধূটি ছিল প্রাণপ্রাচুর্যে ভরা, সৌখিন প্রকৃতির। কখনও বা নির্মল আনন্দ উপভোগ করতে বধূটি গান-বাজনা ইত্যাদি নানা আমোদে স্ফূর্তিতে মেতে উঠতেন। শাশুড়ির কাছে তা কিন্তু ছিল অসহ্য।

তারতিফের অনুশাসনের ফাঁদে পড়ে শ্রীমতী এলমার তাঁর খেয়াল-খুশিতে বাধা পান। শাশুড়ী খুশি হন। হয়ত এজন্যই মাদাম পারনেসী অতিথি তারতিফের অনুরাগী হয়ে ওঠেন। তাকে তিনি উপকারী বন্ধু বলে মনে করেন।

কিছুদিন পরে অরগন-পত্নী কি এক কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়েন। ভণ্ড তারতিফও ছলনা করে নিজেকে অসুস্থ বলে জাহির করে। অরগন তার সেবায় সদাব্যস্ত থাকেন। স্ত্রীর দিকে নজর দেবার অরগনের সময় হয় না।

স্বামীর এ অবাঞ্ছিত আচরণে শ্রীমতী এলমার মনে আঘাত পান। আভাসে ইঙ্গিতে সে-কথা তিনি স্বামীর কাছে প্রকাশ করতেও দ্বিধা করেন না। কিন্তু তাতেও অরগনের হুঁশ হয় না।

কুমারী মারিয়ানিকে পাবার আশ্বাস পেয়েও লম্পটের লালসার নিবৃত্তি হয় না। মেটে না তার কামনা! তার লোভ দুর্জয়। আসলে গোড়া থেকেই তার নজর ছিল অরগন-পত্নী সুন্দরী এলমারের ওপর। শয়তান এতদিন সুযোগের অপেক্ষায় ছিল।

শ্রীমতী এলমারের আরোগ্যের খবরটি তার কানে পৌঁছুতে তারতিফের মাথায় কূট বুদ্ধি খেলে যায়—

সেদিন তাঁকে শুভেচ্ছা জানাবার উদ্দেশ্যে তারতিফ সরাসরি শ্রীমতীর শোবার ঘরের দিকে এগিয়ে যায়। ঘটনাচক্রে ঘরটিতে তখন আর কেউ ছিল না। শ্রীমতী এলমার একাকী বসে ছিলেন।

তাঁর ঘরের দিকে পা বাড়াতে নেহাৎ সৌজন্যের খাতিরেই শ্রীমতী

এলমার তারতিফকে সাদর অভ্যর্থনা জানান। পরিস্থিতির সুযোগ পেয়ে তারতিফ তাঁকে শুভেচ্ছা জানাবার কথা ভুলে যায়! সে তার হৃদয় উন্মুক্ত করে। বলে,—সত্যিই তুমি কি সুন্দর!

এই অপ্রত্যাশিত স্তুতিবাক্য শুনে শ্রীমতী এলমার অপ্রস্তুত হন। তিনি লজ্জায় রাঙ্গা হয়ে ওঠেন। বিব্রত এলমার মুখ ফুটে কিছু বলেন না। তারতিফ ধরে নেয়, শিকার তার ফাঁদে পা বাড়িয়েছে। তার দুঃসাহসের মাত্রা বেড়ে যায়। এবার তারতিফ শ্রীমতীর সুডৌল নগ্ন হাঁটুর ওপর তার স্থূল হাতটি বাড়িয়ে দিতে দ্বিধা করে না।

স্পর্শকাতর অঙ্গে ঐ কুৎসিত হাতের স্পর্শ পেয়ে শ্রীমতী এলমার শিউরে ওঠেন। লজ্জা, সঙ্কোচ এবং ঘৃণায় তাঁর কণ্ঠরোধ হয়। বিমূঢ় নারী অসহায় ভাবে এদিক ওদিক তাকান।

অকারণ মা-র ঘরের দিকে ঐ অসময় তারতিফকে আসতে দেখে পুত্র ডামিসের মনে গোড়াতেই কেমন সন্দেহ জেগেছিল। তাই সে অদূরে আত্মগোপন ক'রে তার ওপর নজর রেখেছিল। মা-ও তা জানতেন না। তারতিফের ঐ অশোভন আচরণ প্রত্যক্ষ করে শ্রীমান হুঙ্কার দিয়ে ছুটে আসে।

তারতিফ ঐ গর্জন শুনে শিকার ছেড়ে পালিয়ে বাঁচে। জানোয়ারটার কবল থেকে মুক্তি পেয়ে শ্রীমতী এলমার স্বস্তির নিঃশ্বাস নেন।

তার এ দুষ্কৃতির প্রতিশোধ নিতে ডামিস দৃঢ় সঙ্কল্প করে। ক্রুদ্ধ ডামিস ছুটে গিয়ে পিতার কাছে তারতিফের ঐ কুৎসিত আচরণের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানায়। উত্তেজিত কণ্ঠে বলে,—আপনি ঐ কালসাপটি এক্ষুনি দূর করুন। এ লম্পটের জন্য সংসার ছারখার হয়ে যাচ্ছে।

পুত্রের মুখে শুনেও ঘটনাটি অরগন বিশ্বাস করতে চান না। উল্টে ডামিসকে ধমক দেন। গৃহকর্তার এ বিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে তার বিরুদ্ধে ঐ কলঙ্ক রটাবার জন্য ধূর্ত তারতিফ ডামিসের বিরুদ্ধে উল্টো অভিযোগ তোলে।

অরগন পুত্রকে তারতিফের কাছে তার অপরাধের জন্য ক্ষমা চাইতে আদেশ করেন।

সাবালক পুত্র পিতার এ অন্যায় আদেশ মানবে কেন? ডামিস ঘৃণাভরে পিতার সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। ফলে, অরগন পুত্রকে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে বলেন।

অতিথির তুষ্টির জন্য একমাত্র পুত্রটিকে ত্যাগ করেও অরগনের তৃপ্তি হয় না। তারতিফের ওপর তাঁর অগাধ আস্থা জাহির করতে অরগন তাঁর বাড়ি-ঘর, বিষয়-সম্পত্তি সব কিছুর জন্য তারতিফকে ট্রাস্টি বলে ঘোষণা করেন। সেই সঙ্গে কন্যাটিকেও তারই হাতে সঁপে দেবার সিদ্ধান্ত তিনি মুক্ত কণ্ঠে জানান।

কণ্টকরূপ ডামিস বাড়ি থেকে বিদায় হ'তে এবং সমস্ত সম্পত্তির ওপর প্রভুত্বের অধিকার হাতে পেয়ে ভণ্ড উল্লসিত হয়ে ওঠে। এবার শ্রীমতী এলমারের প্রতি লম্পটের লালসার আগুন আরও জ্বলে ওঠে।

কিছুদিন থেকে শ্রীমতী এলমার অতিথির অবাঞ্ছিত আচরণ আর উপদ্রবে উত্ত্যক্ত হচ্ছিলেন। তিনি মনে মনে স্থির করেন: আর নয়, এবার যেমন ক'রে হ'ক ঐ ভণ্ডের ওপর থেকে স্বামীর অন্ধ বিশ্বাস দূর করতে হবে।—বিড়াল-তপস্বীর ধর্মের মুখোশটি খুলে ফেলে তার আসল রূপটি স্বামীকে দেখাতে হবে।

সেদিন স্বামী তাঁর ঘরে ঢুকতে শ্রীমতী তাঁকে জানান,—যাক্, তুমি সময় মতই এসে গেছ। আমি তোমাকে খবর দিতেই যাচ্ছিলাম। আর দেরী নয়, তুমি ঐ টেবিলটির নীচে চুপটি করে লুকিয়ে থাকো।

—কেন? এই বয়সে আবার লুকোচুরি খেলা কেন?

—নাগো, তা নয়। এক্ষুনি তোমার দেবতাটি এ ঘরে আসবেন। তাঁর মধুর উক্তি শুনে নিজেকে ধন্য করো—আসল তারতিফকে প্রত্যক্ষ করো...।

অরগন আর কথা না বাড়িয়ে সেই ঢাকা টেবিলটির নীচে আত্মগোপন করেন—

শ্রীমতীর পরিকল্পনা মতো খানিক বাদে তারতিফ প্রবেশ করে।

শ্রীমতী এলমার তাকে মিষ্টি হাসি দিয়ে সাদর অভ্যর্থনা করেন। তারতিফ পরিবেশটিকে ইঙ্গিতময় বলে ধরে নেয়। সময় নষ্ট না করে সে একেবারে শ্রীমতীর গা ঘেঁসে এসে দাঁড়িয়ে তার হৃদয় উন্মুক্ত করে। বলে ঃ তুমি সুন্দরী যুবতী। কেন মিছে ঐ অপদার্থ বুড়োটার জন্য তোমার অমূল্য জীবন নষ্ট করছো? তোমার পক্ষে তা নিশ্চয়ই গৌরবের নয়; আনন্দের তো নয়ই। আমি বলি, এই গ্লানিকর জীবন থেকে নিজেকে মুক্ত করো। চলো, আমার সঙ্গিনী হয়ে সুখে থাকবে।···আমি তোমাকে মাথায় করে রাখবো।

ঐটুকুই অরগনের মোহমুক্তির পক্ষে যথেষ্ট। গর্জন করে তিনি টেবিলের নীচ থেকে বেরিয়ে এসে তারতিফের টুঁটি চেপে ধরেন; তক্ষুনি তাকে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে বজ্রকঠিন কণ্ঠে আদেশ করেন।

অরগনের আদেশ শুনে তারতিফের মুখে বিদ্রূপের হাসি ফুটে ওঠে। সে ব্যঙ্গভরে জবাব দেয়,—ভুলে যেও না, এ বাড়ির মালিক আমি, তুমি আমার আশ্রিত মাত্র।—উইলটা আমার হাতেই আছে।

অরগন চমকে ওঠেন। আত্মগ্লানিতে তাঁর মন ভরে ওঠে। তিনি অস্বস্তি বোধ করেন। তাঁর মনে পড়ে,—রাজনৈতিক কারণে তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু দেশান্তরিত হবার আগে বিশ্বাস করে কিছু গুরুত্বপূর্ণ গোপন দলিলপত্র অরগনের কাছে গচ্ছিত রেখে গিয়েছিলেন। কোন্ কুক্ষণে সেগুলিও তিনি ঐ দুষ্ট তারতিফের হাতেই তুলে দিয়েছিলেন!

অরগন জানেন, তারতিফ যদি ঐ দলিলগুলি রাজার কাছে পেশ করে তবে শুধু দেশান্তরিত বন্ধুটির-ই প্রাণদণ্ড হবে না, অরগনও রাজ-দ্রোহিতার অপরাধে নিশ্চয়ই দণ্ডিত হবেন।

অরগনের ধারণা হয়, হীন তারতিফ এ সুযোগ থেকে নিজেকে বঞ্চিত করবে না। সম্পত্তি হারাবার চেয়েও সেই গুপ্ত দলিলগুলির কথা মনে পড়তে অরগন বিশেষ শঙ্কিত হয়ে ওঠেন।

এই ঘটনার পরের দিন। আইনের আশ্রয় নিয়ে তারতিফ অরগনকে ঐ বাড়ি ছাড়তে বাধ্য করে। গৃহস্বামী হন গৃহহারা, সর্বহারা। আর, ভবঘুরে তারতিফ হয় প্রাসাদের মালিক।

দু'দিন বাদে তারতিফ গোপন দলিলের বাক্সটি রাজার কাছে পৌঁছে দিয়ে অরগনের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানায়। অরগন গ্রেপ্তার হন।

দলিলের বাক্সটি কিন্তু খোলা হয় না। ঐ সীলমোহর-করা অবস্থায় রাজার কাছে থাকে।

বিচারের সময় আসামী অরগনের সঙ্গে তারতিফকেও রাজার সামনে উপস্থিত হ'তে হয়।

তারতিফের ওপর নজর পড়তেই রাজা ভ্রূকুঞ্চিত করেন। প্রতারককে চিনতে রাজার দেরী হয় না। ধূর্ত তারতিফ বুঝতে পারে রাজার মনোভাব—কিন্তু রাজদরবার থেকে সরে পড়বার কোন উপায় দেখতে পায় না। সে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থাকে।

রাজা তারতিফকে দেখেই চিনতে পারেন, এ সেই ফেরারী আসামী—পাশের রাজ্য থেকে পালিয়ে এসে তাঁর রাজ্যে গা ঢাকা দিয়েছে। তিনি তাকে কঠোর শাস্তি দেবার জন্য মনে মনে সঙ্কল্প করেন।

ইতিমধ্যে আসামীর কাঠগড়ায় অরগনের ওপর রাজার দৃষ্টি পড়ে। লোকটিকে পরিচিত বলে মনে হয়। তাঁর ইঙ্গিতে কাছে এলে অরগনকে চিনতে রাজার অসুবিধা হয় না।

তাঁর মনে পড়ে, এককালে এই অরগন ছিলেন একজন রাজভক্ত পদস্থ অফিসার। তাঁর সেনাবাহিনীতে দীর্ঘকাল বিশেষ সুনামের সঙ্গে অরগন কাজ করেছেন। তিনি সহানুভূতির সঙ্গে অরগনের কাছ থেকে সব কথা শোনেন।

অরগনের এই লাঞ্ছনার জন্য রাজা বেদনা বোধ করেন। তিনি অরগনকে সমবেদনা জানান। তারপর কোন প্রশ্ন না করেই সীলমোহর-করা বাক্সটি অরগনের হাতে তুলে দেন।

রাজার শুভেচ্ছায় অরগন তাঁর বিষয়-সম্পত্তি সবকিছুই আবার ফিরে পান। লাঞ্ছিত জীবন থেকে মুক্তি পেয়ে অরগনের মুখে ফুটে ওঠে খুশির আভাস।

তারতিফ আর কোনভাবে নিষ্কৃতির উপায় খুঁজে পায় না—নিরুদ্ধ নিঃশ্বাসে সে রাজার দিকে অসহায় ভাবে চেয়ে থেকে শাস্তির প্রতীক্ষা করে।

রবিনসন্ ক্রুশো

[ইংরেজ সাহিত্যিক ড্যানিয়েল ডিফো (Daniel Defoe)-র **'রবিনসন ক্রুশো'** (Robinson Crusoe), ১৭১৯ খ্রীঃ, উপন্যাসটির গল্প।]

কতই বা তার বয়স? কিশোর ছেলেটি ঐ বয়সেই দুঃসাহসিক জীবনের স্বপ্ন দেখেঃ সমুদ্র পাড়ি দেবে, দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়াবে। গৃহ-সুখে তৃপ্তি নেই। পিতার আদেশ, স্বচ্ছন্দ জীবনের আশ্বাস, এমন কি মায়ের চোখের জলও ছেলেটির মন স্পর্শ করে না। সে নীরবে সুযোগের অপেক্ষা করে।

ক্রমে গৃহ-সুখ তার কাছে অসহ্য হয়ে ওঠে। সমুদ্র ছেলেটিকে হাতছানি দিয়ে ডাকে। সুযোগ পেয়ে তার এক বন্ধুর সঙ্গে একদিন লণ্ডন-অভিমুখী একটি জাহাজে চড়ে পালিয়ে গিয়ে কিশোর ছেলেটি স্বস্তি পায়।

জাহাজটা মাঝ-সমুদ্রে পড়তে প্রবল বেগে ঝড় ওঠে। সমুদ্র ক্রমাগত ফেঁপে ওঠে। জাহাজটা ডুবু-ডুবু হয়। ভয়ে যাত্রীদের সকলের মুখ শুকিয়ে যায়। কিশোর রবিনসনও ভয়ে ঈশ্বরের কাছে আকুল ভাবে প্রার্থনা করে। সে প্রতিজ্ঞা করেঃ এই ভয়াবহ সমুদ্রযাত্রা থেকে বেঁচে ফিরে একবার শুকনো মাটিতে পা দিতে পারলে সে ছুটে বাড়ি ফিরে যাবে; জীবনে আর কোনদিন ভুলেও জাহাজের দিকে পা বাড়াবে না।

ওদিকে সমুদ্রের রোষ বেড়ে চলে। অসুস্থ রবিনসন এক সময় অজ্ঞান হয়ে পড়ে। ততক্ষণে জাহাজের খোল জলে প্রায় ভরে ওঠে। জাহাজটার অবস্থা যাই-যাই। বেশীর ভাগ যাত্রীর প্রাণ হয়ে ওঠে ওষ্ঠাগত।

অগত্যা সাহায্যের জন্য জাহাজ থেকে কামান দাগা হ'তে থাকে।

সে শব্দ শুনে দূরের কোন এক অচেনা জাহাজ থেকে একটি নৌকো এগিয়ে আসে। অনেক কষ্টে সকলে সেই নৌকোটিতে ওঠবার কিছুক্ষণ পরে তাদের চোখের সামনেই ঝড়ে বিধ্বস্ত জাহাজটা সমুদ্রের অতল তলে তলিয়ে যায়।

অভাবিত ভাবে রবিনসন তার বহু আকাঙ্ক্ষিত শুকনো মাটির স্পর্শ পেলো—তারা ইয়ারমাউথে পৌঁছল। ততক্ষণে রবিনসনের বাড়ি ফেরবার সংকল্প কিন্তু কর্পূরের মতো উবে গেছে। দু'দিন বাদে সুযোগ পেয়ে সেখান থেকে সে আফ্রিকার গিনি কোস্ট অভিমুখী একটি জাহাজে উঠে পড়ে।

রবিনসন এবার যাত্রা করেছিল জাহাজের নাবিক হিসেবে, সে ফিরে এলো একজন পাকা ব্যবসাদার হয়ে। তায় এখন সে ঐ জাহাজের ক্যাপ্টেনের স্নেহধন্য।

কিছুদিন পরের কথা। আর এক যাত্রায়। একদিন তুর্কী জলদস্যুদের আক্রমণে তাদের জাহাজটিই শুধু বিধ্বস্ত হল না, তাদের বহু লোকও হত হলো—বাকী সকলে দস্যুদের হাতে বন্দী হল। বিজয়ী জাহাজের ক্যাপ্টেন রবিনসনকে তার ক্রীতদাস হিসেবে রেখে অন্য সকল বন্দীকে তাদের সম্রাটের কাছে 'উপহার' স্বরূপ পাঠিয়ে দেয়।

দু'বছরে রবিনসনের কাছে ক্রীতদাস-জীবন অসহ্য হয়ে ওঠে। সে পালাবার সুযোগ খোঁজে। ঘটনাচক্রে একদিন তার মনিবের সুন্দর নৌকোটি হাতে পেয়ে রবিনসন্ সমুদ্রের দিকে দ্রুত এগিয়ে যায়। সে স্থির করে, যেমন ক'রে হোক ঐ নরক-জীবন থেকে তাকে মুক্তি পেতেই হবে। নৌকো তরতর করে এগিয়ে যায়। কিন্তু মাঝ সমুদ্রে এসে পৌঁছুতে বিভ্রান্ত রবিনসন ঠিক করতে পারে না—এবার সে কোন্ দিকে যাবে!

তার ভাগ্যগুণে ঐ সময় সে-পথে একটি পোর্তুগীজ জাহাজ যাচ্ছিল। রবিনসনের দুরবস্থা দেখে সহৃদয় ক্যাপ্টেন ওকে তাঁর জাহাজে তুলে নেন। তাঁদের সঙ্গে রবিনসন ব্রেজিলে এসে পৌঁছয়।

ব্রেজিলে এসে রবিনসন শুধু মুক্তিই পায় না! চার বছর আখের চাষ করে সে তার ভাগ্যটাই ফিরিয়ে ফেলে। সেখানে সে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। স্থানীয় প্ল্যাণ্টারদের সঙ্গে তার বন্ধুত্বও গড়ে ওঠে।

ব্রেজিলে তখন চাষের কাজে মজুরের বড়ই অভাব। স্থির হয়ঃ আফ্রিকা থেকে এক জাহাজ নিগ্রো আমদানি করে সে-অভাব দূর করা হবে। আনবার সব খরচ বন্ধুরা যোগাবেন। সেখান থেকে ওদের আনবার কষ্টটা শুধু রবিনসনকে স্বীকার করতে হবে। অবশ্য ক্রীতদাসের সমান অংশ থেকে রবিনসন বঞ্চিত হবে না। রবিনসন বন্ধুদের সে-প্রস্তাব লুফে নেয়।

যাত্রার আয়োজনে ত্রুটি হয় না। যাত্রার দিন রবিনসনের মনে পড়ে, আট বছর আগে ঠিক এই দিনটিতেই সে ঘর ছেড়ে পালিয়ে প্রথম সমুদ্র-যাত্রা করেছিল। ক্ষণিকের জন্য তার মনটা চঞ্চল হয়ে ওঠে, হয়ত তার মা-বাবার জন্য।

চমৎকার আবহাওয়ার মধ্যেই জাহাজের নোঙর তোলা হ'ল। জাহাজটা সুন্দর ভাবেই এগিয়ে চলল। কিন্তু রবিনসনের বরাতের লিখন! যাত্রার বারো দিনের দিন এলো সেই বিপর্যয়। হঠাৎ প্রবল বেগে ঝড় উঠতে জাহাজটা দিক্‌ভ্রষ্ট হ'ল। ঝড়ের তাড়ায় জাহাজটি দ্রুত এগিয়ে চলল। কিন্তু কোন্‌দিকে—কেউ তা জানে না, বুঝতে চেষ্টা করেও কোন ফল হয় না।

উন্মত্ত ঢেউগুলো জাহাজটাকে গ্রাস করবার জন্য এক একবার. চারিদিক থেকে প্রচণ্ড বেগে তেড়ে আসে। মাঝে মাঝে সেটাকে নিয়ে নির্মম ভাবে খেলা করে। জাহাজটার খোলে কয়েক জায়গায় ছিদ্র দেখা গেলো। ঘনিয়ে এলো চরম বিপর্যয়। ঝড় তখনও থামেনি, উন্মত্ত ঢেউগুলোর তাণ্ডব-নৃত্যও শেষ হয়নি।

হঠাৎ জলের তলায় কিসের সঙ্গে একটা প্রচণ্ড ধাক্কা খেতে জাহাজটার গতি স্তব্ধ হয়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে পর্বত-প্রমাণ ঢেউ তার ওপর মহা আক্রোশে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

অনেক কষ্টে জাহাজের নৌকোটা জলে নামিয়ে ফাঁসির আসামীর মত কাঁপতে কাঁপতে সকলে তাতে উঠে পড়ে। তারা বুঝতে পারে সেই ঢেউয়ের কবল থেকে নৌকোটিকে বাঁচানোর কোন উপায় নেই। তবুও অসহায় ভাবে দাঁড় টেনে তারা তীরের দিকে এগিয়ে যেতে প্রাণপণ চেষ্টা করে।

তাদের তীরে পোঁছুতে আর খানিকটা বাকী, এমন সময় একটা বিরাট ঢেউ পাগলের মতো ছুটে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে নৌকোটাকে উল্টে দেয়। হতভাগা যাত্রীরা এদিকে ওদিকে ছিট্‌কে পড়ে।

ভাগ্য-পীড়িত রবিনসনের ভাগ্যের লিখন ছিল অন্য রকম। সে নৌকো থেকে জলে ছিটকে পড়ার পর কি ক'রে একটা ঢেউ তার অচৈতন্য দেহটাকে তুলে একেবারে শুকনো মাটিতে আছড়ে ফেলে দিল।

জ্ঞান ফেরার পর চোখ মেলে তাকাতে সব কথা একটা দুঃস্বপ্নের মতোই রবিনসনের মনে পড়ে যায়। সে বুঝতে পারে, তার সঙ্গীরা সব সমুদ্রের কোলেই শেষ আশ্রয় পেয়েছে। যাহোক্ ক'রে নিজে প্রাণে বাঁচবার জন্য সে ঈশ্বরকে কৃতজ্ঞতা জানায়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে উপলব্ধি করে,—সে বাঁচা কা ভয়ঙ্কর। দুর্নিবার ক্ষুধা আর হিংস্র জন্তুর মুখোশ পরে মৃত্যু তার সামনে অপেক্ষা করছে। কিন্তু আত্মরক্ষার জন্য সামান্য একটা অস্ত্রও তার সঙ্গে নেই। ভয়ে সে শিউরে ওঠে।

তবুও রবিনসন বাঁচবার সংকল্প করে। আস্তে আস্তে এগিয়ে গিয়ে সামনের জঙ্গলে ঢুকে একটা বড় গাছের উঁচু ডালে উঠে কোনরকমে সে রাতটা কাটায়। ভোরের আলো ফুটে উঠতে রবিনসনের ঘুম ভেঙ্গে যায়। চোখ মেলে তাকিয়ে দেখে, আবহাওয়া পরিষ্কার, সমুদ্র শান্ত। গাছটা থেকে নেমে জঙ্গলের চারিদিকে ঘুরে তার মনে হয়,—গোটা দ্বীপটা বন্ধ্যা, জায়গাটা জনহীন; কিছু বন্য জন্তু থাকতেও পারে, কিন্তু তার নজরে পড়েনি। সে ভাবে, মন্দের ভালো। আরও কিছুদূর এগিয়ে গিয়ে পানীয় জলের সন্ধান পেয়ে পেট ভরে জল খেয়ে সে ক্ষুধা নিবারণ করে। তারপর একটা উঁচু টিবি থেকে সমুদ্রের দিকে নজর পড়তে তার চোখ

বিস্ফারিত হয়ে ওঠে। আনন্দে সে লাফিয়ে ওঠে। দেখে, তীরের অদূরে একটা পাথরের ওপর তাদের জাহাজটা দাঁড়িয়ে আছে।

দুপুরের পর ভাঁটার টানে জল সরে যেতে রবিনসন মাঝের খাঁড়িটা সাঁতার কেটে পার হয়ে জাহাজের কাছে পৌঁছল। জাহাজটার ওপর উঠে দেখল, খাবার এবং অন্যান্য জিনিসগুলো প্রায় সবই ঠিক আছে, নষ্ট হয়নি। প্রথমে সে গোগ্রাসে এক পেট খেয়ে নিল। তারপর সে তক্তা আর মাস্তুলের কাঠ দিয়ে একটা ভেলা তৈরী ক'রে নিল। সেই ভেলায় করে জাহাজ থেকে সে ক্রমে ক্রমে তীরে নিয়ে এলো প্রচুর খাবার,পানীয় জল, জামাকাপড়, বন্দুক, গুলি-বারুদ, দুটো তলোয়ার, ছুতোরের সিন্দুকটা, ফালতু ক্যানভাস, দড়ি ও সুতো আর প্রচুর তক্তা ; দুটো ধর্ম-গ্রন্থ, কালি ও কাগজ, রুটি তৈরীর যন্ত্রটি, এক ব্যারেল ময়দা এবং তিন বাক্স মদ পর্যন্ত।

এবার নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য জায়গা বেছে নিয়ে রবিনসন একটা তাঁবু খাটাল। তাঁবুর চারপাশ দিয়ে খুব শক্ত করে দু'সারি মজবুত কাঠ গভীর ভাবে পুঁতে দিয়ে আশ্রয়টা একটা দুর্গের মত তৈরী করে নেয়। ঐ দুর্গের কোন দরজা রইল না। একটা মই দিয়ে রবিনসন কাজ চালিয়ে নেয়। বাইরের থেকে ভেতরে ঢুকে সে মইটা তুলে নেয়। কিছুদিনের জন্য তার খাদ্যেরও চিন্তা থাকে না। তবুও সে খুব হিসেব করে খাবার খায়—যাতে ফুরিয়ে না যায়। মাঝে মাঝে বুনো ছাগল আর মুরগী মেরে বিকল্প খাদ্যের ব্যবস্থা করে। একেবারে নিঃসঙ্গ জীবন, তবুও রবিনসনের আরামে দিন কাটে।

ক্রমে সে তার তাঁবুর পেছনের পাহাড়ের গুহাটি কেটে তাতে তক্তা বসিয়ে 'তাক' বানিয়ে সেটাকে দিব্যি ভাঁড়ার ঘরে রূপান্তরিত করে। আস্তে আস্তে বাড়তি কাঠ এবং তক্তা দিয়ে টেবিল, চেয়ার বানিয়ে রবিনসন তার সংসার সাজায়। বুনো ছাগল মেরে তার চর্বি শুকিয়ে তাতে পলতে লাগিয়ে সে বাতির ব্যবস্থা করে। দিনপঞ্জী লিখতে সে ভুল করে না। দিনান্তে সে ভুল করে না ঈশ্বরের নাম নিতে, তাঁকে কৃতজ্ঞতা জানাতে।

বছর শেষে একদিন ঘুরতে ঘুরতে দ্বীপের অপর প্রান্তে রবিনসন এক উর্বর উপত্যকা আবিষ্কার করে। সেখানেও সে একটি সুন্দর বাগানবাড়ি তৈরী করে। ক্রমে সেখানে কৃষিকাজ ক'রে সে চমৎকার ফসল ঘরে তোলে। আরও দিন যেতে সে ছাগল পুষে দুধের অভাব মেটায়। আবার সে-দুধ থেকে চীজ্, মাখনও তৈরী করে। এখন শিকার না করলেও তার টাটকা মাংসের অভাব হয় না।

একটা কুকুর, দু'টো বেরাল এবং একটা তোতা—এই নিয়ে রবিনসনের সংসার। এদের সঙ্গে খেলা ক'রে, কথা ব'লে তার দিন কাটে। এমনি ভাবে সেই হতভাগা দ্বীপে রবিনসনের তেইশ বছর কেটে যায়। সে-বছরগুলো তার শান্তিতেই কাটে। হঠাৎ এই দ্বীপান্তর জীবনের চব্বিশ বছরে ঘটে এক অঘটন। ফলে, তার জীবনের গতিটাই পাল্টে যায়।—

সেদিন সকালে রবিনসন অবাক-বিস্ময়ে দেখে, একদল অসভ্য বর্বর লোক তার দুর্গের অদূরে সমুদ্রতীরে এসে একটা নৌকো লাগিয়েছে; আগুন জ্বেলে ওরা দুটো হতভাগা জংলীকে সেই আগুনের কাছে টেনে হেঁচড়ে নিয়ে চলেছে। শিকারের একটা মাঝ রাস্তায় পড়ে যেতে সকলের দৃষ্টি সেদিকে আকৃষ্ট হয়। সেই সুযোগে অপর জংলীটা এক ঝটকায় নিজেকে মুক্ত করে প্রাণপণে পালাতে চেষ্টা করে। ঘটনাচক্রে সে রবিনসনের দুর্গের দিকেই ছুটে আসছিল। তিনটে অসভ্য শিকারের পেছনে ছুটতে থাকে। হতভাগাটা মাঝ পথের খাঁড়িটা সাঁতার কেটে পেরিয়ে এপারে আসতে রবিনসন বন্দুক নিয়ে এগিয়ে যায়। অতর্কিতে আক্রমণকারীদের ওপর গুলি চালিয়ে সে সেই হতভাগাটাকে উদ্ধার করে।

সেদিনের বারের নাম অনুসারে লোকটার নামকরণ করা হল 'ফ্রাইডে'। ফ্রাইডে রবিনসনের শুধু অনুগত ভৃত্যই হল না, সে হল তার বিশ্বস্ত সঙ্গী, বন্ধুও বটে। প্রভুর চেষ্টায় সে কিছুদিনের মধ্যে ইংরেজী ভাষাও আয়ত্ত করে নিল। ফ্রাইডে ছিল পরিশ্রমী এবং বুদ্ধিমান। রবিনসন নতুন সঙ্গী পেয়ে খুশি হল। চব্বিশ বছর বাদে সে একজন মানুষের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পেয়ে ধন্য হল।

ফ্রাইডের কাছ থেকে রবিনসন জানতে পারে তার দেশে ঐ অসভ্য লোকগুলোর হাতে সতেরো জন শ্বেতাঙ্গ বন্দী হয়ে আছে। সে খবর শুনে রবিনসন সেই বন্দী লোকদের সঙ্গে মিলিত হবার জন্য ব্যগ্র হয়ে ওঠে। উদ্দেশ্য, তাদের সহায়তায় যদি আবার সে সভ্য জগতে ফিরে যেতে পারে।

বহু পরিশ্রম করে ফ্রাইডেকে নিয়ে ওদের দেশে যাবার জন্য রবিনসন একটা নৌকো তৈরী করে ফেলে। নৌকোর পাল এবং হালেরও ব্যবস্থা হয়। ফ্রাইডেও হাল ও পালের ব্যবহার শিখে নিয়ে একজন পাকা নাবিক হয়ে ওঠে। তাদের যাত্রার আয়োজন সম্পূর্ণ হয়।

কিন্তু সে-যাত্রার ঠিক দু'দিন আগে আবার ঘটল এক অঘটন। সেদিন দেখা গেল, তিনটে নৌকো বোঝাই করে একদল নরখাদক এপারে এসে আগুন জ্বালিয়ে একজন জংলীকে কেটে ঝলসাতে বসেছে; অদূরে আর একটি শ্বেতাঙ্গ বন্দীকে মারবার জন্য ক'জন টেনে নিয়ে যাচ্ছে।

সে বীভৎস দৃশ্য দেখে ফ্রাইডের মত রবিনসনও প্রথমে ভীষণ ভয় পেয়ে গিয়েছিল। পরে সাহস সঞ্চয় করে ফ্রাইডেকে নিয়ে এগিয়ে গিয়ে বেপরোয়া হয়ে সে গুলি চালায়। সঙ্গে সঙ্গে চারজন ঢলে পড়ে। আহত হয় কিছু সংখ্যক। বিভ্রান্ত অসভ্যের দল শ্বেতাঙ্গ বন্দীটিকে ফেলে পালাবার পথ খোঁজে। রবিনসনের নির্দেশে ফ্রাইডে সিংহবিক্রমে পলাতকদের পেছন পেছন ছুটে যায়। সুযোগ পেলেই সে ওদের ওপর নির্মম ভাবে কুড়ুল চালায়।

রবিনসন এবার এগিয়ে গিয়ে বন্দীর বাঁধন কেটে তাকে মুক্ত করে। তাকে খাদ্য দেয়, দেয় পানীয় আর বাঁচার আশ্বাস। খানিক বাদে শ্বেতাঙ্গটি চাঙ্গা হয়ে ওঠে। রবিনসন জানতে পারে, এ সেই সতেরো জন বন্দী স্প্যানিয়ার্ডের একজন।

সেই স্প্যানিয়ার্ডকে সঙ্গে নিয়ে রবিনসন দুর্বৃত্তদের ওপর গুলি চালায় দ্বিগুণ উৎসাহে। এমনি ভাবে দলের ছাব্বিশ জন নিহত বা আহত

হয় গুরুতর ভাবে। তবুও কি করে চারজন পালিয়ে গিয়ে তাদের একটা নৌকোয় উঠে প্রাণের দায়ে নৌকো চালায়।

পলাতকদের নৌকোটার দিকে নজর পড়তেই ওদের পরিত্যক্ত আর একটা নোকোয় ফ্রাইডেকে নিয়ে রবিনসন তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে ওদের তাড়া করতে। হঠাৎ রবিনসন লক্ষ্য করে হাত-পায়ে বাঁধা একজন হতভাগা মড়ার মত নৌকোর খোলে পড়ে আছে।

ওদের বুঝতে অসুবিধা হয় না, এ আর একটি শিকার। একেও ওরা পুড়িয়ে খেতো। বন্দীর বাঁধন কেটে দিয়ে রবিনসন তাকে বসিয়ে দেয়। তার মুখের দিকে লক্ষ্য পড়তে ফ্রাইডে হঠাৎ পরম আবেগে বন্দীকে জড়িয়ে ধরে ঘন ঘন চুমু খায়। ফ্রাইডের দু'চোখ বেয়ে অবিরত অশ্রুধারা নেমে আসে।

বৃদ্ধ বন্দীর নড়বার শক্তি নেই। কিন্তু তার চোখেও জল। রবিনসন হতভম্ব। খানিক বাদে ফ্রাইডে মুখে ভাষা পেল। রবিনসন জানল, হতভাগ্যটি ফ্রাইডের পিতা। ফ্রাইডের পিতৃভক্তি দেখে রবিনসন মুগ্ধ হয়। তাছাড়া মৃত্যুর মুখ থেকে পিতাকে এভাবে ফিরে পেয়ে জংলীদের পিছু তাড়া করতে ফ্রাইডে বা রবিনসনের আর উৎসাহ থাকে না।

রবিনসন এবং ফ্রাইডের সেবাযত্নে বৃদ্ধ এবং স্প্যানিয়ার্ড ভদ্রলোকটি ক'দিনের মধ্যেই সুস্থ এবং সবল হয়ে ওঠে। তারা দু'জনে রবিনসনকে কৃতজ্ঞতা জানাবার ভাষা খুঁজে পায় না। রবিনসন ওদের কাছ থেকে অসভ্যদের হাতে বন্দী শ্বেতাঙ্গদের আসন্ন বিপদের কথা জেনে চঞ্চল হয়ে ওঠে। সে সেখান থেকে ওদের উদ্ধারের কথা চিন্তা করে। ভাবে, যদি ওদের এখানে কোন প্রকারে একবার আনা যায় তখন হয়ত বা এতগুলো লোকের মিলিত চেষ্টায় একদিন সভ্যজগতের আলো দেখা সম্ভব হবে। সেই উদ্দেশ্যে রবিনসনের নির্দেশে ফ্রাইডের পিতাকে সঙ্গে নিয়ে স্প্যানিয়ার্ড ভদ্রলোক একদিন রবিনসনের নৌকোটিতে পাল তুলে দেয়। নৌকোটি অসভ্যদের দেশের দিকে দ্রুত এগিয়ে যায়।

স্প্যানিয়ার্ড ভদ্রলোক চলে যাবার সাতদিন পরের কথা। সেদিন সকালে রবিনসন লক্ষ্য করে তীরের প্রায় দু'মাইল দূরে একটি ইংরেজ জাহাজ নোঙর করে আছে। রবিনসন অবাক বিস্ময়ে জাহাজটার কথা ভাবে। হঠাৎ সমুদ্রতীরে তার লক্ষ্য পড়ে। দেখে, সেখানে হাত-পায়ে বাঁধা তিনজন লোক পড়ে আছে। দেখে তার বিস্ময়ের সীমা থাকে না। ক্রমে তার মনে কেমন সন্দেহ জাগে।

বন্দুক, পিস্তল সঙ্গে নিয়ে রবিনসন আস্তে আস্তে বন্দীদের কাছে এগিয়ে যায়। রবিনসন জানতে পারে, ঐ তিনজনের ভিতর একজন অদূরের জাহাজটির ক্যাপ্টেন এবং অপর দু'জন তাঁর বিশেষ অনুগত। বাকী অনুগতদেরও একই অবস্থা হবে। জাহাজের লোকেরা অকারণ বিদ্রোহ করায় তাদের এই দুরবস্থা।

রবিনসন ক্যাপ্টেনকে সমবেদনা জানায়। জাহাজটা ফিরে পেতে তাকে যথাসাধ্য সাহায্য করবার আশ্বাসও দেয়। বন্দীদের বাঁধন কেটে দিয়ে রবিনসন তাদের সকলের হাতে তুলে দেয় বন্দুক। তারপর তার ছোট্ট দলটি নিয়ে কৌশলে জাহাজটার ওপর উঠে অতর্কিতে বিদ্রোহীদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। ফলে বিদ্রোহীদের দু'জন নেতা হত হয়। বাকী সব রবিনসনের হাতে বন্দী হয়।

জাহাজটাকে হাতে ফিরে পেয়ে ক্যাপ্টেনের সে কী আনন্দ! রবিনসনকে আলিঙ্গন করে তিনি বললেন,—বন্ধু, আপনার ঋণ শোধ করা আমার সাধ্যের বাইরে। এ জাহাজে যা-কিছু আছে সবই আপনার। আর দেরী নয়। এবার চলুন দেশে ফিরে যাই।

রবিনসনের অনুমতি পেয়ে যাত্রার আয়োজন হয়। বিদ্রোহের অপরাধে ফাঁসির ভয়ে বন্দীদের ভেতর ক'জন আর দেশে ফিরে যেতে রাজী হল না। তারা রবিনসনের অনুমতি নিয়ে সেই হতভাগা দ্বীপেই থেকে যায়। রবিনসন তাদের হাতে স্প্যানিয়ার্ড ভদ্রলোকের নামে একখানি চিঠি দেয়। তাতে আশ্বাস থাকে,—প্রথম সুযোগেই তার জন্য সে জাহাজ পাঠাবে। তারপর রবিনসন তার

অনুগত অনুচর ফ্রাইডেকে সঙ্গে নিয়ে সেই জাহাজে ইংলণ্ডে পাড়ি দেয়।

পঁয়ত্রিশ বছর বাদে রবিনসন দেশে ফিরে আসে। সকলের কাছে সে এখন অচেনা। সে বুঝতে পারে, দেশের সকলে ধরে নিয়েছিল—এতদিনে সে মরে গেছে। তবুও দেশে ফিরে আসার আনন্দে সে আত্মহারা। রবিনসন ভাবে, এত সুখ, এত শান্তি বুঝি তার সইবে না।

বাড়িতে পা দিয়ে রবিনসন হতাশায় ভেঙ্গে পড়ে। শোনে, তার মা-বাবা অনেকদিন হল গত হয়েছেন, আপনজন প্রায় কেউই বেঁচে নেই। থাকবার মধ্যে আছে শুধ্ দুই ভাইপো। রবিনসন বাড়িতে থাকবার কোনও আকর্ষণ বোধ করে না।

ফ্রাইডেকে নিয়ে সে চলে যায় লিস্‌বনে—তার বহু বছর আগেকার প্ল্যানটেশন-এর খোঁজ করতে। স্থানীয় বন্ধুরা ঠগ্ ছিলেন না। তার প্ল্যানটেশন-এর থেকে অর্জিত প্রায় পাঁচ হাজার টাকা তারা রবিনসনের হাতে তুলে দেন। সে অর্থ নিয়ে রবিনসন আবার ইংলণ্ডে ফিরে আসে।

ভবঘুরে রবিনসন এবার বিয়ে করে ঘর বাঁধে। কিন্তু গৃহসুখ তার বরাতে বেশীদিন সয় না। বিয়ের আট বছরের মধ্যেই সে গৃহিণীকে হারায়। স্ত্রীকে হারিয়ে তার মন হাহাকার করে, ঘরে মন টেঁকে না।

ক'দিন বাদে আবার সে সমুদ্রযাত্রা করে—চীন এবং ইস্ট ইণ্ডিজ অভিমুখে। পথে সে তার অভিশপ্ত দ্বীপে নোঙর করে। দেখে, সেখানে সেই স্প্যানিয়ার্ড ভদ্রলোক আর বন্দী বিদ্রোহীরা মিলে দ্বীপটিতে একটি দিব্যি উপনিবেশ গড়ে তুলেছে। তা দেখে রবিনসন তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলে।

দু'দিন তাদের সঙ্গে আনন্দে কাটিয়ে রবিনসন-এর জাহাজ ব্রেজিলের দিকে এগিয়ে যায়। পথে জাহাজটা কতগুলো অসভ্য লোকের দ্বারা আক্রান্ত হয়। ফলে, রবিনসন তার পরমপ্রিয় ফ্রাইডেকে হারায়। 'কেপ অব গুড্ হোপ' ঘুরে জাহাজ আরও এগিয়ে যায় চীনের উপকূল

ধরে। এমন সময় কি এক তুচ্ছ কারণে জাহাজীদের মধ্যে মারপিট শুরু হয়। রবিনসন তাদের উপদেশ দিতে যাওয়ায় মূর্খ নাবিকের দল আরও ক্ষেপে গিয়ে রবিনসনকে চীনের কোন এক অখ্যাত জায়গায় জোর করে জাহাজ থেকে নামিয়ে দেয়। ভাগ্যক্রমে একটি যাযাবর দলের সহায়তায় রবিনসন সেখান থেকে উদ্ধার পায়। অনেক কষ্টে এক সময় সে ইংলণ্ডে আবার ফিরে আসে।

চুয়ান্নটা বছর ছন্নছাড়া জীবন কাটিয়ে রবিনসনের দুঃসাহসিক জীবনের প্রতি বিতৃষ্ণা আসে। সমুদ্র-যাত্রার প্রতিও আর তার কোন মোহ থাকে না। সে চায় শান্তি, চায় মুক্তি। মোহমুক্ত রবিনসন্ ক্রুশো এবার অনন্ত পথে যাত্রার জন্য নীরবে অপেক্ষা করে।

গলিভার-এর ভ্রমণ-কাহিনী

[ইংরাজ সাহিত্যিক জোনাথন সুইফ্‌ট্ (Jonathan Swift)-এর **'গলিভারস্ ট্রাভলস্'** (Gulliver's Travels), ১৭২৬ খ্রীঃ, গ্রন্থটির সারাংসার।]

ভদ্রলোক দীর্ঘদিন ধৈর্য ধরে চেষ্টা করলেন। না, ডাঙ্গায় তাঁর পশার কিছুতেই জমল না। অগত্যা ডাক্তার স্যামূয়েল গলিভার স্থির করেন, জাহাজে চাকরী নেবেন। ভাবেন, তাহ'লে একসঙ্গে রথ দেখা আর কলা বেচা দু'-ই হবেঃ নিশ্চিন্ত উপার্জনের সঙ্গে তাঁর দেশ-ভ্রমণের অদম্য ইচ্ছাটাও পূর্ণ হবার একটা সুযোগ ঘটবে।

ক'দিন বাদে তাঁর মনোবাসনা পূর্ণ হয়। ভালো একটি জাহাজে গলিভারের চাকরী জুটে যায়।

মে মাস, ১৬৯৯ খ্রীঃ। ব্রিস্টল থেকে জাহাজটি যাত্রা করে। পাল তুলে জাহাজটি সমুদ্রের বুক চিরে তরতর ক'রে এগিয়ে যায়। গলিভারের মনে আনন্দ ধরে না। কিন্তু দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরে জাহাজটি পৌঁছুতে হঠাৎ প্রচণ্ড ঝড় ওঠে। ক্রুদ্ধ হাওয়া আর ঢেউয়ের তাড়নায় দিশেহারা জাহাজটা গিয়ে ছিটকে পড়ে এক জলমগ্ন পাহাড়ের গায়ে। ফলে, জাহাজটা ভেঙ্গে চৌচির হয়ে যায়।

যাত্রীদের মধ্যে হাহাকার রব ওঠে। যে যে-ভাবে পারে প্রাণ বাঁচাবার চেষ্টা করে। পাঁচজন লোকের সঙ্গে গলিভারও একটি ছোট্ট ডিঙ্গিতে উঠে সমুদ্র পাড়ি দেবার চেষ্টা করেন।

অদৃষ্টের লিখন! ডিঙ্গিতে করে কিছুদূর এগুতেই আসে চরম বিপর্যয়। ঝড়ের বেগে ডিঙ্গিটি উল্টে যায়। সহযাত্রীরা কে কোথায় ছিটকে পড়ে গলিভার বুঝতে পারেন না; ওদের পরিণতি নিয়ে তিনি আর মাথা ঘামাবার চেষ্টাও করেন না। চাচা আপন প্রাণ বাঁচা!

প্রাণপণে বহুক্ষণ সাঁতার কাটবার পর গলিভার একসময় মাটির স্পর্শ পান। মাটি তো নয় যেন স্বর্গ। তাঁর সৌভাগ্যের জন্য গলিভার ঢেউ আর হাওয়াকে মনে মনে কৃতজ্ঞতা জানান।

তখন তাঁর প্রাণ ওষ্ঠাগত। কোন্ দেশে এলেন—সেখানে আশ্রয় এবং খাদ্য মিলবে কি না, সে বিষয়ে চিন্তা করবার মতো গলিভারের মনের অবস্থা ছিল না।

রাতের অন্ধকারে কোন রকমে হামাগুড়ি দিয়ে গলিভার ডাঙ্গায় উঠে ঘাসের ওপর গা এলিয়ে দিয়ে প্রাণভরে নিঃশ্বাস নেন। অল্প সময়ের মধ্যে নিদ্রাদেবী তাঁর গভীর শ্রান্তি আর পেটের অসহ্য ক্ষুধার জ্বালা জুড়িয়ে দেন।

ভোরের আলো চোখে লাগতে গলিভারের ঘুম ভেঙ্গে যায়। তিনি তাড়াতাড়ি উঠে বসতে যান। কিন্তু পারেন না। এমন কি মাথাটা ফেরাতে গিয়েও তিনি অপ্রস্তুত হন। গলিভার বুঝতে পারেন, চুল সহ তাঁর সর্বাঙ্গ মাটির সঙ্গে শক্ত করে বাঁধা।

অগত্যা বেচারী আকাশের দিকে শূন্যদৃষ্টি মেলে ব্যাপারটা বুঝতে চেষ্টা করেন। এমন সময় গলিভার অনুভব করেন—তাঁর গায়ের ওপর দিয়ে কতোগুলি কি যেন হেঁটে বেড়াচ্ছে। ধীরে ধীরে ঐ জীবগুলো তাঁর বুক বেয়ে মুখের কাছে এগিয়ে আসতে গলিভারের চক্ষুস্থির। তাঁর মনে হয়, ওগুলো মানুষের আকৃতি, হাঁ, মানুষ-ই বটে, তবে ক্ষুদে—লম্বায় দু'ইঞ্চির বেশী নয়।

গলিভার বুঝতে পারেন, তিনি লিলিপুটদের হাতে বন্দী। অত দুঃখের মধ্যেও গলিভার অট্টহাসিতে ফেটে পড়েন। তাঁর সেই হাসির শব্দে ক্ষুদে লোকগুলি ভীষণ ভয় পায়। কিছু লোক ছিটকে প'ড়ে হাত-পা ভাঙ্গে। কিছু প্রাণের ভয়ে পালিয়ে বাঁচে।

গলিভার আর একবার উঠে বসবার চেষ্টা করেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে চারিদিক থেকে কয়েক শত ছুঁচের মতো কি যেন তাঁকে বিদ্ধ করে—ক্ষুদে তীর।

ছুঁচ ফোটারও তো একটা যন্ত্রণা আছে। তায় একসঙ্গে অতগুলো। গলিভার স্থির করেন চুপ ক'রে পড়ে থাকবেন। যা-খুশি ওরা করুকগে।

ক্ষুদে লোকগুলি কিন্তু হৃদয়হীন ছিল না। খানিক বাদে তারা প্রচুর খাবার এনে দেয় গলিভারকে। তাদের কয়েক শ' লোকের খাবার গোগ্রাসে খেয়ে গলিভার একটু সুস্থ হন। রাজার নির্দেশে গলিভারের একটা আশ্রয়েরও ব্যবস্থা হয়।

তাঁর পায়ে বেড়ী পরিয়ে সব বাঁধন খুলে অনেক কষ্টে গলিভারকে একটা প্রকাণ্ড ঠেলাগাড়ীতে তোলা হয়। তারপর সহস্রাধিক ঘোড়া ঐ গাড়ীটাকে টেনে নিয়ে আসে লিলিপুটদের রাজধানীতে। ওঁকে উঠে দাঁড়াতে দেখে ক্ষুদে লোকগুলির সে কি বিস্ময়!

ওদের দেশের যেটা সব চেয়ে বড় বাড়ি, সেখানেই গলিভারের থাকার ব্যবস্থা হয়। গলিভারকে কিন্তু তবুও অনেক কষ্টে গুঁড়ি মেরে ঐ বাড়িতে ঢুকতে হয়। তাঁর পায়ের শেকল-বেড়ী অবশ্য খোলা হয় না।

দু'দিনের মধ্যে গলিভার লিলিপুটদের ভাষা কিছুটা শিখে নেন। তাঁর আচরণে রাজা খুশি। রাজার অনুগ্রহে গলিভার রাজদরবারে ঠাঁই পান। পায়ের বেড়ী থেকে গলিভার মুক্ত হন, সেই সঙ্গে কিছুটা স্বাধীনতাও তিনি লাভ করেন।

দেশটির চারিদিকে ঘুরে বেড়িয়ে গলিভারের মনে হয়, দেশটি ছোট্ট হ'লেও মোটামুটি য়ুরোপের কোন অঞ্চলেরই মতো। তিনি লক্ষ্য করেন, লিলিপুটদের মধ্যেও দলাদলি আছে—তাদের ভেতরও জাত-বিচার বড় কম নেই।

একদল সভাসদ্ গোড়া থেকেই গলিভারকে সু-নজরে দেখেনি। গলিভারের অপরাধ—রাজা ওঁকে প্রীতির চোখে দেখেন, তাঁকে বিশেষ খাতির-যত্ন করেন। তা হোক্। সেখানে গলিভারের দিনগুলো মোটামুটি ভালই কাটে।

ব্লিফুস্কু রাজ্যটি ছিল লিলিপুটদের প্রতিবেশী—আটশ' গজ দূরে।

আর, দু'দেশের মাঝখান দিয়ে একরত্তি একটা খাল বয়ে চলছিল আপন মনে—

লিলিপুট-অধিপতি কি করে একদিন জানতে পারেন, প্রতিবেশী ব্লিফুস্কু শীঘ্রই তাঁর রাজ্য আক্রমণ করবে। তিনি গভীর চিন্তায় মগ্ন হন।

খবরটা কানে পৌঁছুতে গলিভার স্বতঃস্ফূর্ত হ'য়ে রাজাকে সাহায্য করতে এগিয়ে যান। তাঁকে কৃতজ্ঞতা জানাবার ভাষা রাজা খুঁজে পান না।

এক ফাঁকে আড়ালে দাঁড়িয়ে গলিভার লক্ষ্য করেন, খালের ওপারে ব্লিফুস্কু বন্দরে সারবন্দী দাঁড়িয়ে আছে কতগুলো ক্ষুদে জাহাজ। এবার তাঁর মনেও সন্দেহ জাগে, হয়তো জাহাজগুলো সত্যিই যুদ্ধের জন্য তৈরী—অনুকূল হাওয়ার অপেক্ষা মাত্র!

গলিভার দেরী করেন না। চট্‌পট্ কতগুলো লোহার আংটা তৈরী ক'রে সেগুলো এক একটা শক্ত দড়ির সঙ্গে বেঁধে নেন। তারপর চুপিচুপি খালটার মাঝামাঝি গিয়ে আংটাগুলো ঐ জাহাজগুলোর মাস্তুলে ছুঁড়ে ছুঁড়ে আটকে দেন। তারপর সজোরে টেনে জাহাজগুলোর নোঙর ছিঁড়ে সেগুলোকে এপারে নিয়ে আসেন।

লিলিপুট রাজ্যে আনন্দের হিল্লোল ব'য়ে যায়। রাজা তাঁকে একজন সম্ভ্রান্ত বন্ধু হিসেবে বরণ করেন।

কিন্তু রাজার আশা মেটে না। তিনি গলিভারের কাছে আবদার করেন,—ও-দেশটা তুমি পুরোপুরি জয় করো; ব্লিফুস্কু অধিবাসীরা আমার পায়ের তলে লুটিয়ে পড়ুক।

গলিভার কিন্তু রাজার এ অন্যায় আবদারে রাজী হন না। অকারণে একটা স্বাধীন দেশকে পরাধীনতার শৃঙ্খলে বাঁধবার প্রস্তাবে তাঁর মন বিদ্রোহ ক'রে ওঠে। এমন সময় ব্লিফুস্কুরা সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে আসে। অগত্যা রাজা সন্ধির প্রস্তাব গ্রহণ করেন। কিন্তু মনে মনে তিনি গলিভারের ওপর বিরূপ হন। 'বড়র পীরিতি বালির বাঁধ'।

এবার গলিভারকে শাস্তি দেবার জন্য রাজা ষড়যন্ত্র করেন। খবরটা জানতে পেরে গলিভার সেখান থেকে পালাবার সুযোগ খোঁজেন।

ছ'দিন বাদেই সে-সুযোগ এসে যায়। গলিভারের সৌজন্যে তাঁর দেশের স্বাধীনতা অক্ষুন্ন থাকে বলে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে ব্লিফুস্কুর অধিপতি গলিভারকে তাঁর দেশে সাদর আমন্ত্রণ জানান।

ঐ নিমন্ত্রণ রক্ষা করার ছলে একদিনের নাম করে গলিভার ব্লিফুস্কুতে পালিয়ে যান। আর ফেরেন না। লিলিপুট-রাজ ক্ষোভে নিজের হাত কামড়ান।

কিছুদিন পরের কথা। ব্লিফুস্কু দেশের মিস্ত্রিদের সাহায্যে সমুদ্রের চরে এসে-পড়া একটা ভাঙ্গা নৌকো মেরামত ক'রে নিয়ে গলিভার একদিন নিজের দেশের দিকে যাত্রা করেন।

ইংলণ্ড অভিমুখী একটি জাহাজ গলিভারকে অমনি ভাবে ভাসতে দেখে তুলে নেয়। কিন্তু ওঁর বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা জাহাজীরা কেউ বিশ্বাস করতে চায় না। ওঁর কথা শুনে তাদের মুখে বিদ্রূপের হাসি ফুটে ওঠে।

গলিভার তখন ব্লিফুস্কু থেকে আনা ক্ষুদে কয়েকটি গরু ঘোড়া তাঁর থলে থেকে বার করেন। দেখে তাদের চক্ষুস্থির। এবার জাহাজের লোকগুলি গলিভারকে ঘিরে বসে,—সেই আজব দেশের অদ্ভুত কাহিনী শোনবার জন্য।

এত হাঙ্গামা ক'রে বাড়ি ফিরে এসেও গলিভারের কিন্তু ছ'দিন যেতে না যেতেই ঘরে আর মন টেঁকে না। সমুদ্র তাঁকে হাতছানি দিয়ে ডাকে। সে আকর্ষণ দুর্বার। ক'দিন বাদে তিনি আবার ভারতবর্ষ-গামী একটি জাহাজে চেপে বসেন।

কিন্তু বরাত মন্দ গলিভারের। জাহাজটি তাতার দেশে পৌঁছুতে

প্রবল বেগে ঝড় ওঠে। ফলে, জাহাজটি একটি চরের ওপর গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে।

জাহাজের গরু ঘোড়াগুলোর খাদ্যের সন্ধানে কিছুলোক তখন উপকূলে নেমে যায়। গলিভারও ওদের সঙ্গে যান। প্রাকৃতিক শোভা দেখতে দেখতে গলিভার দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন।

এমন সময় পর্বত-সমান একটি দৈত্যের তাড়া খেয়ে দলটি জাহাজে ছুটে পালিয়ে আসে। গলিভারের কথা ভাববার তখন আর কারুর অবকাশই হয় না।

গলিভার আপন মনে হাঁটতে হাঁটতে গিয়ে হাজির হন এক চাষের ক্ষেতে। সেখানে বিরাট আকৃতির চাষীদের সামনে গলিভারের নিজেকে মনে হয় যেন একটি লিলিপুট।

অপ্রত্যাশিত ভাবে ঐ ক্ষুদে আগন্তুকটিকে সেখানে দেখে চাষীরা সব হৈ হৈ ক'রে ওঠে। তাদের সকলের চোখে মুখে ফুটে ওঠে বিস্ময় আর কৌতূহল। ততক্ষণে গলিভারের অবস্থা কাহিল।

মন্দের ভালো। একজন সহৃদয় চাষী ছোঁ মেরে গলিভারকে নিজের বাড়িতে নিয়ে আসে। গলিভারকে দেখে চাষীর মেয়েটির সে কি আনন্দ! মেয়েটি গলিভারকে খেলার পুতুল মনে ক'রে লুফে নেয়।

চাষীর মেয়েটির বয়স আর কত হবে? ন' বছরের বেশী নয়। ঐ বয়সেই মেয়েটি লম্বায় চল্লিশ ফুটের কম নয়। গলিভার অবাক্-বিস্ময়ে মেয়েটির দিকে তাকিয়ে থাকেন।

ওদিকে গলিভারকে কেন্দ্র ক'রে চাষীর মনে ব্যবসায়িক বুদ্ধি উঁকি দেয়। স্থানীয় বাজার এবং সহরে প্রদর্শনী হিসেবে তাঁকে ব্যবহার ক'রে চাষীও প্রচুর উপার্জন করতে সুরু করে। চাষীর পৌষ মাস। কিন্তু বেচারী গলিভারের শরীর ক্রমে ভেঙ্গে যায়।

ক্রমে চাষীর মনেও সন্দেহ জাগে, গলিভার হয়ত আর বাঁচবে না। তাই সে তাড়াতাড়ি গলিভারকে রাণীর কাছে একদিন বেচে দেয়।

রাজবদ্যির চিকিৎসা আর স্বয়ং রাণীর সেবাযত্নে গলিভার শীঘ্রই সুস্থ

হয়ে ওঠেন। রাণীও স্বস্তির নিঃশ্বাস নেন। গলিভার ক্রমে রাজারও অনুগ্রহ লাভ করেন। তাঁরা পরস্পরের মধ্যে নিজ নিজ দেশের নানা বিষয় নিয়ে আলাপ আলোচনা করেন।

এই ব্রবডিঙ্গন্যাগ দেশের সব কিছুতেই গলিভার কৌতুক বোধ করেন। গলিভার লক্ষ্য করেন, সেখানকার বামন-রাও কেউ তিরিশ ফুট লম্বার কম নয়, দেশের ইঁদুরগুলো যেন এক একটা সিংহ ; এমন কি বোলতাগুলোও যেন এক একটা তিতির পাখি !

দু' বছর গড়িয়ে যায়। গলিভার সেই অদ্ভুত পরিবেশে নিজেকে মানিয়ে নেন। নিশ্চিন্ত আরামে নির্ধারিত বাসভবনটিতে তাঁর দিন কাটে। বাসভবন মানে বড় একটা কাঠের বাক্স আর কি ?

কিন্তু হায় ! একদিন কোথা থেকে বিরাট আকারের একটা পাখি এসে ছোঁ মেরে গলিভারের বাসভবনটিকে তুলে নিয়ে যায়। খেয়ালী পাখিটা কিছুদূর গিয়ে এক সময় বাক্সটাকে সমুদ্রের মাঝখানে ফেলে দেয়।

তখন ইংলণ্ডগামী একটি জাহাজ যাচ্ছিল সেই পথ দিয়ে। কি মনে করে ক্যাপ্টেন বাক্সটিকে জাহাজে তুলে নেয়।

এমনি ভাবে গলিভার আবার ফিরে আসেন নিজের ঘরে। কিন্তু স্বাভাবিক জীবনে নিজেকে মানিয়ে নিতে তাঁর বড় কম বেগ পেতে হয় না।

* * *

আশ্চর্য, ক'দিন যেতে না যেতে গৃহ-সুখ গলিভারের কাছে অসহ্য হ'য়ে ওঠে। তিনি আবার সমুদ্র-যাত্রা করেন—কিছুদূর যেতে জাহাজটি চীনে-জলদস্যুদের কবলে পড়ে। এই অতর্কিত আক্রমণের জন্য জাহাজীরা প্রস্তুত ছিল না। ফলে, যা হবার তাই হ'ল।

দস্যুরা গলিভারকে প্রাণে মারে না। তাঁকে একটি দ্বীপে ছেড়ে দেয়। দ্বীপটা একেবারে জনশূন্য। সেখানে গোটাকতক পাহাড় আর গাছপালা ছাড়া আর কিছু গলিভারের নজরে পড়ে না। গলিভার ভাবেন তবে কি চিরনির্বাসন ! ভাগ্যনিপীড়িত গলিভারের যা-হোক ক'রে দিন কাটে।

একদিন একটা বিরাট পিণ্ডাকৃতি পদার্থ—আকাশ থেকে নেমে আসে দ্বীপটার ওপর। লেপুটা জাতি-র ভাসমান দ্বীপ। দ্বীপবাসীরা অসহায় গলিভারকে তাদের রাজ্যে সাদর অভ্যর্থনা জানায়। গলিভার হাতে স্বর্গ পান।

গলিভার লক্ষ্য করেন, এ আজব দেশের অধিবাসীরা সকলেই অদ্ভুত ভাববিলাসী, বাস্তবজ্ঞানহীন। রাজা থেকে সকলেই অত্যন্ত আনমনা। সামান্য কথা বলতে গিয়েও তারা কথার খেই হারিয়ে ফেলে।

ভাসমান দ্বীপটি কিন্তু ভেসেই চলে। কোথাও দাঁড়ায় না। বলনিবার্বি মহাদেশের ওপর সেটি পৌঁছুতে গলিভার সে-দেশে নেমে পড়েন। সেখান থেকে দু'দিন বাদে নৌকো নিয়ে তিনি চলে যান গ্লাবডাবড্রিব দ্বীপে—জাদুকরদের দেশে।

দ্বীপের রাজ্যপাল মায়াবলে বহু ঐতিহাসিক পুরুষদের এনে হাজির করে গলিভারের সামনে—আলেকজেণ্ডার, হনিবল, সীজ্যার, পম্‌পি এবং আরও অনেককে।

এতগুলো ইতিহাস-প্রসিদ্ধ জলজ্যান্ত পুরুষ তাঁর সামনে এসে দাঁড়াতে গলিভার হতভম্ব হয়। আশ্চর্য, গলিভারের সঙ্গে এঁরা কথাও বলেন। তাঁদের থেকে গলিভার জানতে পারেন, সত্যিকারের কোন ইতিহাস আজও লেখা হয়নি।

* * *

গলিভারের বিস্ময়ের তখনও শেষ হয়নি। জাদুকরদের দেশ থেকে গলিভার ঘুরতে ঘুরতে এক সময় গিয়ে হাজির হন—লাগ্‌নেগ দেশে। লাগ্‌নেগ অধিপতি স্বয়ং তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা জানান। রাজার সৌজন্যে গলিভার প্রত্যক্ষ করেন ঐ দেশের অমর অধিবাসীদের—যারা কোনদিন লোকান্তরিত হবে না। গলিভারের চক্ষুস্থির। এখান থেকে গলিভার গিয়ে পৌঁছান জাপান দেশে। তারপর ঘটনাচক্রে তিনি আবার ইংলণ্ডে

ফিরে আসেন। তিন বছর বাদে ভবঘুরে স্বামীটিকে ফিরে পেয়ে গলিভারের স্ত্রী-র আনন্দ ধরে না।

* * *

কিছুদিন বাড়ির শান্ত স্নিগ্ধ পরিবেশে কাটাবার পর গলিভার অস্থির হয়ে ওঠেন। আবার সমুদ্র পাড়ি দেবার জন্য তিনি সুযোগ খোঁজেন। অপ্রত্যাশিত ভাবে সে-সুযোগ এসেও যায়। এবার আর ডাক্তার হিসাবে নয়, একেবারে ক্যাপ্টেন পদে।

আগস্ট মাস, ১৭১০ খ্রীঃ। জাহাজটি পোর্টসমাউথ বন্দর থেকে নোঙ্গর তুলে দক্ষিণ মহাসাগরের দিকে দ্রুত এগিয়ে যায়। কিন্তু দু'দিন যেতে না যেতে কি কারণে নাবিকরা হঠাৎ বিদ্রোহ করে। গলিভার ওদের হাতে বন্দী হন। জাহাজ কিন্তু এগিয়ে চলে।

বিদ্রোহীরা ষড়যন্ত্র ক'রে বন্দী গলিভারকে একটি ডিঙ্গিতে চাপিয়ে সমুদ্রের বুকে ভাসিয়ে দেয়। গলিভার অসহায় ভাবে চলমান জাহাজটির দিকে তাকিয়ে থাকেন। জাহাজটি তাঁর দৃষ্টির বাইরে চলে যেতে একটি চাপা দীর্ঘনিঃশ্বাস বেরিয়ে আসে গলিভারের বুক ভেঙ্গে।

ভাসতে ভাসতে ডিঙ্গিটি একসময় নাম-না-জানা একটি দেশের মাটি স্পর্শ করে। গলিভার মহা আনন্দে লাফিয়ে পড়েন ডিঙ্গি থেকে।

বনপথ ধরে চলতে চলতে গলিভার এক বিচিত্র জীব দেখে থমকে দাঁড়ান ঃ অর্ধেক বানর এবং অর্ধেক মানুষের আকৃতির এক অদ্ভুত সৃষ্টি— নরপশু। ইঅ্যালু।

গলিভার বুঝতে পারেন, কিছুটা মানুষের চেহারার সঙ্গে সাদৃশ্য থাকলেও জীবটির বোধশক্তি এবং মনোবৃত্তি পশুসুলভ। লক্ষ্য করেন, ঘোড়াকে দেখতে পেলে এই নরপশুরা ভয়ে পালায়। গলিভার স্তম্ভিত।

ক্রমে গলিভার জানতে পারেন, সেখানকার ঘোড়াগুলো সাধারণ ঘোড়া নয়। তারা দস্তুর মতো বিজ্ঞ, প্রায় মানুষের মতো বিচারবুদ্ধি-

সম্পন্ন। ঐ ঘোড়ারা নরপশু এবং অন্যান্য জীবদের ওপর প্রভুত্ব করে। আজব দেশটা ঐ ঘোড়া বা উইনিম্‌দের রাজত্ব।

এমনি কোন এক উইনিম্‌-পরিবারের আতিথ্য গ্রহণ করেন গলিভার। তারা অতিথিকে সুস্বাদু ওটের কেক্ এবং দুধ দিয়ে আপ্যায়ন করে। অতিথির আদর-যত্নের ত্রুটি হয় না। অল্পদিনের মধ্যে গলিভার তাদের অন্তরঙ্গ বন্ধু হয়ে ওঠেন। তাদের সহৃদয় ব্যবহারে গলিভার মুগ্ধ হন।

গলিভারের মুখ থেকে সভ্যজগতের নানা আজগুবি কথা শুনে ঘোড়ারা কৌতুক বোধ করে। কিন্তু সেখানে ইঅ্যালু জাতীয় জীবরা ঘোড়াকে দিয়ে মাল টানায় জেনে উইনিম্‌রা আঁৎকে ওঠে।

এদের সঙ্গে গলিভারের দিনগুলো ভালই কাটছিল। হঠাৎ তাঁর আশ্রয়দাতা একদিন জানায়,—তাদের পরিষদে সিদ্ধান্ত হয়েছে: এদেশে থাকতে হ'লে গলিভারকে ইঅ্যালুদের শ্রেণীভুক্ত হ'তে হবে। অন্যথায় তাকে অবিলম্বে সে-দেশ ছাড়তে হবে।

সভ্যজগতে ফিরে যাবার কথা মনে হ'তে গলিভারের মনে আতঙ্ক জাগে। তবুও তাঁকে সে-দেশ ছাড়তে হয়।

নানা বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে একদিন গলিভার সুস্থ শরীরেই বাড়ি ফিরে আসেন। তাঁর খুশি হবার কথা। কিন্তু আশ্চর্য, আপন পরিজনদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হ'তে ইঅ্যালুদের কথা তাঁর মনে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে দুনিয়ার মানুষের ওপর গলিভারের মন ঘৃণায় ভরে ওঠে। এমন কি তাঁর স্ত্রী আনন্দের উচ্ছ্বাসে ছুটে এসে তাঁকে আলিঙ্গন করতে গলিভার মূর্ছা যান।

বাকী জীবন গলিভার মানুষের সঙ্গ এড়িয়ে চলেন। তাঁর ঘোড়াটি হয় গলিভারের একমাত্র হিতৈষী বন্ধু, সাথী।

ফাউস্ত

[জার্মান মহাকবি যোহান ভোল্‌ফগাঙ্‌ ফন্‌ গ্যোতে (Johann Wolfgang von Goethe)-এর **'ফাউস্ত'** (Faust), ১৭৯০-১৮৩১ খ্রীঃ, কাব্য-নাটকটির সারাংসার।]

স্বর্গের দরবারে বসে সেদিন ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি—মানুষ এবং মর্ত্যলোকের কথা নিয়ে দেবদূতগণ তাঁর গুণকীর্তন করছিলেন। অদূরে দেবতাদের আবেষ্টনে স্মিতমুখে বসে ছিলেন স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর।

দেবদূতগণ যখন তন্ময় হয়ে সেই বিচিত্র সৃষ্টির মহিমা বর্ণনা করছিলেন, ঠিক সেই সময় ঈশ্বরদ্রোহী পাপপুরুষ শয়তান মেফিস্তোফেলেস্‌ সেখানে আবির্ভূত হয়।

শয়তান সেই গুণগানের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানায়। ঈশ্বরের কাছে অভিযোগ তোলে,—আপনার তথাকথিত শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষ বহুক্ষেত্রে পশুরও অধম; পৃথিবীতে তাদের দুঃখেরও অন্ত নেই।

তাঁর সৃষ্টির এই ত্রুটি নিয়ে শয়তান ঈশ্বরকে উপহাস করে। সেই সঙ্গে তাঁর বিধি-নিষেধের প্রতিও মেফিস্তোফেলেস্‌ কটাক্ষ করে।

ঈশ্বর শয়তানের অভিযোগের বিরুদ্ধে কোন প্রতিবাদ করেন না, নীরব থাকেন। তারপর শান্তকণ্ঠে বলেন,—হ'তে পারে কিছু মানুষের আচরণ নিন্দনীয়। কিন্তু তাই ব'লে তুমি যা বলছো তা ঠিক নয়, পৃথিবীর সকলেই খারাপ নয়।

ঈশ্বর হঠাৎ শয়তানকে প্রশ্ন করেন,—তুমি চেনো আমার পরম ভক্ত ফাউস্ত-কে? সে কখনও সত্যের পথ থেকে বিচ্যুত হবে না।

ঈশ্বরের উক্তি শুনে শয়তানের মুখে বিদ্রূপের হাসি ফুটে ওঠে। বলে,—কি যে বলেন! চিনবো না কেন ঐ বাতিকগ্রস্ত খ্যাপা আচার্যি

মশায়কে ? ওঁর ওপর আপনার এতই বিশ্বাস ! কিন্তু ওঁকে ভ্রষ্ট করা আর এমন কি শক্ত কাজ ?

শয়তান দৃঢ়কণ্ঠে বলে,—আমার অসাধ্য কিছু নেই। মায়াবলে আমি যে কোন মানুষকে জয় করতে পারি। আপনার প্রিয় সেবক ফাউস্তকেও। বাজি ধরুন !

ঈশ্বর বলেন,—তথাস্তু।

ঈশ্বর জানতেন, ফাউস্তের ছিল অদম্য জ্ঞান-পিপাসা, ছিল তার জীবনে অতৃপ্ত কামনা। তবুও সে ছিল সত্যের পূজারী। তার ভাবশুদ্ধ মনটির প্রতি ঈশ্বরের কোন সন্দেহ ছিল না।

ওদিকে ফাউস্তের মনের অনন্ত অতৃপ্তি আর অসম্পূর্ণতার কথা শয়তান মেফিস্তোফেলেস্-এরও অজানা ছিল না। তার দৃঢ় বিশ্বাস, সেই দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে ফাউস্তের নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক পতন ঘটানো শক্ত নয়। তাই ঐ বাজি ধরতে শয়তানের অত উল্লাস আর উৎসাহ। ভাবে, ঈশ্বরকে জব্দ করার এ এক অপূর্ব সুযোগ !

*　　　*　　　*

ফাউস্ত ছিলেন একজন বিশিষ্ট দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক, উচ্চ-মানসিক-আদর্শযুক্ত মহাপণ্ডিত জ্ঞানবৃদ্ধ বয়োবৃদ্ধ ফাউস্তের তবুও জ্ঞান-তৃষ্ণা মেটে না। জীবনের সার-সত্য সম্বন্ধে অতৃপ্ত জ্ঞান-পিপাসা নিয়ে দারুন অশান্তি ও অস্বস্তিতে তাঁর দিন কাটে।

জীবনে আশা ও আনন্দ থেকে বঞ্চিত হয়ে ফাউস্ত এক সময় আত্মহত্যার মধ্যে মুক্তি খোঁজেন। কিন্তু কি ভেবে তাঁর মনে দ্বিধা জাগে। আত্মহনন থেকে ফাউস্ত বিরত হন।

আবার ক'দিন যেতেই মানুষের সীমিত ক্ষমতার কথা উপলব্ধি করে ফাউস্ত ক্ষুব্ধ হন। নিখিল বিশ্বে নিজেকে তাঁর বড়ই অকিঞ্চিৎকর বলে মনে হয়। ভাবেন, এ ভাবে বেঁচে থাকা অর্থহীন।

এমনি দ্বন্দ্ব-বিক্ষুব্ধ মনে অনুচরটিকে সঙ্গে নিয়ে ফাউস্ত একদিন লোকালয়ের দিকে বেড়াতে বেরোন—যেখানে দর্শন-শাস্ত্রের জটিল প্রশ্নে

জনগণের মন কণ্টকিত নয়। সেখানে উৎফুল্ল নাগরিকগণের সঙ্গে আনন্দোৎসবে ফাউস্ত নিজেকে বিলিয়ে দেন। ফলে, তাঁর মনের গ্লানি দূর হয়। ক্ষণকালের জন্য ফাউস্ত মনে প্রশান্তি অনুভব করেন।

তিনি অনুচরটিকে জানান,—আসলে আমার মধ্যে দু'টি সত্তা বর্তমান: একটি পার্থিব সুখ ভোগ করার জন্য উন্মুখ, অপরটি ভাবশুদ্ধ আধ্যাত্মিক আদর্শে বিশ্বাসী—এ রক্ত-মাংসের বেড়াজালে তার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আছে।

দিন যায়। একঘেয়ে জীবনে ক্লান্ত তাঁর মন হঠাৎ নতুন জীবনের স্বাদ ও রস অনুভব করবার জন্য লালায়িত হয়ে ওঠে।—সে-পথ হোক না কেন কঠিন বা অবাঞ্ছিত!

শয়তান মেফিস্তোফেলেস্ অলক্ষিতে এতদিন সুযোগের অপেক্ষা করছিল। নিয়তই সে ফাউস্তকে ছায়ার মতো অনুসরণ করে বেড়াত। নগরের সেই আনন্দোৎসব থেকে ফেরবার পথে, শয়তান কুকুরের ছদ্মবেশে ফাউস্তের পিছু পিছু তাঁর বাড়িতে আসে।

ফাউস্তের মনের ঐ চরম দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে শয়তান এবার স্ব-শরীরে তাঁর কক্ষে উপস্থিত হ'য়ে আত্মপরিচয় দেয়—ফাউস্তকে প্রলুব্ধ করে।

মেফিস্তোফেলেসের কূট চক্রান্তের ফাঁদে পড়ে পার্থিব জীবনের চরম আনন্দের বিনিময়ে—তা সে-আনন্দ যত ক্ষণস্থায়ী-ই হোক না কেন—ফাউস্ত নিজেকে শয়তানের দাস-রূপে তার হাতে সঁপে দিতে রাজী হন। তিনি উপলব্ধি করেন, উত্তরকালে হয়তো সেই ক্ষণিক আনন্দের জন্য তাঁর মন অসহ্য যন্ত্রণায় ক্লিষ্ট হবে; মৃত্যুর পর ঐ শয়তানটার সঙ্গেই হবে তাঁর অনন্ত নরকবাস। তবুও ফাউস্তের মন মোহমুক্ত হয় না। ভোগের লালসা তখন দুর্জয়।

ফাউস্ত কিন্তু শয়তানকে তাঁর সর্তটির কথা স্মরণ করিয়ে দিতে ভুল করেন না। বলেন, মনে রেখো,—আমি আমার আত্মাকে তখনই শুধু তোমার কাছে বিকোবো যদি তোমার প্রস্তাবিত পার্থিব স্থূল সুখে

আমার কখনও ক্লান্তি না আসে এবং আমার ভোগের লালসা যদি সত্যিই তৃপ্ত হয়; যদি তোমার প্রভাবে কর্মের প্রতি আমার অনীহা আসে এবং সেই সঙ্গে আমার ব্যক্তি-সত্তার অবলুপ্তি হয়। শুধু তখনই, অন্যথায় নয়।

শয়তান খুশি মনে ফাউস্তের এ সর্ত মেনে নেয়।

ফাউস্তকে শয়তান দু' দু'বার পাপ পথে প্রলুব্ধ করবার চেষ্টা করে। কিন্তু ব্যর্থ হয়। এবার শয়তানের যাদুর প্রভাবে বৃদ্ধ ফাউস্ত নবযৌবন লাভ করেন। তারপর অপূর্ব সুন্দরী কুমারী মার্গারেতের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়।

ফুলের মতো নিষ্পাপ কুমারীটির দিকে মুগ্ধ-দৃষ্টিতে ফাউস্ত তাকিয়ে থাকেন। তার রূপসুধা তিনি পান করেন। কিন্তু তাকে কলুষিত করবার কথা ভাবতে পারেন না। তাঁর মন বিদ্রোহ করে ওঠে।

শয়তানের কূট চক্রান্তে ক্রমে তাঁরা পরস্পরকে গভীর ভাবে ভালবাসেন। একদিন ফাউস্ত মার্গারেতকে প্রেম নিবেদন করেন। মার্গারেতও দয়িতকে আত্মদান করে। ফাউস্ত কিন্তু নিজেকে বঞ্চিত করেন না।

তাঁদের দু'জনের মিলনে মার্গারেতের ভাইয়ের মনে সন্দেহ জাগে। সে বাধা দেয়, ফাউস্তকে ক্ষান্ত হ'তে আদেশ করে। কোন ফল হয় না। ফাউস্তের সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধে মার্গারেতের ভাইটি এক সময় প্রাণ হারায়।

ফাউস্ত অবাধে মার্গারেতের প্রেমে অবগাহন করেন। ফলে, ভাবরাজ্য থেকে তাঁর পতন হয়। কিন্তু ক'দিনের জন্য? মার্গারেতের যে উদ্দাম প্রেম তাঁকে ভাসিয়ে দিয়েছিল, দু'দিন যেতেই সে-সব কিছু ফাউস্তের বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে যায়। কামনার প্রতি তাঁর মনে বিতৃষ্ণা জাগে। শুদ্ধ প্রেমানুভূতির জায়গায় আবার শুষ্ক জিজ্ঞাসার প্রবৃত্তি তাঁর চিত্তকে উদ্বেল করে।

শয়তান মেফিস্তোফেলেস্ চঞ্চল হয়ে ওঠে। ফাউস্তের এই প্রবৃত্তির পরিপূর্তির জন্য সে তাঁকে নানাভাবে প্রলুব্ধ করতে প্রাণপণ চেষ্টা করে। শয়তান ফাউস্তকে ডাকিনী ও নানা প্রেতযোনি দেখায়। কোন ফল হয় না। ফাউস্ত ততদিনে উপলব্ধি করেন, এ জৈব-কামনার তৃপ্তি নেই। কখনও বা আত্মগ্লানিতে তাঁর মন ভরে ওঠে।

সময় গড়িয়ে যায়—

এদিকে ফাউস্তের সঙ্গে অমনি অবাধ মিলনের ফলে কুমারী মার্গারেত মা হয়। কিন্তু কোথায় সে-সন্তানের জন্মদাতা? মার্গারেতকে কে দেবে তার সন্ধান?

দুঃখে ক্ষোভে এবং নৈরাশ্যে প্রায় উন্মাদ মার্গারেত ঐ সন্তানটিকে একদিন জলে ডুবিয়ে হত্যা করে। বেচারী মার্গারেত কিন্তু নিষ্কৃতি পায় না। সন্তানটিকে অমনি ভাবে হত্যা করে আরও অশান্তি ডেকে আনে।

এই মর্মন্তুদ অপরাধের জন্য মার্গারেত কারাগারে বন্দী হয়; অভাগী প্রাণদণ্ডের জন্য অসহায় ভাবে প্রতীক্ষা করে।

এই দুঃসংবাদ তাঁর কানে পৌঁছুতে দুঃখী নারীটির জন্যে ফাউস্তের মন কেঁদে ওঠে। মার্গারেতকে উদ্ধার করতে তিনি যাদুবলে কারাগারে প্রবেশ করেন।

এতদিন বাদে প্রাণপ্রতিমকে অপ্রত্যাশিত ভাবে কাছে পেয়ে মার্গারেতের বিক্ষুব্ধ মন আনন্দে উচ্ছল হয়ে ওঠে। ফাউস্তের সঙ্গে সে পালিয়ে যেতেও রাজী হয়।

কিন্তু রাতের শেষ প্রহরে শয়তান মেফিস্তোফেলেসের ছায়া দেখে মার্গারেত আর্তনাদ করে ওঠে। তার সাধ্বী-চেতনা লুপ্ত হয়। সে পালিয়ে যেতে অস্বীকার করে।

তখন ভোর হয়-হয়। দিবালোকে শয়তানের যাদুর প্রভাব থাকে না। সুতরাং শয়তান আর সময় নষ্ট করতে নারাজ। মেফিস্তো-ফেলেসের সঙ্গে ফাউস্ত অদৃশ্য হতে বাধ্য হন।

কারাগার থেকে বাইরে যেতে-যেতে ফাউস্তের কানে ভেসে আসে —তাঁর-ই উদ্দেশে বন্দিনীর আকুল আহ্বান—'হাইনরিশ্‌! হাইনরিশ্‌!' প্রণয়ীর কাছে প্রণয়িনীর বুভুক্ষু-হৃদয়ের শেষ আকৃতি।

* * *

ফাউস্ত প্রণয়-রসের স্বাদ পেলেন কিন্তু সেই চরম আনন্দ বা সৌন্দর্যের সঠিক অনুভূতি তাঁর হয় না—যে আনন্দের বিনিময়ে তিনি আপন আত্মাকে চিরদিনের মতো নরকস্থ করতেও প্রস্তুত ছিলেন; যে আনন্দ-মুহূর্তকে উদ্দেশ্য করে ফাউস্ত বলতে চেয়েছিলেন,—'একটু দাঁড়াও, তুমি কি সুন্দর!'

শয়তান প্রমাদ গোণে। ক্রমে সে বুঝতে পারে, ফাউস্ত সৌন্দর্যের পূজারী। তাই মেফিস্তোফেলেস্‌ মায়াবলে এক সময় পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্যের প্রতীক, প্রাচীন গ্রীকজগতের সেই সুন্দরী-শ্রেষ্ঠা হেলেনকে ফাউস্তের সামনে উপস্থিত করেন।

কল্পনা-জগতের হেলেনকে ফাউস্ত বাস্তবে তাঁর সামনে দেখে এক মূক-আনন্দে অভিভূত হয়ে পড়েন। আত্মস্থ হয়ে নীরবে তিনি হেলেনের রূপ-সুধা পান করেন।

কিন্তু তাঁর তৃষ্ণার নিবৃত্তি কোথায়? ফাউস্ত উপলব্ধি করেন, এ আনন্দও ক্ষণিকের জন্য। পার্থিব সৌন্দর্য বা আনন্দে তৃপ্তি নেই; হয়তো আছে সাময়িক সুখ, তাতে শান্তি থাকে না। সে-সম্ভোগে নেভে না কামনার আগুন, তাতে বাড়ায় শুধু অন্তরের জ্বালা।

এই নব-চেতনা লাভ ক'রে, ফাউস্ত ফিরে আসেন আপন দেশে। স্থির করেন, কর্ম-সাধনার মধ্যে আত্মস্থ হবেন; সর্বশক্তি দিয়ে, সে-শক্তি যতো নগণ্যই হোক্‌ না কেন, জনকল্যাণের জন্য তিনি কিছু সৃষ্টি করবার প্রাণপণ চেষ্টা করবেন।

তাঁর এই মানসিক পরিবর্তনের ফলে, ফাউস্ত শয়তানের অলৌকিক ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত হ'য়ে সাধারণ মানুষের সত্তায় ফিরে আসেন। কিন্তু তাতে ফাউস্তের বিন্দুমাত্র ক্ষোভ হয় না।

দীর্ঘদিন কঠিন পরিশ্রম করে বহু মানুষের বসবাসের জন্যে সমুদ্র-গর্ভ থেকে ফাউস্ত এক বিশাল ভূমিখণ্ড উদ্ধার করেন। তারপর অক্লান্ত কর্মদ্বারা তিনি সেই জনগণের জন্য সুখ-শান্তির ব্যবস্থা করেন।

তারপর বহু বছর গড়িয়ে যেতে ফাউস্ত অতি-বৃদ্ধ হয়ে দৃষ্টিশক্তি হারান। তবুও তাঁর দুশ্চিন্তা আর অতৃপ্তি দূর হয় না।

হঠাৎ একদিন বৃদ্ধ ফাউস্ত উপলব্ধি করেন, তাঁর ঐ পরিশ্রম ও চেষ্টার জন্য বহু লোক উপকৃত হয়েছেন। এই উপলব্ধির সঙ্গে সঙ্গে তিনি আত্মতৃপ্তি এবং পরম আনন্দের স্বাদ উপভোগ করেন।

এমনি নিঃস্বার্থ ভাবে পরের মঙ্গলের জন্য নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে ফাউস্ত আপন আত্মাকে ফিরে পান। সেই সঙ্গে তিনি আধ্যাত্মিক নবজন্ম লাভ করায় পাপপুরুষ মেফিস্তোফেলেসকেও পরাজয় স্বীকার করতে হয়। তিনি শয়তানের কবল থেকে মুক্তি পান।

তখনই ঈশ্বরের নির্দেশে দেবদূতগণ ফাউস্তকে সাদরে স্বর্গরাজ্যে নিয়ে যান।

* * *

ফাউস্তের দেবলোকে প্রবেশ-অধিকার লাভের পেছনে সাধ্বী মার্গারেতের অবদানও বড় কম ছিল না—"শাশ্বতী নারী-ই আমাদের ঊর্ধ্ব-লোকে আকর্ষণ ক'রে নিয়ে যায়।"*

* নাটকটির শেষ দুই ছত্র।

অহমিকা

[ইংরেজ লেখিকা জেন অস্টেন্ (Jane Austen)-এর **'প্রাইড্ অ্যাণ্ড প্রেজুডিস্'** (Pride and Prejudice), ১৮১৩ খ্রীঃ, উপন্যাসটির কাহিনী।]

একটি নয়, দু'টি নয়—পাঁচটি অনূঢ়া কন্যার জননী শ্রীমতী বেনেট। কন্যাদের বিয়ের চিন্তায় শ্রীমতীর চোখে ঘুম নেই। দিবারাত্র তিনি ভাবেন, কি করে এদের পাত্রস্থ করবেন। তাই বলে যার তার হাতে তো আর মেয়েদের তুলে দিতে পারেন না। পাত্রটি রূপে গুণে মর্যাদায়—সব দিক থেকে মনের মতো হওয়া চাই।

দারুন অশান্তির মধ্যে শ্রীমতী বেনেটের দিন কাটে। এ অশান্তির কথা তিনি মুখ ফুটে কাউকে বলতেও পারেন না—স্বামীকেও নয়। কারণ সদাশিব স্বামীটি সংসারের সমস্যাতে কেমন যেন উদাসীন থাকেন।

দিন যায়। শ্রীমতী বেনেট মেয়েদের পাত্রস্থ করতে মনের মতো একটি পাত্রেরও সন্ধান পান না। তবুও তিনি ভেঙ্গে পড়েন না, আশায় বুক বেঁধে থাকেন।

এমন সময় বিঙ্গলে নামে এক সুদর্শন যুবক আসে সেই অঞ্চলের নেদারফিল্ড পার্কের অট্টালিকাটিতে ভাড়াটে হয়ে।

শ্রীমতী বেনেট কৌতূহলী হন। তিনি সন্ধান নিয়ে জানতে পারেন, তাঁর প্রতিবেশী আগন্তুকটি লণ্ডনের অধিবাসী। তিনি অকৃতদার এবং ঐশ্বর্যবান। লোভনীয় পাত্র বটে!

শ্রীমতীর মনে আশার আলো উঁকি দেয়। তাঁর আনন্দ আর ধরে না। শ্রীমান্‌কে কেন্দ্র করে মনে মনে তিনি কল্পনার জাল বোনেন।

আনন্দের উচ্ছ্বাসে শ্রীমতী বেনেট এক সময় ভোলানাথ স্বামীর কাছে তাঁর মনের কথাটি খুলে বলেন—

কল্পনাবিলাসিনী স্ত্রীর কথা শুনে মিঃ বেনেটের কিন্তু ভাবান্তর হয় না। নির্লিপ্ত কণ্ঠে বলেন,—তুমিও যেমন··· । তোমার কথা শুনে মনে হয় যেন ছেলেটি তোমার কোন এক কন্যাকে উদ্ধার করতেই এই পল্লী অঞ্চলে ছুটে এসেছে। দুনিয়াতে তার আর কোন কাজ নেই। অকারণ ও-নিয়ে চিন্তা করে আর অশান্তি বাড়িও না।

স্বামীর উক্তি শুনে শ্রীমতী আর কথা বাড়ান না কিন্তু তিনি হতোদ্যমও হন না।

ততদিনে আগন্তুক বিঙ্গলে স্থানীয় সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করলেও বেনেট-তনয়াদের সঙ্গে তখনও তার প্রত্যক্ষ পরিচয়ের সুযোগ হয়নি। ঐ অঞ্চলের যুবক-যুবতীদের উদ্যোগে আয়োজিত নৃত্যানুষ্ঠানটি এনে দেয় সেই সুযোগ।

পাঁচ বোনের মধ্যে জেনী ছিল সর্বজ্যেষ্ঠা। রূপের দিক থেকেও বোনদের ভেতর সে ছিল শ্রেষ্ঠ সুন্দরী। আবার রূপের সঙ্গে তার শান্ত কোমল স্বভাবটি জেনীকে করেছিল আরও আকর্ষণীয়। জেনী ছিল পরিবারের গর্ব। অবিবাহিত যুবকদের কাছে সে ছিল লোভনীয়।

পরের বোন এলিজাবেথ অত রূপসী না হ'লেও—দেখতে সেও মন্দ ছিল না। তার শ্রীমণ্ডিত মুখখানি ছিল বুদ্ধিদীপ্ত, স্বভাবে চটপটে —আপন মহিমায় মহিমান্বিত। সব মিলিয়ে এলিজাবেথও বড় কম আকর্ষণীয় ছিল না।

ভিন্ন প্রকৃতির হলেও এই বোন দুটির পরস্পরের মধ্যে গভীর ভাব ছিল। তারা চলাফেরাও করতো একই সঙ্গে। নৃত্যানুষ্ঠানটিতেও জেনী এবং এলিজাবেথ একসঙ্গে যায়।

আনন্দমুখর নৃত্যানুষ্ঠান। স্থানীয় প্রায় সব তরুণ-তরুণীই উপস্থিত। বিঙ্গলে এবং তার অন্তরঙ্গ বন্ধু ডারসিও থাকে সেখানে।

রূপসী জেনী সেখানে পৌঁছুতে বিঙ্গলের সঙ্গে তার দৃষ্টিবিনিময় হয়। সঙ্গে সঙ্গে দুজনের মধ্যে বিদ্যুৎবেগে কি যেন হয়ে যায়। তারা

পরস্পর পরস্পরের প্রতি কৌতূহলী হয়ে ওঠে। ক্রমে সে কৌতূহল জাগায় গভীর আকর্ষণ।

বিঙ্গলে তার সঙ্গে নাচবার জন্য জেনীকে অনুরোধ করে। প্রস্তাব শুনে জেনী লজ্জায় রাঙা হয়ে ওঠে। তার মুখ মূক হলেও চোখ দু'টি মুখর হয়ে ওঠে। জেনীর সে চোখের ভাষা বুঝতে বিঙ্গলের অসুবিধা হয় না।

পুলকিত জেনী সলাজ পায়ে বিঙ্গলের সঙ্গে এগিয়ে যায় তার নৃত্যসঙ্গিনী হয়ে।

ততক্ষণে প্রায় সকলেই আপন আপন নৃত্যসঙ্গী বা সঙ্গিণী বেছে নিয়েছে। এলিজাবেথ তখনও খুঁজছে। হঠাৎ তার নজরে পড়ে বিঙ্গলের বন্ধু সুদর্শন ডার্সির ওপর। এলিজাবেথ স্মিতমুখে এগিয়ে যায় ডার্সির দিকে।

ডার্সি একাকী বসেছিল। এলিজাবেথ তার কাছে পৌঁছুতেও ডার্সির কোন ভাবান্তর হয় না। তার ভাবখানা যেনঃ তুমি আবার কে এলে? ডার্সি এলিজাবেথের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করে।

এলিজাবেথের মনে হয়, কে যেন তার গালে ঠাস্ করে একটা চড় কসিয়ে দিল। কিন্তু এলিজাবেথও দমবার পাত্রী নয়। ভাবে, এতই দম্ভ! তারপর সে আপন মনে বলে, আচ্ছা আমিও দেখে নেবো—এক মাঘে শীত যায় না।

এলিজাবেথ সেখানে আর দাঁড়ায় না। আচ্ছা মাপ করবেন, বলে আহতা এলিজাবেথ সেখান থেকে দ্রুত প্রস্থান করে।

যাবার আগে এলিজাবেথ ডার্সির মনে অনুশোচনার আগুন জ্বালিয়ে যায়। শুধু তাই নয়, এ ঘটনার পর ডার্সি এলিজাবেথের প্রতি এক অদ্ভুত আকর্ষণ অনুভব করে।

ক'দিন বাদে। আবার একটি নৃত্যানুষ্ঠানের আয়োজন হয়। এবার এলিজাবেথ ডার্সিকে পাল্টা প্রত্যাখ্যান করবার সুযোগ পেয়ে তৃপ্তির নিঃশ্বাস নেয়। তবুও কিন্তু এলিজাবেথের প্রতি ডার্সির অনুরাগ শ্লথ হয় না।

ডার্সির এ অদ্ভুত আচরণে এলিজাবেথ মনে মনে কৌতুক বোধ করে। কিন্তু বাইরে তা প্রকাশ করে না। ফলে, তার প্রতি ডার্সির আকর্ষণ ক্রমে গভীর হয়।

ওদিকে বিঙ্গলে এবং জেনীর ভালবাসা গাঢ় হয়। তাদের অনুরাগের কথাটা চাপা থাকে না। জেনীর মনে হয়, বিঙ্গলের বোন মিস্ কারডিনাও তাকে প্রীতির চোখে দেখে।

কিন্তু এলিজাবেথের প্রতি ডার্সির আকর্ষণকে কারডিনা খুব সু-নজরে দেখে না। এ তার আদিখ্যেতা বলে মনে হয়।

এলিজাবেথকে কারডিনা সহ্য করতে পারে না। তার যত আক্রোশ গিয়ে পড়ে এলিজাবেথের ওপর। তাদের পরিবারের নানা খুঁত নিয়ে এলিজাবেথকে প্রকাশ্যে কটাক্ষ করতেও কারডিন দ্বিধা করে না।

এলিজাবেথের আত্মমর্যাদা-বোধ বড় কম ছিল না। সে অহেতুক এ অপমান সহ্য করবে কেন?

নানা প্রতিকূল ঘটনাচক্রের আবর্তে পড়ে এ ছু'পরিবারের প্রীতির সম্পর্ক ক্রমে শিথিল হয়।

এলিজাবেথের মনের মধ্যে তখন আকর্ষণ-বিকর্ষণের টানাপোড়েন চলছে। এমন সময় আর একটি যুবক ধূমকেতুর মতো তার সামনে হাজির হয়। কলিন্স্। যুবকটি নিজেকে এলিজাবেথের ভক্ত বলে পরিচয় দেয়। তারপর সে তার হৃদয় উন্মুক্ত করে।

কলিন্স্ ছিল বেনেট পরিবারের দূর সম্পর্কীয় আত্মীয়—তাদের সম্পত্তির ভাবী উত্তরাধিকারী। আসলে যুবকটি একটি মাকাল ফল। তার চলন বলন ছিল হাস্যকর। কি করে যে সে পাদ্রী হয়েছিল বলা শক্ত। তবে বিদ্যাদিগ্‌গজটি লম্বসাটপটাবৃত হয়েই সমাজে চলাফেরা করতো।

এমন সোনার চাঁদ যুবকটি কবে থেকে যে তার ভক্ত হয়ে উঠেছে—এলিজাবেথ টের পায়নি। হয়ত তার পরিবারেরও কারুর তা জানবার অবকাশ হয়নি।

তাই নিতান্ত অপ্রত্যাশিত ভাবে কলিন্‌স্‌ বিয়ের প্রস্তাব করতে এলিজাবেথ বিমূঢ় ভাবে তার দিকে তাকিয়ে থাকে। সম্বিৎ ফিরে আসতে এলিজাবেথ চমকে ওঠে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে সামলে নিয়ে এলিজাবেথ কলিন্‌স্‌কে রূঢ় ভাবে প্রত্যাখ্যান করে।

কন্যার উক্তি শুনে শ্রীমতী বেনেট হায়-হায় করে ওঠেন। তিনি ভেবেছিলেন, মন্দ কি? ছেলেটি দেখতেও মন্দ নয়। ওর সঙ্গে মেয়ের বিয়ে হ'লে এক ঢিলে দু'পাখি মারা যাবে। এখন শিকার হাত থেকে ফসকে যেতে শ্রীমতী এলিজাবেথের ওপর রুষ্ট হন। পিতা কিন্তু তাঁর আদরিণী কন্যা কলিন্‌স্‌কে প্রত্যাখ্যান করাতে মনে মনে খুশি হন। স্ত্রী-র আড়ালে তিনি এলিজাবেথকে এজন্য তারিফও করেন।

এমনি ভাবে প্রত্যাখ্যাত হয়ে কলিনসের পৌরুষে ঘা লাগে। হাজার হোক পুরুষ তো!

কলিন্‌স্‌ দমবার পাত্র নয়। ভাবে, নাই বা পেলাম এলিজাবেথকে। আসলে বিয়ের আগেই কুমারীদের যতো দেমাক আর জৌলুস।—বিয়ের পর তাদের মধ্যে আর কোন বৈষম্য থাকে না। তখন সব নারী-ই এক......।

হঠাৎ কলিন্‌সের মনে পড়ে এলিজাবেথের অন্তরঙ্গ বান্ধবী শার্লোটির কথা। কলিন্‌স্‌ অগত্যা দুধের স্বাদ ঘোলে মেটাতে স্থির সিদ্ধান্ত করে।

শুভস্য শীঘ্রম্‌। আর কালবিলম্ব না করে কলিন্‌স্‌ শার্লোটির কাছে বিয়ের প্রস্তাব করে।

মেয়েদের মন বোঝা ভার। এলিজাবেথের অন্তরঙ্গ বান্ধবী হয়েও কুমারী শার্লোটি কলিন্‌সের প্রস্তাব লুফে নেয়। তাদের বিয়ের শুভ দিনটিও স্থির হতে দেরী হয় না।

এমন সময় মিঃ বিঙ্গলে হঠাৎ একদিন নেদারফিল্ড পার্কের সংসার গুটিয়ে সদলবলে লণ্ডনে ফিরে যায়। বিঙ্গলের এমন অন্তর্ধানের তাৎপর্য বেনেট পরিবার বুঝে উঠতে পারে না। জেনীও না। খবর শুনে

বেচারী স্তব্ধ হয়। শ্রীমতী বেনেট হতাশায় ভেঙ্গে পড়েন। এলিজাবেথ বোনকে প্রবোধ দেয়।

দয়িতাকে এমনি ভাবে পায়ে দলে চলে যাবার মিঃ বিঙ্গলের কিন্তু ইচ্ছা ছিল না—

সংসারে চলার পথে সব সময় ব্যক্তিগত ইচ্ছায় সব কাজ হয় না। অনেক সময় অনিচ্ছা সত্ত্বেও ঘনিষ্ঠ আত্মীয় পরিজনের অভিরুচিকে প্রশ্রয় দিতে হয়। বাস্তব জীবনে ব্যক্তিগত ক্ষতি স্বীকার করেও এ বিড়ম্বনা অনেককেই মুখ বুজে সইতে হয়। মিঃ বিঙ্গলেও ছিল এই বিড়ম্বিতদের মধ্যে একজন।

মিঃ বিঙ্গলের অন্তরঙ্গ বন্ধু ডার্সি বেনেট পরিবারের ছোট তিন মেয়ের চলাফেরা সুনজরে দেখেনি। ঐ মেয়ে তিনটির কিছু কুখ্যাতিও তার কানে পৌঁছেছিল। ফলে ঐ পরিবারটির ওপর তার মনে বিতৃষ্ণা ছিল। এমন একটি পরিবারের মেয়ের সঙ্গে বন্ধুর বিয়ের প্রস্তাবে সে সায় দিতে পারে না। তাই সে বিঙ্গলেকে এ বিয়েতে নিরুৎসাহ করে।

অবশ্য বোন কারডিনার আপত্তির পেছনে তার ব্যক্তিগত স্বার্থ জড়িত ছিল। কারডিনার আসল ইচ্ছাটা ছিলঃ দাদা ডার্সির-বোনকে বিয়ে করুক। তাহলে ধনী ডার্সির গলায় তার মালা পরাবার পথটা সহজ হবে। এই কারণেই সে জেনী এবং এলিজাবেথকে সুনজরে দেখতে পারেনি।

ডার্সি এবং কারডিনার দৃষ্টিভঙ্গি ভিন্ন হলেও উভয়ের উদ্দেশ্য ছিল এক—বেনেট পরিবারের আওতা থেকে বিঙ্গলেকে যেমন ক'রে হ'ক দূরে সরিয়ে নেওয়া। বন্ধু এবং বোনের নিখুঁৎ ষড়যন্ত্রের পাকে চক্রে পড়ে বিঙ্গলেকে ঐভাবে লণ্ডনে ফিরে যেতে হয়।

লণ্ডনে পৌঁছে কারডিনা জেনীকে এক চিঠি দেয়ঃ ভাই, রাগ করো না। খুব তাড়াহুড়োর মধ্যে চলে আসতে হ'লো। তোমার কাছ থেকে

আমরা বিদায় নেবারও অবকাশ পেলাম না। এ জন্য দুঃখিত। ক্ষমা ক'রো। হাঁ, ভালকথা—ভাই বিঙ্গলে শীঘ্রই ডার্সির বোনকে বিয়ে করছে।

বেচারী জেনী তার প্রেমাস্পদের বিয়ের খবরটি সরল মনে বিশ্বাস করে। সে মর্মাহত হয়।

কিন্তু চতুর এলিজাবেথের মনে সন্দেহ জাগে। সে বোনকে আশ্বাস দেয়,—তুই মিছে ভেঙ্গে পড়ছিস। বিশ্বাস কর্, তোর প্রতি বিঙ্গলের ভালবাসায় ফাঁকি নেই। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, বিঙ্গলের বিয়ের খবরটা সত্যি নয়। এ সব তার বোন এবং বন্ধুটির ষড়যন্ত্র। তুই বিঙ্গলের প্রেমে আস্থা রাখ।

বিঙ্গলে চলে যাবার দু'দিন বাদে শ্রীমতী বেনেটের বোন শ্রীমতী গার্ডেনার লণ্ডন থেকে বোনের বাড়িতে বেড়াতে আসেন। বড় এব মেজ বোনঝি দু'টির ওপরই মাসির টানটা একটু বেশী। জেনীর দুঃখের কাহিনী শুনে মাসি বেদনা বোধ করেন।

ভেবে চিন্তে মাসি প্রস্তাব করেন,—আচ্ছা, জেনী আমার সঙ্গে কিছুদিন লণ্ডনে বেড়িয়ে আসুক। জায়গা পরিবর্তনে ওর দেহ মন সুস্থ হবে। ভেবে ভেবে বেচারীর চেহারাটা কি হয়েছে। বলা যায় না, খবর পেলে বিঙ্গলে নিজে থেকেই ওর সঙ্গে দেখা করতে হয়ত ছুটে আসবে।

শ্রীমতী গার্ডেনারের উক্তি শুনে এলিজাবেথ বলে,—তা জেনীকে সঙ্গে নিয়ে যেতে চাও, ভাল কথা। কিন্তু মাসি, তুমি অতো আশা করো না। তুমি যে পাড়ায় বাস করো—বিঙ্গলের দাম্ভিক বন্ধুটি ওকে সেখানে পা বাড়াতে দেবে না।

মাসির সঙ্গে জেনী লণ্ডনে চলে যায়—

কলিন্সের সঙ্গে এলিজাবেথের বান্ধবী শার্লোটির বিয়ের দিন ঘনিয়ে আসে। বান্ধবীর একান্ত অনুরোধ,—তার বিয়েতে এলিজাবেথকে

উপস্থিত থাকতে হবে। বান্ধবীর অনুরোধ এলিজাবেথ ঠেলতে পারে না।

তবে হানস্‌ফোর্ডে বিয়ে—বাড়িতে যাবার পথে এলিজাবেথ লণ্ডন হয়ে যায়—

মাসির বাড়িতে পেঁাছে এলিজাবেথ জানতে পারে, তার আশঙ্কা মিথ্যা হয়নি ঃ বিঙ্গলের বোন একদিন নেহাৎ সৌজন্যের খাতিরে এলেও বিঙ্গলে আসেনি। এলিজাবেথ জানতে পারে,—জেনীর লণ্ডনে উপস্থিতির কথাটা বন্ধু এবং বোন বিঙ্গলের কাছে কৌশলে গোপন রেখেছে। এলিজাবেথের ধারণা হয়, যত নষ্টের গোড়া ঐ বন্ধুটি।

বান্ধবীর বিয়ের পাট চুকে যায়। তবুও তারা এলিজাবেথকে ছাড়ে না। আত্মীয়তা সূত্রে ডার্সিও ঐ বাড়িতে আনাগোনা করে। তখন এলিজাবেথের সঙ্গে ডার্সি আলাপ জমাবার চেষ্টা করে।

নেহাৎ সৌজন্যের খাতিরে এলিজাবেথ সহজ ভাবেই ডার্সির সঙ্গে কথা বলে। ক্রমে ডার্সি এলিজাবেথের একজন অনুরাগী হয়ে ওঠে। ডার্সি একদিন এলিজাবেথের কাছে তার হৃদয় উন্মুক্ত করে। শুধু তাই নয়, ডার্সি তার কাছে বিয়ের প্রস্তাব করতেও দ্বিধা করে না।

এলিজাবেথ বুদ্ধিমতী। সে অতিথি। এতদিন ভদ্রতার খাতিরে সে ডার্সির কাছে তার মনের বিরক্তি প্রকাশ করেনি। প্রথমতঃ জেনীর সঙ্গে বিঙ্গলের বিয়েটা পণ্ড করার মূলে ছিল ডার্সি। ডার্সিই তার বোনের দুঃখের কারণ। দ্বিতীয়তঃ, এলিজাবেথের প্রিয় বন্ধু সুদর্শন মিলিটারী অফিসার উইক্‌হামকেও এই ডার্সি প্রবঞ্চনা করেছিল।

ডার্সির প্রস্তাব এলিজাবেথ রূঢ় ভাবে প্রত্যাখ্যান করে। এমন কি, ডার্সির প্রতি তার বিতৃষ্ণার কথা জানাতেও দ্বিধা করে না।

সরাসরি ডার্সি কোন প্রতিবাদ জানায় না। কিন্তু পরের দিন তার বিরুদ্ধে ঐ অভিযোগগুলি খণ্ডন করে ডার্সি এলিজাবেথকে একটি সুন্দর চিঠি দেয়।

ডার্সির চিঠি পড়ে এলিজাবেথ স্তম্ভিত। সে উপলব্ধি করে তার অভিযোগ ভিত্তিহীন। এবার তার পক্ষপাত-তুষ্টতার মনোভাব শিথিল হয়। ডার্সির সঙ্গে ওরকম অশোভন আচরণ করায় আত্মগ্লানিতে এলিজাবেথের মন ভরে ওঠে। তার হঠকারিতার জন্য এলিজাবেথ বারংবার নিজেকে ধিক্কার দেয়। এ ঘটনার পর ডার্সির সঙ্গে দেখা না করেই সে বাড়ি ফিরে আসে।

ক' মাস পরে মাসির সঙ্গে এলিজাবেথ বিদেশ ভ্রমণে বেরোয়। ঘুরতে ঘুরতে তারা ডার্বিসায়ারে যায়। সেখানে অপ্রত্যাশিত ভাবে আবার ডার্সির সঙ্গে দেখা হয়। তাদের দেখে ডার্সি আনন্দে প্রায় লাফিয়ে ওঠে।

ডার্সির পীড়াপীড়িতে এলিজাবেথকে অবশেষে তার আতিথ্য গ্রহণ করতে হয়। ডার্সির মধুর ব্যবহারে এলিজাবেথ মুগ্ধ হয়।

ডার্সির সান্নিধ্যে এলিজাবেথের দিনগুলি ভালভাবেই কাটতে থাকে একদিন তারা দু'জনে গল্প করছিল। এমন সময় জেনীর কাছ থেকে একখানা চিঠি এল।

রুদ্ধশ্বাসে এলিজাবেথ চিঠিটি পড়েঃ ছোট বোন লিডিয়া তার এক বন্ধুর আমন্ত্রণে ব্রাইটনে গিয়েছিল। খবর এসেছে, উইক্‌হাম সরল লিডিয়াকে ভুলিয়ে নিয়ে সেখান থেকে কোথায় উধাও হয়ে গেছে। আরও বিপদের কথা, পলাতক যুগলের হদিস পাওয়া যাচ্ছে না। লিডিয়াকে উইকহামের বিয়ে করবার মতলব আছে বলেও মনে হয় না।

সর্বনাশা খবর। এলিজাবেথ মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ে।

এলিজাবেথের মুখে দুর্ঘটনাটি শুনে ডার্সি গভীর চিন্তায় মগ্ন হয় এলিজাবেথ তার থেকে বিদায় নিয়ে চলে যায়।

সেদিনই এলিজাবেথ মাসির সঙ্গে দেশের বাড়ি লংহামে ফিরে আসে। আসার আগে ডার্সির সঙ্গে তার আর কোন কথাবার্তার অবকাশ হয় না।

এলিজাবেথ বাড়ি পৌঁছুবার হু'দিন বাদেই লণ্ডন থেকে মেসোমশাই জানান,—তোমরা শুনে খুশি হবে, পলাতক প্রেমিক যুগলের সন্ধান পাওয়া গেছে। উইক্‌হাম বাবাজী লিডিয়াকে বিয়ে করতে রাজী। তবে একটি সর্তেঃ বাবাজীর কিছু অর্থের চাহিদা আছে। এদের বিয়ের ব্যবস্থা হচ্ছে।

সংক্ষিপ্ত চিঠিটি বেনেট পরিবারের বিষণ্ণ মুখগুলিতে আবার হাসি ফুটিয়ে তোলে।

হু'দিন পরে নববিবাহিত দম্পতীর আগমনে বাড়িতে আনন্দের হিল্লোল বয়ে যায়।

উইক্‌হাম সেনাবিভাগে সন্থ অফিসারের পদ লাভ করেছে, সেই সঙ্গে বদলির হুকুমটিও। কর্মস্থলে যাওয়ার আগে হু'চারদিন শ্বশুরবাড়ি কাটিয়ে যেতে আসে। শ্বশুরালয় নতুন। কিন্তু এলিজাবেথ তার পুরনো বান্ধবী। উইক্‌হামের আদর-যত্নের ত্রুটি হয় না।

লিডিয়ার সর্বাঙ্গ থেকে খুশি উপচে পড়ে। তার ভাবখানা যেন—দেখো, সকলের ছোট হয়েও আমি তোমাদের ওপর কেমন টেক্কা দিলাম।

বোনেরা লিডিয়াকে নিয়ে রঙ্গরস করে। এলিজাবেথ তাকে বলে,—কিরে অহঙ্কারে যে মাটিতে তোর পা পড়ছে না। বিয়ের কিছু গল্প বল্, শুনি।

—হাঁ, তোমাকে বলতে ভুলে গেছলাম। মিঃ ডার্সিও আমাদের বিয়েতে উপস্থিত ছিলেন। যাই বলো, ভারি ভদ্রলোক তিনি।

বোনের উক্তি শুনে এলিজাবেথ ভ্রুকুটি করে ওঠে। কথাটা তার ঠিক বিশ্বাস হয় না। মনে সন্দেহ জাগে। কিন্তু লিডিয়াকেও সে এ বিষয়ে কিছু প্রশ্ন করে না। খবরটা সঠিক জানবার জন্য সে চুপি চুপি মাসিকে জরুরী চিঠি দেয়।

সঙ্গে সঙ্গে মাসি জানান,—খবরটা তোমার মুখে শুনে সেদিনই ডার্সি লণ্ডনে চলে আসে। তারপর অনেক কষ্টে সে-ই পলাতক

প্রেমিক যুগলকে খুঁজে বার করে। শুধু তাই নয়, ডার্সির উদ্যোগেই এদের বিয়ে সম্ভব হয়েছে। উইক্‌হামের অর্থের দাবীটাও ডার্সি মিটিয়ে দিয়েছে। সুতরাং এ বিয়েতে ডার্সি উপস্থিত থাকবে না তো কে থাকবে ?

মাসির চিঠি পেয়ে এলিজাবেথ ব্যাপারটা উপলব্ধি করে। ডার্সির প্রতি শ্রদ্ধায় তার মন ভরে ওঠে। এক মূক আনন্দে এলিজাবেথ উচ্ছল হয়ে ওঠে।

উইক্‌হাম এবং লিডিয়া চলে যাবার দু'দিন বাদে নিতান্ত অপ্রত্যাশিত ভাবে বিঙ্গলে বন্ধু ডার্সিকে নিয়ে আবার হাজির হয়।

বিঙ্গলে ফিরে আসতে নেদারফিল্ড পার্কের সেই অট্টালিকাটি আবার আনন্দমুখর হয়ে ওঠে। কালবিলম্ব না করে বিঙ্গলে জেনীর কাছে বিয়ের প্রস্তাব করে।

এই অপ্রত্যাশিত প্রস্তাবে জেনীর থেকে তার মা শ্রীমতী বেনেট-ই যেন বেশী খুশি হন। বিঙ্গলের বাগ্‌দত্তা হবার সৌভাগ্য লাভ করে জেনী পরম তৃপ্তির নিঃশ্বাস নেয়, তার মুখে ফুটে ওঠে খুশির আভাস।

* * *

এলিজাবেথ হঠাৎ আবিষ্কার করে, ডার্সির প্রতি তার মনের সব সংশয় এবং সন্দেহ দূর হয়ে, কে জানে কবে থেকে, সেখানে গভীর অনুরাগ দানা বেঁধেছে।

এলিজাবেথ অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে, কবে ডার্সি মুখ ফুটে তার কাছে প্রস্তাব করে। কিন্তু কাকস্য পরিবেদনা। ডার্সির কাছ থেকে সে-বিষয়ে কোন ইঙ্গিত পর্যন্ত এলিজাবেথ পায় না। ফলে, এলিজাবেথের জ্বালা বেড়ে যায়।

এমন সময় ডার্সি হঠাৎ কি কারণে আবার লণ্ডনে ফিরে যায়। তাতে এলিজাবেথের মন অন্তর্দ্বন্দ্ব-বিক্ষুব্ধ হয়।

ডার্সি লণ্ডনে চলে যাবার ক'দিন পরে তার জাঁদরেল মাসি লেডী

ক্যাথারিন অপ্রত্যাশিত ভাবে এসে হাজির হন। তিনি কোথা থেকে শুনেছেন, ডার্সি নাকি শীঘ্রই এলিজাবেথকে বিয়ে করবে।

খবরটা লেডী ক্যাথারিনের মুখে শুনে এলিজাবেথ অপ্রস্তুত হয়। এলিজাবেথের বিমূঢ় ভাব লক্ষ্য করে লেডীর মুখে কিন্তু হাসি ফুটে ওঠে। স্মিতমুখে বলেন,—তাই বলো। আমিও জানতাম, এ অসম্ভব। তবুও নিজের কানে তোমার মুখ থেকে শোনবার জন্য ছুটে এলাম ...। তা বাপু তুমি একটু লিখে দাও যে ডার্সিকে তুমি বিয়ে করবে না।

এলিজাবেথ তাঁর আব্দার দৃঢ় কণ্ঠে প্রত্যাখ্যান করতে লেডী ক্যাথারিন রাগে গজ গজ করতে করতে লণ্ডনে ফিরে যান।

লণ্ডনে পৌঁছে লেডী ক্যাথারিন ভাগ্নের কাছে এলিজাবেথের বিরুদ্ধে সাত পাঁচ করে নানা মিথ্যা অভিযোগ তুলে তার মন ভাঙ্গাবার চেষ্টা করেন। কিন্তু তাতে ফল হয় উল্টো।

মাসির স্বভাবটি ডার্সির অ-জানা ছিল না। তাই ডার্সি তার প্রতি মাসির রূঢ় আচরণের জন্য ক্ষমা চেয়ে এলিজাবেথের কাছে জরুরী চিঠি দেয়। সেই সঙ্গে ডার্সি বিয়ের প্রস্তাবটিও জানায়।

ডার্সির চিঠি পেয়ে এলিজাবেথ খুশিতে উচ্ছল হয়ে ওঠে। ছ'দিন বাদে ডার্সি ফিরে আসতে তাদের বিয়ের শুভদিনটি স্থির হ'তে দেরী হয় না।

বড় ছ'বোনের সাহায্যে চতুর্থ বোন কেটীর বিয়েও আর সুদূর-পরাহত থাকে না। তৃতীয় বোন মেরীকে অবশ্য তার স্টুডিও-জীবন নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হয়।

গোরিও

[ফরাসী সাহিত্যিক বালজাক (Balzac)-এর 'ফাদার গোরিও' (Father Goriot), ১৮৩৫ খ্রীঃ, উপন্যাসটির গল্পরূপ।]

মঁসিয়ে গোরিও তাঁর ব্যবসা থেকে অবসর গ্রহণ করে স্থির করেন, এবার তিনি নির্ঝঞ্ঝাট-জীবন যাপন করবেন। মঁসিয়ের অর্থের অভাব নেই। তিনি মাদাম ভকার-এর 'অতিথিশালা'য় দোতালার সেরা ফ্লাটটি ভাড়া নেন।

নিঃসঙ্গ এই আগন্তুককে ওরকম ব্যয়বহুল ফ্লাটটিতে জাঁকিয়ে বসতে দেখে অকারণে হোটেলের অন্যান্য সভ্যদের ভেতর তাঁকে কেন্দ্র করে নানা জল্পনা-কল্পনার সৃষ্টি হয়। তা হোক্। গোরিও কিন্তু গায়ে পড়ে কারুর সঙ্গে কথা বলেন না। আপন মনেই দিন কাটান।

দু'দিন যেতে গোরিও'র বিলাসমণ্ডিত চালচলন লক্ষ্য করে অনূঢ়া মাদাম ভকারও তাঁর সম্বন্ধে কৌতূহলী হয়ে ওঠেন। তাঁর কুমারী মনে আশার আলো উঁকি দেয়।

মাদাম ভাবেন, নতুন অতিথিটি নিশ্চয়ই বিত্তবান। হয়তো বা ওঁর একটু বয়স হয়েছে। তা হলোই বা? ওঁর চেহারাটি তো স্বাস্থ্যোজ্জ্বল! ও-রকম পুরুষের একটু বয়সে কি এসে যায়। তিনি নিজেও তো আর কচি খুকিটি নেই।

এমনি করে সেই ফ্লাটটিতে গোরিও'র এক বছর বেশ শান্তিতেই কাটে। ততদিনে মাদাম ভকারের হৃদয়ে গোপন-আশাটি অঙ্কুরিত হয়ে ওঠে—মনের রং গাঢ় হয়।

দ্বিতীয় বছরের শেষের দিক। গোরিও হঠাৎ একদিন মাদামের কাছে

অনুরোধ করেন,—দেখুন, দয়া করে যদি ঐ কোণের দিকের ঘরটি আমাকে ব্যবস্থা করে দেন !

মাদাম যেন নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারেন না। অবাক-বিস্ময়ে খানিকক্ষণ তাঁর বিশেষ অতিথিটির দিকে তাকিয়ে থাকেন।

ঐ সাধারণ ঘরটিতে গোরিও আস্তানা নিতে চাওয়ায় মাদাম ভকার আশাহত হন। নিজের মনকে তিনি প্রবোধ দেন ঃ আসলে ভদ্রলোক একজন কৃপণ সুদখোর ; হয়তো বা ফাট্‌কার কারবারীও। মরুকগে। ভাগ্যিস্‌ ওঁর সঙ্গে নিজের ভাগ্যকে জড়িয়ে ফেলিনি !

হোটেলের সভ্যরা লক্ষ্য করে, দু'টি সুন্দরী তরুণী যখন-তখন গোরিও'র ঘরটিতে নিঃশব্দে আনাগোনা করে। তাদের মনে দুষ্টু সন্দেহ উঁকি দেয়। ক্রমে তাদের মধ্যে এক চাপা গুঞ্জন ওঠে। কেউ কেউ বা সরবে বলাবলি করে,—এ দু'টি নিশ্চয়ই গোরিও'র প্রেমিকা। লোকটি বাহাদুর বটে !

কথাটা কানে পেঁছুতে গোরিও লজ্জিত ও বিব্রত বোধ করেন। একদিন তিনি তাদের হতাশ করে দিয়ে জানান, ঐ মেয়ে দু'টি তাঁর বড় আদরের কন্যা।

সভ্যরা লজ্জা পায়। তাদের অশোভন আলোচনার জন্য কেউ বা গোরিও'র কাছে ক্ষমা চায়। সেদিন থেকে গোরিও সকলের পিতার মর্যাদা লাভ করেন ; তিনি হন—'ফাদার গোরিও'।

তৃতীয় বছর। ফাদার গোরিও আশ্রয় নেন তিন তলার ওপর—হোটেলের সবচেয়ে সস্তা ঘরটিতে।

বিভ্রান্ত সভ্যরা গোরিও'র ঘর পাল্টাবার রহস্য বুঝতে পারে না। তারা তাঁকে ভুল বুঝে এ নিয়ে নিজেদের ভেতর হাসি-ঠাট্টা করে।

কিছুদিন যেতে না যেতেই তারা লক্ষ্য করে, ঐ সস্তা ঘরে উঠে যাবার পর গোরিও'র কন্যা দুটির আনাগোনাও যেন শিথিল হয়েছে। মেয়ে দু'টিকে কদাচিৎ দেখা যায়। ফলে, গোরিও-রহস্য আরও গাঢ় হয়।

তরুণ ইয়ুজেন্ দ্য রাস্টিগ্‌ন্যাক্ মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে। আইনের ছাত্র। ইয়ুজেন্ হ'ল গোরিও'র পাশের সস্তা ঘরটির অংশীদার।

সেদিন এক নৃত্যানুষ্ঠান থেকে গভীর রাত্রে ফিরছিল ইয়ুজেন্। গোরিও'র ঘরের আলোর রশ্মি চোখে পড়তে ইয়ুজেন্ থমকে দাঁড়ায়।

অত রাত্রে গোরিও'র ঘরে আলো জ্বলতে দেখে ইয়ুজেনের তরুণ-মন কৌতূহলী হয়। ওঁর দরজার চাবির ছোট্ট ফুটোটি দিয়ে উঁকি দিয়ে ইয়ুজেন্ স্তম্ভিত। দেখে, গোরিও কতগুলি রূপোর বাসন গলিয়ে একটি তাল তৈরী করছেন।

ইয়ুজেন্ আর দাঁড়ায় না। নিজের ঘরের দিকে পা বাড়ায়। পরদিন এক সময় ইয়ুজেন্ শুনতে পায় তার কক্ষ-সঙ্গী ভটরিন কাকে যেন বলছে,—জানেন, আজ খুব সকালে গোরিও একটি রূপোর তাল বিক্রী করে অনেক টাকা কামিয়েছেন।

ভটরিন কি করে জানবে, আসলে আদুরে কন্যা কাউন্টেস্ অ্যানাস্‌টেসী দ্য রসটেড্-এর আব্দার মেটাতে গোরিও-কে অমনি ভাবে টাকা উপার্জন করতে হয়েছে। ইয়ুজেনেরও তা জানবার কথা নয়। যদিও এই কাউন্টেস্ ইয়ুজেনের অপরিচিতা নয়—গত রাত্রের নৃত্যানুষ্ঠানটিতেও তার সঙ্গে ইয়ুজেনের দেখা হয়েছে।

বিকালের দিকে সৌজন্যের তাগিদে ইয়ুজেন্ কাউন্টেস্ অ্যানাস্‌টেসীর বাড়ি যায়। বাড়িটিতে ঢোকবার পথে ফাদার গোরিও'র সঙ্গে ইয়ুজেনের দেখা হয়। গোরিও কিন্তু দাঁড়ান না।

ইয়ুজেন্ ছিল মাদাম দ্য বেসান্তের দূর-সম্পর্কীয় আত্মীয়। গত রাত্রের নৃত্যানুষ্ঠানটির তিনি ব্যবস্থা করেছিলেন।

ওরকম একজন মাদামের আত্মীয় জেনে কাউন্টেসের সঙ্গে তাঁর স্বামী এবং ভক্তটিও ইয়ুজেন্‌কে সাদর অভ্যর্থনা জানান। কথায় কথায় গোরিও তার বিশেষ পরিচিত বলে ইয়ুজেন্ উল্লেখ করতে কাউন্টেস্ ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। সঙ্গে সঙ্গে ইয়ুজেন্‌কে 'এবার তা'হলে আসুন' বলতেও তিনি

ইয়ুজেন্ স্তম্ভিত। তবুও তাকে বেরিয়ে আসতে হয়। সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে চাকরের প্রতি ফাউন্টেসের কঠিন নির্দেশটি ইয়ুজেনের কানে ভেসে আসে,—ভবিষ্যতে এ ভদ্রলোকটি এলে তাঁকে জানিয়ে দেবে, আমি বাড়ি নেই।

এমনি ভাবে আহত হ'য়ে ইয়ুজেন্ সোজা গিয়ে হাজির হয় মাদাম বেসান্তের কাছে—ফাউন্টেসের ব্যবহারের রহস্যটি তাকে জানতেই হবে!

ইয়ুজেনের মুখে ঘটনাটি শুনে বুদ্ধিমতী বেসান্তের কিন্তু বুঝতে দেরী হয় না। ক্ষণিকের জন্য তাঁর মুখে বিষণ্ণ-হাসি ফুটে ওঠে। তিনি ইয়ুজেন্‌কে বলেন,—

—কি জান, ব্যাপারটা কঠিন হলেও সত্যি। বিয়ের যৌতুক বলে নয়, বিয়ের পরও কন্যা দু'টির অন্যায় আব্দার মেটাতে ভদ্রলোক ফকির হয়েছেন। তাই গোরিওকে এখন অমনি দীন ভাবে চলতে হয়। কন্যা দু'টি আবার খুব উন্নাসিক। নিজেদের খুব অভিজাত বলে জাহির করতে সদা-ব্যস্ত। তাই সামাজিক দিক থেকে তারা গোরিওকে এখন লজ্জা বলে মনে করে। ঠিক সেই কারণে দরিদ্র গোরিওকে পিতা বলে পরিচয় দিতে কন্যা দু'টি কুণ্ঠিতা। বেচারী গোরিও'র তবুও কিন্তু কন্যা-অন্ত প্রাণ।

ইয়ুজেন্ স্তম্ভিত।

মাদাম বেসান্ত ইয়ুজেন্‌কে উৎসাহ দেন,—তা' তোমার ইচ্ছা হলে ওঁর অন্য কন্যাটি—ডেলফিন দ্য নুচিনজেন-এর সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দিতে পারি।

ইয়ুজেনের মনের গ্লানি কিন্তু যায় না। তার দুঃখের কথা শুনে সঙ্গী ভটরিন বলে,—তুমিও যেমন! ওরকম বিবাহিত নারীর পেছনে সময় নষ্ট করা অর্থহীন।

একটু থেমে ভটরিন আবার বলে,—আমার কথা শোনো। এ বাড়ির ও-দিকটায় কুমারী ভিক্তরিন টিলেফার থাকে। তাকে হয়তো দেখে থাকবে। মেয়েটি তার পিতার ঐশ্বর্য থেকে বঞ্চিতা। ঐ ঐশ্বর্যের

উত্তরাধিকারী তার ভাই। তুমি আমাকে হাজার তুই ফ্রাঙ্ক দিলে ভাইটিকে নিশ্চিহ্ন করে দিই। তখন তুমি অনায়াসে সেই রাজকন্যার সঙ্গে তার পিতার রাজত্বটাও লাভ করতে পারো।

কুমারী ভিক্তরিন ইয়ুজেনের একেবারে অপরিচিতা নয়। মেয়েটির চোখে মাঝে মাঝে সে অস্পৃষ্ট বন্ধুত্বের আশ্বাসও লক্ষ্য করেছে। কিন্তু তার ভাইর সম্বন্ধে বন্ধুর ঐ প্রস্তাবটা ইয়ুজেন্ গ্রহণ করতে কুণ্ঠা বোধ করে। বন্ধুকে মুখে বলে, আচ্ছা আমি ভেবে দেখছি।

পরের সন্ধ্যায় ইয়ুজেন্ মাদাম বেসান্তের সঙ্গে একটি নাট্যশালায় যায়। সেখানে ইয়ুজেন্ ডেলফিন ত্য নুচিন্‌জেন-এর সঙ্গে পরিচিত হয়। ডেলফিনের মধুর ব্যবহারে ইয়ুজেন্ মুগ্ধ হয়। বিদায় নেবার আগে ডেলফিন পরের দিন তাঁর সঙ্গে নৈশভোজ এবং নাটক দেখবার জন্য ইয়ুজেনকে অনুরোধ করেন।

পরের দিন। নৈশভোজের আগে ইয়ুজেন ডেলফিনের সঙ্গে দূরের এক জুয়ার আড্ডায় গিয়ে হাজির হয়। তাঁর প্ররোচনায় ইয়ুজেনকে খেলতেও হয়।

জীবনে প্রথম অভিজ্ঞতা। তবুও অল্প সময়ের মধ্যে ইয়ুজেন অভাবনীয় ভাবে ছ' হাজার ফ্রাঙ্ক লাভ করে। শ্রীমতী ডেলফিনের মনে আনন্দ ধরে না।

একটু ইতস্তত করে ডেলফিন খুব মিষ্টি করে বলেন,—তুমি সহৃদয়। কিছু যদি মনে না-করো। বলছিলাম, এ টাকাটা আমার সত্যিই খুব দরকার। তোমাকে বলতে কি, টাকাটা আমার একজন পুরনো অনুরাগীর ঋণ শোধ করতে প্রয়োজন।

বেচারী ইয়ুজেনকে নীরবে সব টাকাটাই শ্রীমতী ডেলফিনের হাতে তুলে দিতে হয়।

এমনি ভাবে পর পর তু'জন নারীর কাছে আশাহত হয়ে ইয়ুজেনের দিনগুলি অশান্তিতে কাটে। হঠাৎ তার ভটরিনের প্রস্তাব মনে পড়তে সে সঙ্গীটির সাহায্য প্রার্থনা করে।

ব্যবস্থা হয়, পরের দিন খুব সকালে ভিক্তরিনের ভাইয়ের সঙ্গে ভটরিনের দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ হবে। সে বিষয়ে কথাবার্তা সবে শেষ হয়েছে এমন সময় গোরিও ইয়ুজেনকে জানান, তার জন্য একটি ভালো ফ্লাট ঠিক করেছেন। শুনে ইয়ুজেন খুশি হয়, বিশেষ করে শ্রীমতী ডেলফিনের চেষ্টায় যখন হয়েছে।

কিন্তু ভোর হ'তে দ্বন্দ্ব-যুদ্ধের নামে তার ইচ্ছাপূরণ করতে যে অঘটনটি হবে—তা মনে হ'তে ইয়ুজেন শিউরে ওঠে। সে বিবেক-দংশনের জ্বালা অনুভব করে।

তাই সে ব্যস্ত হয়ে গোরিও'র মাধ্যমে ভিক্তরিনের ভাইকে সতর্ক করবার চেষ্টা করে। স্থির করে, ঘটনাস্থলে নিজেও উপস্থিত থাকবে। কিন্তু দুষ্টু ভটরিনের চক্রান্তে সব ব্যর্থ হয়।

সেদিন রাত্রে ভটরিন কৌশলে ইয়ুজেনকে অতি-মাত্রায় ঘুমের ওষুধ খাইয়ে দেয়। ফলে, পরের দিন অনেক দেরীতে তার ঘুম ভাঙ্গে।

সবে সে ঘুম থেকে উঠেছে, এমন সময় কে একজন জানায়—দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে ভিক্তরিনের ভাই মারাত্মক ভাবে আহত হয়েছে। শুনে ইয়ুজেন চমকে ওঠে। অনুশোচনায় ইয়ুজেনের মন ভরে ওঠে।

ক্লান্ত মনে ইয়ুজেন ঘরে একাকী বসেছিল। হঠাৎ গোলমাল শুনে সে দ্রুত নীচে নেমে যায়। শোনে, ভটরিন নাকি কফি খেতে খেতে অচৈতন্য হয়ে পড়ে। ক্রমে সে জানতে পারে, এ সেই কুখ্যাত দাগী ফেরারী আসামী—ট্রম্পি লা মর্ট। এতদিন নাম ভাঁড়িয়ে ভটরিন নামে এখানে গা ঢাকা দিয়ে ছিল। তার পিঠে ঐ চিহ্ন সুস্পষ্ট। এই চিহ্নটি পরীক্ষা করবার জন্য পুলিশের নির্দেশে তার কফিতে ওষুধ দেওয়া হয়েছিল।

অল্প সময়ের মধ্যে পুলিশ ছুটে আসে তাদের 'শিকার'টি উদ্ধার করতে।

ইয়ুজেন স্থির করে, না আর দেরী নয়। এক্ষুনি এ পাপ-পুরী ছাড়তে হবে।

গোরিও যখন ইয়ুজেনের সঙ্গে নতুন ফ্লাটটিতে চলে যাবার জন্য তৈরী হচ্ছিলেন, তাঁর কন্যা শ্রীমতী ডেলফিন এসে হাজির হন। তাঁর চোখে বিপদের ছায়া। ফলে, গোরিও-র সঙ্গে ইয়ুজেনও হাত গুটিয়ে বসে। তাদের আর যাওয়া হয় না।

স্বামীর সঙ্গে শ্রীমতী ডেলফিনের সদ্‌ভাব ছিল না। কন্যার ইচ্ছায় গোরিও আইনের আশ্রয় নিয়ে তার বিবাহ-বিচ্ছেদ ক'রে স্বামীর থেকে একটা মোটা মাসোহারারও ব্যবস্থা করেছিলেন। ভদ্রভাবে চলার পক্ষে ঐ মাসোহারা যথেষ্ট। তবুও শ্রীমতী ডেলফিন পিতার কাছে তাঁর দারুণ অর্থকষ্টের অভিযোগ করেন। অর্থের জন্য গোরিওকে পীড়ন করেন।

সবে শ্রীমতী ডেলফিন বিদায় নিয়েছেন—তাঁর বোন শ্রীমতী অ্যানাস্‌টেসী ছুটে এসে পিতার কাছে আছড়ে পড়েন। জানান, তিনি মহাবিপদে পড়েছেন। পুরনো প্রেমাস্পদের ঋণ শোধ করবার জন্য স্বামীর পৈতৃক আমলের মূল্যবান কয়েকটি হীরে তিনি বিক্রী করেছিলেন। কি করে স্বামী টের পেয়েছেন। কিছু তিনি উদ্ধার করছেন; বাকী ক'টির জন্য তিনি ক্ষতিপূরণের দাবী করছেন। তাছাড়া ঐ প্রেমাস্পদটির জন্য তাঁর এক্ষুনি অন্তত বারো হাজার ফ্রাঙ্ক চাই-ই।

শুনতে শুনতে গোরিও উদাস দৃষ্টি মেলে বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকেন। পিতার ঐ উদাসীনতা লক্ষ্য করে শ্রীমতী পিতাকে যাচ্ছেতাই বলে গালমন্দ করে ঝড়ের বেগে একসময় বেরিয়ে যান।

আত্মসুখী স্বার্থপর কন্যা দুটির পীড়নে হঠাৎ গোরিও'র একদিন জ্ঞান-চক্ষু খুলে যায়। কিন্তু ততদিনে তিনি ভেঙ্গে পড়ছেন। ঐ রাত্রে শ্রীমতী ডেলফিনের সঙ্গে ইয়ুজেন স্ফূর্তি করে। ফিরে দেখে গোরিও অসুস্থ, যেন তিনি হঠাৎ কতো বুড়ো হয়ে গেছেন। ইয়ুজেন তাঁর মনের কোন হদিস্‌ পায় না। গোরিও নীরবে বিছানায় পড়ে থাকেন।

আশ্চর্য, ভোর হ'তে গোরিও'র মনে পড়ে পয়সার অভাবে

অ্যানাস্টেসীর সান্ধ্য-পোষাকটি দর্জির কাছে পড়ে আছে! তাঁর শেষ সম্বলটুকু পুঁটলিতে বেঁধে ধুঁকতে ধুঁকতে গোরিও বেরিয়ে যান বিক্রী করতে। ফিরে এসে তিনি শয্যাশায়ী হন।

পিতার দারুণ অসুস্থতার কথা জেনেও কন্যা দু'টি কিন্তু সেদিকে ভ্রুক্ষেপ করে না। তারা নৃত্যানুষ্ঠানে যথারীতি মেতে ওঠে।

পরের দিন সকালে গোরিও'র অবস্থা ভয়াবহ হ'তে ইয়ুজেন তাঁর আদরের কন্যা দু'টিকে খবর দেয়। শ্রীমতী ডেলফিন জানায়,—এতো সকাল সকাল কি বেরোন যায়! আর, শ্রীমতী অ্যানাস্টেসী যখন দয়া করে এলেন তখন গোরিও প্রায় স্তব্ধ হয়ে গেছেন—পৃথিবীর কাছে তাঁর সব প্রয়োজন মিটে গেছে। শ্রীমতী অ্যানাস্টেসীও মুমূর্ষু পিতার কাছে দাঁড়িয়ে আর সময় নষ্ট করেন না।

সারাদিন কেমন এক আচ্ছন্নতার মধ্য দিয়ে কাটিয়ে পরের দিন গোরিও জীবন-যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পান। তাঁর সৎকারের জন্য কন্যারা একটি পয়সাও দেয় না।

ভিখারীদের কবরে মাটি পান গোরিও। তাঁর জন্য শোক প্রকাশ করতে কবরস্থানে উপস্থিত থাকে শুধু ইয়ুজেন আর একটি গরীব ছাত্র। কন্যাদের অবকাশ কোথায়? তাদের প্রতিনিধি হিসাবে দু'জনে দু'টি শবযান পাঠিয়ে পিতৃঋণ শোধ করবার প্রয়াস পান।

কাউনট্ অফ্ মণ্টেক্রীস্টো

[ফরাসী সাহিত্যিক আলেকজান্দার ডুমা (Alexander Dumas)-র **'দি কাউনট্ অফ্ মণ্টেক্রীস্টো'** (**The Count of Montecristo**) ১৮৪৪ খ্রীঃ, উপন্যাসটির সংক্ষিপ্তসার ।]

নেপোলিয়ন তখন এলবা দ্বীপে কড়া পাহারায় নজরবন্দী। ফ্রান্সের একদল লোক তাঁকে সেখান থেকে উদ্ধার করবার ষড়যন্ত্র করছে।

এই সময় মার্সেলজ সহরে এদমন্দ্ বলে একজন তরুণ বাস করত। সংসারে তার আপনজন বলতে একমাত্র বুড়ো বাপ। সুন্দরী মার্সিদিস্ এদমন্দের বাগ্‌দত্তা; ফার্দিনান্দ তার প্রতিদ্বন্দ্বী। এদ্‌মন্দ জাহাজে কাজ করে। তার কাজের গুণে সে জাহাজের কাপ্তেনের প্রিয়পাত্র, বিশ্বাসভাজন।

ডুষ্টু ড্যাংলারও অনেক দিন থেকে ঐ জাহাজে কাজ করছে। কাপ্তেন পদটির ওপর তার অনেক দিনের লোলুপ দৃষ্টি। বুড়ো কাপ্তেন মরলে সে-ই তার গদিতে বসবে, এই আশায় সে বেঁচে আছে।

মরবার সময় কাপ্তেন কিন্তু এদ্‌মন্দের হাতেই জাহাজের সব ভার দিয়ে গেলেন। সেই সঙ্গে তিনি ওর হাতে একখানা চিঠিও দিলেন,— প্যারীতে একজনের হাতে গোপনে সেটি পৌঁছে দেবার জন্য।

এদ্‌মন্দ এ চিঠির বিষয়বস্তু সম্বন্ধে কিছুই জানত না; জানবার তার কোন কৌতূহলও হ'ল না। ডুষ্টু ড্যাংলার কিন্তু সে চিঠির কথা কি করে টের পেয়েছিল। তাই সে সুযোগের অপেক্ষায় থাকে।

ক'দিন বাদে ওদের জাহাজ মার্সেলজে ফিরে এল। হিংসুটে ড্যাংলার এবার শয়তান ফার্দিনান্দের হাতে হাত মেলালো। দুজনে

পরামর্শ করে বেচারা এদ্‌মন্দের বিরুদ্ধে পুলিশের কাছে খবর দিল,—'এদ্‌মন্দ নেপোলিয়নের মুক্তির ষড়যন্ত্রে সক্রিয়ভাবে জড়িত। এ সম্পর্কে একটি বিশেষ গোপন চিঠিও ওর কাছে পাওয়া যাবে।' এদ্‌মন্দের প্রতিবেশী এদের নোংরা চক্রান্তের নীরব সাক্ষী রইল।

ইতিমধ্যে এদ্‌মন্দের সঙ্গে মার্সিদিসের বিয়ের দিন ঠিক হয়ে যায়। তাই এদ্‌মন্দ ভেবেছিল, দুদিন বাদে একেবারে বিয়ের ঝঞ্ঝাট চুকিয়েই সে চিঠিটা প্যারীতে পৌঁছে দেবে। অদৃষ্ট!

—বিয়ে করতে বেরোচ্ছে, এমন সময় পুলিশ সেই চিঠি সমেত ওকে গ্রেপ্তার করে। বেচারা এদ্‌মন্দ! বিনামেঘে মাথায় বজ্রাঘাত।

বিচারের জন্য এদ্‌মন্দকে ম্যাজিস্ট্রেট ভিলেফোর্ত-এর কাছে আনা হল। বিচারক আশ্চর্য হ'য়ে দেখলেন চিঠিখানা তাঁর বাবার নামেই লেখা! স্বার্থপর বিচারক তাঁর নিজের মান আর বাপের জান বাঁচাতে ব্যগ্র হয়ে উঠলেন। তিনি প্রকাশ্যে বিচার না করে আসামীকে তাড়াতাড়ি সেই কুখ্যাত সার্তুদাফ্ কারাগারে যাবজ্জীবন বন্দী থাকবার হুকুম দিলেন।

ইতিমধ্যে নেপোলিয়ন এল্‌বা দ্বীপ থেকে ফিরে এসেছেন। নিরপরাধ বন্দী এদ্‌মন্দের কথা কিন্তু কারুর আর মনে রইল না।

বছর গড়িয়ে গেল। বন্দী এদ্‌মন্দ হতাশায় একেবারে ভেঙ্গে পড়ল। আত্মহত্যা করেই সে তার অসহ্য জীবন-যন্ত্রণা থেকে মুক্তি নেবে বলে ঠিক করেছে। ঠিক সেই সময়—

এক রাত্রিতে মাটি খুঁড়বার মত একটা শব্দ যেন এদ্‌মন্দের কানে এলো। মনে হল যেন শব্দটা তার পাশের ঘর থেকেই আসছে। চারদিন বাদে সে লক্ষ্য করল তার ঘরের মেঝের খানিকটা অংশ হঠাৎ ধ্বসে পড়ল। এদ্‌মন্দ অবাক্ হয়ে দেখলো সদ্য খোঁড়া সরু সুড়ঙ্গ পথে এক বৃদ্ধ—পণ্ডিত পাদ্রী ফারিয়া। তাঁর হিসাবে একটু ভুল হবার দরুণ সুড়ঙ্গটি কারাগারের বাইরে না গিয়ে এ ঘরে পৌঁছেছে।

ফারিয়ার এতদিনের কঠোর পরিশ্রম ও চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ায় প্রথমে একটু হতাশ হয়েছিলেন বৈ কি। কিন্তু এদ্‌মন্দের মুখের দিকে তাকিয়ে

নিজেকে তিনি সামলে নিলেন। নিজের দৃষ্টান্ত দেখিয়ে তিনি এদ্‌মন্দকে বাঁচবার প্রেরণা দিলেন। তিনি বললেন,—কোন প্রতিকূল অবস্থাতেই মানুষের ভেঙ্গে পড়া উচিত নয়। চেষ্টা, ধৈর্য, এবং দৃঢ় সঙ্কল্পের দ্বারা পৃথিবীতে অনেক অসাধ্য কাজ করা যায়।

ক'বছরের মধ্যে পণ্ডিত ফারিয়ার সাহায্যে এদ্‌মন্দ নানা ভাষা শিখে নিল। সেইসঙ্গে ইতিহাস, বিজ্ঞান, গণিতশাস্ত্র, ভূগোল ইত্যাদি অনেক বিষয়েই ওর বিশেষ দখল হল।

এইভাবে তের বছরের বন্দী জীবন কাটল এদ্‌মন্দের। বৃদ্ধ ফারিয়ার হঠাৎ সন্ন্যাস রোগে একদিন মারা গেলেন। মরবার আগে তিনি এদ্‌মন্দকে মণ্টেক্রীস্টো দ্বীপে এক বিপুল গুপ্তধনের সন্ধান দিয়ে গেলেন। কার্ডিনাল স্পার্ডা-র বিশাল সম্পত্তি! ঐ ঐশ্বর্য যে আবিষ্কার করবে সেই-ই তার মালিক হবে!

ফারিয়ার মৃতদেহটা কারাগার-রক্ষীরা সমুদ্রের জলে ফেলে দেবার জন্য চটে মুড়ে সেলাই করে রেখে গেল।

এদ্‌মন্দ সুযোগ বুঝে চট্ করে ফারিয়ার মৃতদেহটা থলে থেকে বার করে টেনে নিয়ে নিজের বিছানায় ওটাকে চাদর মুড়ে শুইয়ে রাখল। তারপর নিজে সেই থলের ভিতর ঢুকে আবার সেলাই করে মরার মত পড়ে রইল। ফারিয়া যে লোহার থালার ভাঙ্গা টুকরোটা ছুরীর মত ব্যবহার করতেন, সেটি এদ্‌মন্দ সঙ্গে নিতে ভুললো না।

কারাগারের লোকেরা কোনকিছু সন্দেহ না করে চটেমোড়া জিনিসটি পাহাড়ের উপর থেকে সমুদ্রে ফেলে দিল। এদ্‌মন্দ ভিতর থেকে থলে কেটে বেরিয়ে রাতের অন্ধকারে সাঁতার কেটে কাছের একটি নির্জন দ্বীপে গিয়ে উঠল।

চৌদ্দ বছর নরক জীবনের পর এদ্‌মন্দ মুক্তি পেল।

পরদিন ভোরে অনেক কষ্টে কোন এক চোরাকারবারী জাহাজের সাহায্যে এদ্‌মন্দ সেখান থেকে উদ্ধার পেল। জাহাজের কাজ ওর ভালই জানা ছিল। তাই, সে জাহাজে তার আশ্রয়ও মিলে গেল।

গুপ্তধনের কথা এদ্‌মন্দের মনে মাঝে মাঝে উঁকি দেয়। একদিন জাহাজটি মণ্টেক্রীস্টোর পাশ দিয়ে যাচ্ছে, এমন সময় ওর প্রস্তাবে, শিকারের লোভে জাহাজ সেই দ্বীপে নোঙর ফেলল। জনমানবশূন্য ছোট্ট একটি দ্বীপ—শুধু জঙ্গল আর একটা বড় পাহাড় মাত্র।

এদ্‌মণ্ড একটা বড় পাথরের উপর উঠতে গিয়ে হঠাৎ পড়ে গেল। ভাব দেখাল, ওর নড়বার একদম শক্তি নেই। অগত্যা এদ্‌মন্দের প্রস্তাবে ওর আত্মরক্ষার জন্য একটি বন্দুক, একটা বড় শাবল আর কিছু খাবার রেখে জাহাজ আবার চলল। যাবার আগে ওরা জানিয়ে গেল, দুদিন বাদে এদিক দিয়ে ফিরবার পথে আবার ওকে জাহাজে তুলে নিয়ে যাবে।

জাহাজটি চোখের আড়াল হতেই এদ্‌মন্দ লাফিয়ে উঠল। সারাদিন ধরে খোঁজবার পর দিনের শেষে একটি অস্পষ্ট গুহার সন্ধান মিলল। এবার অনেক কষ্টের পর তার ভিতর একটি বহু পুরানো সিন্দুকও দেখা গেল। ডালা খুলে তার ভিতরের দৃশ্য দেখে এদ্‌মন্দের চক্ষুস্থির। —এ যে দেখছি দুনিয়ার সব ঐশ্বর্য এই সিন্দুকের ভেতর!

পরের দিন ভোরে কয়েকটি মাত্র হীরে পকেটে পুরে সিন্দুকটা যেমন ছিল ঠিক তেমনি ভাবে আবার রেখে এদ্‌মন্দ জাহাজের জন্য অপেক্ষা করতে থাকে।

যথাসময়ে জাহাজ এসে ওকে তুলে নিয়ে যায়।

এক সুযোগে এদ্‌মন্দ এবার মার্সেলজ-এ ফিরে এল। জানল, ওর বাপ অনেক কষ্ট পেয়ে ইতিমধ্যে মারা গেছেন। প্রেয়সী মার্সেদিস্‌-ও অনেক দিন ওর জন্য অপেক্ষা করে শেষে ফার্দিনান্দ্‌কেই বিয়ে করেছে।

এদ্‌মন্দ তবুও কিন্তু দমবার পাত্র নয়।

সঙ্গের হীরে কয়টি বিক্রী করে এদ্‌মন্দ প্রথমে একটি জাহাজ কিনল। তাতে করে এক ফাঁকে সে মণ্টেক্রীস্টো দ্বীপ থেকে সেই গুপ্তধনের সিন্দুকটা নিয়ে এল। দুনিয়ায় এখন তার এই বিপুল ঐশ্বর্যের তুলনা কোথায়?

এবার, যারা ওর সর্বনাশের মূলে ছিল তাদের সম্বন্ধে খোঁজ খবর নেবার উদ্দেশ্যে এদ্‌মন্দ একদিন ভবঘুরে পাদ্রীর ছদ্মবেশে এসে হাজির হল সেই পুরনো প্রতিবেশী হোটেল-মালিক ফেডারাউসের কাছে। জানল, বিচারক ভিলেফোর্ত ইতিমধ্যে যথেষ্ট অর্থ ও যশ পেয়ে জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত। দুষ্টু ড্যাংলার এখন কোটিপতি, ব্যাঙ্কের মালিক। ফার্দিনান্দও প্রচুর ঐশ্বর্যের মালিক; গ্রীক যুদ্ধে কি একটা বড় খেতাবও সে উপরি পেয়েছে। সেই সঙ্গে তার প্রথম মনিব মোরেলের দুর্দশার খবর জেনে সে দুঃখিতও হল।

কাপ্তেন মোরেলের ঋণ এদ্‌মন্দ ভোলে নি—তা ভোলবার নয়। তাঁর-ই দয়ায় প্রথম জীবনে এদ্‌মন্দের অন্ন জুটেছিল। তাই, প্রথমেই যথেষ্ট টাকা দিয়ে সে সেই মনিবকে সাহায্য করলে। পুরনো মনিব বাঁচলেন—তাঁর জাহাজের কারবার আবার ফেঁপে উঠল।

এদ্‌মন্দ এবার কাউন্ট অব মন্টেক্রীস্টো নাম নিয়ে প্যারীতে এল। চোখ-ধাঁধানো রাজকীয় তার চালচলন। সেই সঙ্গে তার উদারতা এবং মধুর স্বভাবে সকলে মুগ্ধ হয়। অল্পদিনেই সে সহরের আলোচনার প্রধান বিষয়বস্তু হয়ে ওঠে। তাকে সকলেই বিশেষ খাতির করতে চায়। তার একটু কৃপাদৃষ্টি পেলে তারা নিজেদের ধন্য মনে করে। তার ইতিহাস কিন্তু কেউ জানতে চাইল না। এদ্‌মন্দকে কারুর আর মনে পড়ে না।

এদ্‌মন্দ শত্রুদের ওপর প্রতিহিংসা নেবার সঙ্কল্প করল। ওদের সর্বনাশের জন্য সে ধীরে ধীরে এমন ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করলে যে সে ফাঁদে তাদের ফেলতে বিশেষ বেগ পেতে হল না।

প্রথমেই এদ্‌মন্দ লোভী গুপ্তচর প্রতিবেশী হোটেল মালিককে শেষ করল। তারপর পরম দুই শত্রু ফার্দিনান্দ ও ড্যাংলারকে সর্বস্বান্ত করার সুযোগ খুঁজতে এদ্‌মন্দ ওদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশতে লাগল।

ফার্দিনান্দ নানাভাবে অপদস্থ হতে লাগল। স্ত্রীপুত্র তাকে ত্যাগ করে একসময় দেশান্তরিত হল। শেষে সে আত্মহত্যা করে মুক্তি পেল।

আর, কোটিপতি ড্যাংলার সর্বস্বান্ত হয়ে স্ত্রীপুত্র সব কিছু ছেড়ে বিদেশে পালিয়ে বাঁচে। এদিকে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব, যিনি ওকে বিনা অপরাধে শাস্তি দিয়েছিলেন, এদ্‌মন্দের চক্রান্তে তাঁর অত সাধের চাকুরি গেল, স্ত্রী-পুত্র বিষ খেয়ে মরল; কাউন্ট অব মণ্টেক্রীস্টোর আসল পরিচয় জেনে শেষে তিনি নিজে পাগল হয়ে রাস্তায় বেরোলেন।

ম্যাজিস্ট্রেটের মেয়ে ভেলেন্তাইনও এ চক্রান্তের ফাঁদে পড়ে অসহায়-ভাবে মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করছিল। ঠিক সেই সময় এদ্‌মন্দ জানতে পারে ওর বন্ধু ওকে ভালবাসে; ওরা উভয়ে পরস্পরের প্রতি আসক্ত। এদ্‌মন্দ তৎক্ষণাৎ ভ্যালেন্তাইনকে উদ্ধার করে ওদের তুজনকে বিয়ে দিল। শুধু তাই নয়, বন্ধুকে তার সমস্ত সম্পত্তি দিয়ে তাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে সে আবার সমুদ্রযাত্রা করল।

এদ্‌মন্দ আর ফিরে আসে নি।

ভাগ্যহারা

[ফরাসী সাহিত্যের দিক্‌পাল ভিক্তর হিউগো (Victor Hugo)-র **'লা মিজারেবল'** (Les Miserables), ১৮৬২ খ্রীঃ, অমর উপন্যাসের সারাংশ।]

১৮১৫ সাল। শীতকাল। সন্ধ্যা হতে তখনও ঘণ্টাখানেক বাকি। ফ্রান্সের ছোট্ট একটি শহর···।

—রাস্তায় ঐ বিদেশী লোকটি কে? ওর বুকটা কি বিশাল! কে এই শক্তিমান পুরুষ? কিন্তু ওকি, ওর মুখখানা এত করুণ কেন? লোকটির চেহারাটাই বা কেন এত শ্রান্ত, ধূলিমলিন? অদ্ভুত!

লোকটি পর পর দু'টো হোটেলে ঢোকে। হোটেলওয়ালারা সঙ্গে সঙ্গে তাকে তাড়িয়ে দেয়। বেচারি ওদের মিনতি করেঃ খিদেয় মরে যাচ্ছি। সেই ভোরবেলা থেকে ছত্রিশ মাইল হেঁটেছি। এখনও পেটে কিছু পড়েনি। এই নাও দাম দিচ্ছি, না হয় ডবল নাও—দয়া করে তোমরা আমাকে কিছু খেতে দাও। আর কিছু না হোক্ একটুকরো রুটি আর রাতটা কাটাবার মত যে-কোন জায়গায় একটু আশ্রয় দাও।

কিন্তু কেউ শুনল না হতভাগার প্রার্থনা।

বিভ্রান্ত লোকটি হাঁটতে হাঁটতে এক সময় স্থানীয় থানায় হাজির হল। সেখানে ও নিজের দুর্দশার কথা জানিয়ে ঐ রাতটা হাজতে কাটাবার জন্য কর্তাকে অনুরোধ করল। কোন ফল হ'ল না। সে হাজতেও আশ্রয় পেল না। সেখান থেকে তাকে নিরাশ হয়ে আবার রাস্তায় নামতে হয়। আবার সে চলতে থাকে। মাঝে মাঝে তার শ্রান্ত পা দুটো বিদ্রোহ করতে চায়। তবুও সে পথিককে চলতে হয় অনন্ত পথ ধরে।

ক্রমে সন্ধ্যা হয়। চারিদিকে অন্ধকার নেমে আসে। সেই সঙ্গে

লোকটির আশার শেষ আলোটুকুও যেন নিভে আসে। বাইরের প্রচণ্ড ঠাণ্ডা হাওয়ায় বুঝি সব কিছু হিম হয়ে যায়। লোকটি তার পেটের ক্ষুধার আগুনেই বুঝি-বা একটু উত্তপ্ত থাকে, তার পা দু'টো কিন্তু অনড় হয়ে পড়ে।

অনেক কষ্টে বেচারী সামনের গির্জার পাশে একটা পাথরের ওপর এক সময় এসে বসে পড়ে। সে স্থির করে, যেমন করে হোক্ সেখানে বসেই রাতটা সে কাটিয়ে দেবে।...এমন সময় একজন ভদ্রমহিলা সেই গির্জা থেকে বেরিয়ে আসেন। লোকটির দুরবস্থা দেখে মহিলাটি থমকে দাঁড়ান, তাঁর কেমন মায়া হয়। তিনি তাকে বললেন,—বাছা, তুমি বিশপের বাড়ি যাও। তিনি দয়ালু। ওঁর কাছে তুমি নিশ্চয়ই আশ্রয় পাবে।

মহিলাটির উক্তি শুনে লোকটির মুখে বিদ্রূপের হাসি ফুটে ওঠে। ভাবে, এই নিষ্ঠুর দুনিয়াতে আবার দয়া! দ-য়া।

মহিলাটি কখন চলে গেছেন লোকটি টের পায় নি। আচ্ছন্ন ভাবটা কেটে যেতে সে কিন্তু যন্ত্রচালিতের মত এসে এক সময় সেই বিশপের দোরে কড়া নাড়ল—

বিশপ অতিথিকে সাদর অভ্যর্থনা জানালেন। লোকটি অবাক হয়ে যায় বিশপের মধুর সম্ভাষণে। সে তার কানকে বিশ্বাস করতে চায় না। ভাবে, এও সম্ভব! এমন অদ্ভুত লোকও এ দুনিয়াতে আছে! বিমূঢ় অতিথি এবার হঠাৎ চেঁচিয়ে ওঠে,—আমি কিন্তু উনিশ বছর জেল খেটেছি! কয়েদী-জাহাজে গলায় শেকল-বাঁধা মজুর ছিলাম।—যে জন্য আজ কোথাও একটুকরো রুটি বা আশ্রয় পাইনি...। কয়েদ থেকে আজ ছাড়া পেয়েছি। আমার নাম—জাঁ ভালজাঁ।...।

আরও কি সে বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু বিশপের মুখে অদ্ভুত মধুর হাসি লক্ষ্য করে জাঁ স্তব্ধ হয়ে যায়।

বিশপ তাঁর উত্তেজিত অতিথিকে আবার সাদর অভ্যর্থনা জানালেন, তাকে অভয় দিলেন। তাকে আপ্যায়ন করলেন বিশিষ্ট অতিথির মত। অতিথিকে তিনি নানারকম খাবার পরিপাটী করে রূপোর থালায় খেতে

দিলেন। খাবার টেবিলে রুপোর বাতিদানে মোমবাতি জ্বালাতেও ভুললেন না। অতিথির জন্য আলাদা ঘরে ভাল বিছানারও ব্যবস্থা করা হল—তার আপ্যায়নের কোন ত্রুটিই হল না।

উনিশ বছর যে হতভাগা কঠিন কাঠের ওপর রাত কাটিয়েছে, অত নরম বিছানায় তার ঘুম আসবে কেন? খানিক বাদেই অতিথির তন্দ্রা ছুটে যায়। কত কথাই না আজ জঁা ভালজঁার মনের মধ্যে একসঙ্গে ভিড় করে আসে,—

হাঁ, জঁা-র ঠিক মনে পড়ছে—সে ছিল গরীব চাষীর ছেলে। খুব ছোটবেলাতেই সে বাপ-মাকে হারিয়েছিল। সংসারে তার আপনার বলতে ছিল একমাত্র দুঃখিনী বিধবা দিদি আর তাঁর সাতসাতটা ছেলে-মেয়ে—হতভাগার দল। এদের মুখে অন্ন যোগাবার ভার ছিল তার ওপর।

উনিশ বছর আগে সেদিনটিও ছিল এক শীতের সন্ধ্যা। তার স্পষ্ট মনে পড়ে, খিদের জ্বালায় সেই সাতটা শিশু ছট্‌ফট্‌ করছিল। তাদের চোখগুলো জ্বল্ জ্বল্ করছিল—মনে হচ্ছিল যেন, ঠিকরে বেরিয়ে আসবে। উঃ সে-দৃশ্য কি মর্মান্তিক, বীভৎস! রুটি! একটুকরো রুটির জন্য সে পাগল হয়ে উঠেছিল। সন্ধ্যার অন্ধকারে সে ছুটে বেরিয়ে গিয়েছিল রুটির সন্ধানে। যেমন করে হোক তাকে এক টুকরো রুটি সংগ্রহ করতে হবে।

উন্মাদের মত এক ঘুঁষিতে একটা দোকানের কাঁচের জানালা ভেঙ্গে সে বার করে নিয়েছিল একখানা পাঁউরুটি—মাত্র একখানা। তারপর খিদের আগুনে পোড়া সেই সাতটা শিশুর মুখে সেই রুটিটা তুলে দেবার জন্যে বাড়ীর দিকে সে ছুটেছিল। কিন্তু পারেনি সে তাদের কাছে পৌঁছুতে। মাঝপথে চুরির দায়ে তাকে গ্রেপ্তার করা হল। বিচারে তার অপরাধ গুরুতর বলে জানানো হল। হুকুম হল—কয়েদী জাহাজে পাঁচ বছর জঁা ভালজঁাকে কয়েদ খাটতে হবে। আদালতের 'রায়' শুনে সে মুখের ভাষা হারিয়ে ফেলেছিল। সে-বিচারের বিরুদ্ধে

ঈশ্বরের কাছে সে নালিশও করেছিল,—যেখানে ছিল প্রচুর ক্ষুধার্ত শিশুদের জন্য সেখান থেকে মাত্র একখানা রুটি সে নিয়েছিল, নিজের জন্য নয়। এ কি অপরাধ ? কিন্তু, না, কোন ফল হয়নি।

জঁা-র মনে পড়ে, এই অবিচারে তার মন বিদ্রোহ করেছিল। তাই সে জেল থেকে বার-বার পালাবার চেষ্টা করেছিল। ফলে, মেয়াদ বাড়তে বাড়তে উনিশ বছরে পেঁীছেছিল। আজ এতদিন পরে সেই নরক থেকে সে মুক্তি পেয়েছে। ভাবতে ভাবতে জঁা ভাল্‌জঁা-র মুখ থেকে অট্টহাসি বেরিয়ে আসে। তার মুখ থেকে অস্ফুট ভাবে বেরিয়ে আসে—মুক্তি, মু-ক্তি !

জঁা ভাল্‌জঁা উপলব্ধি করে, ঘুম আর আসবে না। তার অলস চোখের দৃষ্টি ঘরের এদিক ওদিক ঘুরে ফেরে। ঘরের এক কোণে পড়তে সে-দৃষ্টি স্থির হয়ে যায়। ক্রমে তার চোখ দু'টি বিস্ফারিত হয়। মনে প্রশ্ন জাগে, ওগুলো কি ?—হ্যাঁ, ঐ তো সেই রূপোর বাসনগুলো, খোলা অবস্থায় পড়ে আছে। সে মনকে শাসন করে,—না, অসম্ভব, ছিঃ ছিঃ ! কিন্তু লোভ দুর্জয়। শেষ রাত্রের দিকে এক সময় বিছানা ছেড়ে উঠে রূপোর বাসনগুলো একটি পুঁটলিতে বেঁধে জঁা ভাল্‌জঁা চুপি চুপি ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

সকালে তার পিঠে, ঐ পুঁটলির ওপর নজর পড়তে পুলিশের মনে সন্দেহ জাগে। পুলিশ তাকে প্রশ্ন করে,—এত রূপোর বাসন কোথায় পেলে ?

ভয়ে ভয়ে জঁা জানায়, বিশপ তাকে দিয়েছেন।

দিয়েছেন ? তা বটে, দান করবার মত আদর্শ পাত্রই তুমি। আচ্ছা চলো তাঁর কাছে। জঁা-কে সঙ্গে নিয়ে তারা এগিয়ে যায় বিশপের বাড়ির দিকে।

বিশপ পুলিশদের চম্‌কে দিয়ে ধীর শান্ত কণ্ঠে বললেন, আপনারা ভুল করছেন। না, ও মিথ্যা বলেনি। ঐ বাসনগুলো আমিই ওকে গত রাত্রে উপহার দিয়েছি। তারপর জঁা'র দিকে ফিরে বিশপ বললেন,

রূপোর বাতিদান দু'টোও তো আমি তোমাকে দিয়েছিলাম। ও দু'টো তুমি নিয়ে যাও নি কেন? একটু দাঁড়াও, আমি এক্ষুনি এনে দিচ্ছি।

বিশপের উক্তি শুনে পুলিশ তো হতবাক্। জঁা স্তম্ভিত। কেমন যেন পাথরের মূর্তির মত সে দাঁড়িয়ে থাকে। সেখান থেকে পুলিশ যে কখন চলে গেছে সে টের পায়নি। বিশপ তাঁর ঘর থেকে ফিরে এসে কখন থেকে তার কাঁধে হাত রেখে দাঁড়িয়ে আছেন তাও জঁা জানে না। হঠাৎ বিশপের কণ্ঠস্বর কানে যেতে জঁা চম্‌কে ওঠে। মধুর স্নিগ্ধ কণ্ঠে বিশপ জঁাকে বললেন,—এই নাও, বাতিদান দু'টো সঙ্গে রেখো, তোমার চলার পথে সহায় হবে। ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন।

সকলে চলে গেলে বিশপ জঁাকে চুপি চুপি আশীর্বাদ করে বলেন,—যাও ভাই, সৎপথে থেকে পরের উপকার কর। আজ থেকে তোমার আত্মা আমি ঈশ্বরকে সঁপে দিলুম।

বাতিদান দু'টো হাতে নিয়ে অভিভূত জঁা বিশপের অসাধারণ মহত্ত্বের কথা ভাবতে ভাবতে রাস্তায় বেরিয়ে আসে। তন্ময় হয়ে হাঁটতে হাঁটতে সে শহরের শেষ প্রান্তে এসে এক জায়গায় বসে পড়ে।

এমন সময় একটি ছোট্ট ছেলে একটা টাকা হাতে নিয়ে আসছিল সেই দিকে। টাকাটা ওর হাত থেকে গড়িয়ে যায় জঁা-র পায়ের কাছে। জঁা তখন তার ভাবনায় তন্ময়। অন্যমনস্ক ভাবে সে টাকাটাকে পায়ের তলে চেপে ধরে। ছেলেটি টাকাটা তুলে নিতে চেষ্টা করে। জঁা তখন ভিন্ন জগতে। বিরক্ত হয়ে সে ছেলেটিকে একবার ধমক দিতেই সে টাকাটা ফেলে কাঁদতে কাঁদতে ছুটে পালায়।

এ ঘটনার একটু পরে জঁা উঠে পড়ে। এবার টাকাটা নজরে পড়তেই ও চম্‌কে ওঠে। টাকাটা হাতে নিয়ে ছেলেটির উদ্দেশ্যে সে কত চিৎকার করে ডাকল। কোন ফল হল না। জঁা তার অপরাধের গুরুত্ব উপলব্ধি করে এবার বাচ্চা ছেলের মত ডুকরে কেঁদে ওঠে।

ঘুরতে ঘুরতে জঁা একটি বড় শহরে এসে হাজির হয়। সেখানে সে

ছোটখাটো একটা কারখানা খোলে। ক্রমে সেটি বিরাট হয়ে ওঠে। দয়া-মায়ার জন্য জঁা-র সুনাম চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। এমনি ভাবে একদিন ঐ শহরের মেয়র হলেন। তাঁর ইতিহাস সেদিন কেউ জানতে চাইল না। এখানে তিনি ফাদার ম্যাডেলিন বলে সকলের কাছে পরিচিত হলেন।

সকলেই ফাদার ম্যাডেলিনকে শ্রদ্ধা করে। শুধু পুলিশ ইনস্পেক্টর জ্যাভের তাঁকে কেমন সন্দেহের চোখে দেখে।

ইতিমধ্যে স্থানীয় এক দুঃখিনী মা মৃত্যুশয্যায় এই মেয়রের হাতে তার ছোট্ট মেয়ে কসেত্‌কে সঁপে দিয়ে যায়। মেয়েটি মায়ের কাছে ছিল না; সে ছিল মফঃস্বলে এক দুষ্ট প্রকৃতির লোকের জিম্মায়, সে মেয়েটিকে কষ্ট দিত নানা ভাবে।

জঁা স্থির করলেন, এবার তিনি কসেত্‌-এর খোঁজে বেরোবেন। এমন সময় ঘটল এক অভাবনীয় ঘটনা। হঠাৎ সেই পুলিশ ইনস্পেক্টর জ্যাভের এসে মেয়রকে বলল,—আমাকে শাস্তি দিন।—ছোট্ট একটি ছেলের কাছ থেকে একটি টাকা ছিনিয়ে নেবার অপরাধে জঁা ভালজঁার নামে পরোয়ানা বেরিয়েছিল। আমি আপনাকে সন্দেহ করে গ্রেপ্তার করার জন্য সদরে লিখেছিলাম। তাঁরা জানিয়েছেন,—আসল জঁা ভাল্‌জঁা ধরা পড়েছে কাছের ঐ অ্যারাস্‌ শহরে। আগামী কাল তার বিচার হবে।

মেয়র জ্যাভেরের উক্তি শুনে চিন্তিত হলেন, কিন্তু তাকে তিনি কিছু বললেন না, হাসিমুখে বিদায় দিলেন।

ততক্ষণে ওঁর মনে বিক্ষোভের ঝড় বইতে শুরু হয়েছে। সে রাত্রিতে তাঁর ঘুম হল না।……না, এ অসম্ভব। মিথ্যা সন্দেহে নিরীহ লোকটির জীবন নষ্ট হতে পারে না। অথচ নিজের আসল পরিচয় দিলে তাঁর মেয়র থাকা চলবে না। কসেত্‌কে হারাতে হবে—সাজানো বাগান শুকিয়ে যাবে। কিন্তু উপায় কি? তিনি সত্য গোপন করতে পারবেন না। এ অসহ্য—

পরের দিন। যখন নিঃসংশয়ে সেই বৃদ্ধ 'জঁা ভাল্‌জঁা' বলে

সনাক্ত হয়েছে—সে শাস্তি পেতে যাচ্ছে, ঠিক সেই সময় আদালত শুদ্ধ সকলকে স্তম্ভিত করে সর্বজনপ্রিয় মেয়র নিজের সত্য পরিচয় দিয়ে বললেন,—আমিই আসল জঁা ভাল্‌জঁা…।

জঁা-র যাবজ্জীবন জেল হল, কয়েদী জাহাজে আবার সেই নরকে।

কিন্তু কসেত্‌কে বাঁচাতে হবে—মানুষ করতে হবে। ক'দিন বাদে জঁা সেই নরক থেকে একদিন জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে পালালেন। লোকের ধারণা হল সে জলে ডুবে মারা গেছে।

জঁা কসেত্‌কে সেই দুর্বৃত্তের হাত থেকে উদ্ধার করলেন। আট বছরের কসেত্‌কে নিয়ে প্যারিসের উপকণ্ঠে চলে গেলেন জঁা। পঞ্চান্ন বছরের পিতা আর আট বছরের কন্যার জীবন সুখেই কাটছিল। কিন্তু সেখানে ধূমকেতুর মত একদিন সেই পুলিশ ইনস্‌পেক্টর জ্যাভেরকে দেখা গেল। ধরা পড়ার ভয়ে জঁা কন্যাকে নিয়ে বাড়ি ছাড়লেন। তাঁকে পালাতে হবে। পালাতে পালাতে জঁা এক জায়গায় এসে থমকে দাঁড়ালেন—সর্বনাশ, এ যে কাণাগলি ; পথ যে এখানেই শেষ। তাঁর পিছনে শত্রু, জ্যাভেরের দল। কিন্তু তাঁর দৃঢ় সংকল্প : যেমন কোরে হোক্‌ কসেত্‌কে বাঁচাতে হবে। শক্তিমান জঁা মেয়েকে বুকে নিয়ে এক লাফে সামনের উঁচু দেয়াল টপকে কনভেণ্টের বাগানে গিয়ে পড়লেন। পুলিশের দল হতাশ হয়ে ফিরে গেল।

কনভেণ্টের বাগানের মালী তাঁর অনুরাগী ছিল। জঁা সে বাগানে কাজ নিলেন। মেয়েকে পড়াতে লাগলেন স্কুলে। এমনি ভাবে পাঁচ বছর কেটে গেল। কসেত্‌ বড় হয়ে উঠেছে। এখন সে সুন্দরী তরুণী।

এবার মেয়েকে নিয়ে তিনি শহরে উঠে এলেন। একদিন রাস্তায় মারিয়াস নামে একটি ধনী সুদর্শন যুবকের সঙ্গে কসেতের পরিচয় হল। ওরা পরস্পর পরস্পরকে ভালবাসলো।

ক'দিন বাদে প্যারিসে বিপ্লবের আগুন জ্বলে ওঠে। অত্যাচারী সরকারের বিরুদ্ধে জনতার বিদ্রোহ। এই জনতার একটি দলের নেতা হ'ল কসেতের প্রেমিক—মারিয়াস্‌।

জঁা খবর পেলেন মারিয়াসের জীবন বিপন্ন। তিনি ছুটে গেলেন যুদ্ধক্ষেত্রে! সেখানে গিয়ে জঁা দেখলেন, সরকারের গুপ্তচর এবং তাঁর পরমশত্রু জ্যাভের বিদ্রোহীদের হাতে বন্দী। জ্যাভেরকে শাস্তি দেবার ভার তিনি নিজের হাতে চেয়ে নিলেন। জ্যাভেরকে নিয়ে তিনি পাশের একটা গলিতে ঢুকলেন। তারপর তার হাতের দড়ি খুলে দিয়ে বন্দুকের একটি ফাঁকা আওয়াজ করে বললেন,—যাও, তোমাকে মুক্তি দিলাম। ঐ গুপ্তপথ ধরে পালাও।

এবার জঁা ছুটলেন আহত মারিয়াসের সন্ধানে। কসেতের জন্য মারিয়াসকে বাঁচাতেই হবে। তাকে নিয়ে নিরাপদ জায়গায় পৌঁছুতে হলে একমাত্র পথ—রাস্তার নীচের ময়লার নর্দমার মধ্যে ঢুকে পড়া। বলিষ্ঠ হাতে জঁা টেনে উপড়ে ফেললেন সেই নর্দমার মুখের লোহার শিকগুলো। তারপর অচৈতন্য মারিয়াসকে কাঁধে নিয়ে ঢুকে পড়লেন সেই বিরাট নর্দমার মধ্যে। ভীষণ অন্ধকার, পিছল পথ, মাঝে মাঝে পা ঢুকে যায় চোরা বালিতে ; ওদিকে পেছন থেকে শত্রু সৈন্যরা তাড়া করে আসছে। এমনি ভাবে শত্রুর চোখে ধূলো দিয়ে নিরাপদ জায়গা মনে করে সবে জঁা মাথা উঁচু করেছেন অমনি দেখলেন, সামনে দাঁড়িয়ে পুলিশ ইনসপেক্টর জ্যাভের।

দু'জনেই অপ্রস্তুত। নিজেকে সামলে নিয়ে জঁা সহজ ভাবে বললেন,—তুমি আমাকে নিশ্চয়ই গ্রেপ্তার করবে। কিন্তু তার আগে এই আহত ছেলেটিকে ওর বাড়ি পৌঁছে দিতে আমাকে যদি একটু দয়া করে সাহায্য করো! ভয় নেই, আমি পালিয়ে যাবো না। বিশ্বাস করো, আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি।

জ্যাভেরের মনে তখন কর্তব্য এবং মানবতাবোধের তুমুল দ্বন্দ্ব চলছে। খানিক আগে যিনি তার প্রাণ বাঁচিয়েছেন এখন তাঁকে কেমন করে সে বন্দী করবে ? অথচ কর্তব্য কঠিন।

জ্যাভের নীরবে জঁা-কে অনুসরণ করে চলে। জঁা সবে আহত মারিয়াসকে রাখতে বাড়িতে ঢুকেছেন, সেই ফাঁকে জ্যাভের কাছের

নদীটিতে ঝাঁপ দিয়ে তার মনের সব দ্বন্দ্বের অবসান করল। সে মুক্তি পেল।

ক্রমে মারিয়াস আরোগ্য লাভ করে। তারপর কসেতের সঙ্গে একদিন তার বিয়ে হয়।

বিয়ের পর ওদের দু'জনকে জ্যাঁ খুলে বললেন তাঁর আসল পরিচয়। কসেত্ এতদিনে জানল সে তাঁর পালিতা কন্যা। তবুও জ্যাঁ-র প্রতি কসেতের শ্রদ্ধা-ভালবাসা এতটুকু শ্লথ হয় না। কিন্তু ব্যারনের ছেলে মারিয়াসের আত্মমর্যাদা যেন একটু ক্ষুণ্ণ হয়। জ্যাঁ ভালজ্যাঁ-র প্রতি কসেতের অনুরাগের গভীরতাও সে সমর্থন করে না।

কসেত্ এখন বিবাহিতা। স্বামীর ইচ্ছায় বাধ্য হয়ে একসময় তাকে বৃদ্ধ পিতার কাছে আসা বন্ধ করতে হয়। বৃদ্ধ জ্যাঁ-র কিন্তু এদের আচরণে কোন ক্ষোভ হয় না। দুনিয়ার কারুর বিরুদ্ধে তাঁর কোন নালিশ নেই। কসেত্-কে তিনি মানুষ করেছেন, উপযুক্ত পাত্রের হাতে তুলে দিয়েছেন, তার দুঃখী মার শেষ অনুরোধ রক্ষা করতে পেরেছেন—তাতেই জ্যাঁ তৃপ্ত। এখন তিনি একাই থাকেন। ক্রমে মৃত্যু চুপি চুপি তাঁর কাছে এগিয়ে আসে বন্ধুর মত।

একদিন মারিয়াস কি করে জানতে পারে,—নিজের প্রাণ তুচ্ছ করে কেমন করে জ্যাঁ তার অচৈতন্য দেহটা নিয়ে সেই অন্ধকার নর্দমার পথ দিয়ে আলোতে পৌঁছে দিয়েছিলেন। লজ্জায়, অনুশোচনায় মারিয়াসের মন ভরে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে কসেত্‌কে নিয়ে সে ছুটে যায় জ্যাঁ-র বাড়িতে। বৃদ্ধ তখন অন্তিমশয্যায়।

অপ্রত্যাশিত ভাবে ওদের দু'জনকে দেখে জ্যাঁ-র মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। তাঁর দু'চোখ বেয়ে অবিরাম আনন্দাশ্রু বেরিয়ে আসে। শেষ নিঃশ্বাস ফেলতে ফেলতে তিনি ওদের আশীর্বাদ করলেন। শিথিল হাতে রূপোর বাতিদান দু'টো দু'জনের হাতে তুলে দিয়ে অস্ফুট স্বরে জ্যাঁ বললেন,— 'এ দু'টো তোমরা সঙ্গে রেখো, চলার পথ সহজ হবে।'

ছলনার মেলা

[ইংরেজ সাহিত্যিক উইলিয়াম মেকপীস্ থ্যাকারে (William Makepeace Thackeray)-এর **'ভ্যানিটি ফেয়ার'** (Vanity Fair), ১৮৪৭-'৪৮, উপন্যাসটির সংক্ষিপ্তসার।]

বেকী সার্ফ এবং এমিলিয়া সেড্‌লে এক-ই স্কুলে পড়ে। বেকীর রূঢ় আচরণের জন্য মেয়েরা তাকে এড়িয়ে চলে। এমিলিয়ার স্বভাব ছিল ঠিক উল্টো। এই শান্ত নম্র ভদ্র মেয়েটি আপন গুণে আত্মকেন্দ্রিক উগ্র প্রকৃতির বেকীর সঙ্গে কি করে ভাব জমায়। ক্রমে সহপাঠী দু'জনের মধ্যে নিবিড় বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে।

স্কুলের পাঠ শেষ হ'তে, বেকী বান্ধবীর সঙ্গে তাদের বাড়িতে বেড়াতে আসে। তার ক'দিন আগে এমিলিয়ার দাদাও দীর্ঘদিনের ছুটি নিয়ে বাড়ি পৌঁছন। এতদিন বাদে দাদার সঙ্গে দেখা হ'তে এমিলিয়ার আনন্দ ধরে না। সুদর্শন তরুণ যোসেফ-কে দেখে বেকীর কুমারী মনে কৌতুক জাগে।

যোসেফ মিলিটারী-অফিসার হ'লে কি হবে? তিনি বড্ড লাজুক-প্রকৃতির ছিলেন। অপরিচিতা তরুণীদের সান্নিধ্যে যেতে তিনি কুণ্ঠিত হতেন। বিশেষ করে, বেকীর মতো চপলমতি নারীদের ধার কাছ দিয়ে যোসেফ পা মাড়াতেন না।

তাঁর ব্যক্তিগত দোষ-ত্রুটি নিয়ে বেকী মাথা ঘামায় না। ভাবে, এহ বাহ্য। যোসেফের ঐশ্বর্য এবং সামাজিক মর্যাদা বেকীকে আকর্ষণ করে। অনভিজ্ঞ তরুণ শিকারটিকে চতুর বেকী নানা ভাবে প্রলুব্ধ করবার চেষ্টা করে। বিশেষ কোন ফল হয় না। বেকী কিন্তু হাল ছাড়ে না।

ওদিকে সরল এমিলিয়া মনে করে তার বান্ধবীটি হয়তো সত্যিই দাদার প্রেমে পড়েছে! এমিলিয়া মনে মনে খুশি হয়।

দাদা-বান্ধবীর প্রেমে ইন্ধন যোগাতে এমিলিয়া বাইরে একটি পার্টির আয়োজন করে। সেখানে এমিলিয়ার অনুরাগী জর্জ ওস্‌বর্ণ-ও আমন্ত্রিত হয়।

কিন্তু গোড়াতেই যোসেফ অত্যধিক পান করার ফলে এমিলিয়ার সব প্রচেষ্টা পণ্ড হয়। বেকী আশাহত হয়। সম্বিৎ ফিরে আসতে যোসেফ খুব লজ্জিত হন। ক্রমে আত্মগ্লানিতে তাঁর মন ভরে ওঠে।

দু'দিন বাদে ক্ষোভে দুঃখে ছুটি ফুরোবার আগেই যোসেফ তাঁর কর্মস্থল সুদূর ভারতবর্ষে পাড়ি দেন।

যোসেফ চলে যেতে বান্ধবীর বাড়িতে বেকী আর থাকবার আকর্ষণ বোধ করে না। সম্ভ্রান্ত ক্র্যালে পরিবারে দু'টি শিশুর গৃহশিক্ষিকার চাকুরি পেয়ে বেকী চলে যায়।

দু'দিন যেতে বেকী লক্ষ্য করে, সংসারের সর্বময় কর্তা হচ্ছেন স্যার পিট্ ক্র্যালে। কর্তাটি খিট্‌খিটে মেজাজের, তার ওপর কৃপণের একশেষ। তাঁর দাপটে গিন্নী সব সময় সন্ত্রস্ত; সংসারের সবকিছুর ওপর ভদ্র-মহিলার এক অনীহা। নীরবে তিনি দিন কাটান।

বেকী তার ছাত্রী দু'টিকে যা-হোক করে পড়িয়ে চাকুরি বজায় রাখে। কর্তার অনুকম্পা লাভ করবার জন্য সে তৎপর হয়ে ওঠে।

কিছুদিন পরের কথা। স্যার পিটের চির-কুমারী বোন মিস্ ক্র্যালে আসেন। বেকী জানতে পারে, মিস্ ক্র্যালে বিপুল ঐশ্বর্যের মালিক, থাকেন লণ্ডন শহরে। এ সংসারে সকলেই তাঁকে বিশেষ সমীহ করেন, তাঁর কৃপা লাভের জন্য স্বয়ং কর্তা মশাই-ও উদ্‌গ্রীব।

মিস্ ক্র্যালে কিন্তু সংসারের কাউকেই বিশেষ পছন্দ করেন না, স্যার পিটকেও নয়। তাঁর একমাত্র প্রিয়পাত্র—ভাইপো রডন্—সেনা-বিভাগে কাজ করে। ক্যাপ্টেন। স্যার পিটের প্রথম পক্ষের এক-মাত্র সন্তান।

তাঁর আদরের ভাইপোটির ছুটিতে আসার খবর পেয়ে মিস্ ক্র্যালে ছুটে আসেন দেখা করতে। চতুর বেকী সব কিছু তুচ্ছ করে মিস্

ক্র্যালের মনরক্ষা করবার জন্য ব্যস্ত হয়ে ওঠে। অযাচিত ভাবে সে তাঁর সেবাযত্ন করে।

মিস্ ক্র্যালে বেকীর আচরণে মুগ্ধ হন। সে কথা তিনি ব্যক্ত করতেও দ্বিধা করেন না। ততদিনে বেপরোয়া রডন্ এই ছলনাময়ীর ফাঁদে পা বাড়ায়। স্যার পিট্‌-ও তাঁর প্রতি আসক্ত হন। একই সঙ্গে পিতা-পুত্রের অনুরাগের স্পর্শ পেয়ে বেকী আনন্দে উজ্জ্বল হয়। সে কিন্তু নিজেকে কারুর কাছে প্রকাশ করে না—উভয়ের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে থাকে। ফলে, তার প্রতি রডন-এর কৌতূহল আরও বাড়ে।

মিস্ ক্র্যালের লণ্ডনে ফিরে যাবার সময় ঘনিয়ে আসে। তাঁর মনোরঞ্জনের জন্য বেকী আরও তৎপর হয়। বেকীর স্বার্থসিদ্ধি হয়।

ক'দিনের নাম করে মিস্ ক্র্যালে বেকীকে সঙ্গে নিয়ে যান।

লণ্ডনে ফিরে যাবার ক'দিন পরে মিস্ ক্র্যালে অসুস্থ হয়ে পড়েন। বেকীকে বাদ দিয়ে অন্য কারুর হাতের সেবা-যত্নের কথা তিনি ভাবতে পারেন না। সুতরাং নির্ধারিত সময়ে বেকীর আর ফিরে যাওয়া হয় না।

ক্রমে তিনি সম্পূর্ণ ভাবে সুস্থ হয়ে ওঠেন। তবুও বেকীকে তিনি ছাড়তে নারাজ। ভাইকে এটা-সেটা নানা ছুতো দেখান। বেকীর ফিরে যাওয়া হয় না।

তা হোক। বেকীর কিন্তু দিনগুলি সুখেই কাটছিল। সুদর্শন ভক্ত রডন্ তখন তার হাতের মুঠোয়। রডনের প্রেমে বেকীর কোন সন্দেহের অবকাশ থাকে না।

এমন সময় হঠাৎ একদিন লেডী ক্র্যালের মৃত্যু-সংবাদ পৌঁছোয়। তাঁর এই অকাল মৃত্যুতে সকলেই খুব দুঃখিত, মিস্ ক্র্যালেও।

আশ্চর্য, দু'দিন বাদেই স্যার পিট ছুটে আসেন লণ্ডন শহরে। এসেই তিনি বেকীর খোঁজ করেন। বেকী তাঁর চোখে-মুখে কোন শোকের ছায়া লক্ষ্য করে না। বেকী স্তম্ভিত।

হঠাৎ তিনি নতজানু হয়ে বেকীর প্রেম ভিক্ষা করেন। বলেন,

এবার আর কোন বাধা নেই ; তুমি আমাকে বিয়ে করো। আমি তোমাকে মাথায় করে রাখবো।

বেকী স্তব্ধ। তার বিস্ময়ের ঘোর কেটে যেতে বিনীত কণ্ঠে বলে,—আমায় ক্ষমা করুন।

বেকী ভেবে পায় না, এ ছাড়া তাঁকে আর কি-ই বা তার বলবার থাকতে পারে। মাত্র ক'দিন আগে সে চুপি চুপি রডনের গলায় মালা পরিয়েছে।

তাঁর প্রাণের ভাইপোর বিয়ের খবরটি মিস্ ক্র্যালে তখনও জানেন না, বুড়ো বয়সে তাঁর ভাইএর ঐ পাগলামির কথাটিও না। বেপরোয়া রডন কিন্তু আর সময় নষ্ট করতে নারাজ, বেকীকে নিয়ে মধুচন্দ্রিমা যাপন করতে ব্রাইটনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে।

রডনের এই অবাঞ্ছিত আচরণে রাগে দুঃখে ক্ষোভে মিস্ ক্র্যালে একবারে শয্যাশায়ী হয়ে পড়েন। তাঁর বয়সও কম হয়নি। মিস্ ভাবেন, আর দেরী নয়। উকিলকে ডেকে 'উইল' থেকে রডনের নাম তিনি মুছে ফেলেন।

পুত্রের ভাগ্যকে স্যার পিট গোড়া থেকেই ঈর্ষা করতেন। তার বিয়ের কথা কানে পৌঁছুতে তিনি ক্রুদ্ধ হন।

এমিলিয়া এবং জর্জ ওস্‌বর্ণে-র প্রেমের কথাটা উভয় পক্ষই জানে। দু'জনের পিতা-মাতারই এ বিয়েতে সম্মতিও আছে। বিয়েটা এখন একদিন হলেই হয়। কিন্তু নানা কারণে হ'তে দেরি হয়।

হঠাৎ এক ব্যবসায়িক বিপর্যয়ে এমিলিয়ার পিতা সর্বস্বান্ত হন। ফলে, জর্জের পিতা বেঁকে বসেন। তিনি প্রকাশ্যে বলেন, সে কি হয়! একজন ভিখারীর মেয়েকে ঘরের বৌ করে কি করে আনি? পুত্রকে ডেকে তিনি উপদেশ দেন,—তুমি এ বিয়ের সংকল্প ত্যাগ করো, এমিলিয়াকে জানিয়ে দাও।

জর্জ-ও কি কারণে হঠাৎ পিতৃভক্ত হয়ে ওঠে। তাঁর ইচ্ছাপূরণের

জন্য সে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। খবর পেয়ে এমিলিয়ার আর একজন অনুরাগী, ক্যাপ্টেন ডোবিন, ছুটে আসে। অগত্যা তার চাপে পড়ে জর্জকে এমিলিয়ার হাতে হাত মেলাতে হয়।

বিয়ের পর জর্জ এবং এমিলিয়াও যায় ব্রাইটনে 'মধুচন্দ্রিমা'র উদ্দেশ্যে।

ব্রাইটনে পেঁাছে বেকী এবং রডনের সঙ্গে তাদের দেখা হয়। তাদের অসাধারণ ব্যয়বহুল জীবন-যাত্রা লক্ষ্য করে এমিলিয়া দম্পতী অবাক হয়।

এমন সময় নেপোলিয়নের আক্রমণ প্রতিরোধ করবার জন্য রডন এবং ওস্‌বোর্ণকে ব্রাসেল-এ যেতে হয়। এখানে এসে ওসবোর্ণ বেকীর প্রতি অনুরক্ত হয়। ব্যাপারটা এমিলিয়ার নজর এড়ায় না। তবুও এ নিয়ে স্বামীকে সে ঘাঁটায় না—কি জানি বিদেশ-বিভূঁয়ে অশান্তি বাড়তে যদি কোন বিপদ আসে।

আক্রমণের বিপদটা কেটে যেতে—সেনাবিভাগে আনন্দের জোয়ার বয়ে চলে। তাদের নৃত্য উৎসবের যেন আর শেষ নেই। লাস্যময়ী বেকীর লীলায়িত ভাবভঙ্গির প্রসাদে ক'দিনের মধ্যেই সাধারণ সৈনিক থেকে সেনাপতি পর্যন্ত সকলেই তার ভক্ত হয়ে ওঠে। তারা বেকীর সুখ্যাতিতে পঞ্চমুখ। ওসবোর্ণ-ও সে দল থেকে বাদ যায় না। সেদিন রাত্রের অনুষ্ঠানে স্বামীর অবাঞ্ছিত আচরণ আর সহ্য করতে না পেরে বেচারী এমিলিয়া ক্ষুব্ধ হৃদয়ে একাকী বাড়ি ফিরে আসে। উৎসব চলতে থাকে।

হঠাৎ খবর আসে জঙ্গীরাজ নেপোলিয়ন বেলজিয়ামে প্রবেশ করেছেন। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত ফৌজী বাহিনীর ওপর সীমান্তের দিকে এগিয়ে যাবার হুকুম হয়। সেইসঙ্গে সামরিক ও বে-সামরিক পরিবার-বর্গের শিশু ও নারীদের বেলজিয়াম ছেড়ে সত্বর চলে যাবার জন্য অনুরোধ করা হয়। বহু লোক চলে যায়। বেকী এবং এমিলিয়া কিন্তু ঐ শহর ছেড়ে যায় না। তাদের স্বামী দু'জন যুদ্ধক্ষেত্রে চলে যায়।

বেকী ততদিনে বৃহত্তর জগতের বিপুল আনন্দের স্বাদ পেয়েছে, সে ঐ পরিবেশ ছেড়ে অন্য ক্ষেত্রেও যাবার কথা ভাবতে পারে না। এমিলিয়া ভাবে, স্বামীকে বিপদের মুখে ঠেলে পাঠিয়ে নিজের নিরাপত্তার কথা চিন্তা করা অবান্তর।

ক'দিন পর ওয়াটারলুর যুদ্ধ থেকে রডন অক্ষত দেহে-ই ফিরে আসে। ওস্‌বোর্ণ আর ফেরে না। সে মারা যায়।

বেকী এবং রডন ফুর্তি করতে প্যারিস শহরে চলে যায়। অল্প দিনের মধ্যেই বেকীর বহু ভক্ত জুটে যায় সেখানে। তবুও বেকীর সে আনন্দে এক সময় ক্লান্তি আসে। এক সময় রড্‌নকে বেকী একটি সুন্দর শিশু-পুত্র উপহার দেয়। তারপর তারা লণ্ডনে ফিরে আসে।

সাধ্বী এমিলিয়া স্বামীর মৃত্যুতে দারুন মর্মাহত হয়। লণ্ডনে ফিরে এসে গভীর মনস্তাপে তার দিন কাটে। কিছুদিন বাদে ওস্‌বোর্ণের সন্তানের মা হ'তে—সন্তানটির মুখের দিকে তাকিয়ে এমিলিয়া বেঁচে থাকবার সার্থকতা খুঁজে পায়।

রডনের আথিক সঙ্গতি তখন ভাল নয়। তবুও বেকীর ঠাট বজায় রাখতে লণ্ডনে এসে তাকে একটি বিরাট বাড়ি ভাড়া নিতে হয়। খরচ বিস্তর। রডন ভেবে কূল পায় না। কিন্তু তাকে বেশী দিন ভাবতে হলো না। কিছুদিনের মধ্যেই বেকীর অনুগত ভক্তের সংখ্যা বেড়ে যায়। তার সে জ্বলন্ত রূপ-শিখায় সমাজের শীর্ষস্থানীয়রাও পতঙ্গের মতো এসে আছড়ে পড়েন।

বেকীর মুখে ফুটে ওঠে আত্মতৃপ্তির আভাস। সে নিজেকে বঞ্চিত করে না। একই সঙ্গে সে অর্থ এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠা লাভ করে। বেকীকে কেন্দ্র করে চারিদিকে এক চাপা গুঞ্জন ওঠে। বেকী কিন্তু ভ্রূক্ষেপ করে না। অদম্য উৎসাহে এগিয়ে চলে।

রডনের পিতার মৃত্যুর পর তাঁর ঐ বিপুল ঐশ্বর্যের উত্তরাধিকারী হয় তার সৎভাইটি। স্যার পিটের সব সম্পত্তিই তরুণ পিট উত্তরাধিকার সূত্রে অর্জন করে, পিতার লাম্পট্য গুণটিও।

তরুণ পিট্‌ও একসময় বেকীর মধুচক্রে এসে যোগ দেয়। রডনের মনে মাঝে মাঝে দুষ্ট সন্দেহ উঁকি দেয়। সঙ্গে সঙ্গে চতুর পিট্‌ দাদার হাতে পিতার নামে কিছু গুঁজে দিতে রডন আবার ভাবে, তাও কি সম্ভব ? ওযে ছোট ভাই !

বেকীর উচ্ছৃঙ্খলতা চরমে পৌঁছুতে রডনের আর সহ্য হয় না। হাজার হোক বিবাহিত স্ত্রী। রডন তাকে বাধা দেবার চেষ্টা করে। কোন ফল হয় না। তার গর্ভজাত সন্তানটির দিকেও তাকাবার বেকীর অবকাশ হয় না। অগত্যা শিশু-পুত্রটিকে নিয়ে রডন তার দুঃখ ভুলে থাকার চেষ্টা করে।

ওদিকে বেচারী এমিলিয়া শিশু-পুত্রটিকে নিয়ে অক্লান্ত ভাবে জীবন-সংগ্রাম করে। সে মাঝে মাঝে দিশেহারা হয়ে পড়ে। এমিলিয়া জানে, ওস্‌বোর্ণের পিতামাতা কোনদিন তাকে পুত্রবধূ বলে স্বীকার করবেন না, তার নিজের পিতার অবস্থাও শোচনীয়। অসহায় এমিলিয়াকে সন্তানটিকে বাঁচাবার জন্য এক সময় শ্বশুরের দ্বারস্থ হতে হয়। তাকে তুলে দিতে হয় আপনার পরম-ধনটিকে ঐ শ্বশুরের হাতে।

একদিকে শ্রীমতী বেকীর জৌলুস যেমন দিন দিন বেড়ে যাচ্ছিল অন্যদিকে রডন্ ক্রমে আকণ্ঠ ঋণ-সাগরে ডুবছিল। সাহায্যের জন্য সে বেকীর কাছে মিনতি করে। বেকী রূঢ় ভাবে স্বামীকে প্রত্যাখ্যান করে। ঋণের দায়ে রডন্‌কে শেষ পর্যন্ত কারারুদ্ধ হতে হয়। বেকী তবুও নির্লিপ্ত থাকে।

তরুণ পিটের সাহায্যে রডন হঠাৎ একদিন জেল থেকে মুক্তি পায়। বাড়ি ফিরে এসে সে শুধু হতাশ হয়। দেখে, বেকী কোন এক লর্ডের সঙ্গে স্ফূর্তি করছে। তার দিকে সে কেমন এক অদ্ভুত দৃষ্টি হানে।

আত্মগ্লানিতে রডনের মন ভরে ওঠে। স্থির করে, ব্যভিচারিণী ীর সান্নিধ্য থেকে কোথাও দূর দেশে চলে যাবে। যাবার আগে

মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে, জীবনে আর কোনদিন এই অকৃতজ্ঞ বিশ্বাস-ঘাতক নারীর মুখদর্শন করবে না।

কিছুদিন পরের কথা। দাদা যোসেফ সেনাবিভাগ থেকে ফিরে আসতে এমিলিয়ার দুঃখের কিছুটা লাঘব হয়। আরও ক'দিন পরে তার পুরানো প্রেমাস্পদ ক্যাপ্টেন ডোবিনও ফিরে আসে।

ক্যাপ্টেন ডোবিন এমিলিয়াকে ভোলেনি। সে নতুন করে এমিলিয়াকে প্রেম নিবেদন করে। এমিলিয়া তাকে বন্ধু বলে গ্রহণ করে। এামিলিয়ার দুঃখের কাহিনী শুনে ডোবিন বেদনা বোধ করে। সে ছুটে যায় স্বর্গত ওস্‌বোর্ণের পিতার কাছে। তার চেষ্টায় শ্বশুর এবার এমিলিয়াকে পুত্রবধূরূপে গ্রহণ করেন।

কিন্তু শ্বশুরমশাইর তখন জীবনের বেলা ফুরিয়ে গেছে। ক'দিন বাদে তিনি মারা যান। পুত্রবধূটি তাঁর কাছে সবদিক থেকে বঞ্চিতা হলেও, অভাগা নাতিটির জন্য কিছু রেখে যেতে তিনি ভুল করেননি।

ডোবিন এমিলিয়ার দুঃখের সঙ্গী হয়। তার বিক্ষুব্ধ মনে সহানুভূতির প্রলেপ দেবার চেষ্টা করে। তবুও এমিলিয়ার মনের সংশয় দূর হয় না। ডোবিন একটা দূরত্ব রেখেই তার সঙ্গে কথা বলে, মেলা-মেশা করে।

ডোবিনের উদ্যোগে এমিলিয়া, তার ছেলে এবং যোসেফ কিছুদিনের জন্য বিদেশ ভ্রমণে বেরোয়। তার সুখ-সুবিধার প্রতি ডোবিনের সতর্ক-দৃষ্টি সদাজাগ্রত। আশ্চর্য, ক'দিন যেতে না যেতে তার ছেলেটিও ডোবিনকে আপনজন বলেই মনে করে। ক্রমে এমিলিয়ার মনে ডোবিনের প্রেমের প্রতি কোন সন্দেহ থাকে না। এমিলিয়াও এতদিনে ডোবিনের কাছে তার হৃদয় উন্মুক্ত করে। তাদের বিয়েতে আর কোন বাধা থাকে না।

ঘুরতে ঘুরতে তারা একসময় জার্মানীতে গিয়ে পৌঁছয়। সেখানে বেকীর সঙ্গে তাদের দেখা হ'তে সৌজন্যের খাতিরেই এমিলিয়া

তার সঙ্গে কথা বলে। ডোবিনও। যোসেফ কিন্তু বেকীর প্রতি কৌতূহলী হয়।

বেকী তখন এক সহৃদয় ভদ্রলোকের আশ্রিতা, তাঁর কৃপার প্রার্থিনী। তা সত্ত্বেও অকৃতদার যোসেফকে দেখে ছলনাময়ীর মাথায় কূটবুদ্ধি খেলে যায়।

গোড়া থেকেই ডোবিন কিন্তু বেকীকে সুনজরে দেখেনি। মায়াবিনীর আওতা থেকে দূরে থাকবার জন্যে যোসেফকে সে সতর্ক করে দেয়। এমিলিয়াও দাদাকে ঐ একই অনুরোধ করে।

কিন্তু ততদিনে অনভিজ্ঞ যোসেফ ছলনাময়ী বেকীর ফাঁদে পা বাড়িয়ে দিয়েছে। বেকী জানে, এই তার জীবনের শেষ খেলা—যোসেফ-ই হবে তার বাঁচার শেষ অবলম্বন। সে তাই তাকে অক্টোপাসের মতো আঁকড়ে ধরে।

রডনের সঙ্গে বেকীর তখনও বিবাহবিচ্ছেদ হয়নি। তা না হলেও যোসেফের সঙ্গে স্বামী-স্ত্রীর মতো থাকতে কোন বাধা থাকে না। বোন-ভগ্নীপতির সব বাধা-নিষেধ অগ্রাহ্য করে বেকীকে সঙ্গে নিয়ে যোসেফ এক সময় কোথায় চলে যায়। সেখানে গিয়ে বেকীর নামে সে একটি মোটা টাকার জীবন-বীমা করে।

ক'মাস বাদে যোসেফের বাড়িতে খবর আসে—যোসেফ মারা গেছে। সকলে স্তম্ভিত হয়ে পড়ে। তার মৃত্যুর রহস্য কিন্তু কেউ উদ্ধার করতে পারে না।

বেকী কিন্তু আর দেশে ফিরে আসে না. মুক্ত হস্তে দান-খয়রাত করে। কিছুদিনের মধ্যে তার বদান্যতা এবং সহৃদয়তার খ্যাতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে।

ডেভিড কপারফিল্ড

[ইংরেজী সাহিত্যের দিক্‌পাল চার্লস ডিকেন্স (Charles Dickens)-এর **'ডেভিড কপারফিল্ড'** (David Copperfield) উপন্যাসের কাহিনী।]

ক্রমে ক্রমে সব কিছুই কালের অতলে তলিয়ে যায়। থাকে শুধু স্মৃতিটুকু। কিন্তু তাই-ই বা কতটুকু থাকে?

ডেভিড কপারফিল্ড-এর শৈশবের দু'টি ছবি স্পষ্ট মনে পড়ে—একটি তার মা-র মধুর স্মৃতি, অপরটি তাদের কদাকার পরিচারিকা পেগটি'র।

উত্তর কালে ডেভিড শুনেছে, জন্মের ছ'মাস আগেই তার পিতা স্বর্গত হন। সাফোক জেলার ব্লাণ্ডারস্টোন গাঁয়ে তার জন্ম। হাঁ, তার জন্মের সময় তার বাবার খুড়িমা—মিস্ বেট্‌সিও নাকি উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু সে ভূমিষ্ঠ হতে তিনি আশাহত হয়ে ঐ রাত্রেই রাগ করে চলে যান। তাঁর আশা ছিল—একটি খুকী হবে এবং তিনি তাকে প্রতিপালন করবেন। সেই ঠাকুমা আর কোনদিন তাদের বাড়িতে পা মাড়ান নি।

পেগটি শুধু তাদের বিশ্বস্ত ঝি-ই ছিল না, তার সঙ্গিনীও। ডেভিডের বন্ধু, খেলার সাথী—কি না। তাদের সংসার বলতে—ডেভিড, তার মা ক্লারা এবং পেগটি। তিনটি অভিন্নহৃদয়। সন্ধ্যা হতে তারা একসঙ্গে বসে গল্প করতো। ডেভিড তার মা এবং পেগটিকে ছাড়া দুনিয়ার আর কাউকে চিনতো না; সেই দু'জনের মধ্যেই সীমিত ছিল তার বিশ্ব-দুনিয়া। মা শ্রীমতী ক্লারাও ছিলেন ডেভিড অন্ত প্রাণ।

ডেভিডের আবছা মনে পড়ে, সেদিন সন্ধ্যাবেলা সে পেগটির কাছে বসে গল্প শুনছিল। হঠাৎ লক্ষ্য করে,—সদরে একজন অপরিচিত ভদ্রলোকের সঙ্গে দাঁড়িয়ে তার মা কথা বলছেন। ডেভিডের কিন্তু ভাল লাগে নি।

ক্রমে ঐ ভদ্রলোকের আনাগোনা বেড়ে যায়। মিস্টার মার্ডস্টোন। মাস্টার ডেভি'র কিন্তু গোড়া থেকেই ভদ্রলোকটিকে অপছন্দ। মুখ ফুটে মা-র কাছে প্রতিবাদ করতে তার কেমন দ্বিধা হয়। মাকে আর বলা হয় না। গোপন অসন্তোষটি তার মনে চাপা থাকে।

ডেভিড-এর মনে পড়ে, এমন সময় পেগটি একদিন ইয়ারমাউথে তার ভাই'র ওখানে বেড়াবার নাম করে খুব মজার লোভ দেখায়। ডেভিড তাকে শুধু জিজ্ঞাসা করেছিল,—মা যেতে দেবেন? তাকে ছেড়ে তিনি একলা কি করে থাকবেন?

পেগটি কি উত্তর দিয়েছিল ডেভিড-এর মনে নেই। তবে তার দু'দিন বাদে পেগটির সঙ্গে সে তার ভাই'র বাড়িতে গেছল। দিন পনেরো সমুদ্র-তীরে তাদের সেই অদ্ভুত সুন্দর জাহাজ-বাড়িটিতে কাটিয়ে ভাইপো হ্যাম এবং ছোট্ট ভাইঝি এমিলি'র সঙ্গে হুটোপুটি করে, কখনও বা এমিলির সঙ্গে নুড়ি কুড়িয়ে সে-দিনগুলি ডেভিড-এর খুব ভাল লেগেছিল। হাঁ, শৈশবের ঐ স্মৃতিটিও ডেভিড-এর মনে অম্লান হয়ে আছে।

ইয়ারমাউথ থেকে ফিরে ডেভিড তার মাকে সদরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে না। আধা হাসি-কান্নার মধ্যে সে বাড়ির ভেতরে ঢুকে মা-কে খোঁজে। পায় না। লক্ষ্য করে চারিদিকে কেমন একটা গুমোট থমথমে ভাব। কাঁদো-কাঁদো হ'য়ে পেগটির কাছে মা'র সন্ধান করে...।

উপরে গিয়ে দেখে, মা ম্লান মুখে আপন মনে সেলাই করছেন—অপর দিকে বসে মিঃ মার্ডস্টোন, যেন এক সতর্ক প্রহরী। ডেভিকে দেখে তার মা আরও আড়ষ্ট হন। ভয়ে ভয়ে উঠে তিনি নীরবে তাকে চুমু খেতে যান। পেছন থেকে রুক্ষ কণ্ঠে মার্ডস্টোন গর্জন করে ওঠেন,—হুঁস রেখো, ক্লারা। ডেভিড স্তম্ভিত। অভিমানী বালক আর দাঁড়ায় না। এক ফাঁকে ছুটে পালায়।

ডেভিড লক্ষ্য করে, তার মার মুখে হাসি নেই, সুন্দর মুখখানিতে কেমন এক বিষাদের ছায়া। তার সঙ্গে মা সহজ ভাবে কথা বলেন না। সব সময় মা'র মধ্যে কেমন এক সচকিত ভাব। ডেভিড-ও নিজেকে

দূরে দূরে রাখবার চেষ্টা করে। তবুও একদিন ফাঁক পেয়ে আব্‌ছা অন্ধকারে ডেভি'কে তাঁর বুকে চেপে মা তাকে বলেন,—তোমার নতুন বাবাকে ভালবেসো, তাঁর কথা শুনো।

ডেভিডের সংযমের বাঁধ ভেঙ্গে যায়। ডুকরে কেঁদে ওঠে। মা-ও কাঁদেন। হঠাৎ মার্ডস্টোনের কণ্ঠস্বরে শ্রীমতী ক্লারা-র সম্বিৎ ফিরে আসে। তিান সহজ হতে চেষ্টা করেন। ডেভিড বুঝতে পারে, তার মা-র মনেও শান্তি নেই। তাদের তু'জনের মধ্যে বেশী কথাবার্তাও মার্ডস্টোন পছন্দ করেন না।

তু'দিন বাদে মিস্ মার্ডস্টোন ডেভিডদের বাড়িতে এসে জাঁকিয়ে বসেন। বাড়ির কর্ত্রীত্ব তিনি নিজ হাতে তুলে নেন—ভাই-বোনে ষড়যন্ত্র করে সব কিছুর থেকেই শ্রীমতী ক্লারাকে দূরে ঠেলে রাখেন। পুত্র ডেভি'র সঙ্গেও ক্লারা তাঁর ইচ্ছামতো কথা বলবার স্বাধীনতা হারান। বাড়ির আবহাওয়া আরও বিশ্রী হয়। ভাই বোনের রুক্ষ মেজাজের ভয়ে ক্লারা দূরে দূরে থাকেন—যেন এক অপরাধিনী। ক'দিনের মধ্যেই ক্লারা হয়ে ওঠেন বিষাদের এক প্রতিমূর্তি। প্রাণপ্রতিম ডেভি'র সঙ্গে তাঁর দেখা হয় কদাচিৎ। মার্ডস্টোন ভাই-বোনের কঠিন অনুশাসনের ফাঁদে পড়ে শ্রীমতী ক্লারা এবং ডেভি'র প্রাণ অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। ঐ সংসারে—বালক ডেভি যেন অবান্তর, অপাঙ্‌ক্তেয়।

একদিন একটা তুচ্ছ কারণে মার্ডস্টোন ডেভিকে বেত দিয়ে নিষ্ঠুর ভাবে মারলেন। বেচারী পাঁচ াদন অসাড় হয়ে পড়ে থাকে। তবুও তাঁদের শান্তি হয় না। ভাই-বোন ষড়যন্ত্র করে ডেভিকে লণ্ডনের উপকণ্ঠে এক কু-খ্যাত স্কুলে পাঠিয়ে তবে তারা স্বস্তি পান।

স্কুলের নামে কুখ্যাত 'সালেম হাউসে' এসে ডেভিড বন্দী হয়। তারপর শুরু হয় মাস্টার ক্রীক্‌ল-এর নিষ্ঠুর অত্যাচার—তাঁর হাতে অকারণ হেনস্তা। ট্রাড্‌লস এবং স্ট্রীয়ারফোর্থ-এর মতো তু'জন

সহৃদয় বন্ধু ডেভিড পেয়েছিল বলে তবু রক্ষা। তারা দু'জন ডেভিড-কে যথাসাধ্য আগলে চলতো।

ছুটিতে বাড়ি ফিরে ডেভিড তার নতুন ছোট্ট ভাইটিকে দেখে। কিন্তু এতদিন পর বাড়ি এসেও সে আবহাওয়ার কোন পরিবর্তন দেখতে পায় না—তেমনি বিষাক্ত। সে স্পষ্ট বুঝতে পারে, তারা ওর মা-কে পীড়ন করে; তাঁর মন সদা শঙ্কিত। এমন কি ডেভির সঙ্গে কথা বলতেও মা-র ভয়—যদি ভাই-বোন অসন্তুষ্ট হন, অপছন্দ করেন!

অকস্মাৎ তার মা-র মৃত্যু হতে ডেভিডের লেখাপড়াও বন্ধ হয়ে যায়। মিঃ মার্ডস্টোন তাকে স্পষ্ট জানিয়ে দেন—তিনি তার লেখাপড়ার জন্য আর খরচ করতে পারবেন না। তাঁর নির্দেশে ডেভিড-কে 'মার্ডস্টোন ও গ্রীনবি'-র মদের দোকানে চাকুরি নিতে হয়। চাকুরি মানে চাকরের কাজ আর কি!

দশ বছর বয়সে ডেভিডকে ঐ অস্বাস্থ্যকর গুদাম ঘরে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কঠোর পরিশ্রম করতে হয়। তবুও যদি বেচারী পেটভরে খেতে পেতো—থাকতো যদি ভবিষ্যতে বড় হবার আশ্বাস! ক্রমে ডেভিড মুষড়ে পড়ে।

এমন সময় সহৃদয় মিঃ মিকোবার-এর সঙ্গে ডেভিডের পরিচয় হয়। মিকোবার নিজে অভাবী লোক, দেনায় ডুবু-ডুবু। তবুও তাঁর সৌজন্যে ডেভিড মিকোবার-এর বাড়িতে আশ্রয় পায়।

ডেভিড মিঃ মিকোবার-এর বাড়িতে আশ্রয় পেয়ে সবে স্বস্তির নিঃশ্বাস নিয়েছে, এমন সময় দেনার দায়ে মিকোবার জেলে বন্দী হন। দুদিন বাদে দেউলে আইনের কৃপায় মুক্তি পেয়ে মিকোবার অন্যত্র চলে যান। ডেভিড স্থির করে, সেও ঐ চাকুরি ছেড়ে পালাবে।

কিন্তু কোথায় যাবে সে? কোথায় পাবে আশ্রয়? কে দেবে তাকে বাঁচবার আশ্বাস? ডেভিড জানে, মিঃ মার্ডস্টোনের কৃপায় বাড়ির দরজা

তার জন্য চিরতরে বন্ধ। সে একেবারেই নিঃস্ব। তা হোক। তবুও তাকে যেমন করে হোক এ নরক থেকে পালাতে হবে। দূরে—মিঃ মার্ডস্টোনের আওতা থেকে অনেক দূরে তাকে যেতে-ই হবে।

হঠাৎ তার সেই অপরিচিতা ঠাকুমা মিস্ বেটসি-র কথা মনে পড়তে ডেভিড লাফিয়ে ওঠে। স্থির করে, সেখানেই সে চলে যাবে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ডেভিড আবার মুষড়ে পড়ে। সে তো তাঁর ঠিকানা জানে না। আর যেতে হলেও তো কিছু অর্থের প্রয়োজন।

ডেভিড শ্রীমতী পেগটির শরণাপন্ন হয়। তার মা'র মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে পেগটিকে ডেভিডের নতুন বাবা তাড়িয়ে দিলেও পেগটি ডেভিডকে ভোলেনি। সঙ্গে সঙ্গে পেগটি মিস্ বেটসি-র ঠিকানা জানায়; শুধু তাই নয়, ঐ সঙ্গে তাকে দশ শিলিঙের একটা নোটও পাঠায়।

ঠাকুমার খোঁজে ডোভার-এর উদ্দেশ্যে ডেভিড যাত্রা করে। কিন্তু যাত্রার আগেই একটা ছোকরা-কুলি তার বাক্স আর ঐ সম্বল দশ শিলিঙের নোটটি নিয়ে কোথায় উধাও হয়ে যায়। তবুও বালক ডেভিড দমে না। স্থির করে, পায়ে হেঁটেই সে পৌঁছুবে, সে পথ যতোই দুর্গম দীর্ঘ হোক না কেন।

চলার পথে পেটের ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য ডেভিড একে একে তার প্রায় সব পোষাক বিক্রী করে। এমনি করে এক সময় ডেভিড ঠাকুমার সুন্দর বাড়িটিতে গিয়ে পৌঁছায়।

ঐ ধূলি-মলিন জীর্ণ বেশে ক্লান্ত দেহে ঠাকুমার সামনে গিয়ে যখন সে নিজের পরিচয় দিলো—তিনি তার চেহারা দেখে মূর্ছা যান আর কি। তবুও তিনি এই অপরিচিত নাতিটিকে দূর করে তাড়িয়ে দেন না। ডেভিডের ছিন্ন জামার কলারটি ধরে তাকে টেনে নিয়ে এসে ঘরের সোফার ওপর শুইয়ে দেন।

ডেভিডের মুখে তার দুঃখের কাহিনী শুনে বৃদ্ধা চিন্তিত হন। কিছুক্ষণ পরে তিনি মিঃ ডিক-কে ডেকে পাঠান।

মিঃ ডিক ছিলেন মিস্ বেট্সি'র দূর সম্পর্কের আত্মীয়, তাঁর

আশ্রিত। ভদ্রলোক একটু পাগলাটে ধরনের হলেও মিস্ বেট্সি সব ব্যাপারে তাঁর পরামর্শ চাইতেন।

মিঃ ডিক আসতে ঠাকুমা তাঁকে প্রশ্ন করেন,—বলুন, এখন ওকে নিয়ে কি করবো?

ডেভিড-এর দিকে তাকিয়ে ভদ্রলোক বলেন,—আমি হ'লে ওকে প্রথমে ভাল করে নাইয়ে দিতুম···।

তারপর ডেভিড-কে ভাল করে স্নান করিয়ে ওকে খাইয়ে বৃদ্ধা আবার মিঃ ডিককে ডেকে পাঠান। বলেন, এবার ওর কাহিনীটি ভাল করে শুনুন। তাঁরা দু'জনেই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ডেভিডকে নানা প্রশ্ন করেন। গল্প বলা শেষ হ'লে ডিক-এর পরামর্শে ডেভিড শুতে যায়।

মিস্ বেট্সির চিঠি পেয়ে মিঃ এবং মিস্ মার্ডস্টোন ছুটে আসেন।

মার্ডস্টোন মিস্ বেট্সিকে জানান,—আমি ডেভিড-কে ফিরিয়ে নিতে এসেছি। সে সম্পূর্ণ আমার শাসনাধীনে থাকবে। সে যদি আমার সঙ্গে যাবার জন্য তৈরী না থাকে—তা হলে এখন থেকে আমার বাড়ির দরজা তার কাছে বন্ধ থাকবে। অবশ্য আপনারটা যে খোলা থাকবে তা আমি ধরে নিচ্ছি।

ঠাকুমা এবার ডেভিডের দিকে ফিরে বলেন,—আর খোকা কি বলে? তুমি যেতে রাজী আছো?

ডেভিড কাতর কণ্ঠে জানালো—'না'।

ঠাকুমা—মিঃ ডিক, এ ছেলেটিকে নিয়ে আমি কি করবো?

মিঃ ডিক— এখুনি ওর জামা প্যাণ্টের মাপ নেওয়া দরকার।

ঠাকুমা এবার ডেভিডকে তাঁর কোলে টেনে নিয়ে মিঃ মার্ডস্টোনের উদ্দেশ্যে দৃঢ়কণ্ঠে বলেন,—আপনাদের যখন ইচ্ছা চলে যেতে পারেন; ছেলেটাকে নিয়ে আমি একবার দেখবো। ওর বিরুদ্ধে আপনার অভিযোগের এক বর্ণও আমি বিশ্বাস করি না। আচ্ছা নমস্কার।

এই অপ্রত্যাশিত ঘটনায় ডেভিড খুশিতে উচ্ছল হয়ে ওঠে। দু'দিন বাদে ঠাকুমার ইচ্ছায় ক্যান্টারবেরীর মতো স্কুলে পড়বারও ডেভিডের সৌভাগ্য হয়। তার থাকবার ব্যবস্থা হয় ঠাকুমার সলিসিটার মিঃ উইক্‌ফিল্ড-এর বাড়িতে। থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থায় ডেভিড খুশি। কিন্তু তার চেয়ে সে বেশি খুশি হয়—মিঃ উইক্‌ফিল্ড-এর ছোট্ট মিষ্টি মেয়ে তার সমবয়সী এ্যাগ্‌নেস্‌-কে বন্ধু হিসাবে পেয়ে।

এ বাড়ির সব কিছুই ডেভিডের ভাল লাগে। ভাল লাগে না শুধু মিঃ উইক্‌ফিল্ড-এর কেরাণী উরিয়া হীপ-কে। কি জানি কেন লোকটিকে তার শয়তান বলে মনে হয়।

সতেরো বছর বয়সে ডেভিড স্কুলের পড়া শেষ করে। ঠাকুমা বলেন,—এবার তুমি একটু বেড়িয়ে এসো; তারপর দু'জনে মিলে স্থির করা যাবে—তুমি এটর্নী বৃত্তি নেবে কি অন্য কিছু!

মনের আনন্দ চেপে ডেভিড জানায়,—তোমার যেমন ইচ্ছা, ঠাকুমা।

ডেভিডের প্রথমেই মনে পড়ে পেগটিকে। সে ইয়ারমাউথের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। কিন্তু পথে তার পুরনো বন্ধু স্ট্রায়ারফোর্ড-এর সঙ্গে দেখা হ'তে, সে এক রকম জোর করেই ডেভিড-কে তাদের বাড়ি নিয়ে যায়। দু'দিন সেখানে কাটিয়ে ডেভিড বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে ইয়ার-মাউথে এসে পৌঁছয়।

ডেভিড জানে, তার বন্ধু একটি মেয়েকে ভালবাসে এবং তার শৈশবের পনেরো-দিনের-খেলার সাথী এমিলিও কার যেন বাগ্‌দত্তা। আশ্চর্য তবুও ওরা দু'জনে পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হয়।

ফিরে এসে উত্তরকালে এটর্নী হবার বাসনা নিয়ে ডেভিড স্পেন্‌লো ও জার্কিন্‌স-এর অফিসে ভর্তি হয়। তার সুখ-সুবিধার জন্য ঠাকুমা নিজে সবকিছুর ব্যবস্থা করেন।

মাস্টার ডেভিড ততদিনে মিঃ ডেভিড কপারফিল্ড হয়েছে। এই নতুন

কাজে যোগ দেবার কিছুদিন পর বান্ধবী এ্যাগ্‌নেস্-এর সঙ্গে তার দেখা হয়। এ্যাগ্‌নেস্ তাকে সহৃদয় বান্ধবীর মতই অনুরোধ করে,—তুমি তোমার বন্ধু স্ট্রীয়ারফোর্ড-এর সঙ্গে অতো মেলামেশা করো না কিন্তু। লোকটা সুবিধের নয়। এ্যাগ্‌নেসের কাছ থেকে ডেভিড জানতে পারে—শয়তান কেরানী উরিয়া হীপ কৌশলে তার বাবার কারবারের অংশীদার হতে চেষ্টা করছে। লোকটাকে এ্যাগ্‌নেস্ কেন জানি ভীষণ ভয় করে। ক্রমে ডেভিড জানতে পারে, শুধু তার পিতার কারবার-কেই শয়তানটা গ্রাস করতে চায় না—এ্যাগ্‌নেসের ওপরও তার লোলুপ দৃষ্টি। ঐ নীচ লোকটার ওপর ঘৃণায় ডেভিডের মন ভরে ওঠে। তবুও ডেভিড উরিয়া হীপের ওপর নজর রাখে।

'স্পেন্‌লো ও জার্কিন্‌স্' কোম্পানীতে কাজ শুরু করবার ক'দিন পরে অফিসের কর্তা মিঃ স্পেন্‌লো একদিন ডেভিড-কে তাঁর বাড়িতে আমন্ত্রণ করেন। সেখানে তাঁর মেয়ে ডোরা-কে দেখা মাত্র ডেভিড আত্মহারা হয়ে সেই সরল সুন্দর মেয়েটিকে ভালবেসে ফেলে। কিছুদিন পর ডোরার জন্মতিথিতে ওরা পরস্পর পরস্পরের কাছে হৃদয় উন্মুক্ত করে; ঐদিন-ই চুপিচুপি তাদের বিয়ের কথাটাও তারা পাকাপাকি করে ফেলে। তারা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়।

কথাটা মিঃ স্পেন্‌লো কিছু না জানলেও, খবরটা তার বান্ধবী এ্যাগ্‌নেস্‌কে জানাতে ডেভিড দ্বিধা করে না।

ঠিক এই সময় ডেভিড জানতে পারে—তার বন্ধু স্ট্রীয়ারফোর্ড এমিলিকে নিয়ে কোথায় উধাও হয়েছে। ডেভিড স্তম্ভিত।

ডেভিডের জন্য আরও আঘাত অপেক্ষা করছিল—

হঠাৎ সে একদিন জানতে পারে, কি এক আকস্মিক বিপর্যয়ে তার ঠাকুমার সব টাকা-কড়ি, বিষয়-সম্পত্তি নষ্ট হয়ে গেছে। ওদিকে মিঃ উইক্‌ফিল্ডের ওপর শয়তান উরিয়া হীপ-এর প্রভাব আরও বেড়ে গেছে এবং সে এখন তাঁর অংশীদার। দু'টোই তার কাছে সর্বনাশা খবর।

ঠাকুমার সর্বনাশের কথা জেনে ডেভিড মর্মাহত হয়। ভাবে, এ সময় তাঁকে সে কি ভাবে সাহায্য করতে পারে!

ডেভিড এটর্ণী-শিক্ষানবিসি থেকে নিজের নামটি কাটিয়ে খুব সামান্য বেতনে ক্যান্টারবেরীর স্কুলের মাস্টার মশাই'র কেরাণী পদে বহাল হয়। কিন্তু সে আর কতটুকু? পার্লামেণ্টের বক্তৃতামালা সর্ট-হ্যাণ্ডে নিয়ে কিছু রোজগারের আশায় ডেভিড প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে সর্ট-হ্যাণ্ডও শেখে। সে পথেও ডেভিড কিছু উপার্জন করে।

ট্র্যাডলস্‌ও ছিল ডেভিডের সেই কু-খ্যাত 'সালেম হাউস'-এর বন্ধু। কিন্তু সে স্ট্রীয়ারফোর্ড-এর মতো খারাপ ছিল না, সে ছিল সজ্জন এবং একজন সহৃদয় বন্ধু। ট্র্যাডলস্ এখন উকিল। বন্ধুর দুঃসময়ে সে এগিয়ে আসে। ডেভিড-কে সে একটি চাকুরি দেয়।

মিঃ স্পেন্‌লো হঠাৎ একদিন হৃদ্‌রোগে মারা যেতে তাঁর কোম্পানীটি উঠে যায়। জানা যায়, মেয়ে ডোরার জন্য তিনি কিছুই রেখে যাননি। ডোরা নিঃস্ব, অসহায় হয়ে পড়ে'

ডেভিড তার মানসী ডোরার জন্য গভীর দুঃখ অনুভব করে। ভাবে, এবার কি করে সে ডোরার দুঃখ দূর করবে—নিজেও যে সে ভাগ্যবিড়ম্বিত।

কিছুদিন বাদে ডেভিড খবরের কাগজে একটি চাকুরি পেয়ে স্বস্তি পায়। রিপোর্টারের কাজ। তখন তার বয়স একুশ। ডেভিড ডোরাকে বিয়ে করে।

ক্রমে ক্রমে ডেভিড উপলব্ধি করে ডোরা নিতান্তই একটি খুকী। তার ছেলেমানুষিতে ডেভিড অবাক হয়। মাঝে মাঝে তার মনে সন্দেহ উঁকি দেয়—কি জানি ডোরা হয়তো কোনদিন-ই পরিণত-বুদ্ধির হবে না। অনভিজ্ঞতার দরুন এই নতুন সংসারটি এক রকম জোড়াতালি দিয়ে চলে। কখনও বা দু'জনের মধ্যে একটু আধটু খিটিমিটিও হয়।

ভাগ্য-নিপীড়িত মিঃ মিকোবার এখন উরিয়া হীপ-এর বিশ্বস্ত

সেক্রেটারী। কারবারের সব কিছুই তাঁর নখদর্পণে। ডেভিড পুরনো বন্ধু মিকোবারের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলে।

আরও কিছুদিন পরের কথা। ডেভিড এবং তাঁর উকিল-বন্ধু মিঃ ট্র্যাডলস্ লক্ষ্য করে মিকোবার যেন অত্যন্ত দুশ্চিন্তাগ্রস্ত—তার কথা-বার্তায় রহস্যের ইঙ্গিত। দু'বন্ধুর মনে হয়, মিকোবার কি যেন গোপন কথা বলতে চায়; না বলতে পারায় তার চোখে-মুখে এক অস্বস্তির ছাপ।

দু' বন্ধু তার মনের কথা জানতে চাইলে মিকোবার তাদের সকলকে 'উইকফিল্ড ও হীপ'-এর অফিসে নির্ধারিত সময়ে উপস্থিত থাকতে অনুরোধ করেন।

মিঃ উইকফিল্ড-এর বাড়িতে সকলে উপস্থিত হয়, মিস্ বেট্সিও। তারপর উরিয়া হীপের সামনে সকলকে অবাক করে মিকোবার জানায়—শঠতা, নীচতা, জাল-জুচ্চুরি সব কিছুর রাজা এই হীপ। উইকফিল্ড-এর বার্ধক্য এবং দুর্বল স্মৃতির সুযোগ নিয়ে তাঁর দস্তখৎ জাল করে শয়তান হীপ উইকফিল্ড-এর সব কিছুই গ্রাস করেছে, তাঁর এই বাড়িটিও, ব্যবসাও।

উপস্থিত সকলে স্তম্ভিত। মিস্ বেট্সি এবার পরিষ্কার বুঝতে পারেন, তাঁর সর্বনাশের মূলেও এই শয়তান।

সবকিছু এমনি ভাবে ফাঁস হয়ে যেতে উরিয়া হীপের যা অবস্থা হয়—তা আর বলে কাজ নেই। এক সময় সব কিছুর মায়া ত্যাগ করে সে দেশান্তরে পালিয়ে বাঁচে।

এরপর ট্র্যাডলস-এর সাহায্যে হীপের কবল থেকে সমস্ত দলিল এবং কাগজপত্র উদ্ধার করা হয়। তারপর মিঃ উইকফিল্ড-এর বিষয়-সম্পত্তি এবং মিস্ বেট্সি'র লগ্নীর টাকার প্রায় সবটাই ফিরে পাওয়া যায়।

মিঃ মিকোবার তার বিবেক-দংশনের জ্বালা থেকে মুক্তি পেয়ে ভাগ্যের সন্ধানে সুদূর অস্ট্রেলিয়ায় পাড়ি দেয়। তার যাবার খরচটা অবশ্য মিস্ বেট্সি-ই দেন।

বিয়ের পর থেকে ডোরা'র শরীর ভাল যাচ্ছিল না। ক্রমে

একেবারেই ভেঙ্গে পড়ে। ডেভিড অবশ্য তার স্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্য চেষ্টার ত্রুটি করে না। কিন্তু কোন ফল হয় না।

কুমারী এ্যাগ্‌নেস্ ডেভিডের শুধু বান্ধবী-ই নয়, সে তার চিরদিনের উপদেষ্টা, সহায় এবং বল-ভরসা। ডোরার অবস্থা আশঙ্কাজনক হ'তে ডেভিডের আকুল আহ্বানে এ্যাগ্‌নেস্ তার বাড়িতে ছুটে আসে। তবুও কিন্তু ডোরা বাঁচে না।

সহৃদয় এ্যাগ্‌নেস্ ডেভিডকে সান্ত্বনা দেয়। তাকে সমবেদনা জানায়। তারপর বান্ধবীর উপদেশে ডেভিড মনটা একটু হাল্কা করবার চেষ্টায় বিদেশ ভ্রমণে বেরোয়।

য়ুরোপের নানা দেশে তিন বছর ঘুরে ডেভিড ফিরে আসে। তবুও তার মনের অশান্তি দূর হয়না।

এ্যাগ্‌নেস্ শুধু ডেভিডের পরম হিতৈষী বান্ধবী ছিল না, সে তার ঠাকুমা'রও বিশেষ প্রিয় ছিল। ঠাকুমা দু'জনের কথা ভেবে মাঝে মাঝে বেদনা বোধ করেন। একদিন তিনি কি ভেবে ডেভিডকে বলেন,—শুনছি এ্যাগ্‌নেস্-এর নাকি শীঘ্রই বিয়ে হচ্ছে।

ডেভিড ভারাক্রান্ত হৃদয়ে গিয়ে বান্ধবাকে 'শুভেচ্ছা' জানাতে এ্যাগ্‌নেসের এতদিনের সংযমের বাঁধ ভেঙ্গে যায়। ডেভিড তার প্রতি এ্যাগ্‌নেসের মনের দুর্বলতা উপলব্ধি করে। গাঢ়কণ্ঠে সে বান্ধবীকে জানায়,—গোড়া থেকে তুমি যদি নিজের দিকে একটু নজর দিতে—তাহলে হয়তো আমি খেয়ালের বশবর্তী হয়ে অন্যকে পছন্দ করতুম না।

এবার ওরা পরস্পর পরস্পরের কাছে হৃদয় উন্মুক্ত করে। পরের দিন তাদের দু'জনের বিয়ে হয়। বিয়ের পর ডেভিড সব বৃত্তি ছেড়ে দিয়ে উপন্যাস লেখায় মন দেয়।

সন্ন্যাস ও সংসার

[ইংরেজ সাহিত্যিক চার্ল্‌স্ রীড্ (Charles Reade)-এর—**'দি ক্লয়স্টার অ্যাণ্ড দি হার্থ'** **(The Cloister and the Hearth),** ১৮৬১, উপন্যাসটির কাহিনী।]

ইলিয়াস্ একজন সাধারণ বণিক্। কাঁচা চামড়া এবং কাটা কাপড়ের ব্যবসা। শিক্ষা-সংস্কৃতির বালাই নেই। সারাদিন সে ব্যবসা নিয়ে ব্যস্ত থাকে। পুত্র জেরার্ড-এর শিক্ষা-দীক্ষার জন্য তার মাথা ঘামাবার সময় কোথায় ?

বালক জেরার্ড আপন মনে বই নিয়ে নাড়াচাড়া করে। ছবির বই'র প্রতি-ই যেন তার আকর্ষণটা একটু বেশী। একবার একটি হাতে পেলে সে আহার নিদ্রা ভুলে যায়।

ঐ বালক বয়সেই সাহিত্য এবং চিত্রকলায় জেরার্ডের মেধার লক্ষণ উকি দেয়। মাঝে মাঝে সে স্থানীয় মঠটিতে বেড়াতে যায়। ক্রমে ভিক্ষুরা চিত্রবিদ্যায় বালকটির অদ্ভুত আগ্রহ লক্ষ্য করে তাকে সস্নেহে সাহায্য করেন।

জেরার্ডের আগ্রহ বাড়ে। অল্প কিছুদিনের মধ্যে বালক জেরার্ড আশাতীত সাফল্য লাভ করে। ভিক্ষুরা খুশি হন। কিন্তু বালকটির মেধার বিকাশের পথে সহৃদয় ভিক্ষুরা তাকে এক সময় আর সাহায্য করতে পারেন না।

ঘটনাচক্রে কিশোর জেরার্ডের সঙ্গে বিখ্যাত চিত্রশিল্পীর বোন প্রখ্যাতা শিল্পী শ্রীমতী মার্গারেতের একদিন পরিচয় হয়। মার্গারেত কিশোর শিল্পীটির মেধায় মুগ্ধ হ'য়ে তাকে সাদরে শিষ্য হিসেবে গ্রহণ করেন।

এতদিনে একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠিত শিল্পীর শিষ্য হ'তে পেরে জেরার্ড খুশিতে উচ্ছল হয়।

দিন যায়। শিল্পী মার্গারেত লক্ষ্য করেন, শিল্পের অনুশীলনে ছাত্রটির যেন ক্লান্তি নেই। জেরার্ডের ঐ নীরব-সাধনায় তিনি খুশি হন। ছাত্রের আশাতীত অগ্রগতি উপলব্ধি করে গুরুর আনন্দ ধরে না।

কিছুদিন পরের কথা। বারগান্‌ডি-র ডিউক এবং হল্যাণ্ডের আর্লের মিলিত উদ্যোগে রোটারডম্‌ শহরে একটি চিত্র-প্রদর্শনী আয়োজিত হয়। সেখানে প্রদর্শিত রসোত্তীর্ণ ছবির জন্য লোভনীয় পুরস্কারের ব্যবস্থাও থাকে।

শ্রীমতী মার্গারেত কিশোর ছাত্রটিকে ঐ প্রতিযোগিতায় যোগ দেবার জন্য উৎসাহ দেন। জেরার্ড দ্বিধা করে। শেষ পর্যন্ত গুরুর নির্দেশে তাকে মনের দ্বিধা-দ্বন্দ্বের বেড়া ডিঙোতে হয়।

রোটারডম্‌ শহরে যাবার পথে জেরার্ডের সঙ্গে বৃদ্ধ পিটার ব্রাণ্ড এবং তাঁর কুমারী কন্যা মার্গারেতের দেখা হয়। পথচলার ক্লান্তি দূর করতে তাঁরা একটি গাছের ছায়ায় বিশ্রাম করছিলেন। এঁদের সঙ্গেই জেরার্ড ঐ শহরে পৌঁছয়।

শিল্পী মার্গারেতের অনুরোধে তাঁর দাদা, সেই বিখ্যাত শিল্পী, আসবার আগে জেরার্ডের হাতে একটি সুন্দর পরিচয়-পত্র দিয়েছিলেন জেরার্ড এবার সেই চিঠিটি নিয়ে বারগান্‌ডি-র ডিউক-এর কন্যা কুমারী ম্যারী-র সঙ্গে দেখা করে।

কিশোর জেরার্ডের মেধার পরিচয় পেয়ে ডিউক-কন্যা মুগ্ধ হন। তিনি তাকে তার পল্লী তারগু-র কাছে কিছু জমি দান করবার আশ্বাস দেন। কিন্তু তার আগে জেরার্ডকে পবিত্র ক্যাথলিক ধর্মে দীক্ষি হতে তিনি অনুরোধ করেন। জেরার্ড সঙ্গে সঙ্গে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে না।

চিত্র প্রদর্শনী থেকে পুরস্কার লাভ করে জেরার্ড নিজের দেশ তারগু পল্লীতে ফিরে আসে। কিন্তু সেই রাস্তায় হঠাৎ-দেখা মার্গারেতকে সে কিছুতেই ভুলতে পারে না। ভুলবে কি করে? প্রথম দর্শনেই

সে যে তাকে গভীর ভাবে ভালবেসে ফেলেছিল। ভাবে, কি করে, কোথায় গেলে তার সঙ্গে দেখা হবে !

হঠাৎ একদিন ঐ অঞ্চলের মেয়রের থেকে সেই বৃদ্ধ পিটার ব্রাণ্ড এবং তাঁর কন্যার সন্ধান জেরার্ড জানতে পারে। জেরার্ড পাশের গাঁয়ে তাদের বাড়িতে যাওয়া-আসা সুরু করে।

ধূর্ত মেয়র কিন্তু জেরার্ডের সেখানে যাওয়া-আসা সহ্য করতে পারে না। একদিন সে জেরার্ডের বিরুদ্ধে তার পিতামাতার কাছে কুৎসিত অভিযোগ করেন। ফলে, তাদের সংসারে অশান্তির ঝড় ওঠে। ইলিয়াস্ পুত্রকে শাসায়—খবরদার, ভবিষ্যতে যদি কোনদিন ঐ ডাইনী মার্গারেতের বাড়ির দিকে পা বাড়াও তোমাকে জেল দেবো। ওকে বিয়ে করার কথা মন থেকে মুছে ফেলো।

বিপদে পড়ে জেরার্ড ছুটে যায় তার গুরু—শিল্পী মার্গারেতের কাছে। সে তাঁর উপদেশ নির্দেশ চায়, প্রার্থনা করে সহৃদয় মার্গারেতের সাহায্য।

মার্গারেত সহানুভূতির সঙ্গে প্রিয় ছাত্রটির দুঃখের কাহিনী শুনলেন। তারপর তাকে চিত্রবিদ্যার ওপর বহু মূল্যবান উপদেশ নির্দেশ দিয়ে পরামর্শ দেন,—এ পোড়া দেশে থেকে তোমার কিছু হবে না। আমি তোমাকে প্রয়োজনীয় টাকা দিচ্ছি, তুমি যত শীঘ্র পারো এ দেশ ছেড়ে ইতালিতে চলে যাও। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, সেখানে তোমার গুণের কদর হবে, তোমার প্রতিভা বিকাশের সুযোগ পাবে। হাঁ, মেয়েটিকে অর্থাৎ তোমার প্রণয়িনীকে সঙ্গে নিতে ভুলো না।

গুরুর আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে জেরার্ড তার প্রণয়িনীকে সব খুলে বলে। ওরা পরস্পর পরস্পরের কাছে বাগ্‌দত্ত হয়। স্থির হয়, দু'দিন বাদে একটি শুভদিন দেখে ওরা বিয়েটা সেরে ফেলবে। তারপর ইতালি-যাত্রার উদ্যোগ করবে।

কিন্তু শয়তান মেয়রের মনে কি করে সন্দেহ জাগে। তার কূট ক্রান্তে জেরার্ড জেলে বন্দী হয়। ফলে, ওদের বিয়ে আর হয় না।

কিন্তু তার বাগ্‌দত্তা মার্গারেত এবং তার বামন ভাই কৌশলে ঐ রাত্রেই তাকে জেল থেকে উদ্ধার করে।

জেল থেকে বেরিয়ে আসবার আগে বামন ভাইটি কি করে কয়েকটি গোপন দলিলও নিয়ে আসে। আসলে শয়তান মেয়র-ই ষড়যন্ত্র করে বিভিন্ন লোকের এই দলিলগুলি হস্তগত করে জেলে লুকিয়ে রেখেছিল। বৃদ্ধ পিটার ব্রাণ্ডের দলিলটিও এর মধ্যে পাওয়া যায়।

জেল থেকে বেরিয়ে অনেক কষ্টে গা ঢাকা দিয়ে তারগু অঞ্চল পেরিয়ে তারা তিন জনে এক সময় মার্গারেতদের পল্লী সেফেনবার্জন-এ এসে পৌঁছায়। মার্গারেতের পিতার দলিলটি রেখে বাকী সবগুলি জেরার্ড সেখানে মাটিতে পুঁতে রাখে।

তারপর জেরার্ডকে তার প্রণয়িনীর কাছ থেকে বিদায় নিতে হয়। সেই রাতের অন্ধকারেই সে একাকী রোম নগরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। বেচারী মার্গারেত আর্দ্র নয়নে তার প্রেমাস্পদের গতি পথে তাকিয়ে থাকে। জেরার্ড অদৃশ্য হ'তে এক মূক বেদনা মার্গারেতকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। খানিক বাদে শুধু একটি চাপা দীর্ঘনিঃশ্বাস তার বুক ভেঙ্গে বেরিয়ে আসে। মার্গারেত সেখানে আর দাঁড়ায় না। ঘরে ফিরে যায়।

কিছুদূর যেতে জেরার্ডের সঙ্গে বার্গাণ্ডীর এক সৈনিকের পরিচয় হয়। ডেনিস। তাদের দু'জনের মধ্যে বন্ধুত্ব গড়ে উঠতে দেরী হয় না। ওরা রাইন নদীর দিকে এগিয়ে যায়। চলার পথে জেরার্ডের বিচিত্র অভিজ্ঞতা হয়। সেই দুঃসাহসিক অভিযান জেরার্ডের কিন্তু মন্দ লাগে না।

ইতিমধ্যে মার্গারেত অসুস্থ হয়ে পড়ে। খবর পেয়ে জেরার্ডের গুরু, শ্রীমতী মার্গারেত ফ্যান আইক, ছুটে আসেন তাকে দেখতে। ওদিকে এই প্রেমিক-যুগলের সৈনিক-বন্ধু মার্টিনের অনুরোধে বারগাণ্ডির ডিউক জেরার্ডের অপরাধ মকুব করে দেন।

শয়তান মেয়রের আক্রোশ কিন্তু যায় না। সে নানা ভাবে জেরার্ড এবং তার প্রণয়িনীকে হেনস্থা করবার চেষ্টা করে।

ডেনিসের মতো একজন হিতৈষী বন্ধু পেয়ে জেরার্ড পথের ক্লান্তি ভুলে যায়। নানা বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে তারা এগিয়ে চলে।

আরও কিছুদূর এগিয়ে যেতে তাদের সঙ্গে বার্গাণ্ডীর এক সেনা-বাহিনীর দেখা হয়। ডেনিস্-কে ঐ বাহিনীর সঙ্গে সীমান্তের দিকে চলে যেতে হয়। জেরার্ড একাকী রোম নগরের উদ্দেশে চলতে শুরু করে।

যুদ্ধক্ষেত্রে আহত হয়ে ডেনিস্ ক'দিন পরে হল্যাণ্ডে ফিরে আসে। সে বন্ধুর সন্ধান করে। পায় না। পাবে কি ক'রে? তখন সে রোমের পথে।

বন্ধুর দেখা না পেলেও ডেনিস্ তার পিতা-মাতার সঙ্গে একবার দেখা করতে ভুল করে না। তারপর ডেনিস্ যায় সেভেনবার্জেন পল্লীগ্রামে বন্ধুর প্রণয়িনীর খোঁজে। সে হতাশ হয়। তাদের সন্ধান কেউ জানে না। ডেনিস্ হন্নে হয়ে হল্যাণ্ডের সর্বত্র খোঁজে। কোন ফল হয় না। তবুও ডেনিস্ হাল ছাড়ে না। খুঁজতে খুঁজতে সে এসে হাজির হয় রোটারড্যাম শহরে। এখানের একটি লণ্ড্রিতে ডেনিস মার্গারেতের দেখা পায়। ডেনিস্ জানতে পারে, জীবিকার জন্য মার্গারেতকে সেখানে ঐ বৃত্তি গ্রহণ করতে হয়েছে। মার্গারেতের দুঃখের কাহিনী শুনে ডেনিস্-এর মন বেদনায় ভরে ওঠে। সে ভেবে পায় না—কি করে তার কষ্টের লাঘব করা সম্ভব। সে চিন্তিত হয়।

পরের দিন ডেনিস্ মার্গারেতকে সঙ্গে নিয়ে ফিরে আসে জেরার্ডের পল্লীগ্রাম—টারগু-তে। তখন ডেনিস্-এর মধ্যস্থতায় জেরার্ডের পিতা-মাতা মার্গারেত-কে তাঁদের ভাবী পুত্রবধূ হিসাবে গ্রহণ করেন।

জেরার্ড-এর দুঃসাহসিক অভিযান তখনও শেষ হয়নি। নানা কাণ্ড করে ফ্রান্স এবং জার্মানী পেরিয়ে একসময় সে ভেনিস-এ পৌঁছয়। সেখান থেকে সে রোম-এর উদ্দেশে সমুদ্র পাড়ি দেয়।

জাহাজটি তরতর করে এগিয়ে যায়। জেরার্ড-এর মনে আনন্দ ধরে না। ভাবে, এবার সে তার স্বপ্ন-রাজ্যে পৌঁছুবে। হঠাৎ প্রবল বেগে ঝড় ওঠে। জাহাজটি বিধ্বস্ত হয়, ডোবে আর কি। যাত্রীদের মধ্যে হাহাকার রব ওঠে। নিজের জীবন তুচ্ছ করে জেরার্ড একজন রোমান মহিলা এবং তাঁর শিশুটির প্রাণ বাঁচায়। ভদ্রমহিলা জেরার্ডকে কৃতজ্ঞতা জানাবার ভাষা খুঁজে পান না। যা-হোক করে যাত্রীরা রোম নগরে পৌঁছয়। আশায় বুক বেঁধে জেরার্ড নগরের একপ্রান্তে আশ্রয় নেয়। দিন যায়। কিন্তু জেরার্ড ক্রমে হতাশ হয়। কোন কাজের সন্ধান মেলে না। একদিন জাহাজের সেই ভদ্রমহিলার সাহায্যে জেরার্ড কিছু কাজ পায়। কিন্তু তেমন উল্লেখযোগ্য নয়।

এমন সময় কপট-মেয়র দুঃখ করে জেরার্ডকে মার্গারেতের মৃত্যুর মিথ্যা সংবাদটি জানায়। হাজার হোক্ ঐ পদটির গুরুত্ব তো আছে। তাই জেরার্ডের সরল মনে কোন সন্দেহ জাগে না। কঠিন হলেও এ-সংবাদটিকে সে সত্য বলেই গ্রহণ করে।

প্রণয়িনীর এই আকস্মিক মৃত্যু-সংবাদে জেরার্ড দারুণ মর্মাহত হয়। মার্গারেত-বিহীন জীবন তার কাছে মনে হয় অর্থহীন। সে আত্মহননের মধ্য দিয়ে সেই জীবন-যন্ত্রণার থেকে মুক্তি খোঁজে। সত্যিসত্যিই একদিন রাতের অন্ধকারে জেরার্ড ইতালির টিবার নদীতে ঝাঁপ দেয়।

জেরার্ড কিন্তু ঈপ্সিত মুক্তি পায় না। কে একজন তাকে সেই নদী থেকে উদ্ধার করে তার সংজ্ঞাহীন দেহটি স্থানীয় ক্যাথলিকদের মঠে নিয়ে যায়। ক্রমে ক্রমে জেরার্ড সুস্থ হয়ে ওঠে। তারপর সে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত হয়। মঠের একজন ভিক্ষু হ'তে তার নতুন নামকরণ হয়——'ব্রাদার ক্লিমেণ্ট'।

তারপর কিছুদিন শিক্ষানবিশ থেকে ব্রাদার ক্লিমেণ্ট বেরোয় ধর্মপ্রচার করতে। নানা দেশ-বিদেশে তাঁকে ঘুরতে হয়।

এমন সময় মার্গারেত জেরার্ড-এর সন্তানের মা হয়। মা হবার কিছুদিন পর লিউক প্যাটারসন নামে এক নবীন যুবক এসে দাঁড়ায় তার

সামনে। মার্গারেতকে সে প্রেমনিবেদন করতে চায়। বলে, সত্যিই আমি তোমাকে খুব ভালবাসি, আমাকে তুমি বিশ্বাস করো।

শান্ত কণ্ঠে মার্গারেত যুবককে বলে,—ভালো কথা। প্রমাণ করতে পারো?

নিশ্চয়ই। যুবকের কণ্ঠে উৎসাহ।

তাহলে, আর দেরী নয়। বেরিয়ে পড়ো। যেমন করে হোক জেরার্ডকে খুঁজে বার করো। যদি পারো—সেটাই হবে একমাত্র প্রমাণ।

লিউক সত্যিই আর দাঁড়ায় না। কিন্তু কি করে সে জেরার্ডকে খুঁজে পাবে? জেরার্ডের সত্তা কবে মুছে গিয়ে তার নবজন্ম হয়েছে—দেহে মনে। ব্রাদার ক্লিমেণ্ট-এর-পরিচয় তারা জানে না, তাঁর জন্মের ইতিকথা তো নয়ই। তবুও লিউকের খোঁজার বিরাম নেই। সে চারিদিকে—দেশ থেকে দেশান্তরে জেরার্ডের সন্ধান করে।

ব্রাদার ক্লিমেণ্ট কিন্তু তখনও মার্গারেতকে ভুলতে পারেন নি। পর্যটনে ঘুরতে ঘুরতে এক সময় তিনি সেভেনবারজেন পল্লীগ্রামে এসে পৌঁছন। চুপি চুপি মার্গারেতের কবর খোঁজেন। পান না। সেখান থেকে তিনি ধর্মপ্রচার করতে রোটরডম্ শহরে যান।

রোটরডম্ ধর্মসভাটিতে বহু লোকের সমাবেশ হয়। কেউ ব্রাদার ক্লিমেণ্ট-এর মধ্যে জেরার্ড-কে দেখে না। মার্গারেতও তাঁকে চিনতে পারে না।

এবার তিনি তাঁর নিজ পল্লী টারগু-তে যান। সেই শয়তান মেয়র-কে তিনি ভোলেননি। একদিন গিয়ে হাজির হলেন মেয়রের বাড়িতে। তখন সে অন্তিম শয্যায়। মেয়র ব্রাদার ক্লিমেণ্টরূপী জেরার্ড-কে চিনতে পারে না। তাঁকে খাতির যত্ন করে বসায়। জেরার্ড আত্মপ্রকাশ করতে মেয়র তাঁর হাত দু'খানি ধরে হাউ-হাউ করে কেঁদে ওঠে। কাতর কণ্ঠে বলে,—সব মিথ্যা কথা। আমি শুধু তোমার সঙ্গে এতদিন ছলনা করেছি—চরম শত্রুতা করেছি। বিশ্বাস

করো, মার্গারেত বেঁচে আছে। আমার সময় হয়ে এলো। তুমি আমাকে ক্ষমা করো। তুমি মহৎ…।

ব্রাদার ক্লিমেণ্ট সেখানে আর দাঁড়ান না। শঠের উক্তি তিনি ঠিক বিশ্বাস করতে পারেন না। দ্বন্দ্ব-বিক্ষুব্ধ হৃদয়ে তিনি বেরিয়ে এসে শহর রোটারডমের উদ্দেশে যাত্রা করেন। মার্গারেত সম্বন্ধে তিনি আর কোন সন্ধান করেন না।

শহরের কোলাহল থেকে অনেক দূরে এক সন্ন্যাসীর নির্জন গুহায় ব্রাদার ক্লিমেণ্ট আশ্রয় নেন। স্থির করেন, জীবনের বাকী দিনগুলি তিনি সেখানেই কাটাবেন। স্বার্থপর, হীন মানুষের মধ্যে গিয়ে তিনি আর মনটাকে ক্লেদাক্ত করবেন না। তাদের কথা ভাবতে ঘৃণায় ব্রাদার ক্লিমেণ্টের মন ভরে ওঠে।

দিন যায়। ক্রমে লোকপরম্পরায় মার্গারেত জেরার্ডের অবস্থিতির কথা জানতে পারে। একদিন সে গিয়ে উপস্থিত হয় ঐ গুহার দ্বারে। সে তার দয়িতকে চিনতে পারে।

ব্রাদার ক্লিমেণ্ট স্থির দৃষ্টিতে মার্গারেতের দিকে তাকিয়ে থাকেন। খানিকবাদে তিনি চিৎকার করে ওঠেন,—না না, এ অসম্ভব। এ তার প্রেতাত্মা। কোন শয়তানের খেলা।

মার্গারেত অসহায় ভাবে তাঁকে বোঝাবার চেষ্টা করে সে মরেনি। সে তাঁর সন্তানের জননী………। কিন্তু কোন ফল হয় না।

পরের দিন মার্গারেত তাদের শিশু পুত্রটিকে সঙ্গে নিয়ে হাজির হয়। আবেগ-জড়ান কণ্ঠে বলে,—এই নাও তোমার জেরার্ড, তোমার আত্মজ। আমাকে না হয় স্বীকার নাই বা করলে! তোমার সন্তানকে গ্রহণ করো।

নিজের পুরনো নাম কানে যেতে এবং শিশুটির দিকে তাকাতে তাঁর সম্বিৎ ফিরে আসে। এবার তিনি তাঁর দৃষ্টি তুলে ধরেন মার্গারেতের চোখের ওপর। বুদ্ধিমতী নারার সে-দৃষ্টির অর্থ বুঝতে

অসুবিধা হয় না। সে নানা যুক্তির অবতারণা করে। ব্রাদার ক্লিমেণ্ট তা অস্বীকার করতে পারেন না।

শেষ পর্যন্ত মার্গারেতের পরামর্শ তাঁকে গ্রহণ করতে হয়। সে দেশ ছেড়ে তাঁরা গৌডা-তে চলে আসেন। গীর্জার কর্তৃপক্ষের সহায়তায় ব্রাদার ক্লিমেণ্ট স্থানীয় গীর্জার যাজক পদটিতে অধিষ্ঠিত হন। ব্যবস্থা অনুযায়ী শ্রীমতী মার্গারেত তার সন্তানটিকে নিয়ে আলাদা একটি কুটিরে থাকে।

ব্রাদার ক্লিমেণ্ট তাঁর নিজের কাজ করেন। মার্গারেত তাঁর কাজে আত্মাহুতি দিয়ে জীবন সার্থক করে। এমনি ভাবে তাঁরা দু'জনে মানুষের সেবায় নিজেদের বিলিয়ে দেন।

দশ বছর বাদে। হঠাৎ একদিন কালব্যাধি প্লেগ এসে মার্গারেতের জীবন-দীপটি নিভিয়ে দেয়। তাঁর জীবন-দেবতাকে এমনি ভাবে হারাতে ব্রাদার ক্লিমেণ্ট বেঁচে থাকার মধ্যে আর কোন সার্থকতা খুঁজে পান না। দু' সপ্তাহ বাদে তিনিও দেহ রাখেন!

ক্রমে ক্রমে তাঁদের পুত্রটি বড় হয়। উত্তরকালে যিনি এরাসম্যাস নামে প্রসিদ্ধ হন—যিনি ষোড়শ শতাব্দীতে মহাপণ্ডিত বলে জগৎ-জোড়া খ্যাতি লাভ করেন।

অনাবাদী জমি

[রুশ সাহিত্যের দিক্‌পাল ইভান্ তুর্গেনেভ্ (Ivan Turgenev)-এর **'ভারজিন্ সয়ল্'** (Virgin Soil), ১৮৭৭, রাজনৈতিক উপন্যাসটির কাহিনী।]

পাঁচতলার ওপর একটি ছোট্ট জীর্ণ অপরিচ্ছন্ন অগোছাল ঘর—

সেই নির্জন ঘরটিতে কুমারী মাশুরিনা একাকী বসে ঘরের মালিক নেঝদানভের জন্য প্রতীক্ষা করছিল। এমন সময় অস্ত্রোতুমভ ব্যস্ত হ'য়ে হাজির হয় সেখানে। সেও আসে নেঝদানভের সঙ্গে জরুরী আলোচনার জন্য।

আগন্তুক মাশুরিনার কাছে অপরিচিত নয়। বহুদিন পর এই অপ্রত্যাশিত মিলনে তাদের মধ্যে কিন্তু কোন ভাবান্তর প্রকাশ পায় না। উভয়ে নীরবে ধূমপান করতে থাকে। তু'জনের মুখে দৃঢ় প্রত্যয়ের ছাপ সুস্পষ্ট।

নীরবতা ভেঙ্গে মাশুরিনা একসময় প্রশ্ন করে, মস্কো থেকে কোন খবর পেয়েছো ?

—হ্যাঁ, দলপতি আমাদের তু'তিন জনকে জরুরী তলব করেছেন। তোমাকেও যেতে হবে।

—নিশ্চয়ই যাবো। কিন্তু টাকা! টাকা কোথায় পাবো ?

খানিকক্ষণ চিন্তা করে মাশুরিনা কতকটা আপন মনেই বলে, ঠিক আছে। টাকাটা নেঝদানভ-ই দেবে।

—আমিও সে-আশা নিয়েই এসেছি। অস্ত্রোতুমভ স্বস্তির নিশ্বাস নেয়।

উভয়েই আবার নীরবে ধূমপান করতে থাকে। এমন সময় একটি খর্বাকার কুৎসিত লোক ঘরটিতে প্রবেশ করে। পকলিন।

লোকটি নিজেকে এদের সহকর্মী বলে জাহির করলেও আসলে পকলিন ছিল তাদের অবাঞ্ছিত।

পকলিন ঘরে ঢুকতে মাশুরিনা এবং অস্ত্রোতুমভ চকিত হয়। তাদের মুখে বিরক্তি আর অবজ্ঞার ছাপ ফুটে ওঠে। পকলিন কিন্তু তা লক্ষ্য করেও দমে না। গায়ে পড়ে তাদের দু'জনের সঙ্গে অবান্তর কথার অবতারণা করে। বিশেষ করে কুমারী মাশুরিনার সঙ্গে সে আলাপ জমাবার ব্যর্থ চেষ্টা করে।

এমন সময় একটি সুদর্শন নবীন যুবক দরজায় এসে থমকে দাঁড়ায়। তার চোখে মুখে বুদ্ধির দীপ্তি। নেঝদানভ। অতিথিদের ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে মাথার টুপিটি এবং হাতের বই ক'খানা ঘরের ভেতরে ছুঁড়ে ফেলে নেঝদানভ বিছানাটির একপ্রান্তে গিয়ে ধপ করে বসে পড়ে। তার সুন্দর মুখখানিতে উদ্বেগের ছায়া।

নেঝদানভের চেহারা লক্ষ্য করে মাশুরিনা এবং অস্ত্রোতুমভ শঙ্কিত হয়। কিন্তু তারা কিছু জিজ্ঞাসা করবার অবকাশ পায় না। পকলিন তার স্বভাবসুলভ ভাবে নেঝদানভকে স্বাগত জানায়,—এসো আমাদের রাশিয়ার হ্যামলেট। বলি, তোমার ব্যাপার কি?

রেগে নেঝদানভ জবাব দেয়,—চুপ করো রাশিয়ার মেফিস্টোফিলিস। তোমার বদরসিকতা সব সময় ভালো লাগে না।

—আচ্ছা আমার অন্যায় হয়েছে। কি হয়েছে খুলে বলো, শুনি।

—হবে আবার কি? যেখানে যাও, যেদিকে তাকাও—কেবল নীচতা, অনাচার আর অত্যাচার।

অস্ত্রোতুমভ দ্বিধাজড়িত কণ্ঠে বলে, তাই বুঝি তুমি এই সেণ্ট পিটার্সবার্গ ছেড়ে বাইরে কোথাও পালাবার চেষ্টা করছো?

—হাঁ, এ শহর ছেড়ে যেতে পারলে হাঁফ ছেড়ে বাঁচি। নেঝদানভের কণ্ঠে বিরক্তির সুর।

মুখ নীচু করেই শান্ত কণ্ঠে মাশুরিনা বলে, এখানকার কাজগুলো আগে শেষ করো তো!

এখানকার আবার কি কাজ?

পকলিন ওদের কথার মাঝখানে আবার নাক গলায়। বলে, সত্যিই কোনো খারাপ খবর পেয়েছো কি?

তড়াক করে বিছানা থেকে নেমে নেঝদানভ উত্তেজিত কণ্ঠে বলে, আরও তুমি কি চাও? দেশের অর্ধেক লোক না খেয়ে শুকিয়ে মরছে। চারিদিকে উৎপীড়ন, শঠতা, বিশ্বাসঘাতকতা। এতেও তোমার মন ভরে না? একটু থেমে নেঝদানভ ক্লান্ত কণ্ঠে জানায়, বেসানভকে ওরা গ্রেপ্তার করেছে।

কথাটা কানে যেতে মাশুরিনা এবং অস্ত্রোডুমভ চমকে ওঠে—

ঘরের সেই অখণ্ড নীরবতা ভেঙ্গে অস্ত্রোডুমভ একসময় দলপতির থেকে সন্ত পাওয়া গোপন চিঠিখানা নেঝদানভের হাতে এগিয়ে দেয়। এক নিঃশ্বাসে চিঠিখানা পড়ে নেঝদানভ গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়। পায়চারি করতে করতে নেঝদানভ কুণ্ঠিত কণ্ঠে জানায়, কিন্তু আমার হাতে যে এখন কিছুই নেই…।

পকলিন সেই প্রয়োজনীয় অর্থ দিয়ে সাহায্য করতে এগিয়ে যায়। তার প্রস্তাব কানে যেতেই নেঝদানভ মারমুখী হয়ে ফিরে দাঁড়ায়। ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলে,—চাইনে। তোমার দান আমি কাউকে নিতেও দেবো না। টাকাটা আমিই জোগাড় করবো। আমার মাসোহারা থেকে আগাম নেবো।

অপমানিত পকলিন পাল্টা জবাব দেয়,—আশ্চর্য, তুমি একজন বিপ্লবী অথচ তোমার মেজাজটা……

তার কথা শেষ হয় না। নেঝদানভ উত্তেজিত কণ্ঠে পকলিনের বক্তব্যটি শেষ করে,—রাজা-রাজড়ার মতো! দয়া করে তোমাকে স্মরণ করিয়ে না দিলেও চলতোঃ আমি একজন জারজ সন্তান। আমার শিরায় আছে এক সম্ভ্রান্ত রাজপুরুষের রক্ত।

নেঝদানভের উক্তি শুনে পকলিন অপ্রস্তুত হয়। মাশুরিনা এবং অস্ত্রোত্নমভ মুখ নীচু করে থাকে। অদ্ভুত রকমের এক মুখভঙ্গী করে পকলিন বলে, শোন কথা!

এমন সময় সৌম্যদর্শন মাঝবয়সী এক সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক এসে হাজির হন দরজার বাইরে। তাঁর চোখে মুখে অকৃত্রিম সৌজন্যের আভাস সুস্পষ্ট। সিপিয়াগিন। তিনি নেঝদানভের খোঁজ করেন।

নেঝদানভ ভদ্রলোকটিকে সাদর অভ্যর্থনা জানায়।

ঘরে ঢুকে নেঝদানভের প্রতি তীক্ষ্ণ নজর পড়তে সিপিয়াগিন যুবকটিকে চিনতে পারেন। একটু ইতস্ততঃ করে কিছুদিন আগে নেঝদানভের সঙ্গে কোন এক থিয়েটারে তাঁর আলাপ হবার কথা তিনি নেঝদানভকে স্মরণ করিয়ে দেন। তারপর তিনি কাগজে নেঝদানভের বিজ্ঞাপনের কথা উল্লেখ করে প্রস্তাব করেন,—

স্কুল ছুটির ক'টা মাস আমার দেশের বাড়ি গিয়ে যদি আট বছরের ছেলেটির পড়ার ভার আপনি নেন তো খুশি হবো।

একটু থেমে সিপিয়াগিন তরল কণ্ঠে বলেন, পল্লী অঞ্চল শুনে ভয় পাবেন না। জায়গাটার জল হাওয়া চমৎকার। বাড়ির সামনে প্রকাণ্ড বাগান—নানা সুগন্ধি ফুলের জটলা। কাছেই নদী। সেখানে আপনার কোন অসুবিধা হবে না। ভাল লাগবে বলেই আমার বিশ্বাস। যেতে আপনার আপত্তি না থাকলে দক্ষিণার দিক থেকে আপত্তিকর হবে না। মাসিক একশত রুবল হিসাবে প্রথম মাসের বেতনটাও আমি অগ্রিম দেবো। অবশ্য আপনার যাওয়া-আসা এবং সেখানে থাকার সব খরচই আমার।

নেঝদানভ হাতে স্বর্গ পায়। তবুও টাকার প্রশ্ন উঠতে সে কুণ্ঠিত হয়। মাথা নীচু করেই জানায়,—আপনার বিশ্বাসের মর্যাদা রক্ষা করতে চেষ্টার ত্রুটি করবো না। তবে, ব্যক্তিগত ভাবে আমি স্বাধীন থাকতে চাই। আপনার ছেলেটিকে শুধু পড়াবো; তার অন্য কোন দায়িত্ব নেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

সহৃদয় সিপিয়াগিন সানন্দে জানান,—তথাস্তু।

সিপিয়াগিন দরজার বাইরে পা বাড়াতে পকলিন ছুটে এসে নেঝদানভকে তার অপ্রত্যাশিত সৌভাগ্যের জন্য অভিনন্দন জানায়। আগন্তুক ভদ্রলোকটির পরিচয় জানায়,—তিনি একজন সমাজের উঁচু স্তম্ভ, ভাবী মন্ত্রী।

পকলিনের কথায় নেঝদানভ কান দেয় না। পকলিনও সেখানে আর দাঁড়ায় না।

নেঝদানভের অন্তরে তখন এক গভীর বিষাদের ছায়া ঘনিয়ে ওঠে। সে নীরবে বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকে। নেঝদানভ উপলব্ধি করে, পরিচিত আবেষ্টন ছেড়ে অজানা নতুন পথে পা বাড়াতে হচ্ছে বলেই হয়ত তার এ উদ্বেগ, আতঙ্ক। ভাবে দুঃখ যাদের নিত্যসঙ্গী, স্বপ্ন যাদের বিলাস হয়ত তাদের মন এমন হওয়াই স্বাভাবিক।

বিষণ্ণ মনে নেঝদানভ চিন্তার জাল বুনে চলছিল। মাশুরিনার পায়ের শব্দে সে চমকে ওঠে।

—এসো, মাশুরিনা। টাকাটা তুমি কাল পাবে। হ্যাঁ, ভাল কথা, কালই আমি এখান থেকে চলে যাচ্ছি।

মাশুরিনা কোন জবাব দেয় না। তার বুক থেকে একটা চাপা দীর্ঘনিশ্বাস বেরিয়ে আসে।

ঘরটিতে একটা অখণ্ড নীরবতা নেমে আসে। সেই নীরবতা ভেঙ্গে মাশুরিনা এক সময় গাঢ় কণ্ঠে বলে,—এলেক্সি···

কিছু বলবে ?

—না না, কিছু না। আমি চললুম···বিদায়।

মাশুরিনা অমনি ভাবে চলে যেতে নেঝদানভ হতভম্ব হয়ে পড়ে। তার মনে সন্দেহ জাগে, দুনিয়াটা হয়তো একেবারে নিষ্ঠুর নয়। কে জানে, খামখেয়ালী মেয়েটি হয়তো তার জন্য একটু মমতা বোধ করে। অদ্ভুত !

* * *

সিপিয়াগিনের পল্লীভবন। নেঝদানভের মনে হয় যেন স্বর্গপুরী। তার ওপর পরিবারের অকৃত্রিম মধুর সৌজন্য। নেঝদানভ মুগ্ধ।

ছাত্রটি মেধাবী। দিন রাত্রের ভেতর মাত্র দু'ঘণ্টা পড়াতে হয়। কি আর পরিশ্রম? অফুরন্ত অবসর। তার ওপর অবাধ স্বাধীনতা। চারিদিকে অপরূপ প্রাকৃতিক শোভা। নেঝদানভের দিনগুলি সুখে কাটে।

চারজন লোক নিয়ে পরিবার। তার ভেতর দু'জন ছিল তরুণী—সিপিয়াগিনের অপূর্ব সুন্দরী স্ত্রী ভেলেনটাইন আর তাঁর ভাগ্নী কুমারী মেরিয়ানা। নারী দু'টির প্রকৃতি ছিল পরস্পর-বিরোধী।

মামী ভেলেনটাইনের মতো মেরিয়ানার অসামান্য রূপের জৌলুস না থাকলেও সে শ্রীহীনা ছিল না। তার শান্ত শ্রীর অন্তরালে ছিল এক অনমনীয় দৃঢ়তা, অকুতোভয়তা,—যা ছিল আপন মহিমায় মহিমান্বিত, আকর্ষণীয়। মেরিয়ানা কিন্তু এ পরিবারে সুখী ছিল না। মামীর সঙ্গে তার মন ও মতের সংঘর্ষ চলত অহরহ।

শ্রীমতী ভেলেনটাইনের যেমন দুর্লভ রূপ ছিল তেমনি সে রূপের জন্য তার গর্বেরও সীমা ছিল না। তার সে রূপের জ্বলন্ত শিখায় পুরুষের দল পতঙ্গের মতো উড়ে এসে পুড়ে মরুক, তাকে দেবী বলে তার পদতলে তারা লুটিয়ে পড়ুক—এ ছিল ভেলেনটাইনের এক অদম্য বিলাস। তার এ অভিলাষ পূর্ণ করতে শ্রীমতী করতো সার্থক প্রেমের অভিনয়। আসলে শ্রীমতী নিজেকে ছাড়া কাউকেই ভালবাসতো না—স্বামী-পুত্রকেও না।

মামীর ধারণা মেরিয়ানার আদর্শ বিদ্রোহ। নারী হয়ে সকল রকম সংস্কার বিসর্জন দিয়ে, সমাজ ও রাষ্ট্রের বন্ধন ছিন্ন করতে সে উদ্যত। মেরিয়ানা ভাবে, মামীর এ অনধিকার চর্চা—তাঁর প্রভুত্বের অসহ্য অহংকার, মনুষ্যত্বের অবমাননা। এ জন্য মেরিয়ানা সংসারে সকলের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শ এড়িয়ে চলতে চেষ্টা করে।

গৃহশিক্ষকটি নবীন যুবক তায় সুদর্শন। সুতরাং তার সুখ-সুবিধার প্রতি শ্রীমতী ভেলেনটাইনের নজরটা প্রখর হ'তে দেরী হয় না। মাঝে মাঝে তার অনুমতি নিয়ে শ্রীমতী ছেলের পড়বার সময় তার পাশে গিয়ে বসেন। মুখে বলেন, ছেলের সঙ্গে তিনিও যদি কিছু শিক্ষা লাভ করতে পারেন। আসলে সে-সময়টা তিনি কেমন অদ্ভুত ভাবে নেঝ-দানভের দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন। নেঝদানভের কাছে সে দৃষ্টি অর্থ হীন।

তখনও নেঝদানভ জানে না, মেরিয়ানা ঐ পরিবারের আত্মীয়া কি আশ্রিতা। পরস্পরের সঙ্গে তেমন আলাপও হয়নি। কিন্তু তার মন বলে তারা দু'জন একই পথের যাত্রী। মেরিয়ানার দৃষ্টিতে নেঝদানভ লক্ষ্য করে বন্ধুত্বের আশ্বাস। মেয়েটি নেঝদানভের মনে কৌতূহল জাগায়। কিন্তু গায়ে প'ড়ে কেউ কারুর সঙ্গে বড় একটা কথা বলে না।

* * *

শেষ বসন্তের অপরাহ্ন। নির্জন বনপথ ধরে নেঝদানভ শূন্যমনে একাকী যাচ্ছিল। হঠাৎ এক ব্যর্থ প্রেমিকের করুণ আর্তনাদ তার কানে ভেসে আসতে নেঝদানভ থমকে দাঁড়ায়—

—কোন দিনই কি তোমার মন পাব না?

নেঝদানভ দেখে অদূরে মেরিয়ানার সঙ্গে এক অপরিচিত যুবক। নেঝদানভের সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় হ'তে মেরিয়ানা লজ্জায় রাঙা হয়ে ওঠে।

নিমেষে মেরিয়ানা এবং যুবকটি বনপথে মিলিয়ে যায়। নেঝদানভ বিস্ময়ের ঘোরেই এক সময় বাড়ির দিকে পা বাড়ায়।

বাড়ি পৌঁছে নেঝদানভ মেরিয়ানার সঙ্গী সেই পুরুষটির সঙ্গে পরিচিত হয়। মার্কেলভ—শ্রীমতী ভেলেনটাইনের অগ্রজ। মার্কেলভকে সমাজতন্ত্রের প্রতি অনুরাগী বলে তার সন্দেহ হয়।

ঐ রাত্রেই নেঝদানভ জানতে পারে, তার অনুমান মিথ্যা নয়।

মার্কেলভ তাদের দলের একজন উগ্রপন্থী। মার্কেলভের আমন্ত্রণে নেঝদানভ তার বাড়িতে যায় দলের কর্মসূচী আলোচনা করতে।

সেই গোপন বৈঠকে মার্কেলভ জানায়, পাশের গাঁয়ের সূতাকলের ম্যানেজার সলোমিন একজন খাঁটি এবং কাজের লোক। তাকে দলে টানা প্রয়োজন, কাজটা যদিও শক্ত। সে দায়িত্বটা মার্কেলভ নেঝ-দানভের কাঁধে চাপিয়ে দেয়।

পরের দিন। নেঝদানভ ছাত্রকে পড়িয়ে নিজের ঘরে যাচ্ছিল। এমন সময় ভেলেনটাইন তার সামনে এসে দাঁড়ায়। তারপর এদিক ওদিক তাকিয়ে কি এক দরকারী কথার অছিলায় নেঝদানভকে পাশের একটি ঘরে নিয়ে যায়।

সুসজ্জিত নির্জন ঘর -- শ্রীমতীর নিজস্ব কক্ষ। নেঝদানভকে সাদরে বসিয়ে নিজেও তার কাছে ঘেঁসে বসে। তার চোখে মুখে সকৌতুক হাসি। তখন তার মুখ মূক হলেও আশ্চর্য-সুন্দর চোখ দু'টি মুখর হয়ে ওঠে। রূপগর্বিতা ছলনাময়ী নারী তার মোহবিহ্বল ইঙ্গিতময় দৃষ্টি তুলে ধরে সুদর্শন তরুণ নেঝদানভের মুখের ওপর।

সৌন্দর্যের পূজারী নেঝদানভ বিহ্বল হয়ে তার রূপসুধা পান করে। মায়াবিনী ভাবে, শিকার তার ফাঁদে পা বাড়িয়েছে। কোমল কণ্ঠে অস্ফুট স্বরে বলে,—কি ভাবছো? ভয় নেই—এদিকে কেউ আসবে না।

তার উক্তি শুনে নেঝদানভ চমকে ওঠে। আত্মগ্লানিতে তার মন ভরে ওঠে। সে উঠে দাঁড়ায়। বলে,—আচ্ছা আমি আসি। তার কণ্ঠে ঘৃণার আভাস। নেঝদানভ তড়িৎ বেগে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

রূপ-গর্বিতা ভেলেনটাইন তার অনিন্দ্যসুন্দর মুখটির ওপর যেন চাবুকের এক প্রচণ্ড ঘা খায়, সহস্র কাঁটায় যেন তার বুকটা ক্ষতবিক্ষত হয়। অপমানের অসহ্য জ্বালায় শ্রীমতী কাতর হয়।

এরপর ঘটনাচক্রে মেরিয়ানার সঙ্গে নেঝদানভের ঘনিষ্ঠতা হয়। সে জানতে পারে, মেয়েটি শুধু তার মত দুঃখীই নয়, তার পথ ও মতে মেরিয়ানা বিশ্বাসী। ফলে, তাদের দু'জনের মধ্যে বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে।

পরস্পরের মধ্যে যে-কোন বিষয় নিয়ে অবাধে আলোচনা চলে। ক্রমে পরস্পর পরস্পরকে গভীর ভাবে ভালবাসে। কিন্তু মুখ ফুটে সেকথা কেউ প্রকাশ করে না—নীরবে উভয়ে উভয়ের কাছে আত্মনিবেদন করে। দুজনে দেশের সেবায় আত্মাহুতি দেবার শপথ নেয়।

দু'জনে গভীর রাত পর্যন্ত দেশের নানা জটিল সমস্যা নিয়ে আলোচনা করে। তাদের সে গোপন আলোচনা ক্ষেত্রে কারুর ভেতর এতটুকুও হৃদয়বৃত্তি প্রকাশ পায় না।

কিন্তু শ্রীমতী ভেলেনটাইনের মনে কুৎসিত সন্দেহ উঁকি দেয়। সে সব সময় তাদের পিছু লেগে থাকে। বিশ্রীভাবে দু'জনকে কটাক্ষ করে। শ্রীমতীর উৎপাতে ঐ পল্লীভবনের জীবন তাদের অসহ্য হয়ে ওঠে।

এমন সময় সলোমিন সে বাড়িতে ব্যবসায়িক আলোচনার জন্য একদিন আমন্ত্রিত হয়। গভীর রাত্রি পর্যন্ত নেঝদানভ এবং মেরিয়ানা সলোমিনের সঙ্গে নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা করে—তাদের ব্যক্তিগত দুঃখের কাহিনীও বাদ যায় না।

দু'জনের দুঃখের কথা শুনে সলোমিন তাদের সমবেদনা জানায়। দু'জনকে তার কারখানায় থাকবার জন্য সে তাদের সাদর অভ্যর্থনা জানায়। সলোমিন বলে,—সেখানে অনেক লোকের ভীড়ে আপনাদের স্বচ্ছন্দে লুকিয়ে থাকা সম্ভব নয়। যদি ইচ্ছা করেন, সেখানে আপনাদের বিয়েটাও সেরে নিতে পারেন। ব্যবস্থা আমি করে দেবো।

নেঝদানভ এবং মেরিয়ানা হাতে স্বর্গ পায়—

দু'দিন পর নেঝদানভ এবং মেরিয়ানা গভীর রাত্রে বাড়ি ছেড়ে গিয়ে হাজির হয় সলোমিনের কারখানায়। সেখানে পৌঁছে দু'জনে প্রাণভরে মুক্তির নিঃশ্বাস নেয়।

কারখানার নিভৃত প্রান্তে এসে দু'জনে আত্মগোপন ক'রে ভাই বোনের মতো বাস করে। সলোমিনের সৌজন্যে বিপ্লবী যুগলের স্বাচ্ছন্দ্যের ত্রুটি হয় না।

কারখানা থেকে নেঝদানভ ছদ্মবেশে বেরিয়ে যায় চাষী-মজদুর

ভাইদের ভেতর বিপ্লবের আগুন জ্বালিয়ে দিতে। কিন্তু ক'দিন যেতে সে উপলব্ধি করে, কাজটি অত সহজ নয়, এদের বোঝাবার মতো ভাষা সে খুঁজে পায় না।

নেঝদানভ তাদের সঙ্গে মিশতে চেষ্টা করে কিন্তু প্রতি পদক্ষেপে সে শুধু হোঁচট খায়। জনসাধারণের সঙ্গে অবাধে মিশবার জন্য ভোদকা পান করতেও নেঝদানভ দ্বিধা করে না। কিন্তু ফল হয় উল্টো। সে তাতে অসুস্থ হয়।

ক্রমে নেঝদানভ ব্যর্থতায় ভেঙ্গে পড়ে। তার মনে হয়, মেরিয়ানাও তার থেকে যেন দূরে সরে যাচ্ছে। তার প্রেমের প্রতিও তার আস্থা কমে আসে। নেঝদানভ মনে করে, সে মেরিয়ানার অযোগ্য—এ দুনিয়ায় সে অপাঙ্‌ক্তেয়। কখনও বা সলোমিনকে তার প্রতিদ্বন্দ্বী বলে নেঝদানভের মনে হয়। তবুও নেঝদানভ যন্ত্রচালিতের মতো বিপ্লবের সাধনা করতে ব্যর্থ চেষ্টা করে!

মেরিয়ানা কিন্তু তার আদর্শের প্রতি আস্থা হারায় না—নেঝদানভের প্রতিও নয়।

আরও কিছুদিন পরের কথা। নেঝদানভের মনে তখন দ্বিধা আর সংশয়ের ঝড় বইছে। সেদিন ভোরের দিকে সবে তার চোখে একটু তন্দ্রা এসেছে। এমন সময় খবর আসে, পাশের গাঁয়ে চাষী ভাইরা খাজনা দেবে না ব'লে বিদ্রোহ করেছে। জানা গেছে, ঐ বিদ্রোহের পেছনে মার্কেলভের উস্কানি আছে।

ব্যাপারটা সঠিক জানবার জন্য নেঝদানভ ছুটে যায় বিক্ষুব্ধ অঞ্চলের দিকে। কিন্তু ঘটনাস্থলে সে পৌঁছুতে পারে না। মাঝ পথে কতগুলি মাতাল মজদুরের পাল্লায় পড়ে নেঝদানভকে উৎকট ভোদ্‌কা আকণ্ঠ পান করতে হয়। ফলে, সে চেতনা হারায়। চতুর সঙ্গীটি কোন রকমে তার অচৈতন্য দেহটাকে তাদের কবল থেকে মুক্ত করে কারখানায় নিয়ে আসে।

জ্ঞান ফিরতে মেরিয়ানার মুখ থেকে নেঝদানভ জানতে পারে,—

মার্কেলভ যেসব চাষীদের নিজের জমি ছেড়ে দিয়ে উপদেশ-উৎসাহ দিয়ে গড়ে তোলবার চেষ্টা করেছিল—তারাই বিশ্বাসঘাতকতা করে মার্কেলভকে পুলিসের হাতে তুলে দিয়েছে। মার্কেলভ জেলে বন্দী। তাদের এখানে অবস্থিতিটাও পুলিশের অ-জানা নেই। পুলিশ যে কোন মুহূর্তে তাদের সন্ধানে কারখানায় আসতে পারে।

সব শুনে নেঝদানভের চোখ দু'টি হঠাৎ জ্বলে ওঠে। কি যেন সে বলবার চেষ্টা করে। কিন্তু ক্ষণিকের মধ্যে তার চোখ দু'টি আবার ম্লান হয়ে যায়। নেঝদানভ অসহায় শিশুর মতো মেরিয়ানার কোলে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করে।

মেরিয়ানা স্তম্ভিত। প্রশ্ন করে,—একি, অমন করছো কেন? এ পথ দুর্গম। ভয় পেলে চলবে কেন?

বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে নেঝদানভ জানায়,—ভয় আমি পাইনি। তার কণ্ঠে দৃঢ়তা। বলে, আমার খুব কষ্ট হচ্ছে···। বিশ্বাস করো, শুধু তোমার জন্য···কেন তুমি আমার মতো এমন একটি অযোগ্য লোকের সঙ্গে তোমার অদৃষ্ট জড়িয়ে ফেললে, মেরিয়ানা?

মেরিয়ানা প্রতিবাদ করে। তাকে শান্ত করবার সে চেষ্টা করে। কিন্তু নেঝদানভের মন মানে না। সে উদাস দৃষ্টি মেলে উন্মুক্ত বাতায়নের দিকে তাকিয়ে থাকে। রাত হ'তে মেরিয়ানা কখন উঠে চলে যায় নেঝদানভ টের পায় না।

রাত্রি গভীর হয়, কিন্তু নেঝদানভের চোখে ঘুম আসে না। সে শুতেও যায় না। একে একে সে তার সব গোপন কাগজপত্র পুড়িয়ে ফেলে, পুড়িয়ে ফেলে তার স্বলিখিত প্রিয় কবিতার খাতাটিও। পোড়ায় না—শুধু মার্কেলভের কাছ থেকে উপহার হিসাবে পাওয়া মেরিয়ানার সুন্দর ফটোটি।

তারপর অস্থির ভাবে ঘরময় পায়চারি করতে করতে একসময় সলোমিন এবং মেরিয়ানার উদ্দেশ্যে এক দীর্ঘ চিঠি লিখতে বসে। চিঠি নয়—তার ব্যর্থ-জীবনের মর্মবেদনার করুণ ব্যঞ্জনা। উভয়কে জানায় অকুণ্ঠ

কৃতজ্ঞতা, ব্যর্থতার জন্য তাদের দু'জনের কাছে প্রার্থনা করে ক্ষমা। সবশেষে একান্ত ভাবে অনুরোধ জানায়, তারা দুজনে যেন বিয়ে করে, সুখী হতে।

ভোরের আলো ফুটে উঠতে নেঝদানভ তার অবসন্ন শিথিল দেহটি এলিয়ে দেয় কোচটির ওপর। তার সে চেহারা দেখে মেরিয়ানা চমকে ওঠে।

মেরিয়ানা তার কাছে গিয়ে বসতে নেঝদানভ ক্লান্ত কণ্ঠে বলে,—একদিন যে লক্ষ্য সামনে রেখে আমরা দু'জনে এক হতে পেরেছিলাম, যার আকর্ষণে আমাদের অমনি ভাবে পালিয়ে আসতেও দ্বিধা হয়নি—সে ব্রত আমার কাছে মিথ্যা হয়ে গেছে। তাতে আমার বিশ্বাস নেই। কিন্তু আমি জানি, সে আদর্শে এখনও তোমার অটুট বিশ্বাস আছে। সুতরাং এখন আমাদের মিলনের যোগসূত্র আর কোথায় থাকে, বলো?

মেরিয়ানা কি যেন বলতে যাচ্ছিল। এমন সময় সলোমিন উদ্‌ভ্রান্তের মতো কোথা থেকে ছুটে এসে জানায়,—পুলিশ আসছে। এখান থেকে সকলকে এক্ষুনি পালাতে হবে। হাতে আর আধঘণ্টা সময়। তাই পালাবার আগে তোমাদের বিয়েটা সেরে নিতে হবে। আয়োজন প্রস্তুত। পুরোহিত অপেক্ষা করছেন। তোমরা দু'জনে তৈরী হয়ে নাও!

এক নিঃশ্বাসে কথা কটি বলে সলোমিন সেখানে আর দাঁড়ায় না—তড়িৎবেগে বেরিয়ে যায়।

সলোমিনের কথা শুনে নেঝদানভের কিন্তু এতটুকুও ভাবান্তর হয় না। অপলক দৃষ্টিতে সে মেরিয়ানার মুখের পানে তাকিয়ে থাকে।

মেরিয়ানা নেঝদানভের সে অদ্ভুত চাউনির তাৎপর্য বুঝতে পারে না। স্মিতমুখে বলে,—অমন ভাবে দেখছো কি? আমি এক্ষুনি তৈরী হ'য়ে ফিরছি। ততক্ষণে দয়া করে তুমি এই বিশ্রী পোশাকটা পাল্টে ফেলো।

মেরিয়ানা আর দাঁড়ায় না। নেঝদানভ তার গতিপথে করুণভাবে

তাকিয়ে থাকে। সম্বিৎ ফিরে আসতে নেঝদানভ তাড়াতাড়ি তার শেষ লিখিত চিঠি আর মেরিয়ানার ফটোটি সযত্নে টেবিলের ওপর রেখে দেয়। তারপর কি একটা পকেটে পুরে মুখ বাড়িয়ে দুয়ারের বাইরে এদিক ওদিক দেখে নেয়। না, কাউকে তার নজরে পড়ে না।

নেঝদানভ ভাবে, না আর দেরী নয়। সে ঘর থেকে বেরিয়ে পায়ে পায়ে সামনের বাগানটির দিকে এগিয়ে যায়—

* * *

আপেল গাছটির নীচে আচমকা পিস্তলের গুলির শব্দ শুনে সকলে ছুটে গিয়ে দেখে, নেঝদানভের রক্তাক্ত দেহটি মাটিতে পড়ে আছে। তখনও তার প্রাণের স্পন্দন স্তব্ধ হয়নি।

ধরাধরি করে নেঝদানভের সংজ্ঞাহীন দেহটি সন্তর্পণে তুলে এনে তারই শয্যায় শুইয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু বেচারীকে আর বেশী সময় কষ্ট পেতে হয় না। অল্প সময়ের মধ্যে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে সে জীবন-যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পায়।

মেরিয়ানা বোবা কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে। এ অঘটনের জন্য সে নিজেকেই অপরাধী মনে করে।

সলোমিন স্তম্ভিত, হতবাক্। সে অন্তর্বেদনায় ম্রিয়মাণ। ম্লান মুখে স্থির দৃষ্টিতে সে তাকিয়ে থাকে হতভাগ্য বন্ধুর নিশ্চল করুণ মুখটির দিকে।

হঠাৎ বন্ধুর শেষ মিনতির কথা মনে পড়তে সলোমিন চঞ্চল হয়ে ওঠে। শান্ত কণ্ঠে বলে,—মেরিয়ানা, সময় আর নেই; পুরোহিত এখনও অপেক্ষা করছেন। বন্ধুর শেষ অনুরোধ রক্ষা করে আমাদের এক্ষুনি পালাতে হবে।

মেরিয়ানা নেঝদানভের মৃত্যুশীতল ললাটে কম্পিত ওষ্ঠাধর স্পর্শ করে সলোমিনের হাত ধরে নীরবে বেরিয়ে যায়।

কারামাজভ্ ভ্রাতৃগণ

[রুশ সাহিত্যের মহারথী ফিওদর মিখাইলোভিচ্ দস্তোয়েভ্স্কি (Fydor M Dostoevosky)-এর 'দি ব্রাদার্স কারামাজভ্' (The Brothers Karamazov), ১৮৭৯-'৮০, উপন্যাসটির কাহিনী।]

রাশিয়ার স্কোটোপ্রিগনয়েভস্কি শহরে কারামাজভ পরিবারের বাস। তাদের সংসার বলতে, পিতা ফিওদর এবং তাঁর তিন ছেলে। দমিত্রি ভাইদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ, প্রথম পক্ষের; ইভান এবং আলেক্সি বা আলেয়োশা দু'জন সহোদর, দ্বিতীয় পক্ষের ছেলে। আর ছিল ফিওদরের পুরানো বিশ্বস্ত ভৃত্য—গ্রেগরী।

একদিন গ্রেগরী এ পরিবারে একটি অনাথ শিশুকে নিয়ে আসে। ঐ শিশুটিকে জন্ম দিয়েই পথবাসিনী মা মারা যায়। লোকের বিশ্বাস, শিশুটি আসলে ফিওদরের অবৈধ সন্তান। ক্রমে ফিওদরের ছেলেরা সে-কথা জানতে পারে।

এই অবৈধ ছেলে—স্মেরদিয়াকভ একটু বড় হ'তে এ বাড়িতে চাকরের কাজ করে। ছেলেটি মাঝে মাঝে মৃগী রোগ এবং মানসিক যাতনায় কাতর হয়। সে বিকৃতবুদ্ধিও।

ফিওদর ছিলেন ব্যবসায়ী। কারবার ভালই। বয়স হয়েছে কিন্তু তাঁর দৌরাত্ম্য এবং লাম্পট্যের কাছে উচ্ছৃঙ্খল নবীন যুবকরাও হার মানে। তার ওপর তিনি ছিলেন আত্মসুখী এবং কৃপণের একশেষ। দ্বিতীয় স্ত্রীর মৃত্যুর পর সুখের সন্ধানে ফিওদর-এর বাইরেই বেশী সময় কাটে।

ছেলেরা স্বস্তি পায়। ক্রমে তারা বড় হয়। তিন ভাই তিন ধারায় মানুষ হয়—

বড় ভাই দমিত্রি সেনাবিভাগের অফিসার। বাপের মতোই সে উচ্ছৃঙ্খল, ইন্দ্রিয়াসক্ত। কিন্তু বাপের মতো সে কপট নয়। নিজের

চরিত্রের কথা গোপন করতে সে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হয় না। তবে নিজের ইচ্ছাপূরণের পথে বাধা পেলে দ্‌মিত্রি ক্ষেপে যায়। তার আশা, বড় হ'য়ে একদিন সে-ই বাপের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবে।

দ্বিতীয় ভাই ইভান্ মস্কো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করা। উচ্চশিক্ষিত, বুদ্ধিবাদী। সে কোন কিছুতেই আস্থা রাখে না—না ধর্মে, না ঈশ্বরে। সে নিহিলিস্ট। অভাবের তাড়নায় কিছুদিন ইভান্ শিক্ষকতা করেছিল। কখনও বা সামান্য সাহিত্য-চর্চা করে। যুক্তি-তর্কে সে সব কিছু উড়িয়ে দিতে চায়।

তৃতীয় অ্যালেক্সেই—ধার্মিক এবং স্বপ্নবিলাসী। সংসারের ঝামেলা এড়িয়ে চলে, সকলের প্রতি তার মমতা, ভালবাসা। স্থানীয় খ্রীষ্টীয় মঠের অধ্যক্ষ জোসিমার শিষ্যত্ব নিয়ে সে তাই সন্ন্যাসী হয়।

তিন ভাই রুশিয়ার তিন যুগের ইঙ্গিত: বড় ভাই দ্‌মিত্রি বুদ্ধি এবং সংস্কৃতি বর্জিত প্রাচীন রুশিয়াকে স্মরণ করিয়ে দেয়। দ্বিতীয় ভাই ইভান্ নতুন শিক্ষিত সংস্কারবাদী নাস্তিক রুশিয়ার সমসাময়িক জীবনের যেন প্রতিনিধি। আর, তৃতীয় ভাই অ্যালেক্সেইর চরিত্র মানবতা বোধে স্নিগ্ধোজ্জ্বল, হয়তো ভাবী রুশিয়ার আভাস।

ক্রমে ভাইয়েরা সাবালক হয়। বিষয়-আশয়ের একটা সুস্পষ্ট ব্যবস্থা হওয়া দরকার। তাই ফিওদর ছেলেদের সঙ্গে একদিন ফাদার জোসিমা'র সামনে তাঁর মঠে মিলিত হবার সিদ্ধান্ত জানান।

ঘরোয়া ভাবেই আলোচনা শুরু হয়। কিন্তু বৃদ্ধ পিতার অভব্য কথাবার্তা এবং বেপরোয়া আচরণে পুত্ররা লজ্জিত হয়।

গরজ তারই বেশি হওয়ার কথা কিন্তু তখনও দ্‌মিত্রির দেখা নেই। সকলেই জানে, দ্‌মিত্রি ধনী কর্ণেলের কন্যা কাতেরিনাকে বিয়ে করবে বলে তাকে কথা দিয়েছে—কিন্তু গ্রুশেঙ্কা নামে শহরের সেই কুখ্যাত মেয়েমানুষটিকে নিয়ে দ্‌মিত্রি তবুও মাতামাতি করে। তার সঙ্গে স্ফূর্তি করতে সে টাকা ওড়ায় যদৃচ্ছা, তাই তার টাকার বিশেষ প্রয়োজন। বাপের কাছ থেকে টাকাটা আর আদায় না করলেই নয়।

দেরি হলেও দ্‌মিত্রি এক সময় হন্নে হয়ে আসে। একটু বাদেই স্পষ্ট বোঝা যায়—টাকাটা পিতার কাছ থেকে সহজে পাওয়া যাবে না।

আসলে ঐ গ্রুশেঙ্কার ওপর ফিওদরেরও লোলুপ নজর ছিল। ছেলের প্রেমের সৌভাগ্যে তার ঈর্ষাও সেজন্য কম ছিল না। তার ওপর বুড়ো ছিল হাড় কৃপণ। ফিওদর টাকার আশ্বাস দেওয়া দূরে থাক্, দ্‌মিত্রিকে টাকা ওড়াবার অভিযোগ করে যাচ্ছেতাই বলে গালমন্দ শুরু করে।

তার ইচ্ছা পূরণে বাধা পেতে দ্‌মিত্রিও ক্ষেপে যায়। সেও বাপকে অপমান করতে ছাড়ে না। ঝগড়ার মধ্যে সে মুক্তকণ্ঠে বলতে দ্বিধা করে না,—এমন বাপের মৃত্যুতেই শান্তি।

এমন সময় বৃদ্ধ জোসিমা হঠাৎ মুখ থুবড়ে পড়ে যান তাদের সামনে। সকলে চঞ্চল হয়ে ওঠে। ভাবে, কেন? একি দ্‌মিত্রির কোন ভাবী অমঙ্গলের ইঙ্গিত!

পরিস্থিতি জটিল হয়—

ইভান বড় ভাই'র বাগ্‌দত্তা কাতেরিনাকে ভালবাসে; কাতেরিনাও তাকে ভালবাসে। ইভানের ইচ্ছা, দ্‌মিত্রি গ্রুশেঙ্কাকে বিয়ে করুক। কিন্তু বাপই কি ঐ স্ত্রীলোকটিকে হাতছাড়া করতে রাজী হবে? তাছাড়া সকলেই জানে, ইভান্‌ও অনেক সময় বলেছে—অমন বাপের মৃত্যুতে সকলেরই মঙ্গল।

অগত্যা দ্‌মিত্রি ছোটভাই আলেয়োশার শরণাপন্ন হয়। নিজের উচ্ছৃঙ্খলতার কথা সে তাকে সবই খুলে বলেঃ স্ফূর্তিতে টাকা খরচ হয়েছে বিস্তর—তিন হাজারেরও বেশী রুব্‌ল। এতো টাকা সে কোথায় পাবে? ধার নিয়েছিল কাতেরিনার কাছ থেকে। কিছুদিন থেকে কাতেরিনা ঐ টাকা ফেরত দেবার জন্য অবিরত চাপ দিচ্ছে। তার একান্ত অনুরোধ, আলেয়োশা দ্‌মিত্রির হয়ে বাপের থেকে টাকাটা চেয়ে নিক না!

সব শুনে দরদী আলেয়োশা সত্যিসত্যিই বাপের কাছে যায়। বাপকে

অনেক অনুরোধ-উপরোধ করলে। কোন ফল হ'ল না। বুড়ো নরম হবার পাত্রই নয়!

দ্মিত্রির শেষ আশার আলোটুকু নিভে যেতে টাকার খোঁজে পাগলের মতো এদিক ওদিক ঘুরে মরে। তারপর সে আবার আসে ঐ বাপেরই কাছে শেষ চেষ্টা করতে। বুড়ো খেঁকিয়ে ওঠে। হতাশ হয়ে দ্মিত্রি বাপকে দৃঢ় কণ্ঠে শাসায়,—তোমাকে খুন করে এর প্রতিশোধ নেবো।

কোনখান থেকে টাকা না পেয়ে দ্মিত্রি ছুটে যায় গ্রুশেঙ্কার বাড়িতে। তার সাক্ষাৎ না পেয়ে দ্মিত্রির মাথায় খুন চাপে। ভাবে, নিশ্চয়ই সে গেছে বুড়ো বাপের সঙ্গে স্ফূর্তি ওড়াতে।

উন্মাদের মতো দ্মিত্রি ছুটে আসে বাপের সন্ধানে। সে হতাশ হয়—বাড়িতে বুড়ো নেই, প্রণয়িনী গ্রুশেঙ্কাও নেই। বিভ্রান্ত দ্মিত্রি ভাবে, এবার কি করা যায়! হঠাৎ তার নজরে পড়ে, কে একজন আসছে—গ্রেগরি, না শয়তান বুড়ো বাপ?

ভাল করে লক্ষ্য করে দেখবার তখন তার মনের অবস্থা নয়। লোকটি কাছে এগিয়ে আসতে এক ঘায়ে তাকে ভূতলশায়ী করে দ্মিত্রি ঝড়ের বেগে বেরিয়ে যায়।

কিন্তু যাবেই বা কোথায়? দ্মিত্রি আবার যায় গ্রুশেঙ্কার খোঁজে। সে শোনে, প্রণয়িনী অন্য কে একজনের সঙ্গে শহর ছেড়ে কোথায় গেছে।

দ্মিত্রি আবার ছোটে। সে গ্রুশেঙ্কার সন্ধান পায় একটা হোটেলে। কিন্তু অদ্ভুত এই ছলনাময়ী। গ্রুশেঙ্কা দ্মিত্রিকে সহজ ভাবেই সাদর অভ্যর্থনা জানায়।

মদে ও নৃত্যে স্ফূর্তির জোয়ার বয়ে যায় গ্রুশেঙ্কাকে নিয়ে সেই কুখ্যাত হোটেলে। হঠাৎ সেখানে পুলিশ হানা দিতে তাদের রসভঙ্গ হয়।

পুলিশ অভিযোগ তোলে, দ্মিত্রি বৃদ্ধ পিতাকে খুন করে এখানে

এসে গা ঢাকা দিয়েছে। জানা যায়, পুরনো চাকর গ্রেগরিও ঐ দিন খুন হয়েছে।

পুলিশের সন্দেহ মিথ্যা কি করে হবে? রক্তের দাগ দ্‌মিত্রি'র পোষাক-পরিচ্ছদে ভর্তি। দ্‌মিত্রি হতবাক্। তার বলবার-ই বা কি থাকতে পারে! সে গ্রেপ্তার হয়। দ্‌মিত্রি জেলে বন্দী হয়। তার অপরাধ তো প্রায় প্রমাণিত। শেষ বিচারের অপেক্ষা মাত্র!

বিচারের আগের দিন চাকর স্মেরদিয়াকভ্-এর সঙ্গে ইভানের দেখা হয়। বিকৃতবুদ্ধি স্মেরদিয়াকভ্ তখন দেহমনে ভগ্ন। সে স্বীকার করে, বৃদ্ধ ফিওদরকে সে-ই হত্যা করেছে। আর এই হত্যার জন্য সে ইভানকেই দায়ী করে। কতবার সে ইভানের মুখে শুনেছে, পিতার মৃত্যুতে সকলের মঙ্গল।

অসম্ভব কিছু নয়। হয়তো ইভানের সেই উক্তি দুর্বলচিত্ত স্মেরদিয়াকভ-এর মনে দারুন প্রতিক্রিয়া জাগায়। তার তাতেই এই বিপত্তি। দুর্ঘটনাটি এমন ভাবে ঘটেছে—কেউ তাকে সন্দেহ করেনি। বিকৃতবুদ্ধি হলেও তার কৃতকর্মের গুরুত্ব উপলব্ধি করে স্মেরদিয়াকভ তখন ধুঁকছে। ফিওদরকে হত্যা করে তার বাক্স থেকে যে টাকাটা সে চুরি করেছিল সেটা পুরোপুরি স্মেরদিয়াকভ্ তুলে দেয় ইভানের হাতে। তারপর ঐ রাত্রেই সে ফাঁসি দিয়ে আত্মহত্যা করে। স্মেরদিয়াকভ্ জীবন-যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পায়।

স্মেরদিয়াকভ অনুশোচনার জ্বালা থেকে নিষ্কৃতি পায়। কিন্তু যাবার বেলায় সে ইভানের মনে সে-আগুন জ্বালিয়ে দিয়ে যায়।

আত্মগ্লানিতে ইভানের মন ভরে ওঠে। নিশিদিন সে অন্তরের জ্বালায় জ্বলে পুড়ে মরে। ক্রমে ইভান উপলব্ধি করে, আসলে সেই একমাত্র অপরাধী। সে ভেবে পায় না, কে করবে তার বিচার? বিকারগ্রস্তের মতো সে স্বপ্ন দেখে, প্রলাপ বকে।

দ্‌মিত্রির বিচার শুরু হয়। নিরপরাধ দাদাকে বাঁচাবার জন্য ইভান আদালতে হাজির হয়। সে লক্ষ্য করে, কাতেরিনাও সেখানে উপস্থিত।

সব প্রমাণপত্র দ্‌মিত্রির প্রতিকূলে। আশ্চর্য, কাতেরিনাও প্রতিশোধ নিতে ছাড়ে না। তার কাছে লেখা দ্‌মিত্রির একখানা মারাত্মক চিঠি কাতেরিনা আদালতে পেশ করে। তাতে পরিষ্কার লেখা : বাপকে হত্যা করে শীঘ্রই তোমার টাকা শোধ করে দেবো। এর পর আর কোন প্রমাণের প্রয়োজন থাকে না। তবুও ইভান সমস্ত রহস্যটি খুলে বলে, স্মেরদিয়াকভের চুরিকরা টাকাটাও জমা দেয়। কিন্তু কিছুতেই কোন ফল হয় না। দ্‌মিত্রির সপক্ষে কোন যুক্তি টেকে না।

দ্‌মিত্রি দোষী বলে প্রমাণিত হয়। তাকে সিবিরিয়ায় নির্বাসন-দণ্ড দেওয়া হয়।

এবার কাতেরিনার অনুশোচনার পালা। ভাবে, ব্যক্তিগত চিঠিটা ওভাবে পেশ না করলেই হতো। সে নিজেকে ধিক্কার দেয় বারবার। অনুতপ্ত কাতেরিনা কারাগারে বন্দী অসুস্থ দ্‌মিত্রির কাছে নীরবে মাথা নীচু করে গিয়ে দাঁড়ায়—সে ক্ষমাপ্রার্থিনী।

ছোট ভাই আলেয়োশা আর্ত এবং সত্যের জন্য তার জীবন উৎসর্গ করেছে। দুঃখীর দুঃখে তার প্রাণ কাঁদে। সে স্থির করে, নির্বাসিত দাদার সঙ্গে সেও যাবে সিবিরিয়ায়, তার কষ্ট লাঘব করতে। গুরুর উপদেশ তার মনে পড়ে,—'বিচার করতে চেয়ো না। বিনম্র প্রেমের মতো শক্তি আর কিছুতে নেই। বল প্রয়োগের চেয়ে প্রেমের বলে কাজ হয় বেশী। সক্রিয় সেই প্রেমই দিতে পারে মানুষকে বিশ্বাস।'

মাদাম বোভারী

[ফরাসী সাহিত্যিক গুস্তভ ফ্লোবেয়ার (Gustave Flaubert)-এর **'মাদাম বোভারী'** (Madame Bovary), ১৮৫৭, উপন্যাসটির কাহিনী।]

চার্লস বোভারী চিকিৎসা-বিদ্যার ছাত্র। মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে। পড়ার খরচ বিস্তর ; ঐ খরচ চালানো চার্লস-এর পিতার পক্ষে এক সময় দায় হয়ে পড়ে। অথচ ভাবীকালে ডাক্তার হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়া—চার্লস-এর জীবনের একমাত্র স্বপ্ন।

পয়সার অভাবে চার্লসের লেখাপড়া বন্ধ হয় আর কি! এমন সময় তার মনে পড়ে প্রচুর পয়সার মালিক শ্রীমতী হেলোসী'র কথা।

শ্রীমতী হেলোসী'র বয়সটার প্রতি চার্লস ভ্রূক্ষেপ করে না। লেখাপড়ার স্বার্থে সে একদিন শ্রীমতীর কাছে বিয়ের প্রস্তাব করে। সুদর্শন তরুণের এ প্রস্তাব প্রায়-বিগত-যৌবনা নারী লুফে নেয়। তাদের বিয়ে হয়।

বিয়ের পর ক্রমে দু'জনের মনের ও মতের মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হয়। প্রাণোচ্ছল নবীন যুবকের সঙ্গে শ্রীমতী হেলোসী নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারে না। প্রতি পদক্ষেপে হোঁচট খায়। তাই শ্রীমতীর ঘ্যান ঘ্যান প্যান প্যান-এর মাত্রাও বেড়ে চলে। চার্লস গায়ে মাখে না। সে নীরবে আপন সাধনার পথে এগিয়ে যায়।

আরও কিছুদিন পরে। চার্লস ডাক্তার হয়। এখন ব্যবসার খাতিরে তাকে নানা জায়গায় যেতে হয়। শ্রীমতী কিন্তু চার্লসের এ গতিবিধি পছন্দ করে না, সুনজরেও দেখে না।

ক্রমে শ্রীমতী চার্লস-কে অকারণ বিশ্রী সন্দেহ করতে শুরু করে। ফলে, বেচারী চার্লস-এর জীবন অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। কিন্তু ডাক্তারের ঘরে বসে থাকলে চলবে কেন? চার্লস রোগীদের সেবার মধ্যে শান্তি খোঁজে।

দিন যায়। একদিন অসুস্থ রল্ট-এর বাড়িতে ডাঃ চার্লস-এর ডাক পড়ে। রোগীর বুদ্ধিদীপ্ত সুন্দরী চঞ্চল মেয়েটি চার্লসের মনে কৌতূহল জাগায়। সে ভেবে পায় না, চাষার ঘরে এমন একটি পদ্মকলি কি করে সম্ভব হলো।

ক্রমে চার্লস জানতে পারে, রল্ট চাষী হলেও তার একমাত্র কন্যা এমা-র সুশিক্ষার জন্য সে খরচ করতে দ্বিধা করেনি। সে এমা-কে প্যারিসের কোন একটি ভাল কনভেণ্টে পড়িয়েছে। মেয়েটি পড়াশুনাও কম করেনি—হয়তো একটু কল্পনাবিলাসিনী। তা হোক।

রোগীর বাড়িতে আসতে যেতে ক্রমে ক্রমে চার্লস এমা-র মাধুর্যে মুগ্ধ হয়। দূর থেকে দু'জনের মধ্যে শুধু দৃষ্টিবিনিময় হয়। তখনও তাদের ভেতর আলাপ পরিচয় হয়নি।

কথাটা কিন্তু চাপা থাকে না। খবরটা এক সময় তার সন্দেহবাতিক-গ্রস্ত স্ত্রী-র কানেও পেঁৗছয়। সঙ্গে সঙ্গে সুন্দরী তরুণী এমা-কে কেন্দ্র করে ঘরে তুমুল কাণ্ড শুরু হয়।

রাগটা একটু পড়তে শ্রীমতী কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে। অবশেষে তার একান্ত অনুরোধে চার্লসকে কথা দিতে হয়—সে আর এমা-দের বাড়ি যাবে না। নারী-মন তাতেও শান্ত হতে চায় না। সন্দেহের বীজ যে তার রক্তের সঙ্গে মেশানো।

এ ঘটনার ক'দিন পরে চার্লসের পিতা জানতে পারেন, আসলে শ্রীমতী হেলোসীর বিশেষ টাকাকড়ি নেই। সব মিথ্যা কথা। আর যায় কোথায়? পারে তো পুত্রবধূটিকে শ্বশুর শাশুড়ী গিলে ফেলে! ফলে বেচারী হেলোসীর পুরাণো সুপ্ত ব্যাধিটি আবার মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। চার্লস চেষ্টার ত্রুটি করে না। কিন্তু সে শ্রীমতীকে বাঁচাতে পারে না।

এমনি ভাবে স্ত্রী-র আকস্মিক মৃত্যু হ'তে অনুশোচনায় চার্লস-এর মন ভরে ওঠে। তবুও তাকে রোগীদের ডাকে যথারীতি সাড়া দিতে হয়। না হলে চলবে কেন?

অসুস্থ বৃদ্ধ রল্ট আবার একদিন ডাঃ চার্লস-কে তার বাড়িতে ডেকে পাঠায়। এতদিন বাদে এমা-কে দেখে চার্লসের মন আনন্দে উচ্ছল হয়ে ওঠে। এবার সে এমা-র চোখে বন্ধুত্বের আভাস লক্ষ্য করে। তারা পরস্পর পরস্পরের কাছে হৃদয় উন্মুক্ত করে।

বৃদ্ধ রল্ট-এর অভিজ্ঞ দৃষ্টিতে কিছুই এড়ায় না। সে তার আতুরে কন্যার মনের হদিসও রাখে। পরের দিন চার্লস যেতে বৃদ্ধ তাকে ডেকে বলেন,—ডাক্তার, আমার দিন ফুরিয়ে এলো। তোমার মনের অহেতুক দ্বিধা-দ্বন্দ্ব দূর কর। আমি তোমাদের দু'জনকে খুশি মনে আশীর্বাদ করছি। তুমি এমা-কে বিয়ে করে সুখী হও।

ওরা দু'জনে হাত মেলায়—

বিয়ের পর প্রথম ক' সপ্তাহ ঘরদোর নতুন ভাবে তার মনের মতো করে সাজাতে এমা ব্যস্ত থাকে। সংসারের খুঁটিনাটি সবকিছু তার খুঁতখুঁতে মন দিয়ে খুঁটিয়ে দেখে।

আরও কিছুদিন যেতে এমা তার সদ্য-বিবাহিত জীবনের সুখে আশাহত হয়। বাস্তব জীবনে তার সেই বহু আকাঙ্ক্ষিত কল্পিত পরম সুখের স্পর্শ কোথায়। তার কেতাবী রোমান্সের সঙ্গে ব্যক্তিগত উপলব্ধি তুলনা করে আত্মগ্লানিতে এমা'র মন ভরে ওঠে।

এমা চার্লস-কে ভালবেসেই বিয়ে করেছিল। তবুও সেই বিবাহিত জীবনের প্রতি এমা'র মনে অনীহা জাগে।

ক্রমে চার্লস-কে এমা'র মনে হয় যেন কতগুলি দুর্গন্ধ ওষুধের উপাদানে তৈরী একটি নীরস জীব। আর, নিজেকে সে মনে করে সেই অবাঞ্ছিত স্বামিত্বের শৃঙ্খলে বন্দিনী।

এমা'র জীবনে আশা-আকাঙ্ক্ষার আলোটি যখন নিভে আসছিল তখন চার্লসের একটি সম্ভ্রান্ত রোগী তার চিকিৎসায় আরোগ্য লাভ ক'রে একটি নৃত্যানুষ্ঠানের আয়োজন করেন। চার্লসের সঙ্গে শ্রীমতী এমাকেও তিনি সাদর আমন্ত্রণ জানান।

ঐ নৃত্যানুষ্ঠানে এমা হাল্কা সুরা পান করে, পর পর ছ' জন পুরুষের সঙ্গিনী হয়ে নাচবারও সুযোগ পায়। শুধু তাই নয়, বহু বিশিষ্ট অতিথি-র মুখ থেকে সে তার রূপের সুখ্যাতিও শোনে। এমা'র শূন্য মন ভরে ওঠে।

এরপর চার্লসের স্বামিত্ব তার কাছে অসহ্য হয়ে ওঠে। চার্লস অবশ্য প্রাণপণে এমাকে খুশি করবার চেষ্টা করে। কিন্তু কোন ফল হয় না। এমা হতাশায় ভেঙ্গে পড়ে। সে খোলা জানালাটির কাছে বসে উদাস দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে দিন কাটায়। কখনও বা প্যারিসের বেপরোয়া উল্লসিত সমাজ-জীবনের স্বপ্ন দেখে। এমনি ভাবে এমা অসুস্থ হয়ে পড়ে।

তার স্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্য চার্লস এমাকে নিয়ে ইয়নভিল-এ চেঞ্জে চলে যায়। কিছুদিন বাদে সেখানে এমা জননী হয়। চার্লস স্বস্তির নিশ্বাস নেয়। ভাবে, এবার হয়তো সব ঠিক হয়ে যাবে। তাদের বিবাহিত জীবন সুখের হবে।

শিশু কন্যাটিকে নিয়ে এমা'র দিন কাটে। তাকে নিয়ে কখনও সে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু একটু বড় হতে সন্তানের ঝামেলা তার আর ভাল লাগে না। কন্যাটিকে সে কাছের একটি নার্সিং-হোমে রেখে দেয়।

শিশুটিকে দেখতে এমা মাঝে মাঝে ঐ নার্সিং-হোমে যায়। যেতে আসতে সেখানে একদিন বিকেলে এক সুদর্শন যুবকের সঙ্গে এমা'র দেখা হয়। লিয়ন ডুপিস্। দু'জনের মধ্যে পরিচয় হতে দেরী হয় না। এমা'র রূপ যুবকটিকে আকর্ষণ করে। যুবকটি জাগায় এমা'র মনের সুপ্ত রোমান্সের বাসনা।

লিয়ন ডুপিস্—আইনের ছাত্র। শহরের কোলাহল থেকে সে এখানে এসেছিল বিশ্রামের জন্য। শূন্য মনে সে ঘুরে বেড়াচ্ছিল—এমন সময় রূপসী এমা তার মনে কৌতূহল জাগায়।

এমা'র অনুরোধে লিয়ন তাকে বাড়িতে পৌঁছে দিতে রাজী হয়। গোধূলি বেলা—নির্জন পথ। দু'জনে পাশাপাশি হেঁটে চলে। এমা

বলে চলে, লিয়ন নীরবে তাকে শুধু সমর্থন করে। লিয়ন এমা'র রোমান্টিক ধারণাগুলিকেও অনুমোদন করে। এমা তার আচরণে মুগ্ধ হয়।

ক'দিন বাদে এদের দু'জনের সম্পর্ক গাঢ় হয়। কোথাও বা তাদের কেন্দ্র করে একটা চাপা গুঞ্জনও ওঠে। চার্লস কিন্তু এমা'র চালচলনে কোন অবাঞ্ছিত লক্ষণ দেখে না।

দিন যায়। লিয়ন এমা'র শুষ্ক প্রেমে ক্লান্তি বোধ করে। ঐ ছোট্ট শহরে আর কোন আকর্ষণও খুঁজে পায় না। বিরক্ত হয়ে হঠাৎ একদিন সে ফিরে যায় প্যারিস শহরে—আবার লেখাপড়ায় মন দিতে।

এমনি ভাবে লিয়ন চলে যেতে এমাও কম আঘাত পায় না। তার মনে শুরু হয় গভীর অনুশোচনা। উপলব্ধি করে, তার মিথ্যা লজ্জা সঙ্কোচের জন্য তারা উভয়েই বঞ্চিত হয়েছে। মনে মনে সে নিজেকে তার বোকামির জন্য ধিক্কার দেয় বারবার। ভাবতে ভাবতে এমা আবার অসুস্থ হয়ে পড়ে।

এমা'র রোগটা দেহগত নয়—মনের। রোমান্সে আশাহত সে। গভীর মনস্তাপে তার দিন কাটে। এমন সময় চার্লস-এর চেম্বারে একদিন আসে ধনী রডল্‌ফ বলঙ্গার। এমা আগন্তুকের দৃষ্টির মধ্যে কিসের আভাস লক্ষ্য করে। তার মনে দোলা লাগে।

রডল্‌ফ ছিল নারী শিকারী। এতদিন বাদে একটি লোভনীয় শিকারের সন্ধান পেয়ে তার লালসার আগুন জ্বলে ওঠে। দু'দিনের মধ্যে এমার হৃদয় জয় করতে তার অসুবিধা হয় না। এমা লম্পটের ফাঁদে পা বাড়ায়। চার্লসের চোখে ধুলো দিয়ে এমা মাঝে মাঝে বহুদূরে নির্জন পথে বেড়াতে যায়। তারপর একদিন দ্বিধা সঙ্কোচের বেড়া ডিঙ্গিয়ে সে রডল্‌ফের কাছে আত্মনিবেদন করে।

এই পাপ পথে পা বাড়াবার ফলে এমা নিজেকে কলুষিত মনে করে। সে তার অপরাধের গুরুত্বও উপলব্ধি করে। কিন্তু ক্ষণিকের

জন্য মাত্র। তার মনে ভেসে ওঠে, নাটক-নভেলে পড়া নায়িকাদের চরিত্রের মিছিল। অমনি সে নিজের মনকে প্রবোধ দেয়—এ কিছু অপরাধ নয়। এতদিনে সে তার বহু-আকাঙ্ক্ষিত সত্যিকারের রোমান্সের স্বাদ পেয়ে নিজের জীবনকে ধন্য মনে করে।

কিন্তু ঐ ক্ষণিকের সুখে তৃপ্তি কোথায়? এমা'র মন ভরে না। সে অতৃপ্ত-কামনা নিয়ে আবার ছোটে তার প্রেমাস্পদের কাছে।

এমা নির্ধারিত জায়গাটিতে তার জন্য অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করে। সময় বয়ে যায়। তবুও রডল্‌ফ এসে পৌঁছয় না। ক্রমে এমা অধৈর্য হয়ে ওঠে—

লম্পট জানে, এমা তখন তার হাতের মুঠোয়। গরজ এমা'র, তার নিজের নয়। সে তার খেয়াল খুশি মতো এমা'র সঙ্গে গোপনে মিলিত হয়।

এমা'র মনে এবার সন্দেহ জাগে। ক্রমে সে তার প্রেমিকের আসল স্বরূপটি বুঝতে পারে। তবুও এমা দমে না। ভাঙ্গে না তার রোমান্সের স্বপ্ন। তাই প্রেম-সাগরে হালটি সে ছেড়ে দেয় না।

ঘটনাচক্রে চার্লসের অবস্থা তখন খারাপ হয়ে পড়ে। দৈবের দুর্বিপাকে পড়ে কিছু কুখ্যাতিও সে অর্জন করে। রোজগার যৎসামান্য ভাগ্য-নিপীড়িত চার্লসের মনে শান্তি থাকার কথা নয়।

ঠিক সেই সময় এমা'র মনের স্তিমিত কামনা আবার জ্বলে ওঠে। রডল্‌ফের হৃদয় জয় করতে সে ধার দেনা করে যদৃচ্ছা টাকা ওড়াতে শুরু করে। হঠাৎ ওরকম মূল্যবান পরিচ্ছদের ওপর এমা'র গভীর অনুরাগের তাৎপর্য চার্লস কিন্তু বুঝে উঠতে পারে না। ওকে ঘাঁটাতেও চার্লস সাহস করে না।

রডল্‌ফ-এর মোহে এমা তখন অন্ধ। স্বামীর সংসারের দিকে তার তাকাবার সময় কোথায়? সন্তানটির কথাও সে সহজেই ভুলে যায়।

অবশেষে একদিন স্থির হয়, রডল্‌ফ এবং এমা দু'জনে কোথাও পালিয়ে যাবে। তাই ভেবে এমা প্রাণভরে স্বস্তির নিঃশ্বাস নেয়।

নির্ধারিত দিনে সন্ধ্যা হতে এমা তার প্রেমাস্পদটির জন্য তৈরী হয়ে বসে থাকে। সময় বয়ে যায়। রডল্‌ফ কিন্তু আসে না। আসে রডল্‌ফের ছোট্ট একটি চিঠি। প্রবঞ্চকের সনাতন চিঠি। এমনি ভাবে তার প্রাণপ্রতিমের মুখোশটি খসে পড়তে এমা হতাশায় ভেঙ্গে পড়ে। আত্মহননের মধ্যে সে তার জীবন-যন্ত্রণা থেকে মুক্তি খোঁজে। বাড়ির উঁচু-খোলা-জানালার থেকে যখন সে ঝাঁপ দিতে যাবে—হঠাৎ কি কারণে চার্লস সেই ঘরে প্রবেশ করতে সে-যাত্রায় এমা প্রাণে বাঁচে। প্রাণে বাঁচলেও এমা মনের ব্যাধিতে ক'মাস শয্যাশায়ী হয়ে পড়ে থাকে।

তার মনের হদিস পুরোপুরি না জানলেও চার্লস বুঝতে পারে—এ ওর মানসিক ব্যাধি। তাই একটু সুস্থ হয়ে উঠতে চার্লস এমাকে নিয়ে একদিন কাছের রুয়েন সহরে একটি নাটক দেখতে যায়। চার্লস ভাবে, যদি এতে ওর মনের ক্লান্তি একটু দূর হয়।

কিন্তু ফল হয় উল্টো। ঐ নাটকে প্রেমের অভিনয়ের দৃশ্যটি এমা'র মনে আবার জ্বালায় কামনার আগুন। সেই আগুনে ইন্ধনও এসে যায় সহজ ভাবে। নাট্যশালার থেকে বেরোতে তাদের সঙ্গে লিয়নের দেখা হয়। বিবাহিত জীবনে এমা'র প্রথম বন্ধু—লিয়ন ডুপিস্‌।

লিয়ন ডুপিস্‌ এখন একজন প্রতিষ্ঠিত উকিল। এতদিন বাদে এমাকে দেখে সেদিনের ব্যর্থতার কথা আবার নতুন করে তার মনে জাগে। সঙ্গে সঙ্গে এমাকে জয় করবার এক অদম্য কামনা তার মনে অঙ্কুরিত হয়।

লিয়ন এবার অভিজ্ঞ। সে সঙ্কল্প করে, যেমন ক'রে হোক—এমাকে জয় করতে হবে। সে এমা'র সব অভিযোগ গভীর সহানুভূতির সঙ্গে শোনে; তার হৃদয়ের ক্ষত স্থানটিতে সমবেদনার প্রলেপ দেয়। ওষুধের ক্রিয়া চতুর লিয়নের বুঝতে অসুবিধা হয়

না। সে বুঝতে পারে, শিকার তার ফাঁদে পা বাড়িয়েছে। ব্যাস, এবার ধূর্ত লিয়ন এমা'র কাছে প্রেম নিবেদন করে। এমা-ও ঠিক এই সুযোগটির জন্য অপেক্ষা করছিল। সে খুশি মনে লিয়নের প্রেমের বন্যায় নিজেকে ভাসিয়ে দেয়।

এমা যখন লিয়নের প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছিল—তার স্বামী চার্লস তখন দেনায় ডুবু ডুবু। নানা জটিল সমস্যায় চার্লস দিশেহারা। ঠিক সেই সময় তার পিতা স্বর্গত হন। তাঁর বিষয়-সম্পত্তির খবর কিছুই না জেনে বিব্রতা মা—ছেলের সাহায্য চান। বিমূঢ় চার্লস ঐ জটিল সমস্যার কোন ইঙ্গিত খুঁজে পায় না।

এমা তখন রঙীন স্বপ্নে বিভোর। তার খেয়াল খুশি চরিতার্থ করার জন্য প্রচুর পয়সার প্রয়োজন। তাই সরল স্বামীর দুঃসময়ের সুযোগ নিতেও সে কিছুমাত্র দ্বিধা করে না।

ছলনাময়ী এমা'র পরামর্শে চার্লস তার ব্যক্তিগত এবং মা'র সম্পত্তি তদ্বির-তদারক করতে উকিল লিয়নের নামে একটি 'পাওয়ার অব অ্যাটর্নী' এমা'র হাতে সরল মনে তুলে দেয়।

তবুও তার ঋণের বোঝা দিন দিন বাড়তে থাকায় চার্লসের মনে সন্দেহ উঁকি দেয়। অগত্যা বিরক্ত হয়ে সে ঐ দলিলটি নষ্ট করে। ফলে, এমা বিপদে পড়ে। কারণ, উচ্ছৃঙ্খলতার জন্য ক্রমে ক্রমে এমা'র ব্যক্তিগত দেনার পরিমাণটিও বড় কম হয়নি।

এবার এমা'র সংযম এবং দ্বিধার কোন বালাই থাকে না। সমাজ সংসারের সব বাধা-নিষেধ তুচ্ছ করে সে পুরোপুরি লিয়নের হাতে নিজেকে সঁপে দেয়। নিজেকে লিয়নের প্রণয়িনী বলে জাহির করতে এমা এতটুকুও দ্বিধা করে না।

এর ফলে এমা'র জীবনে আসে চরম বিপর্যয়। ক্রমে ওরা পরস্পর পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা হারায়। হৃদয়ের প্রেম উবে গিয়ে আসে তিক্ততা। লিয়নের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় অর্থ না পেয়ে এমা তাকে মুক্তকণ্ঠে গালমন্দ করতেও দ্বিধা করে না। বেচারী লিয়নের তখন

মনের অবস্থা—ছেড়ে দে মা........। কিন্তু তার বাকী রসটুকু না-নিঙড়ে এমা তাকে ছাড়বার পাত্রা নয়।

এদিকে পাওনাদারদের তাগিদে এমা অস্থির হয়ে ওঠে। কিন্তু সে যে একেবারে রিক্তহস্ত। কয়েক সহস্র ফ্রাঙ্ক দেনা সে শোধ করবে কি করে? কোর্ট থেকে পরোয়ানা বেরোয়—এমা'র ঋণ শোধ করতে চার্লসের সম্পত্তি নিলাম হবে।

চার্লস তখন শহরের বাইরে ভিন্‌দেশে। অগত্যা এমা তার পুরনো প্রণয়ী ধনী রডল্‌ফ-এর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে কিন্তু কোনই ফল হয় না। আশাহত এমা তার পাপের গুরুত্ব উপলব্ধি করে শিউরে ওঠে। কলঙ্কিনী তার স্বামীকে ঐ পোড়া মুখ দেখাবার কথা এখন আর ভাবতে পারে না। আত্মহননের মধ্য দিয়ে সে জীবন-যন্ত্রণার হাত থেকে মুক্তি খোঁজে।

এই সময় ডাঃ চার্লস বিদেশ সফর থেকে ফিরে আসে। বাড়ির বারান্দায় পা দিতেই পাশের ঘর থেকে এক অস্ফুট কাতরানির শব্দ তার কানে ভেসে আসে। সে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। শব্দটা স্পষ্ট শুনতে পেয়ে সে ছুটে যায় ঐ ঘরের মধ্যে।

কিন্তু ততক্ষণে সব প্রায় শেষ। মারাত্মক বিষ পান করার ফলে অনেকক্ষণ আগে থেকেই এমা অসহ্য যন্ত্রণায় ধুঁকছিল। প্রাণটা তার তখন যাই-যাই করছিল। চার্লস ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই এমা তার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে। চার্লস স্তম্ভিত, হতবাক্ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

এই অঘটনের পর দারুণ মনস্তাপে ডাঃ চার্লসের দিন কাটে। কিন্তু মহাকালের স্রোতে ক্রমে ক্রমে সব কিছুই মুছে যায়। চার্লসও এই কঠিন আঘাত থেকে নিজেকে অনেকটা সামলে নেয়।

কি কারণে, হয়ত বা স্মৃতির তাড়নায়, সেদিন চার্লস এমার ব্যক্তিগত আলমারীটি খুলে ফেলে। খুলেই তার চক্ষুস্থির। দেখে, এমা'র প্রেমাস্পদ রডল্‌ফ এবং লিয়নের অসংখ্য প্রেমপত্র সেখানে সযত্নে থরে থরে সাজানো রয়েছে। এমা'র নাটকীয় জীবনটা এবার চার্লসের চোখের

সামনে স্পষ্ট হয়ে ফুটে ওঠে। অনুশোচনা আর গভীর আত্মগ্লানিতে চার্লসের মন ভরে ওঠে। চার্লস উপলব্ধি করে, আর বেঁচে থাকা অর্থহীন।

ক'দিন বাদে তাদের একমাত্র কন্যা-সন্তানটির জন্য মাত্র বারো ফ্রাঙ্কের সঙ্গতি রেখে ডাঃ চার্লস তার বিড়ম্বিত জীবন-যন্ত্রণার হাত থেকে মুক্তি পায়।

"পুতুল-খেলা ঘর"

নরওয়ের প্রখ্যাত নাট্যকার হেনরিক ইবসেন (Henrik Ibsen)-এর **'এ ডলস্ হাউস্'** (A Doll's House), ১৮৭৯, নাটকটির গল্পরূপ।

ক্রিস্‌মাস্ পর্ব যতই এগিয়ে আসে শ্রীমতী নোরা হেলমার-এর আনন্দ যেন ততই উপচে পড়ে। হবে না-ই বা কেন? তাদের বিয়ের পর সাত সাতটি ক্রিস্‌মাস্ কি করে যে তারা কাটিয়েছে, ভাবতেও নোরার খারাপ লাগে। সে-বছরগুলি নোরার কাছে ছিল যেন এক একটি দুঃস্বপ্ন। এ বছরেই হবে তাদের সত্যিকারের উৎসব।

উৎসবের আগের দিন নোরা মনের আশ মিটিয়ে কেনা-কাটা করে—স্বামী এবং ছোট ছেলে-মেয়ে দুটির জন্য দামী পোষাক, অনেক অনেক খেলনা, নানা রকম কেক-বিস্কুট, ঘর সাজাবার বিবিধ উপকরণ, সুন্দর একটি 'ক্রিসমাস ট্রী', আরও কতো কি!

নোরার বাজারের বহর দেখে টরভল্ড-এর চক্ষুস্থির। বলে, তুমি একটি উড়নচণ্ডী। আদর এবং অনুযোগ মেশান তার কণ্ঠে।

—কিন্তু এখন তো আর আমাদের অর্থকষ্ট নেই; এবার থেকে তো আমরা খরচ করতে পারি। তুমি অতো বড় ব্যাঙ্কের ম্যানেজার হয়েছো! প্রত্যেক মাসে কতো কতো টাকা আমাদের ঘরে আসবে······

নোরার উচ্ছ্বাসে বাধা পড়ে। টরভল্ড বলে,—তুমি একটি পাগলী। আরে, আমার চাকরি তো শুরু হবে নববর্ষ থেকে। মাইনে পাবো আরও একমাস বাদে।

হলোই বা। এ ক'দিন ধার করে চালিয়ে নিতে অসুবিধা হবে না।

সত্যি, তোমার বুদ্ধি-শুদ্ধি আর হবে না! জানো তো, আমি ধার-দেনা একদম পছন্দ করি না। এতদিন অভাবের সঙ্গে আমরা যুদ্ধ

করেছি, তবুও কারুর কাছে হাত পাতিনি। টরভল্ড-এর কণ্ঠে উষ্মার আভাস।

নোরাকে গম্ভীর হতে দেখে টরভল্ড হাল্কা হতে চেষ্টা করে। সে নোরাকে একটু আদর করে—যেমন ক'রে ছোট্ট ছেলে-মেয়েরা তাদের পুতুলকে করে। তারপর সদ্য কিনে আনা জিনিসগুলোর ওপর একবার নজর বুলিয়ে টরভল্ড প্রায় চিৎকার করে ওঠে,—আরে, এ কি কাণ্ড করেছো? তোমার নিজের জন্যে তো কিছুই আনোনি!

আমার কিছু প্রয়োজন নেই।

তা হয় না। বলো, তোমার কী চাই?

নোরা খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে জানায়,—যদি কিছু দিতে চাও, তা'হলে টাকা দিও—তা যতো সামান্যই হোক; আমি দেখেশুনে পরে কিনবো।

আচ্ছা, তাই নিও আমার মিষ্টি উড়নচণ্ডী। আমার কাছ থেকে টাকা আদায় করার তুমি যে কতো রকমের ফন্দি জানো! আসলে এই খরচে স্বভাবটা রয়েছে তোমার রক্তের মধ্যে।

কিন্তু তোমার যা খারাপ লাগে আমি কখনও কি তেমন কিছু করি?—নোরার কণ্ঠে অভিমানের সুর।

না না, তা নয়। আর, তা হবেই বা কেন? আমি চাই, তুমি ঠিক এমনি আমার মনের মতো হয়েই চলো।

আচ্ছা, তাই হবে গো। নোরার কণ্ঠে খুশির আভাস।

ওদের দু'জনের মুখে আবার হাসি ফুটে ওঠে। এমন সময় একজন অচেনা ভদ্রমহিলা নোরার কাছে আসতে টরভল্ড আর সেখানে দাঁড়ায় না। শ্রীমতী ক্রিস্টীনা লিনডে।

দীর্ঘ ন' দশ বছরের ব্যবধানে গোড়াতে একটু অসুবিধা হলেও তার স্কুলের অন্তরঙ্গ বন্ধুকে চিনতে নোরা'র সময় লাগে না। বন্ধুকে এতদিন বাদে কাছে পেয়ে নোরা আনন্দে বাচ্চা মেয়েদের মতো লাফাতে শুরু করে।

নোরা জানতে পারে, এ ক' বছরের মধ্যে ক্রিস্টীনা-র দেহ-মনের ওপর দিয়ে অনেক ঝড় বয়ে গেছে। তার স্বামী নেই, সন্তান নেই, অর্থ নেই—সুখের এতটুকু স্মৃতিও নেই। সে একেবারে নিঃসহায়, নিঃস্ব। নোরা তার দুঃখের কথা জেনে মনে গভীর বেদনা বোধ করে।

নোরা কিন্তু বান্ধবীকে তাদের ভাগ্য পরিবর্তনের কথাটি জানাতে ভুল করে না। বলে, জানিস এবার থেকে আমাদের খরচ করবার মতো, উড়োবার মতো অনেক টাকা হবে। কি মজা!

বান্ধবী উত্তর দেয়,—আশ্চর্য, তুই এখনও স্কুলের সেই উড়নচণ্ডী-ই রয়ে গেছিস্।

নোরা বাধা দেয়,—না মশাই, না—এতদিন আমাদের যা কষ্টে দিন গেছে! ওঁর সঙ্গে আমাকেও কতো খাটতে হয়েছে দু'টো পয়সার জন্য! কি না করেছি! ওঁকেও সব কথা জানতে দিইনি।

কথায় কথায় নোরা জানতে পারে তার বান্ধবী ক্রিস্টীনা তার স্বর্গত স্বামীকে কোনদিন ভালবাসে নি—বিয়ের আগেও না, পরেও না। আসলে সে ভদ্রলোকটিকে বিয়ে করেছিল তাঁর পয়সার জন্য—অবশ্য অসুস্থ মা'র চিকিৎসা এবং ছোট ভাইদের মানুষ করবার প্রয়োজনেই, ঠিক ব্যক্তিগত স্বার্থের খাতিরে নয়।

নোরা বান্ধবীকে তার স্বামীর ব্যাঙ্কে চাকরির আশ্বাস দিতে কৃতজ্ঞতায় ক্রিস্টীনা-র মন ভরে ওঠে। তরল কণ্ঠে সে বলে,—

তোর মনটা এত ভাল! সংসারের কোন দুঃখকষ্ট, ঝড়ঝাপ্‌টা তোকে সইতে হয়নি, তবুও তোর মনটা কতো সহানুভূতি-প্রবণ রয়েছে—ভাবতেও ভাল লাগছে!

বান্ধবীর উক্তি শুনে নোরার কণ্ঠে অভিমানের সুর বেজে ওঠে। বলে, তোর দোষ নয়। সবাই ভাবে,—আমার কর্তাটিও—আমি কোন কঠিন সমস্যার মুখোমুখি হতে পারি না, আমি কোন দুঃখকষ্ট সহ্য করতে পারি না···

হঠাৎ নোরা উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে ওঠে,—আরে, আমারও গর্ব করার

মতো জিনিস আছে। আসলে সকলে আমাকে যতোটা খুকী ভাবে আমি তা নই। তবে শোন্,—

আমাদের বিয়ের এক বছর পরের কথা। সবে আমাদের প্রথম সন্তানটির জন্ম হয়েছে। ওঁর তখন কোনো বাঁধা রোজগার নেই—প্রয়োজনের তুলনায় উপার্জন সামান্যই। অমানুষিক পরিশ্রমের ফলে ওঁর এই সময় কঠিন অসুখ হয়। ডাক্তার আমাকে চুপি চুপি জানান—ওঁকে বাঁচাতে হলে কোনও স্বাস্থ্যকর জায়গায় অনেকদিন থাকা প্রয়োজন। কিন্তু চেঞ্জে যাবার পয়সা কোথায়? ওদিকে বাবাও তখন ভীষণ অসুস্থ। বাবাকেও একথা জানানো যায় না—তাঁর কাছে হাত পাতার প্রশ্নই ওঠে না। অগত্যা চড়া সুদে আড়াই হাজার টাকা আমাকেই কৌশলে জোগাড় করতে হয়। আমার এই ঋণের কথা স্বামীও জানতেন না। তিনি তাহলে কিছুতেই চেঞ্জে যেতে রাজী হতেন না। তাঁর ধারণা, টাকাটা আমার বাবা দিয়েছিলেন। কথাটা তিনি আজ পর্যন্তও জানেন না।

নোরার কথা শুনে বান্ধবী অবাক হয়। বলে, তাহলে ঐ ঋণ শোধ করতেও তো তোকে কম বেগ পেতে হয়নি।

ক্রিস্টীনার কথা নোরা যেন শুনতেই পায় না। সে আপন মনে বলে চলে—

উঃ, এর জন্য আমাকে কতো দুশ্চিন্তায় দিন কাটাতে হয়েছে, দিনের পর দিন কতো কৃচ্ছ্রসাধন করতে হয়েছে। সংসার-খরচ থেকে তিল তিল করে বাঁচাতে হয়েছে। নিজের পোশাকের জন্য বা কোন কিছুর জন্য হাতে যখনই টাকা পেয়েছি—কখনও তার অর্ধেকের বেশী খরচ করিনি। সবচেয়ে সস্তা পোশাক কিনেছি। এই দীর্ঘ সাত বছর সামান্যতম সুখ-আনন্দ থেকেও নিজেকে নিষ্ঠুর ভাবে বঞ্চিত করেছি। তবুও মাঝে মাঝে দিশেহারা হয়েছি,—কি করে কিস্তির টাকা মাসান্তে শোধ দেবো।

একটু দম নিয়ে নোরা বলে,—এবার মুক্তি। এখন থেকে বাচ্ছাদের সঙ্গে হুটোপুটি করবো, ও যেমন ভালবাসে ঠিক তেমনি ভাবে ঘরদুয়ার

সাজাবো, সংসার চালাবো।—নোরা যেন প্রাণভরে তৃপ্তির নিঃশ্বাস নেয়।

নোরা যার কাছ থেকে টাকা ধার করেছিল সেই কর্গস্ট্যাগ লোকটা ছিল কুখ্যাত। সে ছিল টরভল্ড-এর ব্যাঙ্কের একজন কেরাণী। ব্যাঙ্কে জালিয়াৎ বলে তার দুর্নাম-ও ছিল। অনেকের ধারণা তার স্ত্রীর মৃত্যুর কারণও সে নিজেই। নোরা কিন্তু ওর সম্বন্ধে এত সব খবর কিছুই জানতো না।

কর্গস্ট্যাগ বালক বয়সে টরভল্ড-এর সঙ্গে খেলা করেছে। তার ধারণা, টরভল্ড ম্যানেজার হলে তার পদোন্নতি হবে—অনেক সুযোগ-সুবিধা সে পাবে। কিন্তু টরভল্ড তাকে কোন দিনই দেখতে পারত না। সে উল্টে ঐ অবাঞ্ছিত লোকটাকে দূর করবার কথাই ভাবে। ক্রমে টরভল্ড স্থির করে, নোরার বান্ধবী ক্রিস্টীনাকে সে কর্গস্ট্যাগ-এর পদেই বহাল করবে।

খবরটা কানে পৌঁছুতে কর্গস্ট্যাগ চুপি চুপি ছুটে আসে নোরার কাছে। সে তাকে অনুরোধ করে তার স্বামীকে বলবার জন্য যাতে করে তার চাকরিটি বজায় থাকে।

নোরা তাকে কাতর কণ্ঠে জানায়,—বিশ্বাস করুন এ ব্যাপারে আমার কোন হাত নেই। তবে অল্পদিনের মধ্যেই আমি আপনার বাকী টাকাটা চুকিয়ে দেবো।

কর্গস্ট্যাগ ক্রুদ্ধ হয়ে বলে,—টাকার কথা থাক। তার থেকে বলুন আমার জন্য স্বামীকে আপনার বলবার ইচ্ছা নেই। জেনে রাখুন, আমার হয়ে আপনাকে বলতে বাধ্য করবার মত ক্ষমতা আমার আছে।

কথা ছিল নোরার ঐ আড়াই হাজার টাকার ঋণের জন্য তার বাবা জামিন থাকবেন। কিন্তু তখন তিনি খুব অসুস্থ থাকার দরুন তাঁকে দিয়ে দলিলটা আর সই করান হয়নি। তাঁর মৃত্যুর পর নোরাই

সরল মনে তার পিতার সইটি করেছিল। ঐ জাল সই করবার গুরুত্ব কর্গস্ট্যাগ এখন নোরাকে স্মরণ করিয়ে দেয়। শুনে নোরা শিউরে ওঠে।

নোরা কর্গস্ট্যাগকে চাকরিতে বহাল রাখবার জন্য স্বামীকে নানা ভাবে অনুরোধ করে। কখনও-বা একটু ছলনার আশ্রয়ও নেয়। কিন্তু টরভল্ড তার সঙ্কল্পে অটল থাকে। নোরা তবুও হাল ছাড়ে না। স্বামীকে জানায়—তুমি জান না লোকটার চাকরি গেলে ও আমাদের কি ভীষণ অনিষ্ট করতে পারে—আমাদের সর্বনাশ হতে পারে।

টরভল্ড দৃঢ় কণ্ঠে জানায়,—তা হোক। তবুও আমি একটা জালিয়াৎ-কে নিয়ে কাজ করতে পারব না। আর, তুমি তার হয়ে অত করে বলছো বলেই তাকে রাখা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। বলেই টরভল্ড নোরার সামনেই কর্গস্ট্যাগ-এর বরখাস্তের নোটিশটি পাঠিয়ে দেয়।

কর্গস্ট্যাগ সঙ্গে সঙ্গে টরভল্ড-এর নামে একটি চিঠি লিখে সেটি সহ নোরার সঙ্গে দেখা করে। নোরাকে জানায়,—এ চিঠি থেকেই টরভল্ড এখন সব কিছুই জানতে পারবে। বিবেচনা করে দেখবেন—এখন আমি ও আপনি একই অপরাধে অপরাধী। আপনাদের সুনাম আমার ওপরেই নির্ভর করছে—কর্তার সাধের চাকরিটিও। এই চিঠি পড়ে টরভল্ড যদি আপোস মীমাংসা করে ভাল। অন্যথায় আমিও ক্ষমা করবো না।

কর্গস্ট্যাগ তার চিঠিটি ওদের চিঠির বাক্সে ফেলে দিয়ে চলে যায়। ঐ বাক্সের চাবিটি টরভল্ড সব সময় নিজের কাছেই রাখে এবং নিয়মিত ভাবে নিজের হাতেই খোলে। ঐ মারাত্মক চিঠির চরম পরিণতির কথা নোরা আর ভাবতে পারে না। সে দিশেহারা হয়ে ওঠে।

এ আসন্ন বিপদে নোরা তার নিজের কথা ভাবে না। তার স্বামীর লাঞ্ছনার কথা ভেবেই সে অস্থির হয়ে ওঠে। তার দৃঢ় বিশ্বাস, সব কিছু

জানবার পর তাকে বাঁচাবার জন্য তার স্বামী এগিয়ে এসে সব দোষ ত্রুটি নিজের মাথায় তুলে নেবে। উঃ, তার চেয়ে মৃত্যুও শ্রেয়! কিন্তু নোরার মৃত্যুতেও যে টরভল্ড সে কলঙ্ক থেকে রেহাই পাবে না; নিরপরাধ শিশু দুটিও তার পাপের হাত থেকে রক্ষা পাবে না। ভাবতে ভাবতে নোরা প্রায় উন্মাদ হয়ে ওঠে। সব সময়ই সে সন্ত্রস্ত হয়ে ভাবে— এই বুঝি টরভল্ড চিঠির বাক্সটা খুলে ফেলে!

বিভ্রান্ত নোরা ভেবে পায় না এই বিপদে সে কার কাছে সাহায্য চাইবে। কে করবে তার এই কঠিন সমস্যার সমাধান। হঠাৎ তাদের পরিবারের অন্তরঙ্গ বন্ধু ডাঃ র‍্যাঙ্ক-এর কথা তার মনে পড়ে।

ডাঃ র‍্যাঙ্ক প্রচুর পয়সার মালিক। অকৃতদার। তাঁর পিতার পাপের ফল তাঁর দেহে ফুটে উঠতে তখন তিনি পরপারে যাবার দিন গুনছিলেন। নোরা এবং টরভল্ড দু'জনেরই তিনি বিশেষ অন্তরঙ্গ বন্ধু। রোজই দু' একবার এদের বাড়িতে এসে ডাক্তার গল্প করে সময় কাটিয়ে যান।

কিন্তু আশ্চর্য, নোরা ডাক্তারের কাছে সেদিন সাহায্য চাইবার ইঙ্গিত করতে তিনি নোরার কাছে তাঁর হৃদয়টি যেভাবে উন্মুক্ত করেন তাতে নোরা আঁতকে ওঠে। ডাক্তারের সাহায্যের প্রস্তাবে নোরার মন ঘৃণায় ভরে ওঠে।

নোরার মনে সেদিন যখন এমনি ঝড় বইছিল তার স্বামী টরভল্ড-এর মেজাজটি তখন ছিল খুশিতে ভরপুর। পরের দিনের বিশেষ নৃত্যানুষ্ঠানটিতে তার নোরাও যে অংশ গ্রহণ করবে। তারই নির্দেশে এর জন্য নোরা ক'দিন থেকে তৈরীও হচ্ছিল।

বাইরে থেকে ফিরে এসে নোরাকে ক্লান্ত দেখে টরভল্ড প্রশ্ন করে। নোরা তার প্রশ্ন এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করে। ঠিক সেই সময় টরভল্ড চিঠির বাক্সটা খোলবার কথা উল্লেখ করতে নোরা প্রায়-উন্মাদের মতো তার সামনে নাচতে শুরু করে। বলে, আমাকে দেখিয়ে দাও, ভাল করে শিখিয়ে দাও—সব কেমন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে।

টরভল্ড ঠিক বুঝতে পারে না। বলে,—আচ্ছা, আমি দেখে আসি কোন চিঠি আছে কি না। তুমি ততক্ষণে শুরু করো।

নোরা কাতর কণ্ঠে তার কাছে মিনতি করে, উৎসবটি শেষ না হওয়া পর্যন্ত টরভল্ড যেন ঐ বাক্সটা না খোলে—কি জানি যদি কোন দুঃসংবাদ থাকে! তাহলে সব পণ্ড হবে।

টরভল্ড-এর মনে সন্দেহ উঁকি দেয়। তবুও সে নোরার অনুরোধ মেনে নেয়। চিঠির বাক্সটা তখন আর খোলে না! স্থির হয়, অনুষ্ঠান শেষ হবার পর সেটা খোলা হবে। টরভল্ড নোরাকে বলে:

আচ্ছা, তুমি খুব মন দিয়ে নাচের প্র্যাকটিস্ করো। দরজাটা বন্ধ করে নাও। আমি ততক্ষণ একটু কাজ করিগে। টরভল্ড আর সেখানে দাঁড়ায় না। ডাক্তার-বন্ধুকে নিয়ে নিজের ঘরে চলে যায়।

ওরা চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে ক্রিস্টীনা ঘরে প্রবেশ করতে নোরা স্বস্তির নিঃশ্বাস নেয়। বান্ধবীর চোখ-মুখের ভাবান্তর কিন্তু ক্রিস্টীনা-র নজর এড়ায় না। কিন্তু সে কিছু প্রশ্ন করবার আগেই নোরা তাকে ঘটনাটা সব খুলে বলে; টরভল্ড-এর উদ্দেশ্যে চিঠির-বাক্সে পড়ে থাকা কর্গস্ট্যাড-এর সদ্য-লেখা মারাত্মক চিঠির কথাটাও বাদ যায় না। কিছুই সে লুকোয় না।

সব শুনে ক্রিস্টীনাও ভয় পায়। তবুও সে বান্ধবীকে আশ্বাস দেয় —আমি দেখি একবার শেষ চেষ্টা করে। এক সময় ছিল যখন লোকটা আমার জন্যে সব কিছু করতে পারতো। তুই শান্ত হ'। টরভল্ডের হাতে পড়ার আগেই চিঠিটা যেমন করে হোক্ ওকে দিয়ে ফেরৎ নেওয়াবো।

সন্ধ্যার পর নোরা এবং টরভল্ড নৃত্যানুষ্ঠানে যোগ দিতে যায়। বাড়িটা অনেক ক্ষণের জন্য প্রায় খালি থাকে। এই সুযোগে ক্রিস্টীনা কর্গস্ট্যাগ-কে ডেকে পাঠায়।

দীর্ঘকালের ব্যবধানে হলেও যৌবনের প্রণয়িনীকে চিনতে কর্গ-স্ট্যাগ-এর দেরী হয় না। ক্রিস্টীনা ভূমিকার অবতারণা করে সময় নষ্ট

করে না। বলে,—তখন তোমার জন্য অপেক্ষা করা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। কিন্তু আজ আাম এসেছি। তোমার ছেলেমেয়েদের আমি খুশি মনে বুকে তুলে নেবো।

কর্গস্ট্যাগ এমন অপ্রত্যাশিত ভাবে ক্রিস্টীনাকে পেয়ে সুস্থ এবং স্বাভাবিক ভাবে বাঁচার ভরসা পায়। তার আর কারও ওপরে কোন রাগ-দ্বেষ থাকে না। ক্রিস্টীনার অনুরোধে নোরা এবং তার স্বামীর বিরুদ্ধে সব অভিযোগ তুলে নিয়ে তার আচরণের জন্য তাদের কাছে ক্ষমা চাইতেও কর্গস্ট্যাগ রাজী হয়।

আনন্দ উৎসব থেকে গভীর রাত্রে ফিরে এসেও টরভল্ড কিন্তু চিঠির বাক্সটা খুলতে ভুল করে না। কর্গস্ট্যাগ-এর সেই কুৎসিত চিঠিটা টরভল্ড হাতে তুলতেই নোরা সেখান থেকে চলে যেতে উদ্যত হয়। কিন্তু টরভল্ড তাকে বাধা দেয়। সে নোরাকে প্রশ্ন করে—তুমি জানো এ চিঠিতে কি লেখা আছে?

—জানি।

তাহলে এ সত্যি?

হাঁ। সব সত্যি। আমি...তোমাকে ভালবেসে......

নোরার বক্তব্য শেষ হয় না। টরভল্ড বজ্রকঠিন কণ্ঠে তাকে বাধা দেয়। চিৎকার করে বলে ওঠে,—অপদার্থ মিথ্যাবাদী শঠ—না না তার চেয়েও বেশী—একটা জালিয়াৎ। ছিঃ ছিঃ, একেই আমি আট বছর ধরে ভালবেসেছি! উঃ, এরই জন্যে এখন আমি ঐ বদমাইশটার হাতের মুঠোয়! সকলে আমাকেই মিথ্যা সন্দেহ করবে।

খানিকক্ষণ কি ভেবে টরভল্ড আবার বলে,—শুনে রাখো, এখন থেকে আমাদের দু'জনের মধ্যে কোন সম্পর্ক থাকবে না; ছেলে মেয়ের ওপরও তোমার আর কোন অধিকার থাকবে না—তোমার হাতে আমি বিশ্বাস করে ওদের আর ছাড়তে পারি না। লোকচক্ষুর অন্তরালে তুমি এ বাড়িতেই থাকবে—আমার আশ্রিতা হয়ে, তার বেশী নয়।

অপরাধিনী নোরা স্থির অবিচল হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। তার বলবারই বা কি থাকতে পারে! এমন সময় কর্গস্ট্যাগ-এর দ্বিতীয় চিঠিটা টরভল্ডের হাতে পৌঁছয়।

চিঠিটা পড়ে টরভল্ড আনন্দে আত্মহারা হয়ে চেঁচিয়ে ওঠে—নোরা, আমি বেঁচে গেছি—তুমিও। ঐ দলিলটাও দেখছি ফেরৎ পাঠিয়েছে বদমাইসটা। যাক্, এবারে অনেকটা নিশ্চিন্ত। আর কোন ভয় নেই। বেঁচে গেছি। আমি বুঝতে পেরেছি—তুমি আমাকে ভালবেসেই কাণ্ডটা করেছিলে।

হঠাৎ টরভল্ড লক্ষ্য করে, নোরা তেমনি অবিচল ভাবে দাঁড়িয়ে আছে—কেমন এক অদ্ভুত ভাবে সে তাকিয়ে আছে তার দিকে। নোরা এতক্ষণ নীরবে তার সাধের স্বামীটির স্বরূপ উপলব্ধি করছিল। সম্বিৎ ফিরে আসতে সে ফেটে পড়ে। টরভল্ড-কে উদ্দেশ করে বলে,—শোন, এতদিন আমরা পরস্পরকে বুঝিনি। না, না, একটুও নয়। বোঝবার চেষ্টাও করিনি। তুমি আমাকে কোনদিনই ভালবাসনি, শুধু ভালবাসার কল্পনাটাকেই ভালবেসেছো। বিয়ের পর থেকে তোমার মন ও মত অনুযায়ী আমাকে সব সময় সব কিছু করতে হয়েছে। আমি তোমার পোষা পাখীর মতোই শুধু খেলা করেছি—তোমাকে খুশি করতে। আমি ছিলাম তোমার বিয়ে-বিয়ে-খেলার বৌ। এই ছিল আমাদের সত্যিকারের সম্পর্ক। তাই আজ এই ঘটেছে আমাদের তথাকথিত বিয়ের পরিণতি!

একটু দম নিয়ে নোরা আবার বলতে শুরু করে—স্থির করেছি, এই রাত্রেই তোমার বাড়ি ছেড়ে আমি চলে যাবো। এরপর নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে নিজেকে আমার বুঝতে হবে।

টরভল্ড অসহায় ভাবে নোরাকে স্মরণ করিয়ে দিতে চেষ্টা করে—সে বিবাহিতা নারী। স্বামীর প্রতি, সন্তানের প্রতি তার কর্তব্য আছে।

নোরা দৃঢ়কণ্ঠে তাকে জানায়—সব কিছুর ওপর তার পরিচয় যে সে

একজন মানুষ—একটা পুতুল নয়। সেই পরিপূর্ণ নারীর স্বীকৃতি পেতে এখন থেকে তাকে চেষ্টা করতে হবে। সে আর টরভল্ড-এর মতো একজন অচেনা লোকের সঙ্গে ঘর করতে রাজী নয়। কিছুতেই তা আর সম্ভব নয়।

নোরা আর কথা বাড়ায় না—দাঁড়ায়ও না। অতি সাধারণ বেশে সে সদর দিয়ে বেরিয়ে যায়।

স্তব্ধ টরভল্ড অপলক দৃষ্টিতে নোরার গতিপথের দিকে অসহায় ভাবে তাকিয়ে থাকে।

যুদ্ধ ও শান্তি

রুশ সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখক লেভ্ তলস্তয় (Leo Tolstoy)-এর **'ওঅ্যার্ অ্যাণ্ড পীস্'** (War and Peace), ১৮৬৪-'৬৯, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ উপন্যাসটির সংক্ষিপ্তসার।

১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দ। অস্ট্রিয়ার ভাগ্যাকাশে বিপদের ছায়া ঘনিয়ে ওঠে: জঙ্গীরাজ নেপোলিয়ন বোনাপার্টের লোলুপ দৃষ্টি পড়ে দেশটির ওপর।

অস্ট্রিয়া শুধু প্রতিবেশী রাষ্ট্রই নয়, ঐ দেশটির সঙ্গে রাশিয়ার দীর্ঘকালের বন্ধুত্বের সম্পর্ক। মিত্ররাষ্ট্রের এই আসন্ন বিপদে রাশিয়ার পক্ষে নীরব থাকা সম্ভব নয়। এই দুঃসংবাদ কানে পৌঁছুতেই জার আলেক্‌জান্দার চঞ্চল হয়ে ওঠেন। রাশিয়ার বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে ওঠে নানা জল্পনা-কল্পনার গুঞ্জন, প্রবীণদের মুখে দেখা দেয় উৎকণ্ঠার আভাস।

নেপোলিয়নের বিরাট সেনাবাহিনী ধীরে ধীরে অস্তারলিট্স্ অভিমুখে এগিয়ে আসে। জানা যায়, সে-বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা অন্যূন দেড়

রাশিয়ার জার ছুটে গিয়ে অস্ট্রিয়ার সম্রাটকে অভয় দেন। সম্রাটকে সর্বশক্তি দিয়ে সাহায্য করবার আশ্বাস দেন তিনি।

দুই সম্রাটের মধ্যে স্থির হয়, অস্ট্রিয় এবং রুশ সেনাবাহিনী মিলিতভাবে নেপোলিয়নের আসন্ন আক্রমণ প্রতিরোধ করবে; জঙ্গীরাজের যুদ্ধলিপ্সা তারা মিটিয়ে দেবে।

রুশ বাহিনীর সর্বাধিনায়ক রূপে মনোনীত হন রাশিয়ার প্রবীণ সেনাপতি কুতুজভ্। আর, অস্ট্রিয়ার পক্ষের প্রধান সেনাপতি হন স্বয়ং সম্রাট ফ্রান্সিসের ভাইপো—আর্কডিউক ফার্ডিনাণ্ড।

ডিসেম্বর মাস। অস্তারলিট্স্-এর রণক্ষেত্রে যুদ্ধের দামামা বেজে ওঠে—

ফরাসীদের তুলনায় রুশ সেনাবাহিনীটিও বড় কম ছিল না। শৌর্য-বীর্যের জন্য রুশ জোয়ানদের খ্যাতিও ছিল যথেষ্ট।

রাশিয়ার সেনাবিভাগে সাজো সাজো রব পড়ে যায়। স্বতঃস্ফূর্ত হ'য়ে দেশের যুবকেরা ছুটে আসে সেনাবিভাগের শক্তি বাড়াতে।

রাশিয়ার প্রধান সেনাপতি কুতুজভের সদর দপ্তরের শিবির খোলা হয় অস্তারলিট্‌সের খুব কাছেই—ব্রোনোর কেল্লাতে।

নিজেদের ভাগ্য গড়ে তোলার জন্য রাশিয়ার সম্ভ্রান্ত ঘরের তরুণ সন্তানদের কাছে তখন জাতীয় সেনাবিভাগটি ছিল বড় লোভনীয়। সামান্য একটু তদ্বিরেই সেই সব নবীন যুবক সরাসরি অফিসার পদেই যোগ দেবার সুযোগ পেতো।

নিকোলাই-র বয়স তখন কতই বা হবে? ঐ বয়সেই দুঃসাহসিক সৈনিক জীবনের স্বপ্ন দেখত সে। সম্ভ্রান্ত ঘরের কিশোর ছেলে এই নিকোলাই—সে-ও মনের আনন্দে সেনা-বাহিনীতে নাম লেখায়। তবে সে যায় অফিসার পদে নয়, হুসার দলে—সাধারণ অশ্বারোহী বাহিনীতে, নগণ্য এন্‌সাইন পদে। কিন্তু তার প্রায় সমবয়সী বোরিস্‌ ভর্তি হয় গার্ড-বাহিনীতে।

গার্ড-বাহিনী দেশের সেরা সৈন্যদল। গোলাবৃষ্টির নীচে দাঁড়িয়ে তাদের শত্রুর মুখোমুখি হতে হয় না। অথচ, সম্রাটের নজরও থাকে তাদের ওপর। আবার, সেনাপাতদের চোখের সামনে থাকার দরুণ তারা সহজেই তাঁদের সহকারীর পদমর্যাদাও লাভ করে।

তদ্বির! তদ্বিরে অনেক দুর্লভও সুলভ হয়। নিকোলাইর বাবা কাউণ্ট রস্তভ্‌ ছিলেন মস্কোর অভিজাত সমাজের একটি উচ্চ স্তম্ভ। কিন্তু হ'লে কি হবে? তিনি ছিলেন সাদাসিধে দিলদরিয়া আমুদে ভদ্রলোক। তদ্বির করবার মতো মানসিক গঠন তাঁর ছিল না—বিশেষ ক'রে নিজের পুত্রের জন্য! তাই তিনি বেঁচে থাকতেও তাঁর পুত্র নিকোলাই গার্ড-বাহিনীতে ঠাঁই পায় না। অথচ তাঁরই আশ্রিত পিতৃহীন বোরিস্‌ মায়ের চেষ্টায় সেই দুর্লভ পদে চলে যায়।

অপরিমিত ব্যয় আর পরিচালনার দোষে কাউণ্টের জমিদারি তখন দেনায় ডুবু-ডুবু। তবুও তিনি বোরিসের মা-র কাতর প্রার্থনায় সাড়া না দিয়ে পারেন না। বোরিসের গার্ড-বাহিনীর উপযুক্ত সাজ-পোশাক এবং পাথেয়ের জন্য কাউণ্ট রস্তভ্‌ শ্রীমতী এ্যানা মিহালোভ্‌নার হাতে তুলে দেন সেই প্রয়োজনীয় অর্থ।

সাতশো রুবল নিয়ে বোরিস যাত্রা করে পীতর্স্‌বুর্গ অভিমুখে—সম্রাটের গার্ড-বাহিনীতে যোগ দিতে। আর আঠারো বছরের কিশোর নিকোলাই রিক্ত হাতে ছুটে চলে সীমান্তের দিকে।

স্কুল ছেড়ে সমরক্ষেত্রে। সৈনিকের সাজে বালক নিকোলাই যেন রাতারাতি যুবক হয়ে ওঠে। তার চোখে মুখে ফুটে ওঠে দৃঢ়তার সুস্পষ্ট ছাপ। নতুন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে সে তাকায় দুনিয়ার দিকে। ভবিষ্যৎকে নিকোলাই-র মনে হয় বড় গৌরবোজ্জ্বল।

বোন নাতাশা আর ছোট্ট ভাই পেতিয়া অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে নিকোলাই-এর গতিপথে। সেই অস্পষ্ট পথে নিকোলাই মিলিয়ে যেতে ছোট ভাই বোন দু'টি হাউ-হাউ করে কেঁদে ওঠে।

এমনি ভাবে তাঁদের আদরের সন্তানটি চলে যেতে কাউণ্টেস্ নীরবে চোখের জল মোছেন। ভাবেন—কোথায় অস্ট্রিয়া! কে-ই বা বোনাপার্ট! তাদের কলহের দরুণ রস্তভ্‌ পরিবারের দুলাল হবে কেন? কিশোর ছেলেকে এভাবে মৃত্যুর মুখে ঠেলে পাঠাবার সত্যিই কি কোন সঙ্গত কারণ ছিল?—কে তাঁকে বুঝিয়ে দেবে!

কাউণ্ট রস্তভের কিন্তু কোন ক্ষোভ হয় না। শ্লথ হয় না তাঁর জীবনের গতি। পুত্রের দুঃসাহসিকতা আর দেশের প্রতি অনুরাগে তিনি মুগ্ধ, গর্বিত।

একে কাউণ্টের পুত্র তায় অত অল্প বয়সে একজন সাধারণ সৈনিক হিসেবে নিকোলাই যুদ্ধে যোগ দেওয়ায় মস্কো এবং পীতর্স্‌বুর্গ শহরে ধন্

ধন্য রব ওঠে। এই সময় প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের পাট চুকিয়ে পিয়ের আসে পীতর্স্বুর্গ সহরে।

সকলেই জানে, রাশিয়ার অদ্বিতীয় ধনী কাউণ্ট বেজুখভ্ পিয়েরের জন্মদাতা। তবুও সে ছিল পিতৃপরিচয়হীন, সমাজে অপাঙ্ক্তেয়। তার কোন বংশ-মর্যাদা ছিল না। পিয়ের বেজুখভ্ বলে কেউই তাকে ডাকতো না।

অবৈধ সন্তান হলেও পিয়েরের প্রতি কাউণ্টের স্নেহ-ভালবাসা ছিল গভীর। তাঁর দৌলতে পিয়েরের এতদিন অর্থেরও অভাব হয়নি। তার জন্য দরাজ হাতে খরচ করতে দ্বিধা করেননি কাউণ্ট।

পিয়ের বোঝে, কাউণ্টের বয়স হয়েছে; তিনি আর বেশীদিন বাঁচবেন না। এ কথাও পিয়ের জানে,—কাউণ্টের সঙ্গে তার রক্তের সম্বন্ধ যতই নিবিড় হোক না কেন, আইনের দিক থেকে কাউণ্টের উত্তরাধিকারী সে কখনই হ'তে পারবে না। সে অধিকার চ'লে যাবে কাউণ্টের আশ্রিতা ভাইঝিদের হাতে; ছিটে-ফোঁটা তাঁর দূর-সম্পর্কীয় আত্মীয় প্রিন্স ভ্যাসিলির ভাগ্যেও জুটতে পারে। শুধু তাই নয়, বৃদ্ধ চোখ বুজলে তাঁর মস্কোর রাজপুরীতে একদিনের জন্যও পিয়েরের ঠাঁই হবে না। সে যে সকলের চোখের কাঁটা! পিয়ের উপলব্ধি করে, শীঘ্রই তাকে অর্থের অভাবে পড়তে হবে।

পীতর্স্বুর্গে পাঠাবার আগে বেজুখভ্ পিয়েরের হাতে দশ হাজার রুবল গুঁজে দিয়েছিলেন—হাতখরচের জন্য। তার থাকবার ব্যবস্থা হয়েছিল প্রিন্স ভ্যাসিলির বাড়িতে।

রাজধানী পীতর্স্বুর্গে পিয়ের আসলে এসেছিল ভাগ্যের সন্ধানে, বেড়াতে নয়। সামরিক বিভাগের প্রতি সে কোন আকর্ষণ বোধ করে না। বে-সামরিক চাকরিরই উমেদার ছিল সে।

চাকরির চেষ্টাও সে করেছিল। কিন্তু কোন ফল হয়নি। ওদিকে দশ হাজার রুবলও তার হাত থেকে কর্পূরের মতোই উবে যায়। অগত্যা

পিয়ের মস্কোতে বৃদ্ধ বেজুখভের বাড়িতে ফিরে যেতেই মনস্থ করে, অবশ্য বেজুখভ্ তখন অন্তিম শয্যায়।

মস্কোতে ফিরে যাবার আগের দিন ঘটনাচক্রে অন্তরঙ্গ বন্ধু আন্দ্রেই-র সঙ্গে পিয়েরের দেখা হয়।

সামাজিক মর্যাদা, ব্যক্তিগত চরিত্র বা দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে এই যুবক দু'টির মধ্যে কোথাও মিল ছিল না। তবুও কেমন ক'রে তাদের মধ্যে বন্ধুত্ব গ'ড়ে উঠেছিল।

আন্দ্রেই-র সঙ্গে দেখা হ'তে পিয়ের তাকে প্রশ্ন করে,—আচ্ছা বন্ধু, তুমি এ যুদ্ধে যাচ্ছো কেন? সম্রাটের কোন বাধ্যতামূলক আদেশ তো প্রচার হয়নি!

ক্লান্ত কণ্ঠে আন্দ্রেই জবাব দেয়,—ইচ্ছে করেই যাচ্ছি। কি জান, বৃদ্ধ বাবার দাঁতখিঁচুনি এবং স্ত্রীর প্যানপ্যানানি আর ভাল লাগে না ভাল লাগে না এই একঘেয়ে জীবন। দিনকতক এসব থেকে রেহাই পেতে চাই।

পরের দিন পিয়ের ফিরে যায় মস্কোতে। আন্দ্রেই যায় পিতার সঙ্গে দেখা করতে ব্লীক পাহাড়ের বাড়িতে।

আন্দ্রেই-র পিতা প্রিন্স ভল্‌কোন্‌স্কি ছিলেন রুশ দেশের সেরা লোকদের মধ্যে অন্যতম। বৃদ্ধ ভল্‌কোন্‌স্কি একদিন রাশিয়ার নামকরা সেনাপতি ছিলেন। তবে এ-যুগের যুদ্ধনীতি তাঁর পছন্দ নয়। তাই, তিনি ইচ্ছে ক'রেই আগেভাগে অবসর নিয়েছিলেন সেনাবিভাগ থেকে। কুমারী কন্যা মেরিয়াকে নিয়ে তিনি থাকেন ঐ পাহাড়ের বাড়িতে। ঐ নির্জন পাহাড়ে থেকেও সারা য়ুরোপের সব যুদ্ধের খবরাখবর রাখবার তাঁর আগ্রহের অন্ত ছিল না।

আন্দ্রেই ব্লীক পাহাড়ে পৌঁছুতে বৃদ্ধ প্রিন্স পুত্রের কাছ থেকে আসন্ন অস্ট্রিয়া-যুদ্ধের তোড়জোড় সম্বন্ধে জানতে চান। পুত্রের মুখ থেকে অভিযানের পরিকল্পনা শুনে বৃদ্ধ ভ্রূকুটি ক'রে ওঠেন। বলেন,—

—তোমাদের প্রধান সেনাপতি কুতুজভ্ আমার বিশেষ বন্ধু। কিন্তু

তিনি একজন দক্ষ সেনাপতি হ'য়ে এ রকম একটা আজগুবি পরিকল্পনাতে সায় দিলেন ?

সবিনয়ে আন্দ্রেই জানায়,—না, ঠিক তা নয়। কুতুজভ্ নামে মাত্র সেনাপতি। আসলে পরিকল্পনাটি রচনা করেছেন অস্ট্রিয়-সম্রাটের সামরিক উপদেষ্টারা। আমাদের মহামান্য জার তাতে সম্মতি দিয়েছেন। নেহাৎ তাঁদের কাউকে সেনাপতি করা যায় না ব'লেই কুতুজভ্‌কে সেখানে দাঁড় করান হয়েছে।

পুত্রের উক্তি শুনে টেবিলে সরোষে এক ঘুষি মেরে বৃদ্ধ প্রিন্স বলেন, এ রকম একটা কিছু হবে আমি জানতাম। তাই আগে থেকে মানে মানে আমি বিদায় নিয়েছি···

বৃদ্ধ কিন্তু পুত্রকে দেশের সেবায় আত্মনিয়োগ করতে বাধা দেন না। তিনি আন্দ্রেইকে আশীর্বাদ করেন।

আসন্নপ্রসবা স্ত্রীকে ব্লীক পাহাড়ের বাড়িতে রেখে আন্দ্রেই চলে যায় সেনাবিভাগে যোগ দিতে। তার পিতার সামান্য সুপারিশে আন্দ্রেই সেনাপতি কুতুজভের ব্যক্তিগত সহকারীর মর্যাদা লাভ করে। অল্পদিনের মধ্যেই সে হয়ে ওঠে কুতুজভের প্রিয়পাত্র, তাঁর আস্থাবান বিশেষ সহকারী।

ওদিকে কাউন্ট বেজুখভ্ গত হ'তে সকলকে হতাশ ক'রে পিয়ের-ই বেজুখভের সেই বিপুল সম্পত্তির মালিক হয়। ফলে, অপাঙ্‌ক্তেয় পিয়ের রাতারাতি হয়ে ওঠে সমাজের শিরোমণি। পিয়েরের সামান্য কৃপাদৃষ্টির জন্য সকলে হয় লালায়িত। পিয়েরকে যিনি সবচেয়ে বেশী ঘৃণা করতেন সেই সুবিধাবাদী প্রিন্স ভ্যাসিলি-ই সবার আগে ছুটে আসেন পিয়েরের কাছে। ভ্যাসিলি নিজেকে জাহির করেন, পিয়েরের শ্রেষ্ঠ শুভার্থী এবং অনুরাগী বলে।

ব্রোনোর কেল্লাতে কুতুজভের সদর দপ্তর। আশ-পাশে বহুদূর বিস্তৃত রুশ-সেনার দল আর উপদল।—

শত্রুবাহিনী আরও এগিয়ে আসতে অস্ট্রিয়ার প্রধান সেনাপতি চঞ্চল হয়ে ওঠেন। অবিলম্বে সমস্ত রুশসৈন্য নিয়ে কুতুজভ্‌কে তাঁর সঙ্গে যোগ দেবার জন্য তিনি অনুরোধ জানান।

কুতুজভ্ এ প্রস্তাবে মনের সায় পান না। তাঁর বিশ্বাস, তা হ'লে তাঁর স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হবে। কুতুজভ্ জানেন, সে-ক্ষেত্রে তিনি ইচ্ছামত কাজ করতে পারবেন না। তাই কুতুজভ্ গড়িমসি করেন, নানা ওজর দেখান্।

তবুও এক সময় রুশ সেনাবাহিনীকে কুতুজভ্ আর বাগ্রতিয়োর নেতৃত্বে মার্চ করতে হয়।

সব ব্যবস্থা ঠিক মত চলতে থাকলে সৈনিকরা বিক্ষুব্ধ হ'ত না। কিন্তু তা হয় না। তারা ঘণ্টার পর ঘণ্টা মার্চ ক'রে চলে। তবুও তারা শত্রুর নিশানা খুঁজে পায় না। ক্রমে তাদের মনে সন্দেহ জাগে। বিভ্রান্ত সৈনিকরা কেমন ক'রে আঁচ পায়ঃ অভিযানের পরিকল্পনা তাদের সেনাপতিদের রচনা নয়। তাতে কুতুজভের ব্যক্তিগত সমর্থন নেই। ফলে, সৈন্যদের মন বিদ্রোহ ক'রে ওঠে। প্রকাশ্যে অস্ট্রিয়দের উদ্দেশ্যে বিদ্রূপ বর্ষণ করতেও তারা দ্বিধা করে না। তবুও তাদের ঘন কুয়াশার ভেতর দিয়ে এগিয়ে যেতে হয়।

সেনাবাহিনী এক সময় বিচ্ছিন্ন ভাবে এগিয়ে এসে হোগুবাক নদীর তীরে পৌঁছায়। সেখানে শত্রুদের অপ্রত্যাশিত গুলি-গোলার শব্দে তারা চমকে ওঠে। ঐ বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতিতে সেনাপতিদের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় উপদেশ-নির্দেশ না পেয়ে কিছু সৈন্য দায়-সারা রকমের পাল্টা গুলি চালায়। কোন কোন কোম্পানী তখনও নিজেদের সেনানীর জন্য নীরবে অপেক্ষা করে।

চতুর্থ কোম্পানী, যার সঙ্গে রয়েছেন স্বয়ং কুতুজভ্, তখনও অনেক পেছনে—প্রাজেন উপত্যকায়।

অস্ট্রিয় সেনানাদের পরিকল্পনা ছিলঃ সোকোলনিজ আর শ্লাপনিজ গ্রাম দু'টির ওধারে গিয়ে ঘাঁটি পাতা। কিন্তু নেপোলিয়ন তাদের

অলক্ষিতে সে-দু'টি গ্রামকে পেছনে ফেলে, হোগুবাক নদী পেরিয়ে কখন প্রাজেনের মাথায় এসে হাজির হয়েছেন।

নেপোলিয়নের শ্যেন দৃষ্টি ছিল নীচের উপত্যকায়—কুতুজভের বাহিনীর ওপর। শত্রুর ওপর চরম আঘাত হানবার শুভ মুহূর্তের জন্য তিনি অপেক্ষা করছিলেন।

কুয়াশা একটু কাটতে কোথা থেকে হঠাৎ একটা কামান গর্জে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে উপত্যকাটি ধোঁয়ায় অন্ধকার হয়ে যায়। এই অতর্কিত আক্রমণের জন্য মিত্রশক্তির বাহিনীগুলো প্রস্তুত ছিল না। হঠাৎ কে একজন ভীত কণ্ঠে আর্তনাদ ক'রে ওঠে,—'সব শেষ'।

যুদ্ধক্ষেত্রে ভয়ের মতো মারাত্মক সংক্রামক ব্যাধি কিছু নেই। সেই 'সব শেষ' শুনে সৈন্যরা সকলে ছত্রভঙ্গ হ'য়ে পালাতে থাকে। আহত কুতুজভ্ অসহায় ভাবে পলাতক বাহিনীর স্রোতের গতি রোধ করবার চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁর সাধ্য কি? কোন ফল হয় না। সব শেষ হয়ে যায়।

বিভ্রান্ত অস্ট্রিয় বাহিনী অনেক আগেই ছত্রভঙ্গ হ'য়ে চারিদিকে ছুটে পালিয়েছিল। রুশ বাহিনী নিরাপদ জায়গায় হটে আসে। কুতুজভ্ও এক সময় সেখানে পৌছান। আন্দ্রেই গুরুতর ভাবে আহত হয়েও জাতীয় পতাকাটা আঁকড়ে প'ড়ে থাকে প্রাজেন পাহাড়ের উপত্যকায়।

অস্ট্রিয়া নেপোলিয়নের সঙ্গে সন্ধির প্রস্তাব করতে রুশ সেনাবাহিনী দেশে ফিরে আসে।

অস্তারলিট্সের যুদ্ধে আহত হবার পর নিকোলাই তার বীরত্বের জন্য লেফ্টেনাণ্ট পদে উন্নতি লাভ করে। বোরিস্ কিন্তু কোন বিপদের ঝুঁকি না নিয়েই, খোসামোদ এবং তদ্বিরের গুণে, পুরস্কৃত হয়।

যুদ্ধে রুশ-বাহিনা পরাজিত হলেও রাশিয়ার তাতে বিশেষ ক্ষতি হয় নি। এ পরাজয়ে রাশিয়ার মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয় নি বা কোন গ্লানিও তাকে স্পর্শ করে নি। কারণ, ফরাসী সৈন্য রাশিয়ার সীমান্ত ডিঙ্গিয়ে

দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে পারে নি। ফরাসীদের বিবাদটাও ছিল অস্ট্রিয়ার সঙ্গে, রাশিয়ার সঙ্গে নয়। তাই এতে রুশ সমাজ-জীবনের গতি ব্যাহত হয় নি। দেশের বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা চিরাচরিত নিয়মেই অবান্তর কথার অবতারণা ক'রে সময় কাটায়। তরুণ-তরুণীদের মধ্যেও প্রেম-লীলা চলে অবাধ গতিতে। দেশে আমোদ-প্রমোদের কোন অনুষ্ঠানেও ছেদ পড়ে না।

পিয়ের এখন আর সে পিয়ের নেই। সে এখন পিয়ের বেজুখভ্! পীতর্সবুর্গে বেজুখভ্ প্রাসাদে রাজার হালে পিয়ের বাস করে। নাছোড়বান্দা প্রিন্স ভ্যাসিলির ফাঁদে প'ড়ে তাঁর রূপসী কন্যা এলেনাকে পিয়ের এই সময় বিয়ে করে।

ঐ বিশাল জমিদারি হাতে পাবার আগেই পিয়ের নানা দেশ ঘুরেছিল। সে লক্ষ্য করেছিল বিভিন্ন জাতির শ্রমিক সমস্যা। তখনই তার মনে হয়েছিল,—শ্রমিকদের ক্রীতদাস ক'রে রাখা শুধু বর্বরতাই নয়, অর্থনীতির দিক থেকেও ক্ষতিকর। সুতরাং, প্রিন্স বেজুখভের জমিদারি তার হাতে আসার পর পিয়ের ভূমিদাসদের মুক্তি দেয়।

কিন্তু পিয়ের ছিল ভাববিলাসী—বাস্তবজ্ঞানহীন। তাই জমিদারিতে তার সংস্কার-প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। ক্রমে নানা অপ্রত্যাশিত অসুবিধার সৃষ্টি হ'তে চাষ-আবাদের কাজ প্রায় অচল হয়ে ওঠে। ফলে, পিয়ের অন্যসব জমিদারের উপহাসের পাত্র হয়। অগত্যা কর্মচারীদের ওপর চাষের সব দায়-দায়িত্ব চাপিয়ে বন্ধু আন্দ্রেই-র বাড়িতে গিয়ে সে স্বস্তির নিঃশ্বাস নেয়।

যুদ্ধের পর আন্দ্রেই ব্লীক পাহাড়ের বাড়িতে ফিরে এসে স্ত্রীকে আর দেখতে পায় না। তার পৌঁছুবার কিছু আগে গর্ভের সন্তানটিকে জন্ম দিতে গিয়ে ছোট প্রিন্সেস মারা যায়।

মাতৃহারা শিশু-পুত্রটির লালনের ভার মেরিয়া নিজ হাতে তুলে নেয়। দাদুর নাম অনুযায়ী হতভাগ্য শিশুটির নামকরণ হয় নিকোলে।

স্ত্রী-বিয়োগের শোক কাটিয়ে উঠতে আন্দ্রেই-র কিছুদিন সময় লাগে। তারপর তার জীবনের গতিটাই পাল্টে যায়—

অস্ট্রিয়া-যুদ্ধে থাকাকালীন সমর-বিভাগের অনেক কিছু অ-ব্যবস্থা তার নজরে পড়েছিল। তার দৃঢ় ধারণা, সে-সব ত্রুটি সংশোধন না হ'লে নেপোলিয়নের যুগে আত্মরক্ষা করা সম্ভব নয়। এবার সে তার সুচিন্তিত চিন্তাধারা শৃঙ্খলাবদ্ধ ভাবে লিখতে শুরু করে। উদ্দেশ্য, লেখা শেষে জারের কাছে এটি পেশ করবে।

সেইসঙ্গে পিতার জমিদারিও আন্দ্রেই নিজের হাতে তুলে নেয়। বন্ধু পিয়েরের আদর্শে ভূমিদাসদের অধিকাংশকে সে মুক্তি দেয়। যে সব ত্রুটির জন্য পিয়েরের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়েছিল, সেগুলি সম্বন্ধে গোড়া থেকেই সতর্ক থাকার দরুন আন্দ্রেই প্রমাণ করে দাসত্ব প্রথা বিলোপের সার্থকতা। আন্দ্রেই-র এই আদর্শ সৃষ্টি করে রাশিয়ার অর্থনৈতিক জীবনে এক নবযুগের সূচনা।

দিন যায়। কোন এক বৈষয়িক কাজের তাগিদে আন্দ্রেইকে মস্কো শহরে যেতে হয়। সেখানে রস্তভ্ পরিবারের সঙ্গে তার আলাপ হয়। বিপদটা হ'ল ঐখানে! নিকোলাই-র বোন রূপসী নাতাশাকে দেখে আন্দ্রেই মুগ্ধ হয়। তারা পরস্পর পরস্পরের প্রতি গভীর আকর্ষণ অনুভব করে।

স্ত্রী-বিয়োগের পর আন্দ্রেই স্থির করেছিল,—আর বিয়ে করবে না; দেশ এবং সমাজ সেবার ভেতর দিয়ে বাকী জীবনটা কাটিয়ে দেবে। কিন্তু নাতাশাকে দেখবার পর তার সে-সংকল্প কর্পূরের মতো উবে যায়। নাতাশা-বিহীন জীবন সে অন্ধকার দেখে।

পিয়েরের পারিবারিক জীবনে তখন শান্তি ছিল না। স্ত্রীর অবাঞ্ছিত আচরণে মন তার ক্ষুব্ধ। সেই গ্লানিকর জীবন থেকে মুক্তির জন্য পিয়ের একাকী নিঃসঙ্গ জীবন কাটাচ্ছিল। এমন সময় আন্দ্রেই গিয়ে বন্ধুকে নাতাশার প্রতি তার গভীর অনুরাগের কথা জানায়। নাতাশাকে তার

জীবনসঙ্গিনী হিসাবে লাভ করবার জন্য আন্দ্রেই বন্ধুর সাহায্য প্রার্থনা করে।

রস্তভ্ পরিবারের সঙ্গে পিয়েরের দীর্ঘকালের বন্ধুত্বের সম্পর্ক। নাতাশাকে সে বিশেষ স্নেহ করে। বন্ধুকে পিয়ের সমবেদনা জানায়। তাকে সে আশ্বাস দেয়।

আন্দ্রেই নাতাশাকে বিয়ে করবার প্রস্তাব করে। কন্যাপক্ষের কোন আপত্তি থাকে না। কিন্তু গোল বাধে তার বৃদ্ধ পিতাকে নিয়ে। পিতা দৃঢ় কণ্ঠে প্রতিবাদ করেনঃ গরীবের ঘরের মেয়ে। তায়, ঐটুকু মেয়ে—সংসারের অভিজ্ঞতাও কিছু হয়নি। সব চেয়ে বড় কথা, বিমাতার হাতে পড়লে শিশু নিকোলের লাঞ্ছনার শেষ থাকবে না।

বোন মেরিয়াও এ বিয়েতে আপত্তি তোলে। কে জানে, হয়ত মেরিয়া রূপসী নাতাশার রূপটাকেই সইতে পারেনি। হাজার হোক, মেরিয়া মেয়ে তো, তায় কুমারী!

বৃদ্ধ ভল্‌কোন্‌স্কি কিন্তু একমাত্র পুত্র আন্দ্রেইকে একেবারে নিরাশ করেন না। পুত্রকে এক বছর অপেক্ষা করতে উপদেশ দেন। এই সময়টা নানা দেশ ঘুরে আসবার পরও যদি আন্দ্রেই-র এ-বিয়ের সংকল্প অটুট থাকে তখন তিনি আন্দ্রেই-র আবেদন ভেবে দেখবেন বলে জানান।

সুদর্শন বিত্তবান আন্দ্রেইকে নাতাশাও গভীর ভাবে ভালবেসেছিল। তাই আন্দ্রেই-র মুখ থেকে তার পিতার মনোভাব জানতে পেরে নাতাশা ভেঙ্গে পড়ে।

আন্দ্রেই নাতাশাকে উৎসাহ দেয়। বলে, মাত্র একটা বছর তো! অমন ভাবে ভেঙ্গে পড়লে চলবে কেন? উভয়ের ভেতর স্থির হয়, তাদের বিয়ের ব্যাপারটা গোপন থাকবে। যাতে ক'রে নাতাশা নিঃসঙ্কোচে স্বাধীন ভাবে চলাফেরা করতে পারে।

দেশ ভ্রমণের উদ্দেশ্যে আন্দ্রেই চলে যায় সুইজারল্যাণ্ডে।

* * *

অস্ট্রিয়ার যুদ্ধ শেষ হলেও রাশিয়ার সেনাবিভাগের তৎপরতা বন্ধ

হয় না। কারণ, জঙ্গীরাজ নেপোলিয়নের রণতাণ্ডব তখনও পুরো দমে চলছিল য়ুরোপের নানাস্থানে—রাশিয়ার আশপাশে। সে সব রাষ্ট্র নেপোলিয়নের আক্রমণে দিশেহারা। প্রতিবেশী রাষ্ট্রের বিপদে রাশিয়ার পক্ষে নীরব দর্শক থাকা সম্ভব ছিল না।

নিকোলাই রোস্তভ্ তাই অস্ট্রিয়ার যুদ্ধের পরেও বিশ্রাম করতে পারে না। তাকে নানা যুদ্ধক্ষেত্রে লিপ্ত থাকতে হয়। সে তখন নবীন যুবক, পদস্থ সৈনিক। নিকোলাই নিজের জীবন তুচ্ছ করে যুদ্ধ করে দ্বিগুণ উৎসাহে।

১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দ। অক্টোবর মাস। নেপোলিয়ন জেনাতে প্রুসিয়ানদের পরাজিত ক'রে বিজয়-গর্বে বার্লিনে পৌঁছান। রাশিয়া তখন প্রতিবেশী প্রুসিয়ার সঙ্গে হাত মেলায়। এই দুই শক্তি মিলিতভাবে নেপোলিয়নের মুখোমুখি দাঁড়ায়। ১৮০৭ খ্রীঃ ফেব্রুয়ারী মাসে ইলু-র রণাঙ্গনে প্রচণ্ড লড়াই হয়। কোন্ পক্ষের পরাজয় হয় বলা শক্ত। কারণ, দারুণ শীতে অতিষ্ঠ হ'য়ে প্রুসিয়ার অধিপতি পিছু হটেন। নেপোলয়নও পিছু হটার সুযোগ পেয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস নেন।

ক'মাস পরে শীত চলে যেতে, ডানজিগ্ অধিকার ক'রে নেপোলিয়ন এগিয়ে যান দক্ষিণ দিকে। জুন মাসে ফ্রিডল্যাণ্ডে আবার যুদ্ধ হয়। এ যুদ্ধেও নিকোলাই লিপ্ত ছিল। রুশবাহিনী এ রণক্ষেত্রে নেপোলিয়নের হাতে মার খেলেও এর পরেই, ১৮০৭ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে, জার আলেকজান্দার এবং নেপোলিয়নের মধ্যে সন্ধি হয়। টিলসিট্ সন্ধি।

এই টিলসিট্ সন্ধির মধ্য দিয়েই দুই রাষ্ট্রপ্রধানের মধ্যে বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। নেপোলিয়ন স্বহস্তে ফরাসী দেশের শ্রেষ্ঠ সম্মানের প্রতীক 'লিজিয়ন অফ অনার' পদকটি পরিয়ে দেন জার আলেক্জান্দারকে। আলেক্জান্দারও নেপোলিয়নের গলায় পরিয়ে দেন সেণ্ট জর্জের পদকটি। নেপোলিয়ন জারকে অভয় দেন : বন্ধু, তুরস্ক এবং ফিনল্যাণ্ডে

যদি আপনার কোন স্বার্থ থাকে বা ভবিষ্যতে সে রকম কোন প্রশ্ন ওঠে, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আমি নাক গলাবো না।

নিকোলাই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে। ভাবে, ভালই হ'ল। এই সন্ধির ফলে এবার রাশিয়ার যুদ্ধ অভিযান শেষ হ'ল। ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে সুখে-শান্তিতে বাস করা যাবে।

* * *

বিয়েতে বাধার সৃষ্টি হ'তে নাতাশার দিনগুলি অশান্তিতে কাটছিল। এমন সময় পীতর্সবুর্গ থেকে এক বন্ধুপরিবারের আমন্ত্রণে নাতাশা সেখানে চলে যায়। কিন্তু সেখানে পৌঁছে সে বিপদের মুখে পা বাড়ায়; আর এক নতুন অশান্তি ডেকে আনে।

প্রিন্স ভ্যাসিলির কুখ্যাত পুত্র আনাতোলে বোন এলেনার গৃহে সুন্দরী নাতাশাকে দেখে। তার লোলুপ দৃষ্টি পড়ে নাতাশার ওপর। আনাতোলে বিবাহিত। সে জানে, নাতাশা আন্দ্রেই-র বাগ্‌দত্তা। তবুও লম্পটটা ক্ষান্ত হয় না। সে স্থির করে, যেমন ক'রে হোক নাতাশাকে ভুলিয়ে নিয়ে সে কোথাও পালাবে। আনাতোলে-র এ ষড়যন্ত্রে সহায় হয় তার বোন এলেনা।

অসৎ আনাতোলে নাতাশাকে নানাভাবে প্রলুব্ধ করে। তাকে বিয়ে করবার প্রস্তাব করে। নাতাশা সব শুনে দ্বিধাগ্রস্ত হয়। ভাবে, তাইতো শেষ পর্যন্ত যদি আন্দ্রেই-র সঙ্গে তার বিয়ে না হয়! ওদিকে শ্রীমতী এলেনাও তাকে উৎসাহ দেয়। একটি ভূয়ো বিয়েরও আয়োজন হয়। এদের ফাঁদে পড়ে নাতাশা আনাতোলে-র সঙ্গে পালিয়ে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করে। দু'জনের পালাবার সময় স্থির হ'তেও দেরী হয় না।

কিন্তু নাতাশার বরাত ভাল। কি করে যেন সহৃদয় গৃহিণীর মনে সন্দেহ জাগে। তিনি সতর্ক হন। নাতাশাকে ঘরে তালা বন্ধ করে রাখেন। কেলেঙ্কারীর খবরটা পিয়েরের কানে পৌঁছুতে সে ছুটে এসে নাতাশাকে সর্বনাশের হাত থেকে বাঁচায়। পিয়ের আনাতোলেকে শহর থেকে তাড়িয়ে দিয়ে নাতাশাকে সস্নেহে অভয়-আশ্বাস দেয়।

তার ভুল বুঝতে পেরে পিয়েরের প্রতি কৃতজ্ঞতায় নাতাশার মন ভরে ওঠে। সে-কথা ব্যক্ত করবার ভাষা সে খুঁজে পায় না। পিয়েরের প্রতি নাতাশার শ্রদ্ধা আরও গভীর হয়।

এমন সময় আন্দ্রেই-র বোন সুন্দরী মেরিয়ার সঙ্গে নিকোলাই রস্তভের পরিচয় হয়। প্রথম পরিচয়েই তারা পরস্পর পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হয়। কিন্তু বিয়ের প্রস্তাব ওঠে না। ওঠে না এই কারণে যে তারা জানে, বৃদ্ধ ভল্‌কোন্‌স্কি তাঁর একমাত্র কন্যাকে ক্ষয়িষ্ণু ঘরের নিকোলাই-র হাতে তুলে দিতে কিছুতেই রাজী হবেন না।

*   *   *

মস্কো-পীতর্সবুর্গের অভিজাত সমাজে এসব আকর্ষণ-বিকর্ষণের টানাপোড়েন যখন চলছিল, নেপোলিয়নের রাজমহিমার খ্যাতি তখন মধ্যগগনেঃ মধ্য ও পশ্চিম য়ুরোপের রাজারা তখন নেপোলিয়নের আজ্ঞাবহ। তাঁর ভ্রূকুটিতে সিংহাসনগুলি একের পর এক উল্‌টে পড়ছে—অনুগ্রহজীবীরা স্পেন, হল্যাণ্ড এবং নেপল্‌স্‌-এর রাজসিংহাসন অলঙ্কৃত করছেন। তাঁর একমাত্র অপরাজিত শত্রু—ইংলণ্ড। ঐ ক্ষুদ্র দ্বীপটি যেন নেপোলিয়নের ভাগ্যাকাশে একটি শনিগ্রহ!

টিলসিট্‌ সন্ধি-চুক্তিতে স্থির হয়েছিল, প্রয়োজনে রাশিয়া ইংলণ্ডের বিপক্ষে ফরাসাদের সমর্থন করবে। তবুও অকারণে নেপোলিয়নের মনে এক সময় সন্দেহ জাগে,—জার আলেক্‌জান্দার ইংলণ্ডের পক্ষপাতী। ফলে, নেপোলিয়ন রাশিয়ার প্রতি বিরূপ হন। জারের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্বের সম্পর্ক শিথিল হয়।

১৮১০ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ার দিক। নেপোলিয়ন হঠাৎ জারকে জানান,—পোল্যাণ্ড সম্বন্ধে রাশিয়ার আর মাথা ঘামাবার প্রয়োজন নেই। জার আলেক্‌জান্দার এ কথার তাৎপর্য বুঝতে পারেন না। ক্রমে নানা কারণে নেপোলিয়নের বন্ধুত্বের প্রতি তাঁর মনে সন্দেহ উঁকি দেয়।

ওদিকে নেপোলিয়নের দৃঢ় বিশ্বাস হয়, রাশিয়াকে পদানত করতে না পারলে তাঁর দিগ্বিজয় অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। তিনি সঙ্কল্প করেন,

যেমন ক'রে হোক রাশিয়াকেও পদানত করবেন ; যেমন করেছেন অস্ট্রিয়ার সম্রাট, ইতালির বিভিন্ন অঞ্চলের রাজা এবং নানা দেশের ডিউক এবং গ্রাণ্ডডিউকদের।

চতুর নেপোলয়ন অস্ট্রিয়াকে তাঁর আদর্শ কর্মস্থল ব'লে মনে করেন। সেই সঙ্গে তিনি রাশিয়ার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে শত্রুরাষ্ট্র অস্ট্রিয়ার সঙ্গে অভাবিত ভাবে হাত মেলাতে এতটুকুও দ্বিধা করেন না। উদ্দেশ্য-সিদ্ধির জন্য নেপোলিয়ন অস্ট্রিয়া-অধিপতির কন্যা মেরী লাউসিকে বিয়ে করেন।

এমন ভাবে অস্ট্রিয়ার রাজকন্যাকে নেপোলিয়ন বিয়ে করাতে জার আলেক্‌জান্দার সচকিত হন। তিনি বুঝতে পারেন, বন্ধুত্বের নামে নেপোলিয়ন এতদিন তাঁর সঙ্গে ছলনা করেছেন। নেপোলিয়নের মুখোস খুলে পড়তে জার চিন্তিত হন।

এমন সময় নেপোলিয়ন জার আলেক্‌জান্দারকে হঠাৎ একদিন বহু অলীক অভিযোগ সম্বলিত এক রূঢ় চিঠি দেন। জার হতভম্ব। তাঁর কাছ থেকে কোন উত্তরের অপেক্ষা না করেই নেপোলিয়ন তাঁর বিপুল সৈন্যবাহিনী চালনা করেন রাশিয়ার দিকে।

১৮১২ খ্রীষ্টাব্দ। জুন মাসে নেপোলিয়নের বিপুল বাহিনী নীমেন নদী পার হ'য়ে রুশদেশের সীমানায় এসে হাজির হয়। বিনা বাধায় তারা পরিত্যক্ত স্মলেন্‌স্ক নগরীতে এসে পৌঁছায়।

রুশবাহিনীর মধ্যে সাজো সাজো রব পড়ে যায়। জার আলেক্‌জান্দারের আহ্বানে পুরাতন সৈনিকেরা ফিরে আসে সেনাবিভাগে। দেশের মান বাঁচাতে ছুটে আসে তরুণ এবং নবীন যুবকের দল যুদ্ধে যোগ দিতে ; কিশোররাও পিছিয়ে থাকে না। তারা আসে সাধারণ এবং সম্ভ্রান্ত ঘর থেকে। বীর সন্তানরা আসে গাঁ উজাড় ক'রে। হাসিমুখে আসে তারা শহর মস্কো আর রাজধানী পীতর্স বুর্গ থেকেও।

আন্দ্রেই তখন সুইজারল্যাণ্ডে। তার শরীর ভাল নয়। তা সত্ত্বেও

সেও ছুটে এসে সেনাপতি কুতুজভ্‌কে সেলাম ঠোকে। নিকোলাই-র ছোট ভাই বালক পেতিয়া-ও দাদার পিছু পিছু ছুটে আসে।

সেপ্টেম্বরের গোড়াতে কুতুজভের নেতৃত্বে রুশবাহিনী শত্রুর সামনে রুখে দাঁড়ায় বোরোদিনোতে।

প্রধান সেনাপতি কুতুজভের কিন্তু ইচ্ছা ছিল না শত্রুদের বোরোদিনোতে বাধা দেবার। তাঁর ইচ্ছা ছিল সেখান থেকেও স'রে প'ড়বার, যেমন তিনি হটে এসেছিলেন ভিল্‌না এবং স্মলেন্‌স্ক থেকে। ফরাসীদের বিপুল বাহিনীর সঙ্গে সম্মুখ যুদ্ধে নিজের শক্তি নষ্ট করার পক্ষপাতী ছিলেন না তিনি। তাঁর বিশ্বাসঃ রুশবাহিনী অক্ষুণ্ণ থাকলে একদিন রাশিয়া বিপন্মুক্ত হবে। এমন কি বোরোদিনোর পর মস্কো শহর হস্তচ্যুত হলেও দেশ বাঁচবে, কিন্তু সেনাবাহিনী ধ্বংস হলে দেশকে বাঁচানো যাবে না।

কুতুজভ্‌ চেয়েছিলেন, লোভ দেখিয়ে ফরাসী সেনাকে রাশিয়ার অভ্যন্তরে ঢোকাতে। তাহলে নেপোলিয়ন তাঁর স্বদেশ এবং শক্তির কেন্দ্র থেকে হাজার হাজার মাইল দূরে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বেন। ঠিক সেই সময় রুশ সেনা রুখে দাঁড়ালে ফরাসী বাহিনীর ওপর আসবে চরম বিপর্যয়। কিন্তু জারের চাপে কুতুজভ্‌কে বোরোদিনোতে জঙ্গীরাজ নেপোলিয়নের সামনে রুখে দাঁড়াতে হয়।

ধূর্ত নেপোলিয়নও ঠিক এমনটিই চাইছিলেন। কারণ, রাশিয়ার সামরিক শক্তি চূর্ণ না করে তিনি ঐ সুবৃহৎ দেশটির অভ্যন্তরে ঢোকার বিপদ সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন। তাই রুশ বাহিনী এগিয়ে আসতে নেপোলিয়ন উল্লসিত হন।

নিকোলাই রস্তভ্‌ এখন একজন অফিসার—একদল হুসার সৈন্যের অধিনায়ক। তার অসাধারণ বীরত্বের জন্য দেশের শ্রেষ্ঠ সম্মানের প্রতীক দুর্লভ 'সেণ্ট জর্জ ক্রশ' সে লাভ করেছে। কর্নেল পদেও উন্নীত হয়েছে।

ভীষণ যুদ্ধ হয় বরোদিনোর রণাঙ্গনে। রুশবাহিনীর ক্ষতি হয় যথেষ্ট। তবুও সৈন্যরা স্থান ত্যাগ করে না। তারা যুদ্ধ করে অমিত

বিক্রমে। ফরাসীদের মোহ ভাঙ্গে। তারা চমকে ওঠে। ভাবে, তাদের দুর্বার আক্রমণের মুখে অটল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবার মতো সৈন্যও তাহলে আছে। বিশ্বজয়ী নেপোলিয়নের মুখে ফুটে ওঠে উদ্বেগের ছায়া।

তবুও নানা কারণে সেনাপতি কুতুজভ্‌কে মস্কোতে হটে আসতে হয়। তারপর মস্কোতে একদিনও না দাঁড়িয়ে তিনি আরও পিছিয়ে যান—উত্তরের দিগন্ত-বিস্তৃত প্রান্তর পেরিয়ে।

মস্কো পড়ে থাকে অরক্ষিত। শহরটি ছেড়ে চলে যাবার আগে রুশ বাহিনী চারিদিকে আগুন জ্বালিয়ে দেয়। এই অগ্নিকাণ্ডের ফলে মহানগরী মস্কো মহাশ্মশানে পরিণত হয়।

তারা জানে, তবুও জঙ্গীরাজ মস্কো শহরে হানা দেবে; ফরাসী সৈন্যরা শহর এবং শহরতলি লুঠ করবে, করবে তারা অকথ্য অত্যাচার। তাই যে যেদিকে পারল পালাল। প্রিন্স ভল্‌কোন্‌স্কির পর রস্তভ্‌ পরিবারও চলে যায়। পিয়ের কিন্তু শহর ছেড়ে যায় না। বরোদিনোর যুদ্ধ প্রত্যক্ষ করে পিয়ের সারাক্ষণ কি এক গভীর চিন্তায় মগ্ন থাকে।

নিজের জীবন তুচ্ছ করে পিয়ের মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে, যেমন করে হোক নেপোলিয়নকে হত্যা করবে। মস্কোতে আত্মগোপন ক'রে থেকে পিয়ের নেপোলিয়নের জন্য দিন গুণতে থাকে। রাজপ্রাসাদ ছেড়ে গরিব চাষীর বেশে গোপন উদ্দেশ্য নিয়ে পিয়ের রাস্তায় ঘোরাফেরা করে।

কিন্তু নিয়তির লিখন ছিল প্রতিকূল। অত্যাচারী ফরাসী সৈনিকের কবল থেকে এক আর্ত নারীর সম্ভ্রম বাঁচাতে গিয়ে ছদ্মবেশী পিয়ের একদিন ধরা পড়ে যায়।

রাজনৈতিক অপরাধে পিয়ের ফরাসীদের হাতে বন্দী হয়। বিচারে স্থির হয়, যুদ্ধশেষে অন্যান্য বন্দীদের সঙ্গে পিয়েরও চালান যাবে ফরাসীদেশে।

বরোদিনোর যুদ্ধ শেষে যুদ্ধক্ষেত্র হ'তে গাড়ী ভর্তি করে আহত রুশ সৈনিকদের নিয়ে আসা হয় মফঃস্বল অঞ্চলের দিকে। ব্যবস্থা হয়,

আহতদের সেবা-শুশ্রূষা করবে স্থানীয় লোকেরা ; ডাক্তাররা পালা করে হাজিরা দেবেন।

রস্তভ্‌দের পল্লীভবনের নিভৃত অঞ্চলে একদিন এসে দাঁড়ায় কটা গাড়ী। স্ট্রেচারে করে পর পর আহতদের সেই বাড়ির ভেতর তোলা হচ্ছিল। উপরের জানালাটিতে বসে নাতাশা একদৃষ্টিতে দেখছিল—কারও সর্বাঙ্গ চাদরে ঢাকা, কারও বা ম্লান মুখখানি একটু দেখা যায়।

হঠাৎ একটি ক্লান্ত করুণ মুখের ওপর নজর পড়তে নাতাশা চমকে ওঠে। সে দ্রুত পায়ে নীচে নেমে আসে তার সন্দেহ ভঞ্জন করতে। না, তার চিনতে ভুল হয়নি।—সে যে তার পরমপ্রিয়জন, আপন ধন—প্রিন্স আন্দ্রেই। আন্দ্রেই-র অবস্থা দেখে নাতাশার মাথায় যেন আকাশ ভেঙ্গে পড়ে।

ওদিকে বৃদ্ধ প্রিন্স ভল্‌কোন্‌স্কি দেশের এ বিপর্যয়ের আঘাত সহ্য করতে পারেন না। তিনি হৃদ্‌রোগে মারা যান। বৃদ্ধ গত হ'তে নিকোলাই রস্তভের সাহায্যে তাঁর পরিবারবর্গকে নিরাপদ আশ্রয়ে স্থানান্তরিত করা হয়।

এই বিপদের কথা কানে পেঁছুতে মেরিয়া অগ্রজের বালক পুত্রটিকে সঙ্গে নিয়ে ছুটে যায় রস্তভ্‌দের বাড়িতে। আন্দ্রেই তখন অন্তিম শয্যায়। এদের তিনজনকে একসঙ্গে জীবনে কোনদিন দেখতে পাবে বলে আন্দ্রেই আশা করেনি। তাদের দেখে তার ম্লান মুখে করুণ হাসির রেখা ফুটে ওঠে।

এই পরিবেশে মেরিয়া এবং নাতাশা হঠাৎ একাত্ম হয়ে ওঠে। তারা দু'জনে প্রাণ ঢেলে আহত আন্দ্রেইকে সেবা করে। কিন্তু কোন ফল হয় না। আন্দ্রেই একদিন তাদের অলক্ষিতে ঘুমের মধ্যে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে মুক্তি পায়। রাশিয়ার অভিজাত সমাজের একটি ফুল দেশের সেবায় ঝ'রে পড়ে।

আন্দ্রেই গত হলেও নাতাশার সঙ্গে মেরিয়ার বন্ধুত্ব আরও নিবিড়

হয়। নিকোলাইও মেরিয়ার প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ে। মেরিয়াও মনে মনে নিকোলাইকে ভালবাসে।

প্রিন্স রস্তভের তখন দারুণ অর্থকষ্ট চলছিল। তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র বালক পেতিয়ার মৃত্যু-সংবাদ তাঁকে বজ্রাঘাতের মতো আঘাত করে। বৃদ্ধ পুত্রশোক সামলাতে পারেন না, মারা যান।

নেপোলিয়ন তখন মস্কোর শ্মশান-নগরীতে। পাঁচ সপ্তাহ গড়িয়ে যায়। তবুও জার আলেক্জান্দার সন্ধি ভিক্ষা করতে এগিয়ে আসেন না। নেপোলিয়ন চিন্তিত হন। তিনি ভুলে যান আলেক্জান্দারের দৃঢ় সংকল্প : ফরাসী বাহিনীর শেষ সৈনিকটি নীমেন নদীর ওপারে চলে না যাওয়া পর্যন্ত জার সন্ধির কথা ভাববেন না।

ওদিকে মস্কোতে তখন ফরাসী সৈন্যদের একদিনেরও খাদ্য নেই। জার্মানি বা পোল্যাণ্ড থেকে রসদ আমদানী করা সময়সাপেক্ষ। ফরাসী সৈন্যরা খায় কি? তাছাড়া, সীমান্ত থেকেও তারা দেড় হাজার মাইল দূরে চলে এসেছে। নেপোলিয়ন এ কথাও জানেন, রুশ বাহিনী আর সম্মুখ যুদ্ধে এগিয়ে আসবে না।

প্রচণ্ড শীত। অবিরত বরফ বৃষ্টি। কোথাও রাস্তার চিহ্ন চোখে পড়ে না। চারিদিকে শুধু বরফের পাহাড়। এ অবস্থায় নেপোলিয়ন আর অগ্রসর হওয়া সমীচীন মনে করেন না।

মহাসমস্যায় পড়েন নেপোলিয়ন—

অগত্যা মস্কো ছেড়ে নীমেন নদীর দিকে পিছু হটতে শুরু করেন তিনি। সঙ্গে যায় কয়েক হাজার বন্দী। কোটি কোটি রুবলের মালিক বন্দী পিয়েরও ছিন্ন বস্ত্রে, নগ্ন পায়ে বরফের ওপর দিয়ে চলে তাদের সঙ্গে—চিরনির্বাসনের পথে।

সেই জনপ্রাণিহীন দুর্গম পথে যদি-বা দৈবাৎ কোন খাদ্য মেলে, সৈন্যরা-ই খায়। বন্দীদের ভাগ্যে জোটে হরিমটর! চলার পথে বহু সৈন্য আর বন্দী জীবন-যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পায়। পিয়ের তবুও বেঁচে থাকে।

পলায়মান ফরাসী সৈন্যরা তখন ধুঁকছে। কুতুজভের সৈন্যেরা পেছন থেকে সে-বাহিনীর ওপর চড়াও হয়। বাজ পাখীর মতো অশ্বারোহী কসাক দলও তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। ফলে, অনাহার-ক্লিষ্ট ফরাসী সৈন্যরা পরিত্রাহি ডাক ছাড়ে। তারা দল ছেড়ে এদিক ওদিক পালিয়ে বাঁচে। এমনি এক কসাকদলের অতর্কিত আক্রমণের ফলে পিয়ের মুক্তি পায়।

ফরাসী সেনাবাহিনী নীমেন নদীর তীরে পৌঁছুবার আগেই চূড়ান্ত ভাবে বিপর্যস্ত, লাঞ্ছিত হয়। পাঁচ লক্ষ সৈন্যের মধ্যে তখন অবশিষ্ট থাকে মাত্র কয়েক হাজার সৈন্য। তারাও দিশেহারা।

১৮১২ খ্রীঃ। ডিসেম্বরের মাঝামাঝি। বেগতিক বুঝে নেপোলিয়ন বাহিনী ছেড়ে প্রাণ নিয়ে পালান। কোন রকমে প্যারিসে পৌঁছে নেপোলিয়ন স্বস্তির নিঃশ্বাস নেন। তাঁর পেছনে পড়ে থাকা সৈন্যদল প্রচণ্ড তাড়া খেয়ে চরম বিপর্যয়ের মধ্যে কোন রকমে নীমেন নদী পার হ'য়ে হাঁপ ছেড়ে বাঁচে। এ সেই ঐতিহাসিক পলায়ন!

বন্ধু আন্দ্রেই এবং পত্নী এলেনার মৃত্যু-সংবাদে পিয়ের মর্মাহত হয়। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে পিয়ের সে-শোক সামলে নেয়। তারপর সে বেরোয় পুরানো-পরিচিত বন্ধুদের সন্ধানে।

প্রথমে সে এসে হাজির হয় রস্তভ্ পরিবারের বাড়িতে। এতদিন বাদে নাতাশাকে দেখে সে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে থাকে। নাতাশার তখন শূন্য মন, ভরা যৌবন। পিয়েরের সে দৃষ্টির অর্থ বুঝতে নাতাশার ভুল হয় না। পিয়েরের প্রস্তাবে নাতাশা খুশিমনে তার গলায় মালা পরিয়ে দেয়। তাদের বিবাহিত জীবন সুখের হয়। নিকোলাই ভগ্নীপতি পিয়েরের সাহায্যে স্বর্গত পিতার ঋণ শোধ করে। তারপর আন্দ্রেইর বোন প্রেয়সী মেরিয়ার সঙ্গে তার বিয়ে হ'তে আর বাধা থাকে না। স্ত্রীর ঐশ্বর্যের দৌলতে নিকোলাই অভিজাত সমাজে আবার সহজ ভাবেই আসন লাভ করে।

বিয়ের পরেও পিসির কাছে নিকোলুস্কার আদর-যত্ন একটুও কমে না। নিজের সন্তানদের চেয়েও শ্রীমতী মেরিয়ার প্রাণের টানটা যেন ভাইপোর ওপরই বেশী।

ভাইপোর মুখখানি যেন তার পিতার মুখেরই প্রতিচ্ছবি। বালক নিকোলুস্কা ভেবে পায় না,—তার পিসিমণি মাঝে মাঝে কেন অমন সজল নয়নে তার দিকে তাকিয়ে থাকে।

যুদ্ধান্তেও কালের স্রোত ব'য়ে চলে। জীবন-প্রবাহে ব'য়ে চলে পুত্র কন্যা সহ দু'টি দম্পতি—পীয়ের-নাতাশা এবং নিকোলাই-মেরিয়া।

[ইতালিয় সাহিত্যের দিক্‌পাল গাব্রিএলে দান্নুনৎস্ও (Gabriele D'Annunzio)-র 'দি ট্রায়াম্ফ্‌ অফ্‌ ডেথ্‌' (The Triumph of Death), ১৮৯৪, উপন্যাসটির গল্পরূপ।]

হিপ্পোলাইৎ অপরূপ সুন্দরী, বিবাহিতা তরুণী। কিন্তু বিয়ে তার সুখের হয় নি; স্বামী তার দেহ-মনে কোনদিনই সাড়া জাগাতে পারে নি। এই আশাভঙ্গের বেদনায় অসুস্থ দেহ-মন নিয়ে বিয়ের ক'সপ্তাহ বাদেই সে ফিরে আসে তার বাপের-বাড়ি। হিপ্পোলাইতের জীবন হয় বেদনাময়, তার দিন কাটে নিঃসঙ্গ।

এমন সময় তরুণ কবি জর্জের সঙ্গে হিপ্পোলাইতের একদিন পরিচয় হয়। প্রথম সাক্ষাতেই ওরা পরস্পর পরস্পরের প্রতি অনুরক্ত হ'ল। অল্পদিনের মধ্যেই উভয়ে উভয়কে গভীর ভাবে ভালবাসল।

জর্জ ধনী বনেদী পরিবারের ছেলে, বিপুল সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারী। অর্থ উপার্জনের জন্য জর্জকে ভাবতে হয় না। উদ্দাম প্রেমিক সে। যৌবনের খেয়াল খুশি মেটাবার জন্য তার অর্থের অভাব হ'তো না। কিন্তু বয়সের সঙ্গে সঙ্গে জর্জের দেহটা বিকশিত হলেও মনটা তার পরিণত হয় নি।

স্বামীর কাছ থেকে হিপ্পোলাইৎ যা কোনদিন পায় নি, জর্জ তাকে তা পূরণ করে দেয়। জর্জ জাগায় তার চেতনাহীন নারীত্বকে। হিপ্পোলাইৎ উপলব্ধি করে জীবনের নতুন অর্থ, পায় তার মধুর স্বাদ। জর্জের মধ্যে সে খুঁজে পা বেঁচে থাকার আনন্দ। সেই সঙ্গে সে ফিরে পায় তার যৌবনদীপ্ত গবন্ত দেহমনকেও।

কিন্তু স্বামী জীবিত থাকতে হিপ্পোলাইৎ জর্জকে বিয়ে করতে পারে অথচ স্বামীর সঙ্গে বিবাহ-বিচ্ছেদও সম্ভব নয়; দেশে তা রীতি-

বিরুদ্ধ। তা হোক্। ওরা দু'জনে খেয়াল খুশি মত ইতালির সর্বত্র ঘুরে বেড়ায়। কিন্তু তাতে জর্জের মন ভরে না।

হিপ্পোলাইতের প্রেম শান্ত, স্বাভাবিক। একজন যুবতী যেমন করে একজন যুবককে ভালবাসে তেমনি। কিন্তু জর্জের ভালবাসা সর্বগ্রাসী। সে হিপ্পোলাইতের জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত পুরোপুরি ভাবে পেতে চায়। জর্জ কামনা করে, অন্য কারো এমন কি হিপ্পোলাইতেরও তার নিজের ওপর কোন অধিকার থাকবে না; সে চায় না হিপ্পোলাইতের আলাদা জীবন, তার ভিন্ন কোন সত্তা। সে চায় হিপ্পোলাইৎ তার দেহ-মনের সঙ্গে পুরোপুরি মিশে যাক্।

এই সর্বনাশা প্রেম জর্জকে উন্মত্ত করে তোলে। তার উত্তাপে হিপ্পো-লাইৎও ক্রমে অস্থির হয়ে ওঠে। শেষে জর্জের প্রেমে পুরোপুরি আত্মদান করে সে তৃপ্তির নিঃশ্বাস নেয়।

জর্জের বন্ধুরা একদিন জর্জকে আড়ালে ডেকে জানায়,—কথা শোন জর্জ। কেন তুমি এ মেয়েটির জন্য অনর্থক পাগল হচ্ছো? কেন তুমি বোকার মত ওর পেছনে ঘুরে তোমার জীবনটা নষ্ট করছ? এখনও সময় আছে, তুমি ঐ ছলনাময়ীর মোহমুক্ত হও। তুমি ওর বাইরের সৌন্দর্যটা দেখেই মুগ্ধ হয়েছ। কিন্তু ওর ভিতরের কদর্য রূপটির খবর তো তুমি জান না—তা নিতান্ত কুৎসিত। তুমি জেনো, তোমার চেয়ে ধনী অন্য কারুর কাছ থেকে একটু ইশারা পেলেই সঙ্গে সঙ্গে তোমাকে ছেড়ে তোমার এই হিপ্পোলাইৎ ছুটে চলে যাবে তার কাছে। তোমার দিকে একবার ফিরেও তাকাবে না।

বন্ধুদের উক্তি শুনে জর্জের মনে দ্বিধা জাগে। সে একবার ভাবে,—না না, এ হতে পারে না। এ অসম্ভব। হিপ্পোলাইৎ পুরোপুরি একমাত্র তারই। তারা দু'জনে একাত্ম।

পরক্ষণেই নতুন এক চিন্তা তার মনে ভেসে ওঠে: সত্যই যদি হিপ্পোলাইৎ তাকে ছেড়ে চলে যায়—সে থাকবে কি নিয়ে, বাঁচবে কি করে? ঐ নিষ্ঠুর কথা জর্জ আর ভাবতে পারে না।

জর্জ প্রতিমুহূর্তে অনুভব করে, তার দেহের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রতি রক্ত-কণিকায় হিপ্পোলাইতের অস্তিত্বের উদ্দীপ্ত ঘোষণা। সে-অস্তিত্ব অস্বীকার করা সম্ভব নয়, সহজ নয় তাকে ভুলে যাওয়া। হিপ্পোলাইৎ-হীন জীবন সে ভাবতে পারে না। নিজের শৃঙ্খলিত অসহায় অবস্থা উপলব্ধি করে জর্জের মন ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে। হিপ্পোলাইৎ সত্যিই যদি তাকে ত্যাগ করে চলে যায় তাহলে তার পরিণতি যে কী মর্মান্তিক হবে তাই ভেবে জর্জ মাঝে মাঝে শিউরে ওঠে। এই মর্মান্তিক দ্বন্দ্বের আবর্তে পড়ে সে মানসিক শান্তি হারিয়ে ফেলে।

কিছুদিন পরে এক হতভাগ্য যুবকের নিষ্ঠুর আত্মহত্যা প্রত্যক্ষ করে এই প্রেমিক যুগলের মনে বিশেষ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। ক্ষুণ্ণ হয় তাদের আশা, উদ্দীপনা।

জর্জ স্থির করে, শহরের কোলাহল থেকে এবার তারা দু'জনে চলে যাবে দূরে কোন নির্জন সৈকতে—যেখানে তাদের পরিপূর্ণ মিলনের পথে কোন বাধা থাকবে না।

কিন্তু সুন্দর নির্জন পরিবেশে এসেও তাদের আকাঙ্ক্ষিত মিলন হল না, হল না তাদের জীবন সুন্দর, মধুময়! দু'জনে গির্জায় যায়, প্রার্থনা করে। কোন ফল হয় না। ঈশ্বরের নামেও নেভে না সেই কামনার আগুন, শান্ত হয় না তাদের অশান্ত মন।

এবার জর্জ ভাবে, তবে কি হিপ্পোলাইৎ ফুরিয়ে গেল?… ব্যর্থ হ'ল তার জীবন-যৌবন? হিপ্পোলাইৎ-কে আজকাল কেমন যেন নিরুত্তাপ ব'লে মনে হয় জর্জের। ক্রমে তার মন সন্দিগ্ধ হয়ে ওঠে।

এতদিন হিপ্পোলাইৎ-কে খুঁটিয়ে দেখবার অবকাশ ছিল না তার। এখন তার দেহের নানা খুঁত জর্জের চোখে পড়ে। কখনও-বা সে সরব কণ্ঠে বলে ওঠে,—ইস্, হিপ্পোলাইৎ তোমার পা দু'টো দেখতে কি বিশ্রী!

হিপ্পোলাইৎও মুক্ত কণ্ঠে জর্জের নানা খুঁত নিয়ে খোঁটা দিতে দ্বিধা করে না।

ক্রমে হিপ্পোলাইৎ বুঝতে পারে জর্জ আর আগের মত নেই। সে লক্ষ্য করে, জর্জ আজকাল প্রায়ই অকারণ কেমন বিষন্ন মনে একান্তে বসে থাকে। বসে বসে সে কি ভাবে কে জানে! হিপ্পোলাইৎ ভেবে পায় না, জর্জ কেন এত বিষন্ন, কেনই-বা তার এ পরিবর্তন। যদিও হিপ্পো-লাইৎ জানে, তার একটু স্পর্শ পেলেই জর্জ আবার তার আপন সত্তায় ফিরে আসে—তখন সে হয়ে ওঠে উদ্দাম, দুর্জয়।

এমনি ভাবেই দিন যায়। ওরা ভেবে পায় না,—কামনার উত্তাল তরঙ্গের আঘাত স'য়ে কতদিন এভাবে বাঁচা সম্ভব।

জর্জ উপলব্ধি করে, হিপ্পোলাইৎকে হারাতে তার মন সায় দেয় না। সে প্রশ্ন সম্পূর্ণ অবান্তর। তবে কিছুদিন থেকে দু'টি মর্মান্তিক মৃত্যুর স্মৃতি জর্জের মনকে সব সময় কেমন আচ্ছন্ন করে রাখে। মাঝে মাঝে তার মনে সন্দেহ জাগে—জীবনে প্রেম আর মৃত্যু হয়ত অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত; হয়ত তার মনের এই দ্বন্দ্বের একমাত্র সমাধান হ'ল মৃত্যু। এ ছাড়া ভিন্ন পথ সে খুঁজে পায় না।

বিমূঢ় জর্জ আবার ভাবে, তাই যদি সত্যি হয়, তবে তার অশান্তির উৎস হিপ্পোলাইৎ-কে চিরতরে এ দুনিয়া থেকে সরিয়ে দিলে কেমন হয়? হয়ত তার মৃত্যু মিটিয়ে দেবে তার সকল সমস্যা আর দ্বন্দ্ব। তখন সে ফিরে পাবে শান্তি, পাবে মুক্তি।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তার অন্তর থেকে কে যেন সতর্ক করে দেয়—জর্জ, ওটা তোমার ভুল ধারণা। খবরদার, ওপথে তুমি পা বাড়িও না। একক মৃত্যুতে কখনও শান্তি পাবে না। তাতে তোমাকে অনুতাপের দহনে জ্বলতে হবে। একমাত্র সহমরণের ভেতরই তুমি পাবে চিরশান্তি, পাবে মুক্তি। মুক্তি!

আজকাল হিপ্পোলাইৎ-কে জর্জ একই সঙ্গে ভালবাসে এবং ঘৃণা করে। এই আকর্ষণ-বিকর্ষণের দ্বন্দ্বে জর্জের হৃদয় ক্ষতবিক্ষত হয়। হিপ্পোলাইতের মনে কিন্তু দ্বন্দ্ব নেই। সে পরিপূর্ণ ভাবে বাঁচতে চায়। তার বহু আকাঙ্ক্ষা যে এখনও অতৃপ্ত রয়ে গেছে।

এমনি ভাবেই ওদের দিন কাটছিল। একদিন সন্ধ্যায় ওরা দু'জনে সমুদ্রে নামল স্নান করতে। জর্জ পূর্ব-কল্পিত কৌশলে ওকে সেদিন জলে ডুবিয়ে মেরে ফেলতে চাইছিল। কিন্তু কি ক'রে যেন ওর ওপর হিপ্পোলাইতের সন্দেহ জাগে। সে তাড়াতাড়ি জল থেকে উপরে উঠে এসে সে-যাত্রা প্রাণে বেঁচে যায়। সেই সঙ্গে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে, জীবনে আর কখনও জর্জের সঙ্গে সে সমুদ্রে নামবে না।

এদিকে তার পরিকল্পনা ব্যর্থ হওয়ায় জর্জ মনে মনে একটু ক্ষুণ্ণ হয় বৈ কি!

এই ঘটনার কিছুদিন পরের কথা। সেদিন ওদের নৈশ-ভোজন শেষ হয়েছে। খানিক বাদে দু'জনের শুতে যাবার কথা। ঐ রাত্রে মিলনের প্রত্যাশায় হিপ্পোলাইতের দেহে আশ্চর্য রূপান্তর দেখা দেয়। তার দেহ অদ্ভুত যৌবনোজ্জ্বল হয়ে ওঠে। সে সর্বনাশা রূপ জর্জকে প্রবল ভাবে আকর্ষণ করে। হিপ্পোলাইতের ওপর থেকে জর্জ চোখ ফেরাতে পারে না। এ কী অপরূপ রূপ তার! অনেক কষ্টে জর্জকে আত্ম-সম্বরণ করতে হয়। কিছুক্ষণ পরে দরদী কণ্ঠে সে প্রিয়তমাকে অনুরোধ করে,—

চল, বাইরে একটু বেড়িয়ে আসি।

—এখন! ঐ দেখ, বিছানাটা আজ কি সুন্দর পরিপাটী করে পাতা হয়েছে।

তার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ। একটু বাদেই আমরা ফিরে আসবো ঐ বিছানায়। বিশ্বাস কর, আজ এই সন্ধ্যায় সত্যিই তোমাকে বড় সুন্দর লাগছে। আজ মনে হচ্ছে তুমি অনন্যা। লক্ষ্মীটি, চল বাইরের মুক্ত হাওয়ায় একটু ঘুরে আসি। দেখছো আজকের চাঁদ কি অপূর্ব সুন্দর। চল,—এক্ষুনি ফিরে আসবো।

অনেকদিন পরে জর্জের এই সামান্য সোহাগে হিপ্পোলাইৎ গলে যায়। খুশির উচ্ছ্বাসে সে তার প্রেমিকের সঙ্গে বেরিয়ে পড়ে। ওরা দু'জনে বাহুলগ্ন হয়ে এগিয়ে চলে সমুদ্রের দিকে। নীল অশান্ত সমুদ্র। হাঁটতে হাঁটতে দু'জনে সমুদ্রের খাঁড়ির ওপর এসে থামে।

এক ছোট্ট সঙ্কীর্ণ সাঁকো। সেখানে দাঁড়ালে সমুদ্রের রূপ কিন্তু বেশ ভাল করেই দেখা যায়। প্রেমিক-যুগল ধীরে ধীরে একসময় সেই সাঁকোর জীর্ণ তক্তাটির ওপর উঠে দাঁড়ায়। নীচে তখন পাথরের উপর সমুদ্রের অশান্ত ঢেউ অবিরত আছড়ে পড়ছিল।

ওদের ছু'জনের ভারে সাঁকো ছুলে উঠতে হিপ্পোলাইতের সম্বিৎ ফিরে আসে। সে চম্‌কে ওঠে। হিপ্পোলাইৎ ভাবে, এ কি! জর্জ তাকে কোথায় নিয়ে এসেছে? সর্বনাশ, এ যে মৃত্যুর মুখে পা দিতে চলছে তারা!

হিপ্পোলাইতের কণ্ঠে কাতর মিনতি: জর্জ, আর এগিও না। এক পা-ও না। লক্ষ্মীটি, কথা রাখো, ফিরে এসো। তোমার ছু'টি পায়ে পড়ি। চল, এবার আমরা ফিরে যাই।

জর্জ প্রণয়িনীকে অভয় দেয়। শান্ত কণ্ঠে বলে,—শক্ত ক'রে আমার হাত ধর। কোন ভয় নেই, কিছু হবে না। এসো, আরও একটু এগিয়ে এসো। আমার বুকে এসো, প্রিয়তমে!

বিমূঢ় হিপ্পোলাইৎ হঠাৎ বুঝি একটু আনমনা হয়ে পড়ে। সেই ফাঁকে জর্জ তার লৌহ-কঠিন ছুই বাহু দিয়ে হিপ্পোলাইৎকে টেনে নেয় মরণ-আলিঙ্গনে। ক্ষণিকের জন্য সাঁকোটা আর একবার ছুলে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে আলিঙ্গনাবদ্ধ প্রেমিক-যুগল নীচের সেই গভীর খাদে মিলিয়ে যায়।

নির্জন নিস্তব্ধ রাত্রি। কঠিন উত্তুঙ্গ পাথরের বুকে ছু'টি কোমল মনুষ্যদেহের পতনের শব্দ ছুনিয়ার কেউই শুনতে পেল না। কেউ কিছু জানল না। ওরা নীরবে ছু'টি বুভুক্ষু হৃদয়ের অতৃপ্ত কামনা রেখে গেল সেই অশান্ত সমুদ্রের বুকে। ঢেউগুলো আজও যেন তারই তাড়নায় সেখানে অবিশ্রাম মাথা কুটে মরছে।

টেস্

[ইংরাজ সাহিত্যিক টমাস্ হারডি (Thomas Hardy)-র **'টেস্ অফ্ দি ডার্বার্ভিল্স্'** (Tess of the d'Urbervilles), ১৮৯১, উপন্যাসটির গল্প।]

জ্যাক ডার্বিফিল্ড্ ছিল একজন সাধারণ মজদুর। দারিদ্র্য ছিল এই শ্রম-বিমুখ, আরামপ্রিয় লোকটির নিত্যসঙ্গী। তার সংসারে নিত্যই অভাব লেগে থাকত।

মার্লট গ্রামের এই দরিদ্র পরিবারটির সঙ্গে যদিও বিজয়ী উইলিয়ামের সময়কার বিখ্যাত অভিজাত ডার্বার্ভিল্স্ পরিবারের কোন সম্বন্ধ ছিল না, তবুও কেমন ক'রে যেন জ্যাকের মনে একদিন ঐ আভিজাত্য এবং কৌলীন্যের প্রতি মোহ জাগে। ক্রমে তার দৃঢ় ধারণা হয়, সে ঐ বিশিষ্ট পরিবারেরই বংশধর। জ্যাক নিজেকে ঐ পদবীতেই জাহির করতে শুরু করে।

ধীরে ধীরে জ্যাকের আত্মমর্যাদা-বোধ জেগে ওঠে। ভাবে, অসম্ভব —এখন থেকে তার পক্ষে একজন সাধারণ মজদুরের মত কাজ করা আর কিছুতেই সম্ভব নয়। জ্যাক-পত্নীও তাতে সায় দেয়। বলে,—তা আর বলতে! তোমার মতো যার অত বড় বংশগৌরব তার পক্ষে মজদুরের কাজ কি শোভা পায়? লোকেই বা কি বলবে?

স্ত্রীর সমর্থনে জ্যাক উৎসাহ বোধ করে। সে আর কাজে বেরোয় না। ঘরে বসে জ্যাক স্ত্রীর সঙ্গে বিলাসমণ্ডিত জীবনের স্বপ্ন দেখে। কল্পনার জাল বোনে দু'জনে।

কিন্তু অতগুলো ছেলেপুলের মুখে কি তুলে দেবে? ঘরে তার কোন সংস্থানই নেই। জ্যাকদের সেদিকে হুঁসও নেই।

অবোধ সন্তানগুলো তাদের পিতার মনের হদিস রাখে না। পেটের জ্বালায় তারা হাহাকার করে···তবুও জ্যাক কাজে বেরোয় না।

হঠাৎ কাছের গ্রামের ধনী স্টোক্ ডার্বার্ভিলস্ পরিবারের কথা মনে পড়তে জ্যাক লাফিয়ে ওঠে। স্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করে সে স্থির করে, যেমন ক'রে হোক ঐ স্টোক-পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে ; তাঁদের কাছ থেকে বংশমর্যাদার স্বীকৃতি পেতে হবে। তবেই হবে ভাগ্যপরিবর্তন।

শ্রীমতী জ্যাক স্বামীকে সোৎসাহে সমর্থন করে। শ্রীমতী আরও ভাবে, একবার যোগাযোগ হলে স্বর্গত স্টোকের ছেলের সঙ্গে তাদের রূপসী কন্যা টেসের বিয়ে হওয়াও কিছু অসম্ভব নয়।

মা-র নির্দেশে সরল টেস্ দ্বিধা-জড়িত পায়ে গিয়ে হাজির হয় তাদের কল্পিত পরমাত্মীয়ের বাড়ির আঙ্গিনায়।

দোর-গোড়ায় এক বৃদ্ধা অন্ধ ভদ্রমহিলাকে দেখে টেস্ বুঝতে পারে ইনিই স্বর্গত স্টোকের স্ত্রী। টেস্ তাঁর সঙ্গে কথা বলতে যাবে এমন সময় হাঁ-হাঁ ক'রে কোথা থেকে ছুটে আসে একটি চালিয়াৎ যুবক। যুবকটি টেসের ছিন্ন বেশবাসের প্রতি কটাক্ষ করে তার সঙ্গে রূঢ় ব্যবহার করে। বিমূঢ় টেস্ তাড়াতাড়ি সেখান থেকে পালাবার পথ খোঁজে।

এতক্ষণ বাউণ্ডুলে অ্যালেক্ ডার্বার্ভিল্ আড়াল থেকে সব কিছুই লক্ষ্য করছিল। টেসের সরলতা আর রূপলাবণ্য উদ্ভ্রান্ত যুবককে আকৃষ্ট করে। সে সুযোগের অপেক্ষা করে। টেস্ সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে অ্যালেক দ্রুত পায়ে তার কাছে এগিয়ে গিয়ে তাকে সহানুভূতি জানায়। তাকে সাহায্য করবার প্রতিশ্রুতি শোনায়। তবুও অ্যালেককে হতাশ হতে হয়।

টেস্ রিক্ত হাতে বাড়ি ফিরে আসে। মেয়ের মুখে সবকিছু শুনেও জ্যাক উপার্জনের কথা ভাবে না। সংসারের প্রতি তেমনি উদাসীন থাকে।

টেসের তখন কতই বা বয়স! জীবনের কোন অভিজ্ঞতাই তার

নেই। বাস্তব জগতের কোন খবরই সে রাখে না। তবুও ঘটনাচক্রে সংসারের সব দায়-দায়িত্ব এসে পড়ে অনভিজ্ঞ টেসেরই ওপর।

ধনী অ্যালেকের সেদিনকার আশ্বাসের কথা টেস্ ভোলেনি। সে গিয়ে হাজির হয় অ্যালেকের কাছে জীবিকার সন্ধানে।

উদ্‌ভ্রান্ত যুবক টেসের এই অপ্রত্যাশিত আগমনকে মনে করে তার যৌবনের খেয়ালখুশি মিটিয়ে নেবার এক অপূর্ব সুযোগ। সে টেস্‌কে সাদর অভ্যর্থনা জানায়।

চতুর অ্যালেক জানতো, টেস্ তাদের পরিবারে অবাঞ্ছিত। তাই সে কৌশলে টেস্‌কে তাদের কোন এক খামার বাড়িতে নিয়োগ করে।

ঐ খামার বাড়িতে পশুপাখীর তত্ত্বাবধানে টেসের দিন কাটে। কিন্তু ক'দিন যেতে না যেতেই প্রভুর চাল-চলন আর আচরণ তার ভাল লাগে না। টেসের মনটি ছিল শিশুর মতো সরল। তবুও অ্যালেকের ইঙ্গিতময় কথাবার্তা তার মনে কেমন এক সন্দেহ জাগায়। ক্রমে সেই অস্বস্তিকর পরিবেশে কাজ করতে তার মন বিদ্রোহ করে। সে স্থির করে, অ্যালেকের আওতা থেকে পালাতে হবে। অন্য কোন জায়গায় সে কাজ খুঁজে নেবে।

অ্যালেক টেসের মনের হদিস পেয়ে চঞ্চল হয়ে ওঠে। ভাবে, শিকার বুঝি হাতছাড়া হয়ে যায়। তাই সুযোগের সন্ধানে সে আরও তৎপর হয়ে ওঠে।

সেদিন নির্জন পরিবেশে টেস্‌কে একাকী দেখে অ্যালেক চুপি চুপি তার কাছে এগিয়ে যায়। ঐ পরিবেশে তাকে দেখে টেস্ চমকে ওঠে। বিমূঢ় টেস্ অসহায় ভাবে প্রভুর অদ্ভুত দৃষ্টির দিকে তাকিয়ে থাকে। টেসের সে-দৃষ্টিতে ফুটে ওঠে এক মূক আকৃতি।

মুহূর্তের মধ্যে অ্যালেক ক্ষুধার্ত হিংস্র পশুর মত তার শিকারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। অসহায় টেস্ অ্যালেকের লালসার আগুনে নিজেকে আহুতি দিতে বাধ্য হয়...

বাড়ি ফিরে সরল টেস্ তার তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা মাকে খুলে

বলতে দ্বিধা করে না। অভিজ্ঞ মা বুঝতে পারে, অ্যালেক তার কন্যাকে বিয়ে করবার পাত্র নয়। তাই সে তাদের এ অবৈধ মিলনে চিন্তিত হয়। তবুও ভাগ্য-বিড়ম্বিত টেস্‌কে আবার কাজের জন্য মাঠে বেরোতে হয়।

কথাটা কিন্তু চাপা থাকে না। মাঠের অন্যান্য কর্মীরা টেস্‌কে দেখলেই অ্যালেকের সঙ্গে তার ঐ কেলেঙ্কারির কথা নিয়ে প্রকাশ্যে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতে ছাড়ে না।

কিছুদিনের মধ্যেই ঐ অবৈধ মিলনের বিষফল টেসের দেহে ফুটে ওঠে। ওদিকে অ্যালেকের লালসা দুর্জয়, সে আবার সুযোগ খোঁজে। এদিকে চারিদিকের লাঞ্ছনা সহ্য করে, অ্যালেক্‌কে এড়িয়ে ঐ অসুস্থ শরীর নিয়েও টেস্‌কে মাঠে কাজ করতে হয়। তাকে কাজ করতে হয় ছোট ভাই-বোনদের মুখের দিকে তাকিয়ে।

যথাসময়ে কুমারী টেস্‌ অ্যালেকের সন্তানের জননী হয়। অবাঞ্ছিত হলেও, সন্তান তো! টেস্‌ শিশুটির সেবাযত্নের ত্রুটি করে না। কিন্তু শিশুটি বাঁচে না। এবার টেস্‌ মুক্ত বিহঙ্গের মত ছুটে যায় দূর দেশের কোন এক ডেয়ারীতে জীবিকার সন্ধানে···

ডেয়ারীর নতুন জীবন ধীরে ধীরে তাকে পুরনো দিনের বিভীষিকা ভুলিয়ে দেয়। তার সরল এবং মধুর ব্যবহারে সহকর্মীরা সকলে মুগ্ধ হয়। তারা সকলেই নবাগতা টেস্‌কে খাতির যত্ন করে।

ধর্মযাজক পিতার তরুণ সুদর্শন পুত্র এঞ্জেল ক্লেয়ার ছিল ঐ ডেয়ারীর একজন উৎসাহী শিক্ষানবিশ। পৈতৃক বৃত্তিতে সে আকর্ষণ বোধ করেনি। তার স্বপ্ন ছিল বড় হয়ে নিজে একটি বড় আকারের খামার গড়ে তুলবে। তাই সে কৃষি এবং গো-পালন বিদ্যা শিখতে এসেছিল।

এঞ্জেল ছিল ডেয়ারীর সব তরুণীর কামনার বস্তু। সে নিজে কিন্তু এতদিন কারুর প্রতি আকর্ষণ বোধ করত না। এখন টেসের রূপ এবং তার সরলতা আর নিপুণ কর্মদক্ষতা তার মনে দোলা দিয়ে যায়।

এঞ্জেল ভাবে, টেস্‌কে সঙ্গিনী রূপে পেলে ভাবীকালে সে সুখী

হবে। টেস্ হবে তার মতো কৃষিবিদের আদর্শ ঘরণী। টেসের কাছে তার হৃদয় উন্মুক্ত করতে এঞ্জেল দ্বিধা করে না।

কিন্তু এঞ্জেলের এই নিখাদ আকর্ষণে টেস্ মুস্কিলে পড়ে। সে দ্বিধাগ্রস্ত হয়। তার বিগত জীবনের সব কথা এঞ্জেলকে খুলে ব'লে টেস্ তার কাছে সহজ হতে চায়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মনের দুর্বলতা এসে তাকে বাধা দেয়,—যদি এঞ্জেল তাকে ভুল বোঝে!

মন তার নিষ্পাপ হলেও সেই দুর্ঘটনার পর থেকেই টেস্ নিজেকে কলুষিত বলেই মনে করে। তাই সে নিজেকে দেবতুল্য এঞ্জেলের দৃষ্টির আড়ালে রাখতে প্রাণপণ চেষ্টা করে।

এঞ্জেল তার এই আচরণের মানে বুঝতে পারে না। একদিন টেস্‌কে সে সরাসরি প্রশ্ন করে। টেস্ তাকে কুণ্ঠিত কণ্ঠে জানায়,—এখানে অনেক ভাল মেয়ে আছে, দয়া করে আপনি তাদের কাউকে নিয়ে সুখী হোন।

টেস্ কিন্তু এঞ্জেলের মনের হদিস রাখে না। সে শুধু ভাবে,—না, এ অসম্ভব—ধর্মযাজকের পুত্রের সঙ্গে তার মত একজন সাধারণ মেয়ের বিয়ে হতেই পারে না। তার ওপর সে ভ্রষ্টা।—এ শুধু সমাজ-বিরুদ্ধই নয়, একথা ভাবাও পাপ।

এঞ্জেল কিন্তু টেসের বংশ-মর্যাদার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেয় না। সে অবশ্য জানে যে তার এই বিয়ের প্রস্তাবে পিতামাতার সায় সে পাবে না। তবুও একদিন দ্বিধা আর সঙ্কোচের বেড়া ডিঙ্গিয়ে পিতামাতাকে সে তার মনের ইচ্ছা জানায়। সে তাঁদের সমর্থন তো পায়ই না, পায় শুধু ধিক্কার। তবুও টেসের প্রতি তার ভালবাসা এতটুকুও কমে না।—সে তার সংকল্পে অবিচল থাকে।

দু'দিন বাদে সুযোগ পেয়ে এঞ্জেল এবার টেসের কাছে সরাসরি প্রস্তাব করে,—কিছু মনে ক'রো না...যদি তোমার খুব আপত্তি না থাকে তো আমি তোমাকে বিয়ে করতে চাই। আশা করি তুমি আমাকে হতাশ করবে না।"

ততদিনে টেস্‌ও এঞ্জেলকে গভীর ভাবে ভালবেসে ফেলেছে। কিন্তু সে-ভালবাসার কোনও প্রকাশ দেখা যায় না। এখন প্রিয়তমের কাছ থেকে এই অভাবিত প্রস্তাব শুনে মূক আনন্দে সে বিহ্বল হয়ে পড়ে। হঠাৎ তার বিগত জীবনের সেই দুঃস্বপ্ন তার সামনে মাথা তুলে দাঁড়ায়। ফলে টেস্‌ কুণ্ঠিত ভাবে এঞ্জেলকে জানায়,—না না, তা হয় না। আমার জন্যে আপনার অমূল্য জীবনটি নষ্ট করবেন না—তা হয় না…

তার কথা শুনে এঞ্জেল তো হতভম্ব। তবুও সে আশায় বুক বেঁধে থাকে। আবার সুযোগের অপেক্ষা করে। ক'দিন বাদে আবার সে টেস্‌কে জানায়,—দেখ, পাত্র হিসেবে আমি বোধ হয় খুব অযোগ্য নই। তবুও না হয় তোমার মা-বাবার অনুমতি চেয়ে পাঠাও। আমি তাঁদের নির্দেশ মেনে নেবো।

টেসের পিতামাতা হাতে স্বর্গ পায়। সঙ্গে সঙ্গে তারা জানায়,—যে পাত্র আমাদের আর্থিক সাহায্য করতে সমর্থ অবিলম্বে সানন্দে তার গলায় মালা পরাও। আমাদের আশীর্বাদে ভাবী জীবনে তুমি সুখী হবে।

টেস্‌ জানত, তার দয়িতের আগ্রহে কোন ফাঁকি ছিল না; তার ভাগ্য যে-কোন অনূঢ়া মেয়ের মনেই ঈর্ষা জাগাবে। এবার পিতামাতার অনুমতি পেয়ে টেস্‌ অনেকটা উৎসাহ বোধ করে। সে এঞ্জেলকে তার সম্মতি জানায়।

কিন্তু তখনও তার অন্তর্দ্বন্দ্বের অবসান হয়নি। তাই এটা-সেটা বলে বিয়ের তারিখ সে স্থগিত রাখে।

এঞ্জেলের আগ্রহে অবশেষে একদিন তাদের বিয়ের তারিখ স্থির হয়। বিয়ের আগের দিন আবার টেসের মনে দ্বিধা জাগে। অথচ মুখ ফুটে এঞ্জেলকে সে কিছু বলতেও পারে না। তাই জীবনের সেই দুর্ঘটনার কথা খোলাখুলি ভাবে জানিয়ে এঞ্জেলের উদ্দেশ্যে এক বিস্তৃত চিঠি লেখে। রাতের অন্ধকারে চিঠিটি সে তার ভাবী স্বামীর বদ্ধ দরজার তলা দিয়ে গলিয়ে দিয়ে এসে স্বস্তি পায়। ভাবে, চিঠি পড়ে এঞ্জেল নিশ্চয়ই

তার মোহমুক্ত হবে। ফলে ঐ নিষ্পাপ যুবকের গলায় মালা দিয়ে তাকে আর অপরাধী হতে হবে না।

পরের দিন এঞ্জেলের সঙ্গে দেখা হ'তে টেস্ তার ব্যবহারে এতটুকুও পরিবর্তন লক্ষ্য করে না। এঞ্জেল তার সঙ্গে যথারীতি মধুর ব্যবহার করে। টেস্ অভিভূত হয়।

টেস্ বুঝতে পারে চিঠিটি এঞ্জেলের নজরে পড়েনি। সে চঞ্চল হয়ে ওঠে। দ্বিধা-জড়িত কণ্ঠে বলে,—এখনও ভেবে দেখো……আমার কিন্তু একটা ইতিহাস আছে।

তার উক্তি শুনে এঞ্জেল ভাবে, যে মেয়ে এমনি সরল অকপট, তাকে কোন কলঙ্ক স্পর্শ করতে পারে না। তার কোন অবাঞ্ছিত ইতিহাস থাকতে পারে না। এঞ্জেল হা-হা করে হেসে ওঠে। ফলে, টেসের বক্তব্য আর শেষ হয় না।

কৌতুক করে এঞ্জেল বলে,—মানসী, তোমার ভূগোল জানতে আমার কৌতূহল আছে—ইতিহাস নয়।

—অসভ্য! টেসের মুখে ফুটে ওঠে সলাজ হাসি।

বিয়ের বাসরে এঞ্জেল তার প্রথম যৌবনের রোমান্সের অভিজ্ঞতার কথা টেস্‌কে শোনায়। কাহিনীটি টেস্ সহজ ভাবেই গ্রহণ করে। সুযোগ পেয়ে টেস্ এবার অ্যালেকের সঙ্গে তার অবৈধ মিলনের ঘটনাটি সরল মনে খুলে বলে।

শুনে এঞ্জেল মর্মাহত হয়। টেস্‌কে সে ক্ষমা করতে পারে না। টেসের প্রতি তার মন ঘৃণায় ভরে ওঠে। বাসরের সুখ-শয্যা তার কাছে কণ্টক-শয্যা মনে হয়। এই প্রেমহীন জীবনের কথা এঞ্জেল ভাবতে পারে না। তার মনের কথা টেস্‌কে জানাতে এঞ্জেল দ্বিধা করে না। বিমূঢ় টেস্ ভেঙ্গে পড়ে।

বিয়ের পরের দিন টেস্‌কে তার পিতৃগৃহে রেখে এঞ্জেল ব্রেজিল অভিমুখে যাত্রা করে—ভাগ্য অন্বেষণে।

দু'দিন বাদে নববিবাহিত কন্যার প্রত্যাগমনের কারণ জানতে পেরে মা চমকে ওঠে। টেসের সরলতার জন্য মা তাকে তিরস্কার করে।

পিতার অভাবের সংসার, তায় এমনি ভাবে স্বামী-পরিত্যক্ত হয়ে টেসের মনে শান্তি থাকে না। বড় দুঃখেই তার দিন কাটে।

এঞ্জেলের দেওয়া অর্থের সাহায্যে সংসারটি যাহোক্ করে কিছুদিন চলে। তারপর সে-অর্থ ফুরিয়ে যেতেই সংসারে আবার হাহাকার ওঠে। ক্ষুধার্ত ভাইবোনদের মুখের দিকে তাকিয়ে টেস্‌কে আবার ভাগ্যের সন্ধানে বেরুতে হয়। জীবিকার জন্য সে এখানে ওখানে উঞ্ছবৃত্তি করে।

ক'দিন বাদে পিতার মৃত্যু হওয়ায় দুর্দশা চরমে ওঠে। অভাবের তাড়নায় টেস্ দিশেহারা হয়ে পড়ে।

এমন সময় দুষ্ট গ্রহের মতো অ্যালেক আবার টেসের জীবনে উদয় হয়। কিন্তু অতীত দিনের সে-দুঃস্বপ্নের কথা টেস্ ভোলে নি। সে সতর্ক হয়ে অ্যালেককে এড়িয়েই চলাফেরা করে।

অ্যালেক কিন্তু নাছোড়বান্দা। সে টেস্‌কে নানা প্রলোভন দেখায়। বিয়ে করে তাকে স্বীকৃতি দিতে চায়। ভয় পেয়ে টেস্ প্রিয়তম এঞ্জেলকে চিঠি লেখে,—

—জানি আমার অপরাধের সীমা নেই। আমাকে তুমি ক্ষমা করো। দয়া করে বিশ্বাস করো—মনে-প্রাণে আমি তোমাকে ভালবাসি, শুধু তোমাকেই। ক'দিন থেকে একটা হিংস্র জানোয়ার আমাকে নিয়ত তাড়া করে বেড়াচ্ছে। তুমি আমাকে এ বিপদ থেকে উদ্ধার করো। আমি আর পারছি না—তোমার প্রতীক্ষায় বসে আছি।

দিনের পর মাস গড়িয়ে যায়। এঞ্জেলের কাছ থেকে টেস্ কোন সাড়া পায় না। তার মনে হয় এঞ্জেল হয়তো তাকে ক্ষমা করেনি।

এদিকে ধূর্ত অ্যালেক আরও তৎপর হয়ে ওঠে। শুধু টেসের প্রতি নয়, গোটা দুঃস্থ পরিবারটার ওপরই অ্যালেক সহানুভূতিশীল হয়ে ওঠে। তার এই কপট আচরণের ফাঁদে অজ্ঞাতসারেই টেস্ পা বাড়ায়। তার ওপর তাদের সমগ্র পরিবারের প্ররোচনায় একসময় টেস্ অ্যালেকের সঙ্গে

সহজ ভাবেই বাস করতে শুরু করে। এমনি করেই অসহায় টেস্ ভাগ্যের স্রোতে নিজেকে ভাসিয়ে দেয়।

ওদিকে দীর্ঘকাল পরে টেসের চিঠি এঞ্জেলের হাতে পৌঁছায়। সঙ্গে সঙ্গেই সে ছুটে আসে। এসে দেখে, তার স্ত্রী তখন অ্যালেকের শয্যাসঙ্গিনী। এঞ্জেল মর্মাহত হয় কিন্তু কোন প্রাতবাদ জানায় না। নীরবে ফিরে যায়।

এদিকে প্রিয়তম এঞ্জেলকে দেখে টেস্ তার ভুল বুঝতে পারে। অনুশোচনায় তার মন ভরে ওঠে। শেষবারের মত এঞ্জেলের প্রেম আস্বাদন করতে সে ব্যগ্র হয়ে ওঠে।

ইতিমধ্যে অ্যালেকের মুখোসও খুলে পড়ে। তার সঙ্গে বাস করা টেসের পক্ষে অসহ্য হয়ে ওঠে। টেস্ ভাবে, একমাত্র অ্যালেকের মৃত্যুই তাকে দিতে পারে শান্তি, মুক্তি···

টেস্ একদিন ঘুমন্ত অ্যালেককে হত্যা করে। সম্বিৎ ফিরে আসতে সেই রক্তাক্ত হাতেই টেস্ উন্মাদিনীর মত ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে যায়।

নগরের সুবিস্তৃত পথ ধরে কিছুদূর এগিয়ে যেতে অদূরে অতি-পরিচিত একটি পুরুষের ছায়া তার নজরে ভেসে ওঠে। টেস্ সেই ছায়ার দিকে ছুটতে থাকে। না, তার অনুমান মিথ্যা হয়নি—তার স্বপ্নের এঞ্জেলই বটে।

টেস্ তার দুষ্কৃতির কথা মনের মানুষটিকে অকপটে জানাতে দ্বিধা করে না। এঞ্জেল কিন্তু তাকে তাড়িয়ে দেয় না। টেস্‌কে সে বুকে টেনে নেয়।

এঞ্জেলের কাছে নিজেকে প্রকাশ করতে পেরে টেস্ তার বুকের ওপর মাথা এলিয়ে দিয়ে পরম তৃপ্তিতে নিঃশ্বাস নেয়। অস্ফুট স্বরে বলে,—আজ আমার জীবন ধন্য। এই অপরাধের জন্য আমি এতটুকুও ভীত নই—হাসিমুখেই আমি মৃত্যুদণ্ড বরণ করবো। তারপর সে এঞ্জেলের বুকের ওপরেই নিশ্চিন্ত আরামে এলিয়ে পড়ে।

এঞ্জেল জানে, এতক্ষণে ন্যায়ের উদ্যত খড়্গ টেসের পিছু নিয়েছে।

পুলিশের হাত থেকে টেস্‌কে রক্ষা করা সম্ভব নয়। তবুও সে ভাবে, যে কটা দিন দু'জনে এক সঙ্গে থাকা যায় তাই হবে জীবনের শ্রেষ্ঠ পাওয়া। শহর ছাড়িয়ে উপকণ্ঠে এসে তারা দু'জনে আশ্রয় নেয়।

মাত্র দু'দিন পরের কথা। টেস্‌ তখনও গভীর নিদ্রায় মগ্ন—মুখে তার পরম তৃপ্তির আভাস। সশস্ত্র পুলিশের দল এসে হাজির হয় অপরাধিনী টেস্‌কে গ্রেপ্তার করতে। এঞ্জেলের একান্ত অনুরোধে পুলিশ টেস্‌ জেগে ওঠা পর্যন্ত অপেক্ষা করে।

খানিক বাদে চোখ মেলে তাকাতে টেস্‌ পুলিশদের লক্ষ্য করে, কিন্তু এতটুকুও বিচলিত হয় না। সে জানে, জহ্লাদ ফাঁসির দড়ি নিয়ে তার জন্য অপেক্ষা করছে। তবুও তার মুখের প্রশান্তি মিলিয়ে যায় না। স্নিগ্ধ চোখে সে প্রিয়তম এঞ্জেলের দিকে তাকায়। সে-দৃষ্টিতে তার মনের সবটুকু মাধুরী যেন উপছে পড়ে।

তারপর সহজ ভাবেই পুলিশদের কাছে এগিয়ে গিয়ে শান্ত কণ্ঠে বলে—মাপ করবেন, একটু দেরী হয়ে গেল; এবার চলুন এগিয়ে যাই···

পরের দিন। সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে উড়ন্ত কালো পতাকাটা নজরে পড়তেই এঞ্জেলের মনের আলো চিরতরে নিভে যায়।

হতভাগী টেসের মর্মান্তিক পরিণতির সবটুকু আঘাত বুকে নিয়ে এঞ্জেল এগিয়ে চলে।

অঙ্কুর

[ফরাসী সাহিত্যিক এমিল জোলা (Emile Zola)-র **'জারমিনাল'** (Germinal), ১৮৮৫, উপন্যাসের সংক্ষিপ্তসার।]

খনির খাদ নয় তো যেন মৃত্যু-গহ্বর। তা হোক্। এই খনিই যে শ্রমিকদের জীবনের উৎস। এই খাদই জাগায় তাদের প্রাণের স্পন্দন।

দুর্বার আকর্ষণ ঐ খাদের। সকাল হ'তে ছেলে-বুড়ো, নারী-পুরুষ দল বেঁধে যায় খাদটির দিকে। ষাট বছরের ভিনসেণ্ট মেহুও যায় তাদের সঙ্গে।

মেহুর বয়স হয়েছে, তায় দীর্ঘদিন খাদে কাজ করে ক্ষয় রোগটি সে উপহার পেয়েছে। হাপরের মতো হাঁপায় সে। তবুও তাকে রোজ কাজে বেরুতে হয়। কাজ না করলে খাবে কি?

*　　　*　　　*

একদিন নবীন যুবক এটিনী আসে এই মণ্টস্থ শহরে। সে আসে দূর প্রবাস থেকে—কাজের সন্ধানে। পথে ভিনসেণ্টের সঙ্গে তার দেখা হয়। তাকে দেখে ভিনসেণ্টের মনে মায়া জাগে। সে তার হাতে হাত মেলায়, সাহায্যের আশ্বাস দেয়। পরদিন সে এটিনীকে নিয়ে যায় মালিকের কাছে। বরাত ভাল এটিনীর। সে ঐ খনিতে কাজে বহাল হয়ে যায়।

ভিনসেণ্ট, জাচারী, চাভেল, লেভাকু, ক্যাথারিন এবং অন্যান্য শ্রমিকের সঙ্গে এটিনীও নামে খাদের গহ্বরে। একে অনভিজ্ঞ তায় নতুন পরিবেশ—তবুও নিজেকে মানিয়ে নিতে প্রাণপণ চেষ্টা করে এটিনী।

শ্রমিকের পোষাকে ক্যাথারিনকে এটিনী কিন্তু পুরুষ বলেই ধরে নিয়েছিল। কিন্তু খানিক বাদে ক্যাথারিনের সঙ্গে দৃষ্টি-বিনিময় হতে সে তার ভুল বুঝতে পারে। ক্যাথারিনের সেই গভীর দৃষ্টি এটিনীর হৃদয় ছুঁয়ে যায়। ক্ষণিকের জন্য এটিনী আনমনা হয়ে পড়ে। নিজেকে

সামলে নিয়ে আবার সে কাজে ডুবে যায়। নতুন এই কাজ তার মনে উন্মাদনা জাগায়। এটিনী দেখে সকলেই আপন আপন কাজে ব্যস্ত। অন্যদিকে তাকাবার কারুর অবকাশ নেই। এক সময় কর্তারা এসে ঘুরে যায়। নতুন কর্মী এটিনীর উৎসাহ দেখে তারা খুশিমনেই ফিরে যায়।

মধ্যাহ্ন-ভোজের বিরতি। ক্ষণিকের জন্য মুক্তি। শ্রমিকরা পরস্পরের মধ্যে হাসি-ঠাট্টা করে ক্লান্তি দূর করবার চেষ্টা করে। এক কোণে চাভেল এক রকম জোর করেই কুমারী ক্যাথারিনকে টেনে নিয়ে চুমু খায়। সে দৃশ্য এটিনীর নজর এড়ায় না। ভাল লাগে না তার চাভেলের ঐ অশোভন আচরণ।

* * *

দু'দিন যেতে এটিনী লক্ষ্য করে, শ্রমিকদের পরস্পরের ভেতর তেমন সদ্‌ভাব নেই। সে উপলব্ধি করে—খাদের কাজে ঝুঁকি আর মেহনৎ দুই-ই বেশী, কিন্তু মজুরী সে তুলনায় খুবই কম। তবুও এটিনী সেখানে থেকে যায়।

* * *

অভাব শ্রমিক-সংসারের নিত্য সঙ্গী। ক্যাথারিনদেরও। তবুও তাদের ভরসা যে পাড়ার মুদিটি বেশ সহৃদয়। সেদিনও ক্যাথারিনের মা স্বাভাবিক নিয়মেই মুদি মাইগ্রেটের শরণাপন্ন হয়। বলে,—ভাই, আজ শুধু সওদা নিলেই চলবে না, কিছু অর্থও সঙ্গে চাই। না বললে শুনবো না।

খদ্দেরের প্রস্তাব শুনে মুদির মুখে এক অদ্ভুত হাসির রেখা ফুটে ওঠে। তার ভাবখানা যেন—এ আর বেশী কি কথা? এর জন্য এত সঙ্কোচ কেন?

ক্যাথারিনের ওপর মুদির লোভ ছিল অনেক দিন থেকে। সে তার এই খদ্দেরলক্ষ্মীকে স্মিতমুখে আশ্বাস দেয়। খুশি মনে তার সব আব্দার পালন করে।

কাজ শেষ হ'তে ক্যাথারিনের মা উঠতে যাচ্ছে লক্ষ্য করে হাত কচলে মাইগ্রেট কিছু বলবার জন্য ইতস্তত করতে থাকে।

কিছু বলবে ?—ক্যাথারিনের মা প্রশ্ন করে।

—না তেমন কিছু নয়। বলছিলাম কি......মেয়েটিকে রাত্রের দিকে যদি একবার পাঠিয়ে দাও তো বড় খুশি হই। ওকে বেশীক্ষণ আটকাবো না...

অভাবের জ্বালা বড় জ্বালা। এই কুৎসিত প্রস্তাব শুনে মেয়ের মা হয়েও সে প্রতিবাদ জানাতে পারে না। সওদা হাতে নিয়ে নীরবে তাকে বাড়ি ফিরতে হয়।

মার মুখে মাইগ্রেটের সেই ইঙ্গিতময় প্রস্তাব শুনে ক্যাথারিন রাগে দুঃখে গিয়ে হাজির হয় চাভেলের কাছে। চাভেল তাকে সাদর অভ্যর্থনা জানায়। এতদিনে তার গোপন ইচ্ছা চরিতার্থ করবার অভাবিত সুযোগ পেয়ে চাভেল নিজেকে বঞ্চিত করে না।

ক্যাথারিন ভাবে, মুদির তুলনায় এ লোকটি মন্দ নয়,—একে নবীন যুবক তায় সহকর্মী। ক্যাথারিন চাভেলের নিবিড় আলিঙ্গনে নিজেকে পুরোপুরি ছেড়ে দিয়ে তৃপ্তির নিঃশ্বাস নেয়।

ঘটনাচক্রে সেই সময় এটিনী ওদের দু'জনের অলক্ষিতে কাছেই ছিল। দু'জনের এই নষ্টামির সব কিছুই সে লক্ষ্য করছিল। এই দৃশ্য দেখে এটিনী কেমন এক অন্তরজ্বালা অনুভব করে। কিন্তু সে নিজেকে সামলে নেয়। ক্যাথারিনের প্রতি এবার তার মনে ঘৃণা জাগে। সে তার মোহমুক্ত হয়। এটিনী স্থির করে, এখন থেকে সে নিজেকে কাজের মধ্যে ডুবিয়ে দেবে।

অল্পদিনের মধ্যে সত্যি সত্যিই এটিনী কাজে সুনাম অর্জন করে। সহকর্মীদের ভেতরও সে প্রিয় হয়ে ওঠে। ভিনসেণ্টের মতো প্রবীণ লোকও মনে মনে এটিনীকে ভালবাসে, শ্রদ্ধা করে। চাভেল ছাড়া আর সকলেরই সে অন্তরঙ্গ হয়ে ওঠে।

ইতিমধ্যে ক্যাথারিন প্রকাশ্যেই নিজেকে চাভেলের প্রণয়িনী বলে

পরিচয় দিতে কুণ্ঠিত হয় না। ক্যাথারিনের রকম দেখে এটিনীর গা জ্বলে যায়। কিন্তু মুখ ফুটে সে কাউকে কিছু বলে না।

দিন যায়। সহকর্মীদের দুর্গতি দেখে এটিনী বেদনা বোধ করে। ক্রমে সে বিচলিত হয়ে ওঠে। প্রতিকারের কথা সে মাঝে মাঝে অন্তরঙ্গ দু'এক জনের সঙ্গে গোপনে আলোচনা করে। য়ুরোপের অন্যান্য দেশে মার্কসীয় মতবাদ আন্দোলনের সাফল্যের কথা সে তাদের জানায়। ঐ আদর্শে তাদের উদ্বুদ্ধ করতে সে চেষ্টা করে। নিজেদের মঙ্গলের জন্য মালিকের শোষণ নীতির বিরুদ্ধে কি ভাবে শ্রমিকদের সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে রুখে দাঁড়াতে হবে সে সম্বন্ধেও এটিনী তাদের সঙ্গে আলোচনা করে। সেই সঙ্গে শ্রমিক কল্যাণের জন্য এটিনী একটি গোপন তহবিল খোলে।

এমন সময় ভিনসেণ্টের বড় ছেলে জাচারী বিয়ে করে দুই সন্তানের জননী ফিলোমেনীকে। বিয়ের ক'দিন বাদে ভিনসেণ্টের অনুরোধে এটিনী তার আস্তানা গুটিয়ে নিয়ে এসে হাজির হয় তার বাড়িতে।

ভিনসেণ্ট ছিল শ্রমিকদের মোড়ল। এটিনী ভাবে, ওকে দলে টানতে পারলে তার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে। সফল হবে শ্রমিক আন্দোলন। ভিনসেণ্টকে সামনে রেখে রাতের পর রাত এটিনী শ্রমিকদের সমাজ-তান্ত্রিক নীতিতে উদ্বুদ্ধ করতে চেষ্টা করে।

ভিনসেণ্টের বাড়িতে এটিনীর থাকাটা চাভেল কিন্তু গোড়া থেকে সুনজরে দেখেনি। চাভেলের মনে সন্দেহ ছিল, ক্যাথারিনের প্রতি এটিনী অনুরক্ত। পাছে কোন দুর্বল মুহূর্তে ক্যাথারিন এটিনীর প্রতি আকৃষ্ট হয়—এই ছিল চাভেলের ভয়। ফলে, চাভেল ক্যাথারিনকে অকারণ সন্দেহ করতে শুরু করে। সে কথা প্রণয়িনীকে ইঙ্গিতে জানাতেও চাভেল দ্বিধা করে না। অগত্যা ক্যাথারিনকে ঘর ছেড়ে চাভেলের বাড়িতে চলে যেতে হয়।

* * *

হঠাৎ একদিন মালিকপক্ষ শ্রমিকদের মজুরী কমিয়ে দেয়।

শ্রমিকদের দীর্ঘদিনের চাপা অসন্তোষ জ্বলে ওঠে। এমন সময় খাদে একটা দারুণ দুর্ঘটনা ঘটে। ঐ দুর্ঘটনার ফলে ভিনসেণ্টের তরুণ পুত্র জীনলীন চিরদিনের মত পঙ্গু হয়ে পড়ে। শ্রমিকরা প্রতিবাদ জানায়। তারা ধর্মঘটের হুমকি দেয়। কোন ফল হয় না। ফলে চরম বিপর্যয় এগিয়ে আসে।

১৮৮৪ সালের ডিসেম্বর মাস। এটিনীর নেতৃত্বে ধর্মঘট শুরু হয়—

দিন যায়। ধর্মঘট মেটবার কোন লক্ষণ দেখা যায় না। তাদের ন্যূনতম দাবী আর একবার বিবেচনা করে দেখবার জন্য শ্রমিক-প্রতিনিধিরা কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করে। কিন্তু তবুও কোন ফল হয় না। কর্তারা সাফ জানিয়ে দেয়,—মজুরী বাড়ানো হবে না।

ধর্মঘট বন্ধ হয় না; চলতে থাকে। বিক্ষুব্ধ শ্রমিকরা রাজপথে বেরিয়ে পড়ে। চারিদিকে বিশৃঙ্খলা উঁকি দেয়। শ্রমিকরা বিদ্রোহ করে—ধর্মঘট নয় তো যেন বাঁচবার জন্য লড়াই।

ধর্মঘট গড়িয়ে চলে। দু'মাস হয়ে যায়। মীমাংসার কোন লক্ষণই দেখা যায় না। ওদিকে মজুরদের ঘরে ঘরে হাহাকার, ক্ষুধার্ত শিশুদের কান্নার রোল শোনা যায়।

এটিনী দিনের বেলায় গা ঢাকা দেয়। রাতের অন্ধকার নেমে আসতে সে শ্রমিকদের সঙ্গে মিলিত হয়। সে সকলকে উৎসাহ দেয়, তাদের মনোবল অক্ষুণ্ণ রাখতে প্রাণপণ চেষ্টা করে।

ক্রমে শ্রমিকদের অবস্থা শোচনীয় হয়। অনাহারে, অর্ধাহারে তাদের দিন কাটে। ক্রমে তুচ্ছ বিষয় নিয়ে নিজেদের ভেতর ঝগড়া, মারামারির সৃষ্টি হয়।

এটিনী প্রায় ভেঙ্গে পড়ে। ভাবে, এবার বুঝি তার সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়। একদিন সে মোড়লকে ডেকে চুপিচুপি অনুরোধ জানায়,—এবার যাহোক একটা আপোস-মীমাংসার চেষ্টা করো।

ভিনসেণ্ট ক্ষেপে ওঠে। ক্রুদ্ধ কণ্ঠে জানায়,—অভাবের চাপে পড়ে

শেষ পর্যন্ত মালিকের কাছে নিজেদের বেচে দেবো? তুমি কি বলছো?

ইতিমধ্যে এটিনীকে জব্দ করতে চাভেল তার বিরুদ্ধে পুলিশের কাছে অভিযোগ করেছিল। তার নামে নানা কথা লাগিয়েছিল পুলিশের কাছে। চাভেল জানে না, সে কথা ক্যাথারিন কোন্ ফাঁকে এটিনীকে বলে দিয়েছিল। সেই থেকে এটিনী সতর্ক হয়ে চলাফেরা করে।

সেদিন রাত্রে এটিনী ক'জন সহকর্মীকে নিয়ে গোপনে আলোচনা করছিল। সেই সময় ক্যাথারিন আর চাভেল এসে হাজির হয় সেখানে—

অনেকদিন পর তুই প্রতিদ্বন্দ্বীর মুখোমুখি দেখা হয়ে যায়। তু'জনেই চাপা আক্রোশে ফেটে পড়ে। তু'জনের মধ্যে হাতাহাতি শুরু হয়।

চাভেল পালাবার পথ খোঁজে। বেরিয়ে যাবার সময় সে ক্যাথারিনকে শাসিয়ে যায়,—সে যেন তার কাছে আর না ফেরে। চাভেল আর তার মুখদর্শন করতে চায় না।

ক্যাথারিন ঘাবড়ে যায়। এটিনীও বিব্রত বোধ করে। ক্যাথারিনকে আশ্রয় দেবার মতো আস্তানা কোথায় এটিনীর? অগত্যা মান সম্ভ্রম ভুলে গিয়ে ক্যাথারিনকে আবার ফিরে যেতে হয় চাভেলের কাছে।

কতদিন আর খনির কাজ বন্ধ থাকতে পারে? শ্রমিকদের উচিত শিক্ষা দেবার জন্য কর্তৃপক্ষ বাইরে থেকে নতুন শ্রমিক আমদানী করে—হয়ত কিছু বাড়তি দক্ষিণা দিয়েই।

খবরটা কানে পৌঁছুতে বিক্ষুব্ধ শ্রমিকরা জ্বলে ওঠে। সেই আগুনের কাছে তাদের পেটের আগুন ম্লান হয়ে যায়—

সেদিন নতুন শ্রমিকরা খাদের মুখের কাছে এগিয়ে গেছে। এমন সময় বিক্ষুব্ধ শ্রমিকরা তাদের জীবন তুচ্ছ করে দলবদ্ধ ভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ে সেই আগন্তুকদের ওপর।

এতদিন বাদে শিকার হাতের মুঠোয় পেয়ে পুলিশ নির্মমভাবে গুলি

চালায়। প্রবীন ভিনসেণ্ট এবং তার চোদ্দজন সহকর্মী মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। তারা আর ওঠে না। গুরুতর ভাবে আহত হয় পঁচিশ জনেরও বেশী। কর্তৃপক্ষ ছুটে আসে মীমাংসা করতে।

এদিকে শ্রমিকরাও এটিনীর ওপর বিরক্ত হয়। আন্দোলন ব্যর্থ হওয়ার জন্য সকলে তাকেই দায়ী করে।

সুভেরীন ঠিক করে, সে আর এ অঞ্চলে থাকবে না। শেষ-বারের মতো খাদে নেমে কি একটা কাজ সে চুপি চুপ করে আসে। কেউ টের পায় না।

খানিক বাদে এটিনী ক্যাথারিনকে নিয়ে খাদে নামে। অল্প সময়ের মধ্যে চাভেল এসে উপস্থিত হয় তাদের সামনে। পরম শত্রু এটিনীর সঙ্গে ক্যাথারিনকে দেখে চাভেল উত্তেজিত হয়ে ওঠে।

ঠিক সেই সময় খাদে ভীষণ সোরগোল ওঠে। ভীত কণ্ঠের চিৎকার ভেসে আসে,—প্রচণ্ড বেগে খাদের ভেতর জল ঢুকছে। বাঁচাও, বাঁচাও।

সর্বনাশ, মৃত্যু অনিবার্য। বাঁচবার পথ নেই।

অনেক কষ্টে ডুলির সাহায্যে কিছু লোককে ওপরে তোলা হয়। কিন্তু সে আর ক'জন ? ওদিকে দ্রুত বেগে জল ঢুকে খাদ ভর্তি হয়ে যায়। ডুলি দিয়ে বাকী লোকদের উদ্ধার করা আর সম্ভব হয় না।

এবার খাদের ভেতর যেখানে একটু উঁচু জায়গা নজরে পড়ে অসহায় লোকগুলি সেদিকে ছুটে গিয়ে ভিড় করে।

চাভেলের সঙ্গে এটিনীর আবার দেখা হয়। সে আর নিজেকে সংযত রাখতে পারে না, এটিনীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। কিন্তু ক্ষণিকের মধ্যে তার প্রাণহীন দেহটা লুটিয়ে পড়ে খাদের জলে।

দিন গড়িয়ে রাত বয়ে যায়। সেই অন্ধকার গর্তে অসহায় শ্রমিকরা নীরবে মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করে।

এমন সময় এক প্রচণ্ড বিস্ফোরণ হয়। ফলে, কিছু লোক সেই নরক-যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পায়।

এটিনী আর ক্যাথারিন তখনও ধুঁকছে। কোথা থেকে একটি ডুলি কি করে সেদিকে পৌঁছায়। কিন্তু তার আগেই এক সময় ক্যাথারিনের নিষ্প্রাণ দেহটা এটিনীর কোলে লুটিয়ে পড়ে। সে মুক্তি পায়। কিন্তু এটিনীর মন হাহাকার করে ওঠে।

খুঁজে পেতে আর কাউকে পাওয়া যায় না সেই মৃত্যু-গহ্বরে। একমাত্র এটিনীর অচেতন দেহটাকে নিয়ে ডুলি ওপরে ফিরে আসে।

ছ' সপ্তাহ হাসপাতালে থেকে এটিনী অনেকটা সুস্থ হয়। কিন্তু তার দেহ-মন বড় ক্লান্ত। অলস দৃষ্টি মেলে সে বাইরে তাকিয়ে থাকে। তারই মধ্যে সে উপলব্ধি করে যেন বাইরের বড় বড় শ্রমিক আন্দোলন-গুলি তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে।

হঠাৎ এটিনী অনুভব করে সে সম্পূর্ণ সুস্থ। সে স্থির করে, শ্রমিকদের জন্য তাকে আবার লড়তে হবে—আদায় করতে হবে তাদের বেঁচে থাকবার অধিকার।

সেই সংকল্পে বুক বেঁধে এটিনী যাত্রা করে প্যারিসের উদ্দেশ্যে। তার চোখে মুখে ফুটে ওঠে দৃঢ় প্রত্যয়ের ছাপ।

উপহার

[আমেরিকার বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও'হেনরী (O' Henry)-র **'দি গিফ্‌ট্‌ অভ্‌ ম্যেজাই'** (The Gift of Magi), গল্পটির সারাংশ।]

কাল বড়দিন।

শ্রীমতী ডেলা তার বহুকষ্টে সঞ্চিত পুঁজির থলেটি নিয়ে বসে। পর পর সে তিনবার গুনল। না, গুনতে তার ভুল হয়নি। মাত্র এক ডলার সাতাশি সেণ্ট। এ-ই তার সম্বল। ডেলা ভেবে পায়না এ সামান্য অর্থ দিয়ে তার প্রয়োজন কি করে মিটবে! অথচ সে কী-ই বা করতে পারে? বোবা কান্নায় ডেলা ভেঙ্গে পড়ে।

সামান্য আয়ে সংসার চলে না। তবুও তা থেকে বাঁচিয়ে সারা বছরে সে ঐটুকু সঞ্চয় করেছে। রাই কুড়িয়ে বেল হয়েছে। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় তাই বা কতটুকু! তার প্রাণপ্রতিম জিমের জন্য বড়দিনে একটি বিশেষ উপহার কেনবার ঐ একমাত্র সম্বল—এক ডলার সাতাশি সেণ্ট।

যেমন করে হোক্ জিমকে সুন্দর অথচ দুর্লভ এবং দামী একটা কিছু জিনিস তাকে দিতেই হবে; যেটি জিম নিত্য ব্যবহার করবে এবং যেটা ঠিক তার উপযুক্ত হবে। এ শ্রীমতী ডেলার কল্পনাবিলাস নয়—এ তার বহুদিনের, সারা বছরের একমাত্র বাসনা। কিন্তু কালই যে বড়দিন। তা কি করে সম্ভব হবে। হায় ঈশ্বর! ডেলা আর ভাবতে পারে না।

কান্না থামিয়ে সেই ছেঁড়া নোংরা বিছানা ছেড়ে ডেলা এক সময় উঠে পড়ে। খুঁজে পেতে শতছিন্ন পাউডার পাফটি দু'গালে একটু বুলিয়ে নিয়ে আস্তে আস্তে জানালার পাশে এসে দাঁড়ায়। আনমনা ভাবে সে তাকিয়ে থাকে সুবিস্তৃত রাস্তাটির দিকে।

কালই বড়দিন।

হঠাৎ সে জানলা থেকে ঘুরে ভাঙ্গা আয়নাটার সামনে এসে দাঁড়ায়। সঙ্গে সঙ্গে খুশিতে তার চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। কিন্তু খানিক বাদেই তার মুখখানা আবার বিষাদে মলিন হয়ে যায়। ডেলা এবার আস্তে আস্তে তার চুলটা পুরো খুলে ছড়িয়ে দেয়। দুরন্ত চুলগুলী তার হাঁটুর নীচে ছুটে যায়। চুল নয়তো—যেন শব্দহীন বাদামী রঙের জলপ্রপাতের ধারা। সত্যি, সে এক অপূর্ব দৃশ্য।

জেমস্ ডিলিংহ্যাম ইয়ং পরিবার গরীব হলেও দুটি জিনিষের জন্য তারা গর্ব করতে পারত। সে ঐশ্বর্যের প্রথমটি ছিল ডেলার অদ্ভুত-সুন্দর সোনালী চুলের গুচ্ছ। আর দ্বিতীয়টি ঠাকুরদার কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া জিমির সেই দুষ্প্রাপ্য সোনার ঘড়িটি। এ দুটি ছিল যে কোন সম্রাজ্ঞী বা সম্রাটের ঈর্ষার বস্তু।

ডেলার দৃষ্টি উদাস, মুখখানা করুণ। দ্বিধা-জড়িত পায়ে একটু এগিয়ে গিয়ে সে তার জীর্ণ টুপিটা হাতে তুলে নেয়। তারপর হঠাৎ চোখে ঝিলিক দিয়ে ধুলোমলিন স্কার্টটা ঝেড়ে পুঁছে একবার ঘুরে ছুটে সিঁড়ি বেয়ে একেবারে রাস্তায় নেমে যায়।

পথ সুবিস্তৃত, প্রাণবন্ত। ডেলা এগিয়ে চলে। ওটা কিসের সাইনবোর্ড ?

—"ম্যাদাম সফ্রানি। এখানে নানারকম চুলের তৈরী জিনিস পাওয়া যায়।"

ইউরেকা! খুশিতে ডেলা উচ্ছল হয়ে ওঠে। এক এক লাফে দু'টো করে সিঁড়ি টপকে ওপরে উঠে ডেলা হাঁফায়। অল্পক্ষণের মধ্যেই নিজেকে সামলিয়ে নিয়ে বিরাট গম্ভীর প্রকৃতির মহিলাটির দিকে এগিয়ে যায়।—দ্বিধা-জড়িত কণ্ঠে বলে,—

আপনি কি দয়া করে আমার চুল কিনবেন ?

—হাঁ, নিশ্চয়ই সেই তো আমার পেশা। তা, তোমার টুপটা একটু খোল। চুলটা একবার দেখে নিই।

জলপ্রপাত আবার গড়িয়ে প'ড়ে দোকানঘর আলোকিত করল। দোকানী মুগ্ধ। কিন্তু ডেলার জীর্ণ বেশবাস লক্ষ্য করে তার প্রয়োজনের তাগিদ চতুর দোকানীর বুঝতে অসুবিধা হয় না। তাই সঙ্গে সঙ্গে কপট গাম্ভীর্য মুখে টেনে, সে জানায়,—'কুড়ি ডলার দিতে পারি।'

ডেলা হাতে স্বর্গ পায়। উত্তেজিত কণ্ঠে বলে উঠে—'তাই দিন, শিগ্‌গির।'

কুড়ি ডলার ব্যাগে পুরে' ছু ঘণ্টা ধরে ডেলা অনেক দোকান ঘুরল। কিন্তু খুঁজে পেতে জিমের জন্য পছন্দমত কোন উপহার কোথায়ও পেলো না। তবুও ডেলা তার সংকল্পে অটল। অদম্য আশা আর উৎসাহ নিয়ে সে এবার এগিয়ে যায় আর একটি বড় দোকানের দিকে—

প্লাটিনামের একটি ছোট্ট পকেট চেন। দেখতেও বেশ সুন্দর। ডেলার মনে হয়, যেন ওটি তার জিমের জন্য তৈরি হয়েছে, অন্য কারো জন্য নয়। ওর ঘড়ির সঙ্গে মানাবেও বেশ। জিমকে উপহার দেবার মতই জিনিস বটে। আশ্চর্য! ঠিক এমনি একটি জিনিসই তো সে খুঁজছিল। ডেলা উত্তেজিত কণ্ঠে চেনটির দাম জিজ্ঞাসা করে।

—মাত্র একুশ ডলার।

তা হোক। দাম দিয়ে চেনটি সযত্নে ব্যাগে পুরে সে প্রায় ছুটে বাড়ি ফিরে এল।

আঃ, চেনটি কি সুন্দর! এটির সঙ্গে ঐ ঘড়িটি কি সুন্দর মানাবে! এবার তার জিম যে কোন লোকের সামনে ঘড়িটি বার করে সময় দেখতে পারবে। এখন আর তাকে পুরানো জীর্ণ চামড়ার ব্যাণ্ডটার জন্য সঙ্কোচ বোধ করতে হবে না। কি মজা! ডেলা বুক ভরে তৃপ্তির নিঃশ্বাস নেয়। খানিক বাদেই কিন্তু তার খেয়াল হয়, সে তার দয়িতের প্রিয় চুল বেচে দিয়ে এসেছে। প্রেমের মাধুর্য বজায় রাখবার জন্য অগত্যা তার সেই ছোট চুলগুলি পরিপাটি করতে লোহার যন্ত্রগুলি ডেলা আবার বার করে।

ঘণ্টাখানেকের চেষ্টা ও যত্নে এক রকম দাঁড় করিয়ে সে আয়নার ভিতর নিজেকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে নেয়।

সাতটা বাজতে কফি এবং চপ তৈরি হয়। জিমেরও ফেরবার সময় হয়ে আসে। ডেলা সগুকেনা চেনটি সযত্নে হাতে নিয়ে দরজার পিছনে একটি চেয়ার টেনে প্রিয়তমের প্রতীক্ষায় বসে থাকে। কণ্ঠে তার করুণ প্রার্থনা,—হে ঈশ্বর, জিম যেন আমাকে আজও আগের মতই সুন্দরী দেখে।

এক সময় দরজা খুলে জিম ভেতরে ঢুকে দরজাটি আবার বন্ধ করে দেয়। জিম ঘরে ঢুকতেই কি এক অদ্ভুত অনুভূতি ডেলাকে আচ্ছন্ন করে। সে ভাবে, একী! ওকে আজ এত রোগা আর গম্ভীর দেখাচ্ছে কেন? আহা বেচারা জিম! ওর না আছে একটি ওভারকোট, নেই কোন দস্তানা। হায় ঈশ্বর!

ঘরে ঢুকে ডেলার দিকে নজর পড়তেই জিম সেখানে দাঁড়িয়ে কেমন যেন অদ্ভুতভাবে একদৃষ্টে তার দিকে তাকিয়ে থাকে। সে-দৃষ্টিতে থাকে না রাগ, বিস্ময়, অপছন্দ বা ভয়। ডেলার কাছে সে দৃষ্টি হয়ে ওঠে মারাত্মক, অসহ্য। সে কোন রকমে টলতে টলতে জিমের সামনে এসে অপরাধীর মত মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রুদ্ধকণ্ঠে বলে,—

'জিম, লক্ষ্মীটি, তুমি অমন করে আমার দিকে তাকিও না। কাল বড়দিনে তোমাকে একটি উপহার না দিয়ে আমি কি থাকতে পারি, বল? উপহার কেনবার টাকার জন্য আমি আমার সমস্ত চুল বিক্রী করে দিয়েছি। তুমি বিশ্বাস কর, এছাড়া আর কোন উপায় ছিল না। তবে তুমি মন খারাপ করো না। আমার চুলের খুব বাড়। দু-দিনেই আবার এ চুল বেড়ে উঠবে। তুমি আমায় ক্ষমা করো জিম। কিন্তু, কই, তুমি তো আমাকে ক্রিসমাসের শুভকামনা জানালে না! এস, আমরা আনন্দ করি। জিম, তোমার জন্য কি চমৎকার একটি উপহার এনেছি জান?

এতক্ষণ পরে জিমের হুঁশ হল। তার মুখ ফুটে কথা বেরুল,—

'তোমার সব চুল কেটে ফেলেছ? বলছ কি? তোমার চুল নেই। সত্যি বলছ?'

'জিম, কিছু মনে করোনা। তোমাকে আজ এই উপহারটি দেবার জন্যই চুলগুলি কেটে বিক্রী করেছি। ওসব কথা থাক্। চপটা একটু গরম করি, কি বল?

ততক্ষণে জিমের জ্ঞান ফিরে এসেছে। এবার সে তার ডেলাকে দুহাত দিয়ে তুলে নিল। তারপর পকেট থেকে একটি ছোট্ট প্যাকেট বের করে টেবিলের উপর রেখে বলল,—আমাকে ভুল বুঝো না ডেল, মনে ক'রো না চুল কাটার জন্য বা তা ফাঁপানোর জন্যে তোমার উপর আমার ভালবাসা কিছুমাত্র শিথিল হবে। এই প্যাকেটটা খুললেই তুমি বুঝতে পারবে—একটু আগে আমি কেন এত আনমনা হয়ে তোমার দিকে ওরকম ভাবে তাকিয়েছিলাম।

ডেলা তাড়াতাড়ি কাগজের প্যাকেটটি খুলে আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই সে আবার কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে। তাকে সান্ত্বনা দিতে জিমের সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়।

টেবিলের উপর তখনও ডেলার জন্য সদ্য কিনে আনা উপহারটি পড়ে আছে। একটি চিরুনির সেট। আসল কচ্ছপের খোলের তৈরী—তার চারপাশে সুন্দর দামী পাথর বসানো। চমৎকার চিরুণী, অত্যন্ত মূল্যবান, কতদিন ব্রডওয়ের দোকানের শো-কেসে এই চিরুণী সেটের দিকে ডেলা লুব্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়েছে। এ রকম চিরুণী যে কোনদিন সে ব্যবহার করবার সুযোগ পাবে, এমন আশা সে কখনও করেনি। আজ সেই বহু আকাঙ্ক্ষিত চিরুণী তার হাতে এল, ভাগ্যের এ কি প্রহসন! হায় ঈশ্বর! ডেলা চিরুণীগুলি তুলে নিয়ে আস্তে আস্তে বুকে চেপে ধরে। তারও অনেক পরে সে যেন কথা বলবার শক্তি ফিরে পায়। জিমের দিকে চোখ তুলে ম্লান হেসে বলে,—'আমার চুল তো শীগগিরই আবার বেড়ে উঠবে, জিম।'

জিম তখনও তার উপহারটা দেখেনি, ডেলা হাত বাড়িয়ে সেটা তার

সামনে ধরে রইল। সেই চেনটার ওপর ডেলার মনের সমস্ত মাধুরী যেন ঝলমল করে ওঠে। বলে, চমৎকার জিনিসটা না? আমি শহরের সমস্ত দোকান খুঁজে শেষ পর্যন্ত এটির সন্ধান পেয়েছি। তুমি নিশ্চয়ই খুশি হবে, তোমার ঘড়িটা দাও, দেখি এটার সঙ্গে কেমন মানায়।

তার উক্তি শুনে জিম ধপ করে চেয়ারে বসে পড়ে। মুখে ম্লান হাসি টেনে বলে,—

'ডেল, বড়দিনের এই উপহার দুটো এখন একটু সরিয়ে রাখাই ভাল। অত ভাল জিনিস আমরা না-ই-বা আজ ব্যবহার করলাম। ও আমাদের সহ্য হবার নয়। তুমি কিছু মনে করো না। আমি সত্যিই খুব দুঃখিত, তোমার এই মূল্যবান চিরুণীগুলি কেনবার জন্য সেই ঘড়িটি আমি বেচে দিয়েছি, ডেল···।

মা

[রুশ সাহিত্যের দিক্‌পাল ম্যাক্‌সিম্ গোর্কি (Maxim Gorky)-র "মাদার" (Mother), ১৯০৭, উপন্যাসটির গল্পরূপ]

রাশিয়ার ছোট্ট শহর, নিঝনি-নভগরদ—

চারিদিকের নোংরা বস্তিগুলোতে কারখানার শ্রমিকদের জটলা। এ অঞ্চলের কারখানাটা শ্রমিকদের দিনগুলোকে যেন গিলে খায়। আর, যন্ত্র-দানবগুলো তাদের দেহের শক্তিটুকু নিংড়ে শুষে নেয়।

সারাদিনের হাড়ভাঙ্গা খাটুনিতে শ্রমিকদের দেহ নুয়ে পড়ে। দিনান্তে কারখানা থেকে বেরিয়ে বুড়োরা ভদ্‌কা খেয়ে অবসন্ন দেহটাকে চাঙ্গা করবার চেষ্টা করে। তারপর বাড়ি ফিরে অকারণ বৌ-দের বিশ্রীভাবে গালমন্দ দেয়, তাদের নির্মম ভাবে প্রহার করে। অবোধ শিশুগুলিও পিতার সে-রোষ থেকে নিস্তার পায় না।

ওদিকে যুবকরা ছোটে মদের আড্ডায়। সেখানে তারা অশ্লীল গান গায়, নাচে—পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে বদ রসিকতায় মেতে ওঠে। ভদ্‌কার উগ্র নেশা কি যেন একটা অজানা অস্থির ফরিয়াদ তাদের বুকের মধ্যে জ্বালিয়ে দেয়।

ঐ মনের জ্বালায় লোকগুলি সামান্য কারণেই পাশব হিংস্রতায় মত্ত হয়ে ওঠে। তখন তুচ্ছ কারণে নিজেদের মধ্যে শুরু হয় হাতাহাতি, ক্রমে রক্তারক্তি, খুনোখুনি।

মানুষের সঙ্গে মানুষের সাধারণ সম্পর্কটুকুও এই কারখানার শ্রমিকদের বেলায় কি এক বিদ্বেষে বিষিয়ে থাকে। ঐ বিষের জ্বালায় ওরা অযথা ক্রূর জঘন্য সব অপরাধ করে। ও বিষ ঝেড়ে ফেলা সহজ নয়, রক্তের সঙ্গে মিশে গেছে। তা পিতা থেকে পুত্রে সংক্রামিত। সে বিষ ছায়ার মতো কবর পর্যন্ত তাদের অনুসরণ করে।

তবুও সেই কারখানা আর যন্ত্র ছাড়া ওদের আর কোন কথা থাকে না ; থাকে না অন্য কোন ভাবনা।

ওরা কোন নতুন কথাও শুনতে চায় না। শুনতে গেলে ওদের মনে শঙ্কা জাগে। কখনও বা ওই বক্তার প্রতি তাদের মনে বিশ্রী একটা সন্দেহ উঁকি দেয়। দিনের পর দিন ওরা এমনি ভাবে কাটায়। তাতে নাই থাক সুখ, স্বস্তি তো থাকে। তারা জানে, ও থেকে ওদের মুক্তি নেই।

এমনি ভাবে কারখানার শ্রমিকরা মানুষের রূপে হিংস্র পশুর জীবন যাপন করে। দারিদ্র্য আর দুর্দশা তাদের নিত্যসঙ্গী। ক্রমে ক্রমে তারা অকালে কবরের দিকে পা বাড়ায়।

কারখানাটির দুর্ধর্ষ বেপরোয়া শ্রমিক মিখায়েল ভ্লাসভ হঠাৎ একদিন পেটের কি এক অসহ্য যন্ত্রণায় খানিকক্ষণ দাপাদাপি করে মারা যায়। পড়শিরা বলাবলি করে এবার ওর বৌ পেলাগেয়া'র হাড় জুড়োবে। শ্রীমতী পেলাগেয়া নীরবে চোখের জল মোছে আর মাঝে মাঝে কেমন অদ্ভুত ভাবে তাদের একমাত্র পুত্র প্যাভেল-এর দিকে তাকিয়ে থাকে।

তার লাঞ্ছিত জীবনে প্যাভেল-ই একমাত্র আশার প্রদীপ। শ্রীমতী পেলাগেয়া'র মনে শঙ্কা জাগে, কি জানি বস্তির ঐ দূষিত হাওয়ায় সে প্রদীপটি কখন নিভে যায়! ভাবে, পুত্র পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করবে—তাতে আর বিচিত্র কি!

প্যাভেল তখন তরুণ। পিতা মিখায়েল-এর আকৃতি এবং প্রকৃতি না পেলেও সে এখন জোয়ান ছেলে। প্যাভেলও মদ খেয়ে মনের জ্বালা ভুলতে চেষ্টা করে। কিন্তু উগ্র ভদ্‌কার স্বাদ তার ভাল লাগে না। মা দ্বিধা-জড়িত কণ্ঠে ছেলেকে বলেন,—ও ছাইপাঁশটা অতো খেও না, শরীর নষ্ট হবে।

প্যাভেল কোন প্রতিবাদ জানায় না। কিন্তু ক্রমে সে সুরা পান থেকে নিবৃত্ত হয়। খুশিতে মা'র মনটা ভরে ওঠে।

আরও কিছুদিন যেতে শ্রীমতী পেলাগেয়া লক্ষ্য করেন, গভীর রাত পর্যন্ত প্যাভেল আপন মনে কি যেন বই পড়ে। তাঁর বিস্ময়ের সীমা থাকে না। একদিন সাহস করে তিনি প্রশ্ন করেন,—হ্যাঁরে, তুই রোজ রোজ ওগুলো কি বই পড়িস্?

—ওরা বলে, এগুলো নিষিদ্ধ বই। কিন্তু এ থেকে আমি জানছি কর্তৃপক্ষ কি ভাবে শ্রমিকদের শোষণ করছে। কি মর্মান্তিক ভাবে শ্রমিক ভাইরা তাদের ন্যায্য এবং ন্যূনতম দাবী থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। তরল কণ্ঠে প্যাভেল মা-কে জানায়।

শুনে মা চমকে উঠতে প্যাভেল তাঁকে জানায়,—ভয় পেও না মা। এ কথা আমাদের সকলকে জানতে হবে। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে মিলিত ভাবে সব শ্রমিক ভাই-বোনেদের এ নিষ্ঠুর শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে হবে। সে কথা আলোচনা করতেই আমার সমাজতন্ত্রী বন্ধুবান্ধবীরা আমাদের বাড়ি আসছে।

ছেলের মুখে ঐ সব অদ্ভুত নতুন কথা শুনে ভয়ে মা'র মুখ ফ্যাকাসে হয়ে ওঠে। তিনি আর কথা বাড়ান না। পায়ে পায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যান।

কিন্তু প্যাভেলের ঐ বন্ধু-বান্ধবীরা তাঁর বাড়িতে এলে তাদের মিষ্টি ব্যবহারে মা মুগ্ধ হন। ভাবেন, এমন ছেলে মেয়েও দুনিয়াতে সম্ভব!

তাদের গোপন সভা বসে। দলের আদর্শকে কেন্দ্র করে তর্কের ঝড় ওঠে। অদূরে বসে অবাক বিস্ময়ে মা লক্ষ্য করেন—ব্যক্তিগত ভাবে কেউ কারুর ওপর ক্রুদ্ধ হয় না, একটি বিশ্রী গালমন্দও কারুর মুখ থেকে বেরোয় না; উপস্থিত সকলের মুখেই দৃঢ় আত্ম-প্রত্যয়ের স্পষ্ট ছাপ। এক সময় তিনি উঠে গিয়ে ওদের পাশে বসে পড়েন। তাঁর স্নেহের স্নিগ্ধ স্পর্শে ছেলেমেয়েরা খুশিতে উচ্ছল হয়ে ওঠে।

শ্রীমতী পেলাগেয়া উপলব্ধি করেন, ছেলের বন্ধু-বান্ধবীরা, বিশেষ করে আন্দ্রে, বান্ধবী নাতাশা এবং প্যাভেল নিজে তাঁকে যে শ্রদ্ধা ও সম্মান দেখায় মজুর-ঘরণী পেলাগেয়া মানুষ হিসেবে সে-স্বীকৃতি তাঁর জীবনে কোনদিনই পান নি। এক মূক আনন্দে মা অভিভূত হয়ে পড়েন।

মা সকলকেই তাঁর নিজের সন্তানের মতো ভালবাসেন, স্নেহ করেন। তবুও প্রাণোচ্ছল আন্দ্রের প্রতি-ই তাঁর টানটা যেন একটু বেশী। মা'র অনুরোধে আন্দ্রে তাঁর বাড়িতে এসে আস্তানা নেয়। আন্দ্রে আর প্যাভেল যেন তাঁর দু'টি যমজ ছেলে।

ভ্লাসভদের বাড়িতে বিপ্লবীদের আনা-গোনা চলতে থাকে। তাদের গোপন সভারও বিরাম নেই। ক্রমে বাড়িটি হয়ে ওঠে তাদের প্রাণকেন্দ্র। ধীরে ধীরে এই সন্ত্রাসবাদীদের কার্যকলাপ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে।

খবরটা কিন্তু বেশী দিন চাপা থাকে না। গোয়েন্দা বিভাগ সতর্ক হয়। ছদ্মবেশে পুলিশ বাড়িটির ওপর নজর রাখে। তারপর হঠাৎ একদিন অসতর্ক মুহূর্তে পুলিশ এসে হাজির হয়, খানাতল্লাসী করতে আন্দ্রে, ভেসভস্কীখভ এবং আরও ক'জনকে তারা গ্রেপ্তার করে নিয়ে জেলে বন্দী করে। পুলিশের বর্বরতার নগ্নরূপ প্রত্যক্ষ করে মা'র মনটা শক্ত হয়—কি এক অব্যক্ত শক্তির প্রেরণা তিনি অনুভব করেন। তাঁর ম্লান দু'টি চোখ যেন কিসের উদ্দীপনায় উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

প্যাভেল কারখানায় গিয়ে শ্রমিকদের উদ্বুদ্ধ করবার চেষ্টা করে। ক্রমে শ্রমিক ভাইরা এই অচেনা তরুণটির চোখে বন্ধুত্বের আভাস লক্ষ্য করে উৎসাহ পায়। চতুর চাষী ভাই রুবীন ও মাঝে মাঝে ছুটে আসে প্যাভেলের কাছে—তার বুদ্ধি পরামর্শের জন্য।

পুত্র প্যাভেলের দিকে তাকিয়ে মা পরম তৃপ্তিতে নিঃশ্বাস নেন। পুত্রের গর্বে তাঁর বুকটা ফুলে ফুলে ওঠে। ভাবেন, আঃ বেঁচে থাকার কি আনন্দ!

এমন সময় শ্রমিকরা একদিন জানতে পারে, তাদের বেতন কমে যাবে। যেন বিনা মেঘে তাদের মাথায় বজ্রাঘাত হয়। দিশেহারা শ্রমিক ভাইরা ছুটে এসে প্যাভেলের সাহায্য প্রার্থনা করে।

প্যাভেল এক বিরাট শ্রমিক দলকে সঙ্গে নিয়ে কারখানার ম্যানেজারের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তীব্র ভাষায় প্রতিবাদ জানায়। জ্বালাময়ী ভাষায় সকল শ্রমিক ভাইকে ঐ অত্যাচারের বিরুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করবার চেষ্টা করে। শ্রমিকরা চঞ্চল হয়ে ওঠে। ঠিক সেই মুহূর্তে পুলিশ এসে প্যাভেলকে গ্রেপ্তার করে।

প্যাভেল জেলে বন্দী হওয়ায় মা অবশ্যই গভীর দুঃখ পান। কিন্তু তাঁর ছেলের সঙ্গে আরও বহু লোকের বন্দী হবার খবর শুনে মা তাঁর বেদনা ভুলে যান।

আন্দ্রে তখনও জেলে। প্যাভেলের খবর জানতে পেরে সে মা'র দুঃখ উপলব্ধি করে। সে মা'কে সমবেদনা জানায়, অন্তরের শ্রদ্ধা জানিয়ে তাঁকে চিঠি দেয়। মা'র মনের ক্ষতে যেন স্নিগ্ধ প্রলেপের ছোঁয়া লাগে।

আন্দ্রে এবং প্যাভেল দু'জনেই জেলে বন্দী। মা'র সময় যেন আর কাটে না। শুধু নীরব সাক্ষী হয়ে বসে থাকতে তাঁর মন ক্রমে বিদ্রোহ করে। অথচ ভেবে পান না, তিনি কি-ই বা করতে পারেন! কেমন করে ছেলেদের অসমাপ্ত কাজে তিনি সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতে পারেন?

হঠাৎ তাঁর মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে যায়। মা কারখানার খানা-কুলি'র কাজ নেন। তিনিও কাজে লাগেন।—তাদের খাবার সরবরাহ করবার সুযোগ পেয়ে তিনি গোপনে বিপ্লবের ইস্তাহারগুলি শ্রমিক ভাইদের হাতে হাতে তুলে দেন। সেই সঙ্গে তিনি প্যাভেলের বন্ধুদের সঙ্গেও যোগাযোগ রক্ষা করেন।

এমন সময় আন্দ্রে একদিন জেল থেকে মুক্তি পেয়ে ফিরে আসে। মা তাকে বুকে তুলে নেন। আনন্দে তাঁদের দু'জনের মুখ-ই মূক হয়ে যায়। উচ্ছ্বাসে মা'র চোখ থেকে অবিরাম অশ্রুধারা নেমে আসে।

ক্রমে আন্দ্রের আন্তরিক চেষ্টা ও অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে অল্পদিনের মধ্যেই মা লিখতে পড়তে শেখেন।

এখন আর মা'র স্বার্থ সেই সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে সীমিত নয়। শুধু তাঁর নিজের বা পুত্র প্যাভেলের কথা ভাবলে তাঁর আর চলে না। চিন্তার পরিধি তাঁর এখন বৃহত্তর। বিপ্লবের আদর্শের কাছে তাঁর ব্যক্তিগত স্বার্থ অতি তুচ্ছ। অনেক কাজ তাঁকে করতে হয়, ভাবতে হয় আরও বেশী।

তবুও তিনি প্যাভেলের সঙ্গে মাঝে মাঝে জেলে গিয়ে দেখা করতে ভুল করেন না; ইঙ্গিতে তাকে কাজের কথাও জানান। প্যাভেলকে মা উৎসাহ দেন।

বসন্তকাল। জেল থেকে মুক্তি পেয়ে প্যাভেল একদিন বাড়ি ফিরে আসে। এবার দ্বিগুণ উৎসাহে তাদের গোপন বৈঠক চলে, কার্য-কলাপের পরিধি বেড়ে যায়। স্থির হয়, দলবল নিয়ে তারা আগামী পয়লা মে'র দিন রাজপথে মিছিল করে বেরোবে। পুলিশের ভয় আর তারা করবে না।

ক'দিন বাদে একটি পুলিশের গুপ্তচর আন্দ্রের হাতে নিহত হয়। বিপ্লবীদের খুশি হবার কথা। কিন্তু তারা তা হয় না। দুষ্কৃতির জন্য আন্দ্রের মন অনুশোচনায় ভরে ওঠে।

এদিকে পুলিশ দু' সপ্তাহ তদন্ত করেও অপরাধীর কোন হদিস না পেয়ে ক্ষান্ত হয়। বিপ্লবীরাও স্বস্তির নিঃশ্বাস নেয়।

মে দিবস। ভোর হ'তেই প্যাভেল এবং আন্দ্রে তাদের শোভাযাত্রার তোড়জোড় শুরু করে। অল্প সময়ের মধ্যেই দলের লোকেরা এসে হাজির হয়। পতাকা সামনে নিয়ে মিছিল বেরিয়ে পড়ে। বিপ্লবের আওয়াজ তুলে দলটি রাজপথ দিয়ে এগিয়ে যায়। মুখে তাদের শ্রমিক ভাইদের উদ্বুদ্ধ করার গান।

অল্প সময়ের মধ্যে সশস্ত্র সেনাবাহিনী ছুটে এসে তাদের

দাঁড়ায়। শোভাযাত্রীরা নির্ভীক ভাবে তবুও দাঁড়িয়ে থাকে, পিছু হটে না। তারা তখন বেপরোয়া, সংকল্পে অটল।

সৈন্যেরা নির্মম ভাবে তাদের ছত্রভঙ্গ করে দেয়। তারপর দলের পাণ্ডা প্যাভেল এবং আন্দ্রে তাদের হাতে বন্দী হয়। বন্দী হয় দলের আরও অনেকে। বন্দীরা কিন্তু ক্ষুব্ধ হয় না, সহজ ভাবেই কারা-বরণ করে।

এ ঘটনার পর শূন্য ঘরে মা'র মন টেকে না। তখন প্যাভেলের বন্ধু নিকোলের অনুরোধে তিনি তাদের শহরের বাড়িতে চলে যান। নিকোলে এবং তার মিষ্টি বোন সোফিয়ার সৌজন্যে মা আত্মস্থ হন। তারপর তাঁর দিনগুলি সেখানে মন্দ কাটে না।

শ্রীমতী পেলাগেয়া তখন আর শুধু প্যাভেলের মা নন। তিনি সকলের মাতৃস্থানীয়। তাদের সকলের জন্য তাঁর মন কাঁদে। তাই তিনি বিপদের ভয়ে চুপ করে ঘরে বসে থাকতে পারেন না।

ছ'দিন যেতে সোফিয়াকে সঙ্গী করে তীর্থযাত্রীর ছদ্মবেশে মা বেরিয়ে পড়েন। শহর এবং উপকণ্ঠে ঘুরে ঘুরে বিপ্লবের ইস্তাহার তাঁরা বিলি করেন। পায়ে পায়ে গাঁয়ে গাঁয়ে গিয়ে তিনি প্রত্যক্ষ করেন চাষী ভাইদের দুর্দশা আর ভূ-স্বামীদের নিষ্ঠুর অত্যাচার। ব্যথায় তাঁর মন ভরে ওঠে।

এমন সময় কমরেড ভেস্‌ভস্কীখভ্‌ একদিন জেল থেকে পালিয়ে আসতে মা কৌশলে পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে তাকে লুকিয়ে রাখেন। শুধু তাই নয়, নিজের জীবন তুচ্ছ করে পুলিশের হাত থেকে একটি ছেলের প্রাণও বাঁচান। আর্ত শ্রমিকদের সেবা যত্নের জন্য তিনি ছুটে যান দূর-দূরান্তে। ক্রমে প্যাভেলের চিন্তা তাঁর কাছে গৌণ হয়ে পড়ে, মুখ্য হয় বিপ্লবের সাধনা।

খবর আসে, বিপ্লবের আগুন পল্লী অঞ্চলেও ছড়িয়ে পড়েছে। পুলিশের হাতে চাষী ভাইদের লাঞ্ছনা দিন দিন বেড়েই চলেছে। শুনে

মা চঞ্চল হয়ে ওঠেন। তিনি একা একাই সেখানে ছুটে যান। অবশ্য ইস্তাহারগুলি সঙ্গে নিতে ভোলেন না।

বিক্ষুব্ধ অঞ্চলে পৌঁছে তিনি জানতে পারেন, প্যাভেলের সহকর্মী রাইকিন-কে পুলিশ নির্মম ভাবে প্রহার ক'রে জেলে বন্দী করেছে। সহৃদয় চাষী ভাইদের আন্তরিক অনুরোধ মা ঠেলতে পারেন না। রাতটা তিনি তাদের সঙ্গেই কাটান। রাতের অন্ধকারে চাষী ভাইদের ঘরে ঘরে নিজ হাতে তিনি সঙ্গে-আনা ইস্তাহারগুলি পেঁাছে দেন।

ক'দিন বাদে মা সুকৌশলে রাইকিন-কে জেল থেকে পালাতে সাহায্য করেন। বিভ্রান্ত চাষী ভাইদের মুখে আবার হাসি ফুটে ওঠে।

ওদিকে ছ' মাস জেলে কাটাবার পর প্যাভেল এবং তার বন্দী সহ-কর্মীদের অপরাধের বিচারের জন্য একদিন তাদের আদালতে হাজির করা হয়।

আদালতে এসে প্যাভেল এবং আন্দ্রে লক্ষ্য করে, এতদিন যাদের তারা হিতৈষী বন্ধু ব'লে জানতো আজ তারা যেন তাদের বিপদে মজা দেখতে এসেছে। আসামীদের সপক্ষে সাক্ষ্য দিতে কেউই এগিয়ে আসে না। বিচারপতিদের মুখেও যেন ঘৃণা এবং অবজ্ঞার ছাপ। ব্যাপারটা বুঝে নিতে আসামীদের অসুবিধা হয় না।

দৃঢ় পদক্ষেপে প্যাভেল তার জবানবন্দী দিতে এগিয়ে যায়। তার সেই জ্বালাময়ী নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা সমস্ত আদালত স্তব্ধ হয়ে শোনে। ভয়ে বিচারপতিদের মুখ ফ্যাকাসে হয়ে ওঠে। আন্দ্রে সেই বিচারপতিদের বিদ্রূপ করতেও ছাড়ে না।

বিচারে প্যাভেল, আন্দ্রে এবং আরও ক'জন সিবিরিয়াতে নির্বাসিত হয়। তারপর পুলিশ একে একে বিপ্লবীদের খুঁজে পেতে জেলে বন্দী করতে থাকে। শহরবাসী কর্মী বিপ্লবী নিকোলেও একদিন তাদের ফাঁদে পড়ে।

মা কিন্তু তবুও হতাশ হন না। পুলিশের নজর সতর্কতার সঙ্গে

এড়িয়ে প্যাভেল এবং আন্দ্রের অসমাপ্ত কাজ শেষ করবার জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করেন।

একদিন প্যাভেলের শেষ জবানবন্দীর সেই দৃপ্ত ভাষণ ইস্তাহারে ছাপিয়ে নিয়ে মা মস্কোর দিকে চুপি চুপি রওনা হন।

ট্রেনের ভেতর ছদ্মবেশী পুলিশ এক সময় মা'র টুঁটি চেপে ধরে। তবুও যাত্রীদের লক্ষ্য করে মুখর হ'য়ে ওঠে লাঞ্ছিত মা'র মুখ। পুলিশের প্রচণ্ড প্রহারে দরদর করে তাঁর দেহ থেকে রক্ত বেরোয়। কিন্তু সেদিকে তিনি ভ্রূক্ষেপ করেন না, তাঁর মুখ মূক হয় না। বর্বর পুলিশ এবার তাঁর গলা সজোরে টিপে ধরে। তাঁর সর্বাঙ্গ নীল হয়ে ওঠে। তখন কম্পিত হাতে ঝুলি থেকে শেষ ইস্তাহারটি বের করে তিনি যাত্রীদের মধ্যে বিলিয়ে দিতে ব্যস্ত হন। ঝুলিটি নিঃশেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে মা'র নিস্পন্দ দেহটি লুটিয়ে পড়ে। তিনি আর ওঠেন না।

স্মৃতিচারণ

[ফরাসী সাহিত্যিক মার্সেল প্রুস্ত (Marcel Proust)-এর **'রিমেমব্রেন্স অফ থিংস পাস্ট'** (Remembrance of things past), ১৯১৩-'২৭, উপন্যাসমালাটির সারাৎসার]

যথারীতি বাতিটি নিভিয়ে মার্সেল শুয়ে পড়ে। কিন্তু চোখে তার ঘুম আর আসে না। ক্রমে রাত গভীর হয়। নিঃসাড়ে বিছানায় শুয়ে সে ব্যাকুল হয়ে ঘুমের আরাধনা করে। তবুও তার চোখের পাতা দু'টি এক হয় না।

আশৈশব এমনি ভাবে বছরের পর বছর গড়িয়ে যায়। কি জানি, নিদ্রাদেবী মার্সেলের ওপর অতো অকরুণ কেন ?

ঘুম আর জাগরণের ঐ অন্তর্লীন গোধূলিতে অতীতের ছোট বড় সব স্মৃতি একে একে মার্সেলের মানস-পটে ভেসে ওঠে—

কখনও সদ্য-পড়া বইটির কথা বালক মার্সেলের মনে পড়ে। সে-বইটি ইতিহাস হ'লে তো কথাই নেই; সঙ্গে সঙ্গে ঐতিহাসিক চরিত্র-গুলো মিছিল করে তার সামনে যেন মূর্ত হয়ে ওঠে। তারপর নানা মজার ঘটনাকে কেন্দ্র করে মার্সেল কল্পনার জাল বুনতে শুরু করে।

আবার কখনও বা অতীতে মা বা ঠাকুমা'র সঙ্গে যে সব নানা জায়গায় মার্সেল বেড়িয়েছে বা রাত কাটিয়েছে ঐ সব স্মৃতিবিজড়িত অঞ্চলগুলোর কথাও তার মনে জাগে।

ক্রমে মার্সেল বড় হয়। কিন্তু তখনও শৈশব কালের কঁব্রে'র সে রাত্রের কথা তার স্পষ্ট মনে পড়ে—

প্রতি বছরের মতো সেবারেও গ্রীষ্মের ছুটিতে মা'র সঙ্গে মার্সেল ঠাকুমা আর পিসির ওখানে বেড়াতে গিয়েছিল। সে-রাত্রে পরিবারের বন্ধু মঁসিয়ে সোয়ান তাদের বাড়িতে নিমন্ত্রিত অতিথি। হয়তো তাই

অন্যদিনের তুলনায় একটু আগে বালক মার্সেলকে শুইয়ে দেওয়া হয়েছিল।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা গড়িয়ে যায়, মা তাকে শুভ রাত্রি জানাতে আসেন না। তার সে কি উদ্বেগ, কি গভীর চিন্তা! মঁসিয়ে বিদায় নিতে মা ছেলের কাছে আসবার সুযোগ পান। মা-কে দেখে মার্সেল স্বস্তির নিঃশ্বাস নেয়।

তারপর বহু বছর কেটে গেছে। একদিন মা'র সঙ্গে বসে চা খাবার সময় একটি মিষ্টি কেক মুখে তুলতেই আবার সেই বাল্যস্মৃতি তার মনে জেগে ওঠে। সে উপলব্ধি করে, কেঁব্রে'র সে-স্মৃতি তখনও তার মনে অম্লান হয়ে আছে।

ঠাকুমা'র বাড়ির কাছের দু'টি রাস্তার কথাও মার্সেলের স্পষ্ট মনে পড়ে—একটি তাদের বাগানের বুক চিরে ছুটে গেছে মঁসিয়ে সোয়ানের বাড়ির দিকে, অন্যটি অপেক্ষাকৃত বড়,—নদীর কিনারা দিয়ে চলে গেছে কেঁব্রে'র জমিদার বাড়ি পর্যন্ত। মনে পড়ে, কতো পরিচিত অপরিচিত লোকই না আনাগোনা করতো সে-রাস্তা দু'টি দিয়ে।

সে-রাস্তায় মার্সেল দেখেছে স্থানীয় ডাক্তার এবং পুরোহিতকে; দেখেছে সে বিশিষ্ট গীতিকার ভেন্টিলকেও, যিনি উত্তরকালে তাঁর আদরিণী কন্যার কু-খ্যাতির আঘাত সইতে না পেরে হৃদ্‌রোগে তাঁর গ্লানিকর জীবন থেকে মুক্তি পেয়েছিলেন। তবে সোয়ান পরিবারের স্মৃতিই মার্সেলের মনে সব চেয়ে গভীর রেখাপাত করেছিল।

ক্রমে ক্রমে মার্সেল জানতে পেরেছিল, শ্রীমতী সোয়ান গোড়াতে দীর্ঘদিন তার প্রণয়িনী ছিলেন। তাদের বিয়ের আগে কুমারী ওদেৎ-এর কিছু কুখ্যাতিও ছিল। হয়ত সে বদনামের মূলে ছিল তার রূপ এবং যৌবন। ঘটনাচক্রে সোয়ান এক সময় তাকে বিয়ে করেন। ওদের বিয়ের পরেও রক্ষণশীল পরিবারগুলো ওদেৎ-কে বিশেষ সু-নজরে দেখতো না। মঁসিয়ে সোয়ানের সে কথা অজানা ছিল না। তাই তিনি মার্সেলের ঠাকুমা'র বাড়িতে স্ত্রী-কে সঙ্গে নিয়ে যেতেন না।

বাড়ির কাছের পার্কটিতে মার্সেল পরিচারিকার হাত ধরে বেড়াতে যেতো। সেখানে তাদের ছোট্ট মেয়ে জিল্‌বের্তে-কে নিয়ে মাদাম সোয়ানও আসতেন। ক্রমে দু'জনের মধ্যে পরিচয় হয়। তারা একসঙ্গে খেলা করে। ক্রমে ক্রমে মার্সেল জিল্‌বের্তেকে ভালবেসে ফেলে। মাদাম সোয়ানকেও তার ভাল লাগে, তাঁকেও সে ভালবাসে।

মাঝে মাঝে মার্সেল জিলবের্তেদের বাড়িতে বেড়াতে যায়। ছোট্ট জিল্‌বের্তে লক্ষ্য করে, মার্সেলের আকর্ষণটা যেন ওর মা'র ওপরই বেশী। বন্ধুর ঐ অদ্ভুত আচরণে জিল্‌বের্তে বিরক্ত বোধ করে।

কিছুদিন বাদে। একদিন জিল্‌বের্তে জানায়, সে আর বেশী দিন পার্কে আসবে না। সামনে বড়দিন, তারপর তারা বাইরে কোথাও বেড়াতে যাবে। শুনে মার্সেল মর্মাহত হয়। রুগ্ন ছেলেটির দেহ-মন ভেঙ্গে পড়ে।

শরীর দুর্বল, মনটিও ভাবপ্রবণ—কল্পনার জগতে মার্সেল মুক্তি খোঁজে। দু'দিন বাদে পার্কে আবার মাদাম সোয়ান এবং জিলবের্তেকে সে বেড়াতে দেখে। কিন্তু মার্সেলকে দেখেও ওরা তার কাছে আসে না, দূরে থেকে ঘাড় নেড়ে সরে যায়। রুগ্ন ছেলেটির জন্য বে-হিসাবে সময় নষ্ট করবার ওঁদের অবকাশ কোথায়? শূন্য হৃদয়ে মার্সেল বাড়ি ফিরে আসে।

আরও কিছুদিন পরের কথা। মার্সেলের মনে পড়ে, তাকে নিয়ে ফ্লোরেন্স ও ভেনিস-এ বেড়াতে যাবার কথা হয়। কিন্তু ঐ দু'জায়গায় যাবার উত্তেজনাতে সে অসুস্থ হয়ে পড়ে। যাওয়া আর হয় না।

একটু সুস্থ হয়ে উঠতে ঠাকুমা'র সঙ্গে মার্সেল স্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্য সমুদ্রতীরে কিছুদিনের জন্য বেড়াতে যায়। বেলবেক-এ। জায়গাটি মনোরম, স্বাস্থ্যের পক্ষেও ভাল। মার্সেলের দিনগুলি সেখানে ভালই কাটে।

এখানে সুন্দরী আলবার্টিনকে দেখে মার্সেল মুগ্ধ হয়। ক'দিন বাদে সে ঠাকুমা'র বান্ধবী মাদাম দ্য ভেলীপ্যারীসের সঙ্গে পরিচিত হয়। এই মাদাম ছিলেন কেঁব্রে'র জমিদার গারমেনটেস্ পরিবারের আত্মীয়া।

মার্সেল-এর সঙ্গে মাদাম তাঁর দুই ভাইপোর আলাপ পরিচয় করিয়ে দেন—রবার্ট দ্য সেণ্ট-লুপ এবং ব্যারন দ্য চালর্স।

ক্রমে সেণ্ট-লুপ এবং মার্সেলের মধ্যে বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। সেণ্ট-লুপ নতুন বন্ধুর সঙ্গে তার প্রণয়িনী রাসেলের পরিচয় করিয়ে দেয়। কিন্তু চালর্সের চরিত্রের স্বরূপ জানতে পেরে তার প্রতি মার্সেলের মন ঘৃণায় ভরে ওঠে।

ক'দিন বাদে তারা প্যারীতে ফিরে আসে। মাদাম ভেলীপ্যারীস্ এবং সেণ্ট-লুপের সৌজন্যে মার্সেল স্থানীয় সম্ভ্রান্ত পরিবারবর্গের সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ পায়।

কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই মার্সেলের জীবনে আবার দেখা দেয় এক বিপর্যয়। সে দিনটি সুন্দর দেখে ঠাকুমাকে সঙ্গে নিয়ে মার্সেল রাস্তায় বেড়াতে বেরিয়েছে। কিছুদূর যাবার পরই হঠাৎ সন্ন্যাস রোগে আক্রান্ত হয়ে ঠাকুমা মারা যান।

এমনি ভাবে ঠাকুমা গত হতে মার্সেলের মনে হয়—পৃথিবীতে বেঁচে থাকা অর্থহীন, বিড়ম্বনা মাত্র। শান্তির সন্ধানে সে আলবার্টিনের শরণাপন্ন হয়। মার্সেল হতাশ হয় না।

প্যারীর শূন্য বাড়িতে সুন্দরী আলবার্টিনের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে মার্সেলের দিনগুলি গোড়াতে ভালই কাটছিল। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই তার অদ্ভুত আচরণে উত্ত্যক্ত হয়ে আলবার্টিন আবার বেলবেকে ফিরে যেতে বাধ্য হয়।

আলবার্টিনকে কাছে পেয়েও মার্সেল সুখী হতে পারে নি, শান্তির স্বাদ পায় নি। কিন্তু সে চলে যেতে অসহ্য মানসিক যন্ত্রণায় মার্সেল কাতর হয় গভীর মনস্তাপে যখন তার দিনগুলি কাটছিল, মার্সেল জানতে পারে—ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে গিয়ে তার প্রাণপ্রতিম আলবার্টিন মারা গেছে। সে স্তব্ধ হয়। দুদিন বাদে আলবার্টিনের লেখা একটি চিঠি মার্সেলের হাতে এসে পৌঁছায়। আলবার্টিন জানিয়েছে, শীঘ্রই সে আবার মার্সেলের কাছে ফিরে আসছে।

মার্সেল হিসেব করে দেখে, ঐ চিঠিটি লেখবার পরের দিনই দুর্ঘটনাটা ঘটেছে। এক বোবা কান্নায় মার্সেল অভিভূত হয়ে পড়ে।

তবুও মার্সেলকে বেঁচে থাকতে হয়। অবলম্বনের জন্য সে পুরনো বন্ধু-বান্ধবীদের সন্ধান করে। মার্সেল উপলব্ধি করে, মহাকালের স্রোত তাদের সকলকেই কম বেশী স্পর্শ করেছে; প্রত্যেকেই তারা অনেক বদলে গেছে। তবুও মার্সেল তাদের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিতে প্রাণপণ চেষ্টা করে।

মার্সেল জানতে পারে—মঁসিয়ে সোয়ান অনেক দিন থেকে ভুগছেন। তিনি তখন অন্তিম শয্যায়। তার বাল্য-বান্ধবী জিল্‌বের্তে বন্ধু সেণ্ট-লুপকে বিয়ে করেছে। ওদেৎ-এর কুখ্যাতা বান্ধবী মাদাম ভের্দুর‍্যাঁ কি করে বিপুল ঐশ্বর্যের মালিক হয়ে ঐ বয়সেও দ্বিগুণ উৎসাহে স্ফুর্তিতে দিন কাটাচ্ছে যতো সব সম্ভ্রান্ত পুরুষ আর রাজপুরুষদের নিয়ে। সেণ্ট-লুপের ভাই ব্যারন দ্য চার্লস এতদিনে আরও উচ্ছন্নে গেছে।

ক্রমে মার্সেলের শরীর আরও ভেঙ্গে পড়ে, মনের ক্লান্তিও গাঢ় হয়। অগত্যা তাকে একটি স্যানিটরিয়ামে আশ্রয় নিতে হয়। ততদিনে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের দামামা বেজে উঠেছে।

যুদ্ধের শেষে মার্সেল প্যারীতে ফিরে আসে। ব্যক্তি ও সমাজ জীবনের ওপর ঐ ভয়ঙ্কর যুদ্ধের প্রতিক্রিয়া তার নজর থেকে এড়ায় না।

—রবার্ট সেণ্ট-লুপ যুদ্ধে প্রাণ হারিয়েছে; তার প্রণয়িনী শ্রীমতী রাসেল বিখ্যাত অভিনেত্রী হয়েছে। মঁসিয়ে সোয়ান দীর্ঘদিন রোগে ভুগে জীবন-যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেয়েছেন। স্বামীর মৃত্যুর পর শ্রীমতী সোয়ান আবার এক ধনীকে বিয়ে করেছেন। ওদিকে কেঁব্রে'র প্রিন্স গারমেনটেস্ ঘটনাচক্রে তাঁর সব বিষয়-সম্পত্তি হারান, তারপর স্ত্রী-বিয়োগের পর সেই কুখ্যাতা মাদাম ভের্দুর‍্যাঁর ঐশ্বর্যের লোভে তাকে বিয়ে করেন। আর, লম্পট ব্যারন দ্য চার্লস জরা ও বার্ধক্যে ধুঁকছে।

কিছুদিন পর মার্সেল প্রিন্স গার্‌মেন্‌টেস্‌-এর বাড়িতে এক প্রীতি-

সম্মেলনে আমন্ত্রিত হয়। দীর্ঘকাল পরে হলেও সেখানে তার বাল্য-বান্ধবী জিল্‌বের্তেকে চিনতে মার্সেলের অসুবিধা হয় না। কিন্তু তার সঙ্গের সুন্দরী তরুণীকে সে চিনতে পারে না।

শ্রীমতী জিল্‌বের্তে যখন সঙ্গের মেয়েটিকে তার কন্যা বলে পরিচয় দেয়—মার্সেল চমকে ওঠে। মার্সেল উপলব্ধি করে, তার বয়স কম হয়নি; সে বার্ধক্যে পা বাড়িয়েছে।

ঘুরতে ঘুরতে মার্সেল এক সময় প্রিন্সের লাইব্রেরীতে গিয়ে হাজির হয়। একটি বইয়ের ওপর নজরে পড়তে সে অবাক বিস্ময়ে সেটির দিকে তাকিয়ে থাকে। মার্সেলের মনে পড়ে, বাল্যকালে এ বইটি কতবার-ই না তার মা তাকে পড়ে শুনিয়েছেন।

সঙ্গে সঙ্গে কেঁব্রে'র সে-রাতের স্মৃতিও তার মানস-পটে আবার ভেসে ওঠে—মঁসিয়ে সোয়ানের বিদায়কালীন ঘণ্টার ধ্বনিটি মার্সেলের মনে অনুরণিত হ'তে থাকে। ক্রমে জীবনের ব্যর্থতার গ্লানিতে মার্সেলের মন ভরে ওঠে।

গরম-তৃষা

[নরওয়েজীয় সাহিত্যের দিক্‌পাল যোহান বোয়ার (Johan Bojer)-এর **'দি গ্রেট হাঙ্গার'** (The Great Hunger), ১৯১৭, উপন্যাসটির কাহিনী]।

নরওয়ের সমুদ্রতীরে পাহাড়ের কোলে জেলেদের পল্লী অঞ্চল। গাঁ উজাড় করে জেলেরা মাঝে মাঝে গভীর সমুদ্রে মাছ ধরতে যায়। এ কিছু নতুন কথা নয়।

শীতকাল। সেদিন জেলেরা কিছুদিনের জন্য উত্তর দিকে পাড়ি দেয়। ক্রমে প্রচণ্ড বেগে ঝড় ওঠে। ক্রুদ্ধ ঢেউগুলি তীরের নৌকাগুলোকে ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলতে থাকে জেলেদের কুটিরের চারিদিকে। আর, হাওয়ার বেগে খাঁড়ির পুলগুলি পাখীর মত উড়ে গিয়ে আছড়ে পড়ে এদিক ওদিক।

জেলেনীদের মন উধাও হয় সেই সুদূর লফোটেনে। কি জানি, হয়ত জেলেরা তখন সমুদ্রের মাঝখানে খাবি খাচ্ছে! বুড়ীরা বিড় বিড় করে বলতে থাকে—'হে ঈশ্বর, ওদের রক্ষা কর'।

এমন একটা মজার দিনে কিশোর বালকদের মন কি ঘরে টেকে? তারা চুপি চুপি আপন আপন বস্তি থেকে বেরিয়ে সমুদ্রতীরের দিকে এগিয়ে যায়।

দলের পাণ্ডা পীয়ার সকলের আগে এসে পৌঁছায়। তারপর একে একে এসে হাজির হয়—মার্টিন, পীটার। সব শেষে ছুটতে ছুটতে আসে দলের কনিষ্ঠ, ক্লাউস। ক্লাউস ব্রক, ডাক্তারের ছেলে। তারপর একটা কিছু অপকর্ম করবার জন্য তারা ব্যস্ত হয়ে ওঠে।

সব ব্যাপারেই পীয়ার মোড়ল। গত বছরের অগ্নিকাণ্ডের অপরাধটাও তারই ঘাড়ে চাপানো হয়েছিল। তা হোক্। সে দমবার পাত্র নয়। অনুগত সঙ্গীরাও তাকে ছাড়তে রাজী নয়।

ছেলেরা বিলক্ষণ জানে, তাদের জন্য গভীর সমুদ্রের দিকে পাড়ি দেওয়া নিষিদ্ধ, বড় বঁড়্শিতে হাত দেওয়া মানা। তাতে বিপদ অনেক।

পীয়ারের বয়স তখন কত আর হবে? চোদ্দ-র বেশী নয়। সে গম্ভীর ভাবে বন্ধুদের স্মরণ করিয়ে দেয়,—কি জান, এখন আমাদেরও গভীর সমুদ্রে বঁড়্শি-জাল ফেলবার অধিকার আছে; তাছাড়া লফোটেন থেকে বড়দের শীঘ্র ফেরবার সম্ভাবনাও নেই। এই তো অপূর্ব সুযোগ।

পীয়ারের ওপর দৃষ্টি রেখে মার্টিন দাঁড় টানে আর ভাবে, যে ছেলে বড় হয়ে পাদ্রী হবে ধর্মযাজন করবে সেই পীয়ারের মাথায় এত সব ফন্দি খেলে কি করে?

নৌকাটি ফিয়র্ডের দিকে দ্রুত এগিয়ে যায়। ক্রমে তীরের কুঁড়েঘরগুলো পেছনে অস্পষ্ট হয়ে মিলিয়ে যায়। বড় খাঁড়িটায় পৌঁছে পীয়ার বড় বঁড়্শিটা গভীরতম জায়গাটিতে ফেলে।

খানিক বাদে বঁড়্শিতে যখন জলের নীচু থেকে টান পড়ে, ছেলের দল একসঙ্গে টেনেও টাল সামলাতে পারে না। নৌকাটি কাৎ হয়ে ডোবে আর কি! ভয়ে সকলের মুখ ফ্যাকাসে হয়ে ওঠে। ওদের ভেতর কে যেন চিৎকার করে বলে ওঠে,—বাঁচতে চাও তো সুতো কেটে দাও। কিন্তু পীয়ারের রোখ চেপে যায়। সে সুতো কাটতে নারাজ। সকলকে উৎসাহ দেয়।

এক সময় সেই বিরাট হিংস্র জন্তুটা ভেসে উঠে দাপাদাপি করতে থাকে। গ্রীনল্যাণ্ডের হাঙ্গর। শাণিত বর্শা ও ছুরির আঘাতে হাঙ্গরটিকে ঘায়েল করে অনেক কষ্টে সেটিকে এক সময় নৌকায় তোলা হয়। কিন্তু নৌকায় তার বিশাল দেহটা ধরে না। ছেলেরা আর দাঁড়াবার জায়গা পায় না। তার ওপর হাঙ্গরটার লেজের ঝাপটায় নৌকাটা খানখান হয় আর কি। জন্তুটার ভয়াবহ তীক্ষ্ণ দাঁত আর রক্তবর্ণ ক্রুর দৃষ্টি দেখে ওরা ভয়ে কাঠ হয়।

পীয়ার মরিয়া হয়ে তার চকচকে ছোরাটা হাঙ্গরটার কাঁধে আমূল বসিয়ে চিরে ফেলে। রক্তে নৌকার খোল ভরে ওঠে। তবুও তার দাপট কমে না। একটা অসতর্ক মুহূর্তে জানোয়ারটা পীয়ারের একটি হাত কামড়ে ধরে। অনেক কষ্টে সে প্রাণে বাঁচে। এ সব দেখে ক্লাউস এক সময় মূর্ছা যায়। দুঃসাহসিক ছেলের দল শেষ পর্যন্ত যাহোক করে হাঙ্গরটাকে নিয়ে তীরে ফিরে আসে।

পীয়ার শহুরে ছেলে। কয়েক পরিবার ঘুরে এখন সে এই গ্রামের বৃদ্ধ জেলে ট্রোয়েনে দম্পতির কাছে থাকে। লোকে বলে, তার মা'র চরিত্র নাকি ভাল ছিল না। তবে পীয়ারের জন্মদাতা আর যাই হোন নিঃসন্দেহে তিনি ধনী ছিলেন। কারণ, প্রতি খ্রীষ্টমাসের সময় পীয়ারকে তিনি দশ-দশটা ক্রাউন পার্বণী দিয়ে থাকেন।

কখনও বা তার মা'র কথা উঠলে লোকে শুধু বলে,—'আহা বেচারা!' পীয়ার কিন্তু তাদের সে উক্তির তাৎপর্য বোঝে না। সে বৃদ্ধা ট্রোয়েনে-গৃহিণীকেই 'মা' বলে ডাকে।

একদিন মাঠ থেকে কাজ করে বাড়ি ফিরে পীয়ার শুনতে পায়, তার গর্ভধারিণী মারা গেছেন। সে চমকে ওঠে। ভাবে,—তবে কি বৃদ্ধা ট্রোয়েনে-গৃহিণী তার গর্ভধারিণী নয়! ক্ষুধার্ত পীয়ার তার ক্ষুধা-তৃষ্ণার কথা ভুলে যায়। এক বোবা কান্নায় তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলে।

ক্রমে ক্রমে পীয়ার ব্যাপারটা বুঝতে পারে। সে উপলব্ধি করে, তার এতদিনের সব ধারণা মিথ্যা, এ পরিবারে সে একজন আশ্রিত মাত্র। গভীর দুঃখে তার মনটা ভরে ওঠে।

দিনের বেলায় পীয়ার মাঠে হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খাটে, গভীর মনস্তাপে রাত্রিতেও বেচারীর চোখে ঘুম আসে না। ছেঁড়া কম্বলটা জড়িয়ে মাচার ওপর নীরবে পড়ে থাকে। মাঝে মাঝে নীচের কথাবার্তার টুকরো তার কানে ভেসে আসে: বড় মাগ্‌গীর দিন...বুড়ী আর্দ্র কণ্ঠে প্রতিবাদ

জানায়—না, না···। পীয়ার বুঝতে পারে, এ তার সম্বন্ধেই আলোচনা—সে তাদের গলার কাঁটা।

সকলের ধারণা, পীয়ারের জন্মদাতা বেঁচে নেই। অন্ততঃ তার স্বর্গতা মা ক'দিন আগে এদের তাই বলেছিল। সুতরাং তাঁর কাছ থেকে অর্থ-প্রাপ্তির আর কোন আশাও নেই। তাই ওদের ঐ জল্পনা।

এমন সময় নিতান্ত অপ্রত্যাশিত ভাবে এ পরিবারের হাতে একটি শীলমোহর-করা চিঠি পৌঁছায়। সেটি খুলতেই পাঁচখানা দশ ক্রাউন-এর নোট টপ টপ করে পড়ে যায়। তারপর খাম থেকে একটি চিঠি বেরিয়ে আসে,—

ছেলেটাকে ভালো ভাবে রেখো। ছ'মাস বাদে বাদে ওর জন্য তোমরা এমনি পঞ্চাশ ক্রাউন করে পাবে। ইতি—

তোমাদের বিশ্বস্ত

পি. হল্‌ম্, ক্যাপটেন।

পীয়ারের জন্মদাতার কাছ থেকে ঐ টাকা এবং ভবিষ্যতের আশ্বাস পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পীয়ারকে মাথায় তুলে রাখবার জন্য সকলে ব্যস্ত হয়ে ওঠে।

টাকার হিসাব করে ওরা বলাবলি করে,—এবার থেকে ওর জন্য আমরা ডবল টাকা পাবো। বুড়ী কিন্তু ওদের ঐ কথাবার্তায় যোগ দেয় না। নীরবে ঈশ্বরের কাছে কৃতজ্ঞতা জানায় আর মনে মনে বলে,—বাঁচা গেল, ছেলেটাকে তাহলে আর খোয়াতে হবে না।

পীয়ারের বরাত ফিরে যায়। লোকেরা তাকে অন্য চোখে দেখতে শুরু করে। এখন আর তাকে কেউ 'বেচারা' বলে না, তার সম্বন্ধে কুৎসিত ইঙ্গিতও করে না। তারা ওকে বরং উৎসাহ-ই দেয়। বলাবলি করে,—ভদ্রলোক একটা কিছু নিশ্চয়ই করে দেবেন; তুমি নিশ্চয়ই পাদ্রী হবে, হয়তো বিশপও হ'তে পারো।

আরও কিছুদিন পরে। পীয়ারের জন্মদাতা হল্‌ম্ হঠাৎ একদিন

এসে উপস্থিত হন সেই ট্রোয়েন-এর জেলে-পল্লীতে, পীয়ারকে দেখতে। তিনি তখন আরও বড় অফিসার—কর্নেল।

বিশিষ্ট অতিথিটিকে সাদর অভ্যর্থনা জানাতে গোটা পল্লী ব্যস্ত হয়ে পড়ে। পীয়ারের কল্যাণে হল্‌ম্ দু'হাতে খরচ করেন। পরের দিন যাবার আগে স্কুলমাস্টার আর স্থানীয় পাদ্রীকেও আশাতীত বিদায়ী দক্ষিণা দিয়ে যেতে তিনি ভুল করেন না।

গৃহস্বামীকে তিনি অনুরোধ করেন ছেলেটিকে যাতে তাড়াতাড়ি 'কনফার্ম' করা হয়। তারপর জানান, তিনি ওর লেখাপড়ার জন্য শহরে ব্যবস্থা করবেন; অবশ্য তার আগে যদি কোন অঘটন ঘটে তার জন্য ওর নামে সেভিংস্ ব্যাঙ্কের টাকাটির কথা হল্‌ম্ ওদের জানাতে দ্বিধা করেন না।

হল্‌ম্ চলে যেতে আনন্দে পীয়ারের পা যেন মাটিতে পড়তে চায় না। ওর নামে সেভিংস্ ব্যাঙ্কে জমার কথাটা ছড়িয়ে পড়তে দেরী হয় না। সকলের সঙ্গে পীয়ারেরও ধারণা হয়—ঐ জমা টাকাটার পরিমাণ দশ লক্ষের কম হবে না নিশ্চয়ই।

কনফার্ম হবার পর শহরে গিয়ে স্কুলে পড়বার জন্য পীয়ার তার বাবাকে চিঠি দেয়। দীর্ঘদিন কেটে যায়। হল্‌ম্-এর চিঠি আর আসে না। অবশেষে ক্রিস্টিয়ানিয়া থেকে এক স্কুলমাস্টার পীয়ারের চিঠির জবাব দেন—তোমার সাহায্যদাতা কর্নেল হল্‌ম্ ঘোড়া থেকে পড়ে মারা গেছেন। কতগুলো দরকারী কথার মীমাংসার জন্য তুমি আমার সঙ্গে শীঘ্র দেখা কর।

পিতার আকস্মিক মৃত্যু-সংবাদে পীয়ার ভেঙ্গে পড়ে। তবুও লেখা-পড়া শিখে উত্তরকালে বড় হবার আশা নিয়ে সে ঐ মাস্টার মশাইয়ের কাছে ছুটে যায়। কিন্তু সে হতাশ হয়। তার লেখাপড়ার বাসনার কথা শুনে মাস্টার মশাই চমকে ওঠেন। তিনি তাকে জেলে বা ছুতোর মিস্ত্রী হবার জন্যে উৎসাহ দেন। তার নামের ঐ সেভিংস ব্যাঙ্কের পাশ বইটিও তিনি হাতছাড়া করেন না। ফেরবার আগে পীয়ার

জানতে পারে তার নামে দশ লক্ষ নয়, মাত্র আঠারো শ' টাকা জমা আছে।

অগত্যা পীয়ারকে ট্রোয়েনেই ফিরে আসতে হয়। বুড়ীমা'র কোলে মুখ গুঁজে সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে। বুড়ীর কাছে থেকে সে কিছুটা সান্ত্বনা পায়। হলে কি হবে? খেতে বসে প্রতি গ্রাস খাবার তাকে লজ্জা দেয়। ক্রমে পেটের দায়ে দূরদূরান্তের খামারে তাকে দিন-মজুরের কাজ খুঁজতে হয়। চলার পথে তাকে অনেক বিদ্রূপ আর উপহাসও শুনতে হয়। শুধু কি তাই? এই অল্প বয়সেই শীতের সময় তাকে লফোটেনে মাছ ধরার কাজে ভাড়াটে চাকরের কাজের কথাও ভাবতে হয়।

ক'দিন পর। বন্ধু ক্লাউস ব্রক-এর কাছ থেকে পীয়ার জানতে পারে, সে শীঘ্রই শহরে যাবে মিস্ত্রীর কারখানায় কাজ করতে; তারপর সেখান থেকে সে যাবে টেক্‌নিক্যাল কলেজে—ইঞ্জিনীয়ার হবার উদ্দেশ্যে।

ক্লাউস পীয়ারকে উৎসাহ দেয়—আরে ম্যান, তুমি তো লোহারের কাজ অল্পস্বল্প জানও; আমার সঙ্গে চলো, অবসর সময়ে টেকনিক্যালের পড়াটা তৈরী ক'রে নিও। তারপর কলেজে তিনটি বছর ঐ আঠারো শ' টাকায় হয়ে যাবে'খন।

পীয়ার কোন জবাব দেয় না। বিষাদে তার মুখটি কালো হয়ে ওঠে। তবুও বিদায় নেবার আগে বন্ধুর সৌভাগ্যে তাকে অভিনন্দন জানাতে সে ভুল করে না। বাড়ী ফিরে পীয়ার অগত্যা লফোটেনে যাবার জন্য তৈরী হয়—

চোদ্দ সপ্তাহ লফোটেনে বরফ আর তুষার-ঝঞ্ঝার মধ্যে কাটিয়ে পীয়ার একদিন ফিয়োর্ডে ফিরে এসে তার উপার্জন হিসাব করতে বসে। কিন্তু খাইখরচ আর ঋণের অঙ্কটা বাদ দেবার পর তার হাতে আর

কিছুই থাকে না। শূন্যতায় তার মনটি ভরে ওঠে। হঠাৎ তার বন্ধু ক্লাউস ব্রক-এর কথা মনে পড়ে।

মনের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ডিঙ্গিয়ে ক' সপ্তাহ পরে পীয়ার একদিন গিয়ে হাজির হয় সেই ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস্-এর গেটের বাইরে।

ফ্যাক্টরীর ম্যানেজারটি ছিলেন ক্লাউসের মামা। ভাগ্নের সুপারিশে সেখানে অ্যাপ্রেন্টিস হিসাবে ভর্তি হতে পীয়ারের অসুবিধা হয় না। নামের পর পদবীটি বলতে গিয়ে পীয়ারের গলা আটকে যায়। বন্ধু ক্লাউস সেটি পূরণ করে দেয়—'হল্ম্'।

পীয়ার আস্তানা নেয় শহরের সস্তা অঞ্চলে একটি ঘোড়ার আস্তা-বলের উপরকার একটি জীর্ণ ডেরাতে। কিছুদিন যেতে না যেতেই একান্ত নিঃসঙ্গতা তাকে পীড়া দেয়।

আরও কিছুদিন পর। পীয়ারের আহ্বানে তার সহোদরা বোন লুইসে আসে। বোন আসাতে তার নিঃসঙ্গতা কাটে। ছোট্ট ঘর, তক্তপোশটিতে পীয়ার শোয়, মেঝেতে লুইসে তার শয্যাটি সানন্দে বিছিয়ে নেয়। সারাদিনের কঠোর পরিশ্রমের পর পীয়ার রাত্রে শুয়ে বোনের সঙ্গে গল্প করে দেহ-মনের গ্লানি দূর করার চেষ্টা করে—

লুইসে, মাকে কখনো দেখেছো ?

না।

তোমার বাবাকে ?

দূর বোকা, কি করে দেখব ? মা কি নিজেই জানত সে কে ?

দু'জনেই চুপ করে যায়। এক মূক বেদনা তাদের আচ্ছন্ন করে।

বোনও কিছু রোজগার ক'রে ভাইয়ের সংসারে সাহায্য করে। অত দুঃখ-কষ্টের মধ্যেও তাদের দুজনের মনে শান্তির ছোঁয়া লাগে। পীয়ার টেক্‌নিক্যালের প্রবেশিকা পাস করে। তারপর একদিন ঐ নচ্ছার মাস্টারের কাছ থেকে সেভিংস ব্যাঙ্কের পাস বইখানা উদ্ধার করে এনে বোনকে বলে,—"এই নাও, তিন বছরের জন্য মাসে পঞ্চাশ

ক্রাউন। কলেজের মাইনে, বই, তার ওপর খাওয়া-পরা। আমাদের একটু কষ্ট হবে বটে। তা তোমাকে চালিয়ে নিতে হবে।

কারখানার কাজে পীয়ারকে এক সপ্তাহের ওপর বাইরে কাটাতে হয়। ফিরে এসে বোনকে আর দেখতে পায় না। সে জানতে পারে, ডিপথিরিয়া রোগে লুইসে মারা গেছে। ফলে গভীর মনস্তাপে পীয়ারের দিন কাটে।

লুইসের স্মৃতি তাকে ছায়ার মত অনুসরণ করে। পীয়ার কোন কাজেই আর উৎসাহ পায় না, লেখাপড়ায়ও না।

তবুও পীয়ারকে ক'দিন পরে আবার টেকনিক্যাল কলেজে যেতে হয়। পড়াশোনার ভেতর সে ডুবে থাকবার চেষ্টা করে। এমন সময় পীয়ারের সঙ্গে তার সৎভাই ফার্দিনান্দ হল্‌ম-এর পরিচয় হয়। ফার্দিনান্দ ঐ কলেজেই এক ক্লাস উঁচুর ছাত্র।

পীয়ার সযত্নে তার আসল পরিচয়টি তার কাছে গোপন করে। তাকে সে এড়িয়ে চলবার চেষ্টা করে। কিন্তু তাকে পরাস্ত করবার জন্য পীয়ারের এক সময় রোখ চেপে যায়।

ফার্দিনান্দ কিন্তু পীয়ারের সঙ্গে সহজ ভাবেই মিশতে চায়। ক্রমে ফার্দিনান্দের চেষ্টায় তাদের হু'জনের ভেতর এক রকম বন্ধুত্বও গড়ে ওঠে।

পাঠ্য বিষয় ছাড়াও তাদের মধ্যে নানারকম আলাপ-আলোচনা হয়। ফার্দিনান্দ বন্ধুকে বলে,—আমাদের চেয়ে আপনার পড়াশোনা অনেক অনেক বেশী, আপনার কাছে বই-পড়া জ্ঞানের আধ্যাত্মিক মূল্যও ঢের বেশী। আমার মনে হয়, আধুনিক যন্ত্রবিদ এক রকমের ধর্মযাজক, সেই প্রাচীন প্রমিথিউস-এর উত্তরাধিকারী।

পায়ার কোন প্রতিবাদ করে না। বন্ধুর চোখে আগ্রহের আভাস লক্ষ্য করে ফার্দিনান্দ এবার তাকে প্রশ্ন করে,—আচ্ছা, প্রকৃতির ওপর মানবাত্মার প্রত্যেক বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গে দেবতারা তাঁদের শক্তিমত্তা কি অল্প অল্প করে হারাচ্ছেন না? আমরা আগুন, ইস্পাত,

যান্ত্রিক শক্তি আর মানব-চিন্তাকে বিধাতার অত্যাচারের বিরুদ্ধে অস্ত্রের মতো কি ব্যবহার করছি না ? **জিহোবা** নিশ্চয়ই ইঞ্জিনীয়ারদের সুনজরে দেখেন না ?

বন্ধুর উক্তি শুনে পীয়ার চমৎকৃত হয়। ভাবে, এ যে তারই মনের কথা! সে মুখে কিছু বলে না। শুধু ফার্দিনান্দের সঙ্গে চোখ মেলায়।

কলেজের পড়া শেষ হতে ফার্দিনান্দ এবং ক্লাউস ভাগ্যের সন্ধানে বৃহত্তর জগতে চলে যায়। পীয়ার তার শেষ পরীক্ষার জন্য দিবারাত্র বইয়ের মধ্যে ডুবে থাকে।

সবে তার পরীক্ষা শেষ হয়েছে এমন সময় মিশর থেকে ফার্দিনান্দের এক লোভনীয় চিঠি তার হাতে এসে পৌঁছায়ঃ "বন্ধু, এখানে এক মস্ত বড় ব্রিটিশ ফার্মে আমরা কাজ পেয়েছি। এরা মিশরে খাল আর বাঁধ তৈরী করছে—অন্যান্য জায়গায়ও এদের বড় বড় পরিকল্পনা আছে। তোমার জন্য কাজ ঠিক করেছি, শীঘ্র চলে এস।"

পায়ার তখন দস্তুর মতো মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার। তবুও কিন্তু ঐ চিঠি পেয়ে সে সঙ্গে সঙ্গে মিশরে চলে যায় না। আরও এক বছর থেকে সৎভাইয়ের মতো রাস্তা আর রেলওয়ে নির্মাণের বিদ্যাটাও শিখে নেয়। তার দৃঢ় সঙ্কল্প, ও বিষয়টিতেও সে কারুর পেছনে পড়ে থাকবে না। পীয়ার আশাহত হয় না।

পরীক্ষায় পাশ করে পীয়ার চলে যায় সেই মিশর দেশে। সেখানে সে খাল আর বাঁধ তৈরী করে সুনামের সঙ্গে। এবিসিনীয়ার মরুভূমিতে বিরাট রেলওয়েটিও তার হাতের এক আশ্চর্য সৃষ্টি। শুধু কি তাই ? পীয়ার এক ফাঁকে একটি নূতন মোটর পাম্প আবিষ্কার করে বাজার থেকে অন্য সব পাম্পকে তাড়িয়ে ছাড়ে। চারিদিকে তার নাম যশ ছড়িয়ে পড়ে। সেই সঙ্গে পীয়ার হয় বিপুল ঐশ্বর্যশালী।

কিন্তু পায়ার একদিন উপলব্ধি করে, আগুন আর ইস্পাত দ্রুত

মানুষকে পশুতে পরিণত করে চলেছে ; মানুষের দুঃখ দুর্দশা অসন্তোষ এবং শ্রেণীগত ঘৃণা—সব কিছুর মূলেই ঐ আগুন আর ইস্পাত। যন্ত্র-ই মানুষের ভূমার আকাঙ্ক্ষাকে বিনাশ করছে।

ফলে, ইঞ্জিনিয়ারিং বৃত্তির ওপর তার অনীহা জন্মে যায়। সব কিছু ছেড়ে শান্তির সন্ধানে সে নানা দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ায়। কোন ফল হয়না। তার মনের হাহাকার প্রশমিত হয় না।

পীয়ার স্থির করে দেশে ফিরে একটি সাধারণ মেয়েকে বিয়ে করে সেখানের শান্ত স্নিগ্ধ পরিবেশে ঘর বাঁধবে। তাই সে একদিন ক্রিস্টিয়ানিয়ার উদ্দেশে পাড়ি দেয়।

দেশের অচেনা প্রান্তরের বুক চিরে রেলগাড়ী দ্রুত এগিয়ে যায়। পীয়ার জানে না কোথায় সে নামবে, কোন জায়গাটিতে সে গড়বে তার শান্তির নীড় ! ক্রমে মিয়োসেন-এর বিস্তীর্ণ হ্রদটিও পেছনে সরে যায়। রেলগাড়ী আরোও এগিয়ে যায়। চারিদিকের সেই প্রাকৃতিক সৌন্দর্যসুধা পান করে পীয়ারের বুভুক্ষু হৃদয় ভরে ওঠে।

দিনের শেষে গাড়ী হাঁপাতে হাঁপাতে গুড ব্রাণ্ডসডালেন-এ পৌঁছায়। অপরিচিত ছোট্ট স্টেশন। কিন্তু সেখানকার রোদে-পোড়া খামারগুলো, অদূরের নদী আর পাহাড়ের মাঝেকার সবুজ জটলাটি পীয়ারকে হাতছানি দিয়ে ডাকে। জায়গাটা পীয়ারের একেবারেই অচেনা। কিন্তু দুর্বার সে আকর্ষণ। মনের আনন্দে পীয়ার সেখানে নেমে পড়ে।

কিছুদিন পর পীয়ার রিঙ্গেবীর ধনী ব্যবসায়ী উথোগ-এর কন্যা সুন্দরী মার্লে-কে বিয়ে করে লোরেঙ্গ-এর সেই বিরাট খামার বাড়িটি কিনে জাঁকিয়ে বসে। ক'দিন পরে শহরে একটি কারখানাও কেনে।

খামার বাড়ি তো নয়, যেন এক লোভনীয় সাম্রাজ্য। বিপুল ঐশ্বর্যের মালিক পীয়ারের এবার থেকে নিশ্চিন্ত আরামে দিন

কাটবার কথা। কিন্তু সুখ তার বরাতে বেশীদিন সইল না। ইস্পাত আর আগুন আবার তাকে আকর্ষণ করে।

বেস্‌না বাঁধের পরিকল্পনার গুরু দায়িত্বটি পীয়ার হাতে নেয়। লক্ষ লক্ষ টাকার ব্যাপার। শ্বশুরকেও ঐ টাকার জন্য জামিন থাকতে হয়। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কাজটি শেষ করতে হবে, অন্যথায় তাকে সর্বস্বান্ত হতে হবে, সেই সঙ্গে শ্বশুর মশাইকেও।

পীয়ারের কাজে এতটুকুও ফাঁকি ছিল না, ছিল না তার হিসাবেও কোন ভুল। কিন্তু তার প্রধান কর্মচারীটির বিশ্বাসঘাতকতায় বাঁধের সাফল্য হয় সুদূরপরাহত, আসে বিপর্যয়। পীয়ার বুঝতে পারে সর্বনাশের হাত থেকে রেহাই পাওয়া দুঃসাধ্য। তবুও সে তার স্ত্রী-পুত্রের কথা ভুলে গিয়ে নিজের স্বাস্থ্য তুচ্ছ করে প্রাণপণে কাজ করে।

ঠিক সেই সময় পীয়ার জানতে পারে ফার্দিনান্দের যে যৌথ কারবারে সে তার সঞ্চিত অর্থ লাগিয়েছিল সে-কারবারটি ফেল মারায় ফার্দিনান্দ কোথায় উধাও হয়ে গেছে। পীয়ার মাথায় হাত দিয়ে বসে। ততদিনে বেস্‌না বাঁধের পরিকল্পনাটিও একেবারে ভেস্তে যায়।

কোটিপতি পীয়ার তখন প্রায়-দেউলে। তবুও কিন্তু সে হতোদ্যম হয় না। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেঃ সব বাধাকে তুচ্ছ করে, যা কিছু সম্বল আছে তাই দিয়ে, যেমন ক'রে হ'ক সসম্ভ্রমে বাঁচবার পথ খুঁজে বার করবই।

ছেলে-মেয়েদের নিয়ে শ্রীমতী মার্লে পীয়ারের জন্যে অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করে। ক্রমে রাত হয়। পীয়ার আসে না। অভিমানী শিশুরা একসময় পুতুল আর খেলনা নিয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। মার্লেও সামনের বারান্দায় চেয়ারটিতে বসে থেকে থেকে ক্লান্ত হয়ে এক সময়ে ঘুমিয়ে পড়ে।

গভীর রাত। চারিদিক নিস্তব্ধ। পীয়ারকে নিয়ে ঘোড়াটা হাঁপাতে হাঁপাতে রাজপুরীতে পৌঁছায়। অকারণে পীয়ার তার প্রিয়

ঘোড়াটাকে সজোরে এক চাবুকের ঘা মেরে লাফিয়ে নামে। ঐ চাবুকের ঘা খেয়ে অবোধ ঘোড়াটা কেমন ফ্যাল ফ্যাল করে তার প্রভুর দিকে তাকিয়ে থাকে।

পীয়ার প্রাসাদের দিকে ছ'পা বাড়িয়ে থমকে দাঁড়ায়। ভাবে, এ বাড়ির ওপর আর তার কোন অধিকার নেই, এ যেন অনধিকার প্রবেশ। তবুও ক্লান্ত পা ছ'টি তাকে বয়ে নিয়ে যায় অন্তঃপুরের দিকে।

শ্রীমতী মার্লে তার বিপর্যয়ের খবর জানে না, পীয়ারের মনের হদিসও না। সে সাগ্রহে তার সুপ্রিয়কে সাদর অভ্যর্থনা জানায়। পীয়ার কিন্তু নির্লিপ্ত উদাসীন ভাবে দাঁড়িয়ে থাকে। তার সেই অদ্ভুত দৃষ্টি লক্ষ্য করে মার্লে চমকে ওঠে। ব্যাকুল হয়ে সে তার প্রাণপ্রতিমকে নানা প্রশ্ন করে। তবুও পীয়ার তেমনি ভাবেই মার্লের দিকে তাকিয়ে থাকে। খানিক বাদে পীয়ারের সম্বিত ফিরে আসে।

দীর্ঘদিন বাদে মার্লে পীয়ারের পাশে শুয়েছে। স্বামীর সোহাগের জন্য মার্লের মনটি যখন উদ্বেল পীয়ার তখন আগুন আর ইস্পাতকে কেন্দ্র করে জটিল কল্পনায় বিভোর।

ক'দিন বাদে পীয়ার একটি নতুন ধরণের ঘাস-কাটা কল তৈরী করতে মেতে ওঠে। বিশেষজ্ঞদের মতে এটি শেষ হলে দাম হবে অন্তত বিশ লাখ।

পীয়ার শরীর তুচ্ছ করে মার্লের সব অনুরোধ অগ্রাহ্য করে দিবারাত্র কঠোর পরিশ্রম করে। তার দৃঢ় বিশ্বাস সে কৃতকার্য হবে। কলটি যখন প্রায় শেষ হয়ে আসছে ঐ বিশেষজ্ঞরাই পীয়ারকে প্রবঞ্চনা করে। পীয়ারের অনুকরণে তারা নিজেরাই একটি কল তৈরী করে সেটি বাজারে চালু করে।

ফলে, পীয়ারের সাধের-খামার-বাড়িটিই শুধু নিলাম হয় না, ভগ্নস্বাস্থ্য পীয়ার প্রায় উন্মাদ হয়ে যায়। স্ত্রী আর তিনটি সন্তানকে নিয়ে নিঃস্ব পীয়ারকে তেপান্তরের মাঠে একটা খড়ের বাড়িতে আশ্রয়

নিতে হয়। মার্লের পিতা আর পিসির অনুগ্রহে সে কোন রকমে দিন কাটায় ঐ জনহীন প্রান্তরে।

ক্রমে ছেলে মেয়েরা বড় হয়। ঐ সামান্য সাহায্যে তাদের চলে না। ওদিকে পীয়ারের স্বাস্থ্য ক্রমে ভেঙ্গে পড়ে। মার্লেরও। পীয়ারের রাত্রে ঘুমও হয় না। ঘুম আসবে কি করে? একে তো অনুগ্রহের অন্ন সে গিলতে পারে না। তার ওপর তার ঘাস-কাটা কলটির কথা সে কিছুতেই ভুলতে পারে না। ঘুমের মধ্যেও ঐ দুঃস্বপ্ন তাকে পীড়া দেয়।

বুদ্ধিমতী মার্লে সবই বোঝে। কিন্তু মুখে কিছু প্রকাশ করে না। পীয়ারকে সে সমবেদনা জানাতেও ভয় পায়, পাছে সে আরও আঘাত পায়।

মার্লে এবং সন্তান তিনটির মুখের দিকে পীয়ারের তাকাতে কষ্ট হয়—যতটা পারে সে নিষ্ঠুরভাবে এড়িয়ে চলে। ভাগ্যের বিড়ম্বনায় নীল-নদীর বাঁধের চীফ ইঞ্জিনিয়ার পীয়ারকে আজও ভগ্নস্বাস্থ্য নিয়েও সাধারণ কামারের কাজ করতে হয়। হাতুড়িটা তুলতেও আজ সে হাঁপায় তবুও প্রাণপণে তপ্ত লোহার ওপর ঘা মেরে যায়। মজুরী!—যে যা দয়া করে দেয় পীয়ার নীরবে তাই হাত পেতে নেয়। ওদিকে ঘুমের জন্য পাথরের বোঝা বয় সে, তবুও নিদ্রাদেবীর দয়া হয় না তার ওপর। শরীরটা বেশ খারাপ বোধ করলে বলে,—আজ বড্ড আলস্য লাগছে। মার্লে এতদিনে সে-কথার অর্থ বোঝে। তাই পীয়ারের এই উক্তি শুনে বেচারী নীরবে শুধু চোখ মোছে।

ক্রমে ক্রমে ছেলে-মেয়েরা বড় হয়। রাজরানী মার্লে তখন ভিখারিণী। তবুও এবার তাকে ওদের লেখাপড়ার কথা ভাবতে হয়, বিশেষ করে লুইসে'র কথা।

কিন্তু দু'বেলা যারা পেট ভরে খেতে পায় না, তাদের শিক্ষা কি করে সম্ভব? এমন সময় ক্রুসেথবাসিনী ধনবতী পিসি মারিট ওদের ছেলে-মেয়ে দু'টিকে মানুষ করার প্রস্তাব করে চিঠি দেয়।

পীয়ার আনন্দে প্রায় লাফিয়ে ওঠে। কিন্তু মার্লে তার পিসিকে বিলক্ষণ চেনে। সে জানে, তাঁর এই প্রস্তাব গ্রহণ করার অর্থ ওদের দু'জনকে চিরদিনের জন্য হারানো। তবুও ওদের ভবিষ্যৎ জীবনের কথা ভেবে মার্লে ছেলে আর মেয়েকে একদিন পিসি মারিটের কাছে পাঠিয়ে দেয়।

দুঃখিনী মার্লের মুখের পানে তাকালে পীয়ারের বুক কান্নায় ভরে ওঠে। কিন্তু তখন সে হাসবার জন্য প্রাণপণ সংগ্রাম করে।

পাঁচ বছরের ছোট্ট মেয়েটিকে নিয়ে পীয়ার আর মার্লে দিন কাটায়। ঐ মিষ্টি মেয়েটা দুজনের দুঃখের একমাত্র শীতল প্রলেপ, তাদের অন্ধকার জীবনের প্রদীপ।

কিন্তু পীয়ার আর মার্লে তখনও দুঃখের অতল গভীরে এসে পৌঁছায় নি। পৌঁছায় সেদিন যেদিন তাদের প্রতিবেশীর প্ররোচনায় তার নেকড়ে কুকুরটার হাতে মর্মান্তিক ভাবে ঐ ছোট্ট মিষ্টি মেয়েটি প্রাণ হারায়।

এমনি ভাবে প্রাণের অস্টাকে হারিয়ে মার্লে স্তব্ধ হয়ে যায়। এক হিমশীতল শূন্যতা পীয়ার আর মার্লেকে ঘিরে ধরে।

অস্টাকে মাটি দিয়ে তারা শূন্য ঘরে ফিরে আসে। কেউ কারুর সঙ্গে কথা বলে না। দু'জনেই শূন্য দৃষ্টি মেলে আকাশ পানে তাকিয়ে থাকে। ক্রমে অন্ধকার নেমে আসে। তবুও তারা দু'জন তেমনি ভাবেই বসে থাকে।

এমনি ভাবে দিন যায়। হঠাৎ পীয়ারের অন্তরাত্মা বলে ওঠে,—জ্যোতির আবির্ভাব হ'ক। ক্রমে পীয়ার উপলব্ধি করে, হয়ত আজীবন তার অবচেতন মনের একমাত্র বাসনা ছিল একটি মন্দির গড়ে তোলা—মানবাত্মার পূজার মন্দির, অন্য কিছু নয়।

পীয়ার মানবাত্মার উদ্দেশে তার সশ্রদ্ধ প্রণাম জানায়—যে আত্মা শত দুঃখ-দুর্দশা-লাঞ্ছনার মধ্যেও থাকে অজেয়, চিরন্তন।

জীবনের সায়াহ্নে ঐ ধ্বংসাবশেষ 'পরে দাঁড়িয়ে পীয়ার অনুভব করে, মানবজাতিকে উঠতে হবে। দুঃখরাশির মাঝখানে তাকে সাবধান হ'তে হবে, যাতে তার দেবত্ব না নষ্ট হয়। কারণ, মর্ত্যলোকে মানুষকেই দেবত্বের সৃষ্টি করতে হবে; সেখানেই বিশ্বের অনন্ত জড়শক্তির ওপর মানুষের জয়।

এই প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে পীয়ার গভীর রাতে বিছানা থেকে উঠে পড়ে। রাত তখন দু'টো। মার্লে প্রশ্ন করে, কোথায় যাচ্ছো? পীয়ার তাকে মিনতি করে,—খুঁজে পেতে কিছুটা যব দাও না?

—এত রাত্রে কি হবে? মার্লের কণ্ঠে উৎকণ্ঠা।

চুপি চুপি প্রতিবেশীটির ক্ষেতে বুনে আসি। বেচারী ভিক্ষায় বেরিয়েও তো এতটুকু সংগ্রহ করতে পারেনি। বৃষ্টির আগে না বুনলে ওরা স্বামী-স্ত্রী অনাহারে মারা যাবে। অস্টার মৃত্যুর পর ওদের যে সকলে ঘৃণা করে।

মার্লে আর কথা বাড়ায় না। যবের পুঁটুলিটি হাতে নিয়ে সেও পীয়ারের পিছু পিছু যায়।

ভোরের আলো ফুটে ওঠবার আগেই পীয়ারের কাজ শেষ হয়। বেড়ার কাছে এগিয়ে আসতে পীয়ার লক্ষ্য করে, মার্লে তার দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে, মুখে তার প্রশান্ত হাসির ব্যঞ্জনা। এক অনাস্বাদিত আনন্দে পীয়ারের মন ভরে ওঠে।

বন্ধন

[ইংরেজী সাহিত্যের অন্যতম দিক্‌পাল উইলিয়াম সমারসেট মম (William Somerset Maugham)-এর 'অফ হিউম্যান বণ্ডেজ' (Of Human Bondage), ১৯১৫, উপন্যাসটির কাহিনী]

শৈশবেই ছেলেটির বাবার মৃত্যু হয়। বাবার স্মৃতি তার মনে পড়ে না। স্নেহময়ী মা আর প্রিয় আয়াটিকে ছাড়া আপনজন বলতে দুনিয়াতে সে আর কাউকে জানে না। একদিন অকস্মাৎ তার প্রাণ-প্রতিম জননীও আট বছরের বালক ফিলিপকে চিরদিনের মতো ছেড়ে চলে যান।

ফিলিপ বুঝতে পারে না, তাদের বাড়িতে এত লোকের ভিড় কেন? কেনই বা তাদের সকলের চোখে জল! সকলের কান্না দেখে সেও কাঁদে।

শ্রীমতী কেরির অন্তেষ্টিক্রিয়ার পর অনাথ ফিলিপ আশ্রয় পায় তার দূর-সম্পর্কীয় কাকার সংসারে।

খুড়ো উইলিয়াম কেরি ছিলেন লণ্ডনের উপকণ্ঠে ব্ল্যাকস্টেবল পল্লী অঞ্চলের যাজক। প্রৌঢ় ভদ্রলোকটি ছিলেন স্বভাবে কৃপণ, মেজাজে রুক্ষ এবং ধর্মে গোঁড়া। খুড়িমা লুইসা ছিলেন নিঃসন্তান, কোমল প্রকৃতির—তিনিও প্রৌঢ়ত্বে পা বাড়িয়েছেন।

বৌদির মৃত্যুর পর তাঁর ছেলেটির দায়িত্ব উইলিয়াম অবশ্য খুশি মনে গ্রহণ করতে পারেন নি। কারণ ছেলেদের দৌরাত্ম্য তিনি সহ্য করতে পারতেন না। তায়, ফিলিপের বাবা ছেলের জন্য বলতে গেলে কিছুই রেখে যান নি।

উইলিয়ামের নিজের আর্থিক অবস্থাও বিশেষ ভাল ছিল না। আবার, বৌদিকেও তিনি বড় সুনজরে দেখতেন না।

তবুও ঘটনাচক্রে বালক ফিলিপের লালন-পালনের দায়িত্বটা তিনি অস্বীকার করতে পারেন নি।—হয়ত শ্রীমতী লুইসার বুভুক্ষু-হৃদয়ের তাগিদও এর মূলে ছিল।

শ্রীমতী লুইসা ছেলেপুলের ব্যাপারে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিলেন। তাই বহু-আকাঙ্ক্ষিত ফিলিপ এসে পৌঁছুলে তিনি ব্যস্ত হয়ে পড়েন—তার সঙ্গে তিনি কি রকম ব্যবহার করবেন, তাঁর কর্তব্যে যেন কোন ত্রুটি না হয়। স্পর্শকাতর ফিলিপের নজর এড়িয়ে খুড়িমাকে আবার সতর্ক থাকতে হয়—সে যেন দুষ্টুমি বা কোন গোলমাল না করে যাতে তার খুড়ো বিরক্ত হন।

জন্মগত ঐ খোঁড়া পাটির জন্য ফিলিপের মনস্তাপের অন্ত ছিল না। এবার খুড়োর রূঢ় ব্যবহার আর ধর্মের প্রতি তাঁর গোঁড়ামি ফিলিপের মনকে আরও পীড়া দেয়। গোড়াতে খুড়িমাকে বিশেষ পছন্দ না করলেও ক্রমে তাঁর স্নেহ-ভালবাসার প্রতি ফিলিপের মনে আর কোন সন্দেহ থাকে না। কিন্তু নতুন জায়গায় এসেও তার নিঃসঙ্গ গ্রানিকর জীবন থেকে ফিলিপ মুক্তি পায় না।

ফিলিপের বয়স তখন ন' বছর। গির্জার সংশ্লিষ্ট প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার জন্য ক্যানটারবেরিতে তাকে পাঠানো হয়।

তার ঐ বিকৃত পা'-টির জন্য স্কুলের দুষ্টু ছেলেরা ফিলিপকে উঠতে বসতে ব্যঙ্গ করে। সতীর্থদের নিষ্ঠুর ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ ফিলিপকে নীরবে সহ্য করতে হয়। ফলে, তার দুর্বল মনটি মানসিক যন্ত্রণায় কাতর হয়। অল্পদিনের মধ্যেই ফিলিপের মনটা স্পর্শকাতর হয়ে ওঠে। তার ঐ পা'-টির জন্য সে কারুর কাছ থেকে সহানুভূতির ইঙ্গিত পর্যন্ত সইতে পারে না। সহপাঠী অথবা সাধারণ লোকের সঙ্গলাভের চেয়ে তাদের থেকে দূরে থাকতেই সে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে।

ক্রমে ক্রমে ফিলিপের বিকৃত পা'টি আর তেমন আলোচনার বস্তু থাকে না। তবুও সব সময় সে খোঁড়া পা'টিকে আড়ালে রাখবার চেষ্টা করে। এজন্য খেলাধুলো ত্যাগ করে ফিলিপ লেখাপড়ায়

ডুবে থাকবার চেষ্টা করে। অল্পদিনের মধ্যেই ফিলিপ প্রধান শিক্ষকের প্রিয়পাত্র হয়ে ওঠে এবং তার মেধার জন্য পুরস্কৃতও হয়।

প্রাথমিক শিক্ষার পর, তেরো বছর বয়সে ফিলিপ 'কিংস স্কুলে' ভর্তি হয়—যেটির গর্ব ছিল প্রাচীন ঐতিহ্য। সেই বিদ্যালয়টি ছিল পুরোপুরি প্রাচীনপন্থী, কোন রকম আধুনিক চিন্তাধারা বরদাস্ত করতো না। ক' বছর যেতেই বিদ্যালয়টির শিক্ষাধারার প্রতি ফিলিপের মনে অনীহা জাগে।

খুড়োর ইচ্ছা ছিল, ফিলিপ বড় হয়ে তাঁর বৃত্তি গ্রহণ করবে। সেই কারণে স্কুল জীবনের পরে অক্সফোর্ডে বিশ্ববিদ্যালয়ে তাকে শিক্ষা দেওয়াই তাঁর একান্ত ইচ্ছা ছিল।

ক্রমে যাজক-বৃত্তি সম্বন্ধে ফিলিপের মনে নানা প্রশ্ন জাগে। সে-কথা ব্যক্ত করতেও সে দ্বিধা করে না। খুড়ো বুঝতে পারেন, ফিলিপ তাঁর সাধ পূর্ণ করতে রাজী নয়।

ততদিনে ফিলিপ আঠারো বছরে পা বাড়িয়ে পিতার সেই সঞ্চিত অর্থের উত্তরাধিকার লাভ করেছে। তারপর ঐ সামান্য অর্থের ভরসায় কিংস স্কুলে ইস্তফা দিয়ে শিক্ষার জন্য ফিলিপ জার্মানীতে পাড়ি দেওয়া স্থির করে।

বার্লিনে ফিলিপের কাকার এক পুরানো বান্ধবী থাকতেন। কুমারী উলকিনসন, এক ধর্মযাজকের মেয়ে। যখন এটা পরিষ্কার বোঝা গেল—একগুঁয়ে ফিলিপের ইচ্ছার বিরুদ্ধে না দাঁড়িয়ে সেটা মেনে নেওয়াতেই অশান্তির সম্ভাবনা কম, তখন স্বামী-স্ত্রী দু'জনে ভেবে চিন্তে এ বিষয়ে কুমারী উইলকিনসনের শরণাপন্ন হন।

কুমারী উইলকিনসনের পরামর্শ মতো জার্মান শিক্ষার জন্য ফিলিপ হাইডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়। আর তার থাকবার জন্য সেখানকার অধ্যাপক আর্লিনের বাড়িতে ব্যবস্থা হয়।

ক' বছরের মধ্যে জার্মান-এর সঙ্গে সঙ্গে ফরাসী এবং ইতালীয়

ভাষা দু'টিও ফিলিপ আয়ত্ত করে। কিন্তু তার পাঠকাল শেষ না ক'রে হঠাৎ একদিন ফিলিপ ব্ল্যাকস্টেবল-এ ফিরে আসে।

এতদিন বাদে তাকে দেখে খুশির উচ্ছ্বাসে খুড়ী লুইসা ফিলিপকে জড়িয়ে ধরেন। তাঁর স্নেহের আতিশয্যে ফিলিপ অস্বস্তি বোধ করে। খুড়ীমা'র কিন্তু সেদিকে ভ্রুক্ষেপ থাকে না, তেমনি ভাবে তাকে বুকে চেপে রাখেন। বলেন,—তুমি চ'লে যাওয়ার পর থেকে আমার পক্ষে সময় কাটান কি যে মুশকিল হয়েছিল···অ্যাঁ, দেখছি তুমি এখন বেশ জোয়ান হয়ে উঠেছো।

ফিলিপ এসে পৌঁছুবার ক'দিন আগেই কুমারী উইলকিনসনও তার কাকার বাড়িতে ছুটি কাটাতে আসেন। তিনি ফিলিপের প্রায় মা'র বয়সী। কিন্তু তখনও যৌবন তাঁর কাছ থেকে বিদায় নেয়নি,—যাই যাই করছে। তাঁকে দেখে ফিলিপের মনে কেমন এক মোহ জাগে। তিনিও তার সঙ্গে সহজ ভাবে সরস গল্প করেন। ক্রমে ফিলিপ তাঁর চোখে এক অদ্ভুত ইঙ্গিত লক্ষ্য করে। ফিলিপের সাহস বাড়ে। তারপর একদিন সন্ধ্যায় অপ্রত্যাশিত ভাবে ফিলিপ তাঁকে চুম্বন করে।

উইলকিনসন কিন্তু নিজেকে ফিলিপের বাহু-বন্ধন থেকে ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করেন না। ফিলিপ দ্বিতীয়বার উদ্যত হ'লে তিনি অস্ফুট স্বরে বলেন,—

না, না ও-রকম ক'রো না।

কেন নয়?

আমার যে ভীষণ ভাল লাগছে···এ কি অসহ্য সুখ! ফিলিপের চাহিদা এবার বেড়ে যায়। তাঁকে মিনতি করে। করুণ কণ্ঠে বলে,—আমার প্রতি যদি আপনার এতটুকু মমতা থাকে···

আমি ও-কথা ভাবতেই পারি না। আচ্ছা, ব্যাপারটা যেমন চলছে তাতেই তুমি খুশি থাকতে পারছ না কেন? দেখছি, পুরুষেরা সবই এক।

ফিলিপ তাঁকে পীড়াপীড়ি করতে উইলকিনসন অসহায় ভাবে জানান,—আমি ঐ দুঃসাহসিক ঝুঁকি নিতে সাহস পাই না। তা এখানে অসম্ভব।

কিন্তু ঘটনাচক্রে ব্যাপারটা যখন সত্যিই ঘটল তখন আত্মগ্লানি আর প্রণয়িনীর প্রতি গভীর ঘৃণায় ফিলিপের মন ভরে ওঠে। ক'দিন বাদে ফিলিপ লণ্ডনে হিসাব-পরীক্ষকের বৃত্তি গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে চলে গিয়ে স্বস্তি পায়।

কিন্তু এক বছরের মধ্যেই ঐ নীরস কাজে ফিলিপের মন বিষিয়ে ওঠে। ঐ বৃত্তি ত্যাগ করে সে চলে যায় প্যারীতে চিত্রবিদ্যা শিখতে।

চিত্রবিদ্যায় মোটামুটি সে ভালই অগ্রসর হচ্ছিল। দ্বিতীয় বছর। ফিলিপ হঠাৎ একদিন এ বিদ্যাটার ওপরও বীতশ্রদ্ধ হয়ে ওঠে। অনেক ভেবে চিন্তে স্থির করে, সে ডাক্তার হবে।

ক'দিন বাদে বাবার সেই ষোল শ' পাউণ্ডের পুঁজি সম্বল করে তৃতীয় বারের মতো ভাগ্যান্বেষণের উদ্দেশ্যে ফিলিপ লণ্ডন অভিমুখে যাত্রা করে।

ফিলিপ লণ্ডনের সেণ্ট লুক হাসপাতালে ভর্তি হয়। সে মন দিয়ে পড়াশুনা করে। গায়ে পড়ে কারুর সঙ্গে বড় মেলামেশা করে না, যদি অকারণ অপদস্থ হয় এটাই ছিল ফিলিপের ভয়। তবুও তার দু' একজন বন্ধু জুটে যায়।

সতীর্থ ডান্‌সফোর্ড-এর সঙ্গে ফিলিপ ক্রমে অন্তরঙ্গ হয়। মাঝে মাঝে দু' বন্ধু মিলে একটি রেস্টুরেণ্টে চা খেতে যায়। সাধারণতঃ কুমারী মিলড্রেড-ই তাদের পরিবেশন করে।

মেয়েটি দেখতে সুশ্রী ছিল না। ফিলিপও তার ভেতর কোন আকর্ষণ খুঁজে পায় না। কিন্তু সেখানে যেতে আসতে মিলড্রেড তার মনে কৌতূহল জাগায়, কৌতূহল থেকে তার মনে গভীর ভালবাসা দানা বাঁধে।

ক্রমে ক্রমে ফিলিপ মেয়েটির চিন্তায় কেমন এক অদ্ভুত উন্মাদনা

অনুভব করে। সে উপলব্ধি করে, এ তার আত্মার বুভুক্ষা, যন্ত্রণাদায়ক আকৃতি—অনাস্বাদিত দুঃসহ অন্তর্দাহ। তবুও সে মিলড্রেড-এর ঘনিষ্ঠ সঙ্গ কামনা করে।

প্রেমে পড়ে ফিলিপ মেয়েটির জন্য তার সাধ্যের অতিরিক্ত খরচ করে, নিজের পড়াশুনোয় অবহেলা করে। ফলে সে দু' দুবার পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়। বিনিময়ে মিলড্রেডের কাছ থেকে সে কিছু পায় না। তবুও তার হুঁশ হয় না। ফিলিপ মিলড্রেডের মোহমুক্ত হয় না। তাকে পুরোপুরি পাবার জন্য ফিলিপ একদিন তার কাছে বিয়ের প্রস্তাবও করে। কিন্তু হোটেল সেবিকা তাকে রূঢ় ভাবে প্রত্যাখ্যান করে। তবুও ফিলিপ হাল ছাড়ে না।

তাকে পাবার জন্য অন্তরের অসহ্য যন্ত্রণায় যখন ফিলিপের হৃৎপিণ্ডটা টুকরো টুকরো হবার উপক্রম হয়েছে—মিলড্রেড তাকে একদিন নৈশভোজে আমন্ত্রণ জানায়। এই অপ্রত্যাশিত আমন্ত্রণে ফিলিপ খুশিতে উচ্ছল হয়ে ওঠে। কিন্তু সে তা প্রকাশ করে না, শান্ত থাকে। সহজ ভাবেই সে তার সঙ্গে দূরের কোন এক হোটেলে যায়।

খেতে খেতে মিলড্রেড ফিলিপকে এক সময় জানায়, মিলারের সঙ্গে তার বিয়ে স্থির হয়েছে। তার উক্তি শুনে ফিলিপের মধ্যে কিন্তু কোন উত্তেজনার সৃষ্টি হয় না ; শুধু নিজেকে তার নিঃশেষিত মনে হয়।

এই বিদেশী প্রায়-প্রৌঢ় লোকটি ফিলিপের অপরিচিত ছিল না। ভক্তদের ভেতর মিলারের প্রতি যে মিলড্রেড-এর বরাবর একটু পক্ষপাত ছিল সে কথা ফিলিপের আজানা ছিল না। আহত ফিলিপ শান্ত কণ্ঠে জানায়,—তা তো বটেই, যে বেশী দাম দিচ্ছে তাকেই তো তুমি গ্রহণ করবে! এছাড়া ফিলিপের আর বলবার কি-ই বা থাকতে পারে!

এমনি ভাবে আশাহত হ'তে ফিলিপ আবার পড়াশুনোয় মন দেয়। পর পর দু'টো পরীক্ষায় সে কৃতকার্য হয়। এমন সময় ঘটনাচক্রে

তার এক নতুন বান্ধবী জোটে। নোরা। সহৃদয়া নোরার ভালবাসার স্পর্শে ফিলিপের হৃদয়ের ক্ষতটা ক্রমে ক্রমে শুকিয়ে যায়; তার শূন্য হৃদয় পূর্ণ হয়। বান্ধবী নোরার সান্নিধ্যে ফিলিপের দিনগুলি সুখেই কাটছিল। তার পড়াশুনোটাও ঠিক মতই চলছিল।

কিছুদিন পরের কথা। সেদিন সন্ধ্যায় ফিলিপ নোরার বাড়ির উদ্দেশে বেরুতে যাবে এমন সময় ঝড়ো কাকের মতো মিলড্রেড কোথা থেকে ছুটে এসে তার সামনে আছড়ে পড়ে। মিলড্রেড-এর কান্না আর থামতে চায় না। ফিলিপ হতভম্ব।

মিলড্রেড এক সময় সেই মায়া কান্না থামিয়ে স্থাণুর মত তার সামনে দাঁড়ায়; যেন দীনতার এক করুণ প্রতিমূর্তি। ফিলিপের মন উদ্বেলিত হয়। উপলব্ধি করে, মিলড্রেড'কে সে ঠিক আগের মতোই ভালবাসে। সঙ্গে সঙ্গে ফিলিপ তাকে আপ্যায়ন করতে ব্যস্ত হয়ে ওঠে।

মিলড্রেড-এর ম্লান চোখ দু'টি এবার উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। সে ক্লান্ত কণ্ঠে জানায়,—সেদিনের আমাদের ঝগড়াটার ভেতর নতুনত্ব কিছু ছিল না, মামুলি। মাঝে মাঝে অমন দু' একদিন আমাকে ছেড়ে মিলার কখনও বা কোথাও চলে যেতো। তবে সেদিন যাবার আগে আমার গর্ভে ওর সন্তান আসবার কথা অকস্মাৎ জেনে মিলার খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিল। যতোদিন না-ব'লে পেরেছি ওকে আমি জানাই নি…।

ফিলিপ জানতে পারে, আসলে মিলার কিছুদিন মিলড্রেড-এর সঙ্গে ফুর্তি করবার জন্য বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে তাকে ভুলিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। সে তাকে বিয়ে করে নি। করবে কি করে, স্ত্রী এবং তিনটি সন্তান বর্তমান থাকতে!

যখন রক্ষিতা এবং স্ত্রীর মধ্যে একজনকে বেছে নেবার সময় আসে চতুর মিলার স্ত্রীকেই বেছে নেয়। তাতে তার চাকরিটাও বাঁচে।

নোরাকে ভুলে গিয়ে ফিলিপ এবার মিলড্রেড-এর সেবা-যত্নের

জন্য ব্যস্ত হয়ে ওঠে। তার থাকার জন্য সে আলাদা একটি বাড়িও ভাড়া করে।

ক'মাস বাদে মিলড্রেড-এর গর্ভের সন্তানটি ভূমিষ্ঠ হয়। ফিলিপের সৌজন্যে ক্রমে সে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ওঠে। এবার স্থির হয়, তারা দু'জনে কোন স্বাস্থ্যকর জায়গায় কিছুদিন ঘুরে আসবে। এমন সময় মিলড্রেড ফিলিপের এক বন্ধুর সঙ্গে গোপন প্রেমে মেতে ওঠে। কথাটা ফিলিপের আর অজানা থাকে না।

বিদেশ ভ্রমণের ব্যবস্থা যখন সব ঠিক হয়ে গেছে—মিলড্রেড ফিলিপকে জানায়,—আচ্ছা তোমার সঙ্গে গিয়ে কি লাভ, বল? আমি তো সমস্তক্ষণই ওর কথাই শুধু ভাববো।

তার সেই নির্লজ্জ উক্তি শুনে ফিলিপ অবাক বিস্ময়ে কিছুক্ষণ মিলড্রেড-এর দিকে তাকিয়ে থাকে। তারপর ক্ষোভে দুঃখে সে ফেটে পড়ে। চিৎকার করে বলে,—এরই মধ্যে ভুলে গেছ? যখন বিপদে পড়েছিলে তোমার জন্য আমি কি-না করেছি? যতদিন-না ঐ অবৈধ সন্তানটি হয়েছে, তোমাকে স্বচ্ছন্দে রাখবার জন্য আমি জলের মত টাকা খরচ করেছি, তোমার চিকিৎসার জন্যও খরচ করেছি। ব্রাইটনে যতোদিন ছিলে সে খরচও আমি-ই দিয়েছি, তোমার সন্তানের খরচ, তোমার পোষাকের খরচ, এমনকি যেটি প'রে আছো তার প্রতিটি সেলাইয়ের দামও আমি-ই দিয়েছি। তবুও তুমি এতো অকৃতজ্ঞ…

এতেও মিলড্রেড-এর এতটুকুও ভাবান্তর হয় না। সে ফিলিপের বন্ধুর সঙ্গেই চলে যায়। ছলনাময়ীর ফাঁদে পড়ে খরচটা অবশ্য ফিলিপকেই যোগাতে হয়।

দিন বয়ে যায় তবুও মিলড্রেড ফিরে আসে না। ফিলিপ চঞ্চল হয়ে ওঠে। সে ব্যগ্র হয়ে তাকে ফিরে আসবার জন্য মিনতি করে। কিন্তু ফিলিপের কথা ভাববার তার অবকাশ কোথায়? মিলড্রেড তখন ফিলিপের সুদর্শন বন্ধুর প্রেমে মশগুল, উন্মাদ-প্রায়। ফলে,

ফিলিপের প্রতি তার মনে এক গভীর বিতৃষ্ণা জাগে। মিলড্রেড স্থির করে, নতুন ভক্তটিকে ছেড়ে সে কিছুতেই ফিলিপের কাছে আর ফিরে যাবে না।

ওদিকে প্রেমিকটি মিলড্রেড-এর উগ্র উন্মাদনায় চমকে ওঠে। দু'দিন বাদে চতুর গ্রিফিথস্ তার কবল থেকে মুক্তি খোঁজে। তারপর সে একদিন পালিয়ে বাড়ি ফিরে আসে। তবুও মিলড্রেড-এর কামনার আগুন নেভে না, ফেরে না সে ফিলিপের আকুল আহ্বানে।

মিলড্রেড নামক দুঃস্বপ্নকে এড়াতে ফিলিপ হাসপাতালের কাজে এবং পড়াশুনোর মধ্যে ডুবে থাকবার চেষ্টা করে। অল্পদিনের মধ্যে আকস্মিক ভাবে ওয়ার্ডে এক প্রৌঢ় রুগীর সঙ্গে তার পরিচয় হয়। থর্প এথেলনি। পরিচয়টা ক্রমে ঘনিষ্ঠ হয় এবং তা থেকে দু'জনের বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে।

দু' সপ্তাহ বাদে থর্প এথেলনি হাসপাতাল থেকে মুক্তি পান। যাবার আগে তিনি ফিলিপকে তাঁর বাড়িতে যাবার জন্য আমন্ত্রণ জানান।

এথেলনিদের বাড়িতে গিয়ে ফিলিপ ওঁদের আন্তরিকতায় মুগ্ধ হয়। ওঁদের স্নেহ-ভালবাসার স্পর্শে তার বুভুক্ষু হৃদয় ভরে ওঠে। ক্রমে যাতায়াতের মধ্য দিয়ে ফিলিপ এথেলনি পরিবারের সঙ্গে অন্তরঙ্গ হয়।

ছ' সপ্তাহ বাদে। সেদিন রাত্রে এথেলনিদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে ফিলিপ নির্জন রাস্তাটি দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে বাস-ডিপোর দিকে যাচ্ছিল। হঠাৎ অদূরে একটি পরিচিত লোকের ছায়া দেখে ফিলিপ থমকে দাঁড়ায়।

সেই আঘাতের পর এতদিনে তার স্মৃতি প্রায় ভুলে গেলেও মিলড্রেডকে ঐ আধো আলো-অন্ধকারের ভেতরও ফিলিপের চিনতে ভুল হয় না। তার উগ্র প্রসাধন আর কুৎসিত চলার ভঙ্গীটি লক্ষ্য করে এক ঘৃণামিশ্রিত আতঙ্ক ফিলিপকে আচ্ছন্ন করে। তার মন বিক্ষুব্ধ হয়। বিমূঢ় ভাবে সে দাঁড়িয়ে থাকে।

দ্বিধা-দ্বন্দ্বের বেড়া ডিঙ্গিয়ে ফিলিপ এক সময় তড়িৎ পায়ে এগিয়ে গিয়ে মিলড্রেড-এর মুখোমুখি দাঁড়ায়। এমনি অপ্রত্যাশিত ভাবে ফিলিপকে দেখে মিলড্রেড চমকে উঠে আনত মুখে দাঁড়িয়ে থাকে। ফিলিপের মনে হয়, দুঃখ-কষ্টে তার মুখখানা বড়ই করুণ, একটু বিকৃতও যেন।

আর্দ্র কণ্ঠে মিলড্রেড জানায়, যদি এ নরক জীবন থেকে আমার বাঁচার উপায় থাকত ; যদি কোন ঝিয়ের কাজও পেতাম···

ফিলিপ উপলব্ধি করে, সে আর তাকে ভালবাসে না। কিন্তু গভীর অনুকম্পায় তার মনটি ভরে ওঠে। সন্তানটি সহ মিলড্রেডকে তার বাড়িতে থাকবার জন্য ফিলিপ সাদর অভ্যর্থনা জানায়। মিলড্রেড সে প্রস্তাব লুফে নেয়।

সারাদিন ফিলিপের হাসপাতালে কাটে। আর, সন্ধ্যাবেলায় বাড়ি ফিরে সে তার আপন কাজে ডুবে থাকে, কখনও বা এথেলনিদের বাড়ি বা অন্য কোথাও যায়।

মিলড্রেড কিন্তু ঐ স্বচ্ছন্দ জীবনধারায় সুখ পায় না, ক'দিনের মধ্যেই সে হাঁপিয়ে ওঠে। মাঝে মাঝে মনটা বিদ্রোহ করতে চাইলেও সে মানিয়ে নিতে চেষ্টা করে।

ফিলিপ অবশ্য তার মনের ভাবটা মিলড্রেড-এর কাছে ব্যক্ত করতে দ্বিধা করে না : ঘর-সংসারের কাজের বিনিময়ে তোমাকে খেতে আর থাকতে দিচ্ছি। আমার অন্য কোন উদ্দেশ্য নেই। যতদিন খুশি থাকো। কিন্তু এর বেশি কিছু প্রত্যাশা করো না।

এমনি ভাবেই তাদের দিন কাটছিল। একদিন নৈশভোজের পর দু'জনে বসে গল্প করছিল। হঠাৎ মিলড্রেড বলে ওঠে,—জান, এ বাড়িতে আসা পর্যন্ত একদিনও তুমি আমাকে আদর করনি।

—ও, তাই বুঝি !

আমার মনে হয় তুমি আমাকে আর ভালবাস না। শুধু খুকীকেই তুমি ভালবাস।

গাঢ় কণ্ঠে ফিলিপ জানায়,—কি জান, একদিন ভাবতুম, তোমাকে ছেড়ে থাকার চেয়ে আমার মৃত্যু শ্রেয়। তখন কামনা করতুম, কবে তুমি হৃতযৌবন লোলচর্ম হবে, যখন তোমার দিকে কেউ আর তাকাবে না—যাতে করে তোমাকে আমি পুরোপুরি পেতে পারি।

ফিলিপের উক্তি শুনে আহতা মিলড্রেড নীরবে তার নিজের ঘরের দিকে পা বাড়ায়।

দিন যায়। ক্রমে ফিলিপের উদাসীনতা মিলড্রেড-এর কাছে অসহ্য হয়ে ওঠে। কিন্তু সেও দমবার পাত্রী নয়। সংকল্প করে, যেমন করে হোক ফিলিপকে জয় করতে হবে, তার ঐ মিথ্যা অভিমান সে ভেঙ্গে দেবে।

ক'দিন বাদে ফিলিপ একদিন গভীর রাত্রে বাড়ি ফিরে এলে মিলড্রেড প্রায় নগ্ন অবস্থায় আচমকা তার গলা জড়িয়ে বলে,—তুমি এত নিষ্ঠুর হয়েছো কেন?

ফিলিপ তার বাহুবন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত করবার চেষ্টা করে। দৃঢ় কণ্ঠে বলে,—বাজে ব'কো না। দয়া করে শুতে যাও।

—বিশ্বাস করো, আমি তোমাকে ভালবাসি।

—আমি দুঃখিত, এখন আর উপায় নেই। ফিলিপ কঠিন কণ্ঠে জানায়।

কেন?

তোমার প্রতি আমার সে-প্রেম তিল তিল ক'রে নিঃশেষ হয়ে গেছে। এখন ও-রকম কিছুর চিন্তা করতেও আমি আতঙ্কিত হই।

মিলড্রেড তবুও নাছোড়বান্দা। সে তার কামনাতপ্ত ঠোঁট-দু'টো ফিলিপের মুখের সামনে তুলে ধরে। ফিলিপ এবার এক ঝটকায় নিজেকে মুক্ত করে বলে,—কেন জ্বালাচ্ছ, শুতে যাও।

এবার ছলনাময়ীর মুখোস খুলে পড়ে। পরাজিত নারী ফিলিপকে যাচ্ছেতাই ভাবে গালমন্দ করতে থাকে। ফিলিপ প্রতিবাদ করে না। তারপর একসময় ক্লান্ত হয়ে মিলড্রেড নিজের

ঘরে ঢুকে ফিলিপের মুখের ওপর সজোরে দরজাটা বন্ধ করে দেয়।

পরদিন হাসপাতাল থেকে ফিরে ঘরের লণ্ডভণ্ড চেহারা দেখে ফিলিপের শ্বাসরোধ হয় আর কি! যাবার আগে মিলড্রেড ঘরের একটি জিনিষও আস্তো রেখে যায় নি। নির্মমভাবে সব কিছু সে ভেঙ্গেচুরে টুকুরো টুকরো ক'রে পালিয়েছে।

খানিক বাদে ফিলিপের ম্লান চোখ দু'টো চকচকে করে ওঠে। ভাবে, যাক, ঐ ডাইনীর হাত থেকে সে এতদিনে মুক্তি পেয়েছে। কিন্তু মিলড্রেড-এর খুকীকে ফিলিপ সহজে ভুলতে পারে না।

এ ঘটনার ক'দিন পরে এক ব্যবসায় ফিলিপ তার সঞ্চিত সব অর্থ হারায়। ফলে, তার দুর্দশা চরমে পৌছায়, পড়াশুনোয় ইস্তফা দিতে সে বাধ্য হয়। তখন এথেলনি পরিবারের সৌজন্যে তার যা হোক করে দিন কাটে। ফিলিপ সে যাত্রায় প্রাণে বাঁচে।

আরও কিছুদিন পরের কথা। ফিলিপ তখন তিরিশ বছরে পা বাড়িয়েছে। এই সময় ভাগ্যলক্ষ্মী তার প্রতি প্রসন্ন হন। কাকার মৃত্যুর পর উত্তরাধিকার সূত্রে তার হাতে কিছু অর্থ আসে।

এবার আর ডাক্তারী ডিগ্রীটি লাভ করতে তার দেরী হয় না। স্থায়ীভাবে কোথাও বসে প্র্যাকটিস করবার আগে বিদেশ ভ্রমণে বেরুবার জন্য তার মনে এক তীব্র বাসনা জাগে। সেই উদ্দেশ্যে কোন জাহাজে চাকরি নিতে স্থির করে।

কিন্তু তার আগেই কোন এক প্রবীণ ডাক্তারের সহকারীর অস্থায়ী পদ পেয়ে সে এক পল্লী অঞ্চলে চলে যায়।

এই সময়টা এথেলনি পরিবার প্রতি বছর তাদের দেশের বাড়িতে কিছুদিন কাটিয়ে আসেন। তাঁরা ফিলিপকে সেখানে সাদর অভ্যর্থনা জানান। ফিলিপের কাছে ঐ পল্লীগ্রামের শান্ত স্নিগ্ধ মনোরম শোভার আকর্ষণ দুর্জয়। ক'দিনের ছুটি নিয়ে সে তাঁদের মাঝে ছুটে যায়।

ফিলিপ লক্ষ্য করে এথেলনিদের কন্যা স্যালি আর আগের সেই খুকীটি নেই, রূপ-যৌবনে পরিপূর্ণ এক নারী। শুধু চোখ দু'টি তার তেমনি সরল, স্বচ্ছ। সে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে থাকে।

দুষ্টু হাসি দিয়ে স্যালি ফিলিপকে অভ্যর্থনা জানায়। প্রশ্ন করে,—অমন ভাবে কি দেখছ ?

দেখছি তোমাকে। সত্যিই তুমি বড় হ'য়ে গেছ।

এথেলনি পরিবারের ছেলেপুলেদের সঙ্গে হৈ-হুল্লোড় করে ফিলিপের দিনগুলি আনন্দে কাটতে থাকে। স্যালির কাছে সে তার মনের উত্তেজনা প্রকাশ করে না, তার সঙ্গেও সে সহজ ভাবেই মেলামেশা করে।

সেদিন রাত্রে দু'জনে দোকান থেকে বাড়ি ফেরার পথে এক ইঙ্গিতময় পরিবেশে ফিলিপ স্যালির কাছে প্রেম নিবেদন করে। স্যালি প্রতিবাদ করে না। খুশি মনে সে ফিলিপের কাছে আত্ম-নিবেদন করে।

এ ঘটনার পর দু'জনের মধ্যে গভীর ভালবাসা হয়। কিন্তু ক'দিন পরে ফিলিপকে লণ্ডনে ফিরে আসতে হয়। তারপর এথেলনি পরিবারও লণ্ডনে ফিরে আসেন।

লণ্ডনে ফিরে আসার তিন সপ্তাহ বাদে, দু'জনে যখন বেড়াচ্ছিল, ফিলিপ স্যালির চোখে মুখে চিন্তার আভাস লক্ষ্য করে প্রশ্ন করে,—কি হয়েছে ?

জানি না।

খুলে বলো, লক্ষ্মীটি। ফিলিপ ব্যস্ত হয়ে প্রশ্ন করে।

এখনও পর্যন্ত ঠিক বুঝতে পারছি না। হয়তো কিছু নাও হ'তে পারে।

তার উক্তি শুনে ফিলিপ চমকে ওঠে। দু'জনে নীরবে হাঁটতে থাকে। এক সময় স্যালি তার কাছ থেকে বিদায় নেয়।

সপ্তাহ শেষে স্যালির সঙ্গে আবার দেখা হ'তে ফিলিপ জানতে

পারে, তার আশঙ্কা মিথ্যা। কিন্তু তবুও সে খুশি হয় না, ম্লান দৃষ্টিতে স্যালির দিকে তাকিয়ে থাকে।

স্যালি প্রশ্ন করে, অদ্ভুত মানুষ তুমি। শুনে আনন্দ হ'ল না ?

ঠিক বুঝতে পারছি না। ফিসফিস করে ফিলিপ জানায়।

ফিলিপ উপলব্ধি করে, চিরদিন সে ভবিষ্যতের ভাবনায় দিন কাটিয়েছে। অন্তরের কামনাকে সে তুচ্ছ করে নিজেকে প্রবঞ্চিত করেছে। আসলে সে চেয়েছিল একটি স্ত্রী, একটি সংসার আর চেয়েছিল ভালবাসা। এর বিনিময় হ'তে পারে না, এর কাছে সবই তুচ্ছ, অবাঞ্ছিত।

আত্মস্থ হ'তে সে স্যালির কাছে বিয়ের প্রস্তাব করে।

—আমি তোমার পথের বাধা হ'তে চাই না। তাহলে তোমার বিদেশ ঘোরার কি হবে ?—শান্ত কণ্ঠে স্যালি জানায়।

ও-সব বাজে চিন্তা নিয়ে আমি আর মাথা ঘামাচ্ছি না। আমি তোমাকে ছাড়তে পারি না।—ফিলিপের কণ্ঠে দৃঢ়তার আভাস।

স্যালি আর প্রশ্ন করে না। সানন্দে ফিলিপের প্রস্তাবে সম্মতি জানায়।

স্যালিকে বিয়ে করে ফিলিপ এক জেলে-পল্লীতে গিয়ে সুখের ঘর বাঁধে। সেই গরীব অঞ্চলে ডাঃ ফিলিপের রোজগার যাই হোক না কেন, স্যালির ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে তার মন ভরে ওঠে।

বিরাট

[জার্মান সাহিত্যিক স্তেফান ৎস্‌ভাইক (Stefan Zweig)-র 'বিরাট' (Virata), উপন্যাসটির গল্প।]

অনেক বছর আগেকার কথা। বুদ্ধদেবের তখনও জন্ম হয়নি।

রাজপুতানার বীরভাগ অঞ্চলে বিরাট নামে একজন ন্যায়পরায়ণ এবং উদারচেতা লোক বাস করতেন। সাহসী যোদ্ধা হিসাবেও তাঁর খ্যাতি কম ছিল না।

সে রাজ্যের অর্ধেকটার শাসনকর্তা ছিলেন তখনকার মহারাণীর এক ভাই। তাঁর লোভ ছিল দুর্জয়। পুরো রাজত্বের ওপর লালায়িত হয়ে রাষ্ট্রের প্রধান সেনাপতি ও অন্যান্য পদস্থ কর্মচারীর সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে তিনি সেনাবাহিনীর মধ্যে বিদ্রোহ সৃষ্টি করলেন। তারপর সেই বিশ্বাসঘাতকের দল একদিন অতর্কিতে রাজ্য আক্রমণ করে বসে।

ফলে রাজ্যের সর্বত্র বিশৃঙ্খলা আর অরাজকতার ঢেউ বয়ে যায়। রাজ্য যায় যায়। মহারাজ নিজেকে অসহায় বোধ করেন। অগত্যা নিরুপায় হয়ে তিনি বিরাটের সাহায্য প্রার্থনা করেন। মহারাজ বিরাটকে তাঁর সেনাবাহিনী পরিচালনার ভার নেবার জন্য অনুরোধ করলেন।

কঠিন পরীক্ষা। তবুও অনুগত বিরাট সানন্দে মহারাজের অনুরোধে সেই গুরু দায়িত্ব গ্রহণ করলেন।

সেই রাত্রেই মুষ্টিমেয় স্বদেশ-প্রেমিক সৈন্য সঙ্গে নিয়ে রাত্রির অন্ধকারে বীরবিক্রমে বিরাট হঠাৎ শত্রু-শিবিরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। শত্রুরা এ পাল্টা আক্রমণের জন্য আদৌ প্রস্তুত ছিল না। ফলে, বিরাটের হাতে বিদ্রোহী সেনাবাহিনী সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হল।

ভোরের আলোতে শত্রুদের মৃতদেহের স্তূপ দেখে বিরাট আঁৎকে ওঠেন। ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত মৃত ব্যক্তিদের ভেতর হঠাৎ তাঁর অগ্রজের নিস্পন্দ দেহটি আবিষ্কার করে তিনি ভেঙ্গে পড়েন। বড় ভাইও যে বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন তা তিনি পূর্বে জানতেন না। মৃত অগ্রজের বিস্ফারিত চোখ দু'টি দেখে বিরাটের মনে হচ্ছিল যেন, তাঁর মা প্রথম সন্তানকে হত্যা করার জন্য তাঁকে অভিযুক্ত করছেন। সেই সঙ্গে তিনি উপলব্ধি করলেন, ঈশ্বর যেন তাঁকে ইঙ্গিতে বলছেন যে যারা মানুষ হত্যা করে তারা প্রকৃতপক্ষে ভ্রাতৃহত্যার অপরাধে অপরাধী। বিরাট গভীর ভাবে অনুতপ্ত হলেন।

বিরাটের আদেশে মৃত শত্রুদের শবদেহগুলির যথোচিত সৎকারের ব্যবস্থা করা হয়।

দলের বিজয়োল্লাস বিরাটের ভাল লাগছিল না। তিনি অস্বস্তি বোধ করছিলেন। তাই তিনি গোটা বাহিনীটিকে রাজধানীর দিকে এগিয়ে যেতে আদেশ করেন। বাহিনী এগিয়ে যায়। সকলের পেছনে বিরাট ধীর শান্তভাবে তাদের অনুসরণ করেন। চলতে চলতে মাঝ পথে তাঁর হাতের তরবারিটি নদীর জলে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেন—জীবনে আর কখনও তিনি অস্ত্র ধরবেন না।

অভাবিত বিজয়ের খবর পেয়ে মহারাজ উল্লসিত হয়ে ওঠেন। স্থির থাকতে না পেরে তিনি নিজেই ছুটে এগিয়ে গেলেন বিরাটকে সাদর অভ্যর্থনা জানাতে। পথের মাঝে আনন্দের উচ্ছ্বাসে তিনি বিরাটকে জড়িয়ে ধরলেন। তারপর তিনি তাঁকে প্রধান সেনাপতির পদটি গ্রহণ করতে বিশেষ ভাবে অনুরোধ করলেন।

বিরাট সবিনয়ে সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে জানালেন,—মহারাজ, তরবারি হচ্ছে পশুশক্তির বাস্তব রূপ। সেই তরবারি আমি আর স্পর্শ করব না; জীবনে আমি আর কখনো যুদ্ধ করবো না বলে স্থির করেছি। আপনি আমাকে ক্ষমা করুন, প্রভু।

বিরাটের উক্তি শুনে মহারাজ বিস্মিত হন। উপস্থিত জনতার

মুখরতা স্তব্ধ হয়। একটু ভেবে নিয়ে মহারাজ বলেন,—তুমি ন্যায়-নিষ্ঠ, সুবিবেচক—আমার বিশ্বাস, প্রজারা তোমার কাছ থেকে সুবিচার পাবে। তুমি তা হলে এ রাজ্যের প্রধান বিচারপতির আসন শোভা কর।

বিরাট এ পদ গ্রহণ করলেন।

দিনের পর দিন বিরাট নানা বিচিত্র অভিযোগের বিচার সুষ্ঠু ভাবে করে চললেন। প্রয়োজনে তিনি কঠিন শাস্তিও দিতেন বৈ কি। কিন্তু কখনও কাউকে মৃত্যুদণ্ড দিতেন না। অপরাধ গুরুতর হলেও না। সে জন্য রাজ্যে অপরাধ-প্রবণতা কিন্তু এতটুকুও বাড়ল না। তাঁর সুচিন্তিত সিদ্ধান্তে কখনও কেউ কোন প্রশ্ন করে না। ক্রমে তাঁর সুবিচারের কথা রাজ্যের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে।

বিরাটের বিচারক জীবনের ষষ্ঠ বৎসর। একদিন খাজার নামে এক উদ্ধত হিংস্র প্রকৃতির বন্য যুবককে বাদীপক্ষ বেঁধে নিয়ে এলো বিরাটের বিচারালয়ে। তার বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ: আসামী ভদ্রঘরের একটি মেয়েকে জোর করে বিয়ে করতে চাইছিল। তাতে বাধা পাওয়ায় সে মেয়ের বাপ এবং তিনটি ভাইসহ মোট এগারো জনকে খুন করেছে। তাদের গরু, ভেড়াগুলিও ঘাতকের হাত থেকে রেহাই পায়নি।

অভিযোগ গুরুতর সন্দেহ নেই। সব শুনে বিচারপতি বিরাট গভীর চিন্তায় মগ্ন হলেন। অনেক ভেবেচিন্তে বিচার করে তিনি দণ্ড দিলেন: মোট যত জন লোককে যুবকটি খুন করেছে ততো বছর ভূগর্ভস্থ কারাবাস। সেই সঙ্গে প্রতি বছর এগারোবার তাকে একশ' ঘা করে চাবুক মারবার আদেশও দিলেন। অতগুলি খুন করেছে সে, তবু কিন্তু আসামীকে বিরাট প্রাণদণ্ড দিলেন না।

বিচারকের 'রায়' শুনে বন্দী যুবক উদ্ধতভাবে বলল,—বিচারপতি, আমি তোমার ক্ষমাপ্রার্থী নই। তুমি এ বিচার করেছ অন্যের কথা শুনে। তুমি আজ আমাকে যে দণ্ড দিলে তা যে কি মারাত্মক তা তুমি নিজে জান না। তা উপলব্ধি করারও তোমার শক্তি নেই।

কারণ, তোমাকে জীবনে কখনও চাবুক খেতে হয়নি, মাটির নীচে বন্দী হয়ে একদিনের জন্যও সে-লাঞ্ছনা তুমি ভোগ করোনি। আমি রাগের বশে জ্ঞান হারিয়ে খুন করেছিলাম। কিন্তু তুমি বিচারকের মুখোশ পরে সম্পূর্ণ সুস্থ মস্তিষ্কে আমাকে মাটির নীচে বন্দী করে তার ওপর চাবুক মেরে তিলে তিলে হত্যা করার আদেশ দিলে। এই তো তোমার বিচার! বি-চা-র! আমি জানি, এ রকম বন্দীকে কি পরিমাণ কষ্ট ভোগ করতে হয় সে-অভিজ্ঞতা যে বিচারকের নেই তাঁর কাছ থেকে সুবিচারের আশা করা বিড়ম্বনা মাত্র।

বন্দীর উক্তি শুনে বিচারক আবার গভীর চিন্তায় মগ্ন হলেন। আশ্চর্য, খানিক বাদে চোখ তুলে তাকাতে বন্দীর চোখে তিনি যেন মৃত অগ্রজের সেই অভিযোগপূর্ণ দৃষ্টি লক্ষ্য করলেন। তিনি শিউরে উঠলেন। মৌন বিচারক আস্তে আস্তে কক্ষ থেকে এক সময় বেরিয়ে গেলেন। বন্দীকে কারাগারে নিয়ে যাওয়া হল।

রাজার কাছ থেকে এক মাসের ছুটি নিয়ে বিরাট ঐ দিন রাতের অন্ধকারে সেই ভূগর্ভস্থ কারাগারে গিয়ে ঢুকলেন। বন্দী যুবকের হাতে একটি চিঠি এগিয়ে দিলেন তিনি। তারপর বন্দীর পোষাক নিজে পরে বন্দীকে নিজের পোষাক পরিয়ে সেখান থেকে তাকে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যেতে অনুরোধ করলেন। সেইসঙ্গে ঠিক একমাস পরে ঐ চিঠিখানা মহারাজের কাছে পৌঁছে দিতে যুবকটিকে তিনি নির্দেশ দিলেন। বন্দী যুবক বিরাটের আচরণে হতভম্ব হয়। তবুও সে একসময় চিঠিখানি হাতে নিয়ে বিরাটের পোষাকে কারাগার থেকে বেরিয়ে এসে মুক্তির নিঃশ্বাস নেয়।

দিন যায়। ভূগর্ভের অন্ধকার কারাকক্ষে বন্দীজীবনের সব কিছু অভিজ্ঞতা বিরাট ক্রমে অর্জন করেন। হঠাৎ একদিন কারাগারের দরজা খুলে যায়। সেই চিঠি পেয়ে স্বয়ং মহারাজ ছুটে আসেন বিরাটকে কারাগার থেকে সাদরে নিয়ে যেতে।

একমাসের কারাগার-জীবনে বিরাট উপলব্ধি করেছেন,—মানুষ মানুষের বিচার করতে পারে না। ভগবানের অধিকারে মানুষের হাত বাড়াতে যাওয়া পাপ। তাই বিরাট প্রার্থনা জানালেন,—মহারাজ, আমাকে বিচারকের কর্তব্য থেকে মুক্তি দিন।

বিচারপতির বদলে মহারাজ সাগ্রহে তাঁকে প্রধানমন্ত্রীর পদ দিতে চাইলেন। তাঁর প্রস্তাব শুনে বিরাট এবার নিবেদন করলেন,—মহারাজ, তখন প্রত্যেকটি কথা কাজে পরিণত হবে। অথচ সব কথার সুদূরপ্রসারী পরিণামটা আগে থেকে জানা সম্ভব নয়। তাঁর মতে, নিঃসঙ্গ জীবন-যাপন করাই পাপের হাত থেকে রেহাই পাবার একমাত্র পথ।

রাজকার্য থেকে মুক্তি নিয়ে বিরাট প্রসন্ন মনে নিজ গৃহে ফিরে এলেন। বাড়ি ফিরে আসার পর ক'বছর বিরাটের শান্তিতেই কাটছিল, যদিও তাঁর অমূল্য পরামর্শের জন্য মাঝে মাঝে লোক আসে বহু দূর থেকে। বিরাট ভাবেন, আদেশের চেয়ে উপদেশ শ্রেয়, বিচারের চেয়ে সালিসী মন্দ নয়।

বিরাটের শান্তিময় জীবনের ষষ্ঠ বর্ষের এক সন্ধ্যা—

বিরাট ঘর থেকে শুনতে পেলেন, ছেলেরা মিলিত ভাবে বাড়ির এক ভৃত্যকে কি এক তুচ্ছ কারণে নির্মমভাবে চাবুক মারছে। ছুটে গিয়ে বিরাট ভৃত্যটিকে রক্ষা করলেন। কিন্তু তাকে কেন্দ্র করে পিতা এবং পুত্রদের মধ্যে আদর্শের সংঘাত বাধল। ছেলেদের আচরণে বিরাট মর্মাহত হলেন। তিনি জোর করে তাঁর ব্যক্তিগত ইচ্ছা বা আদর্শ পুত্রদের ওপর চাপাতে চাইলেন না। শান্তি ও সত্যের সন্ধানে ঐ রাত্রিতেই তিনি নিঃশব্দে বাড়ি ছেড়ে চলে গেলেন।

জনহীন নিস্তব্ধ গভীর বন। সেখানে বছরের পর বছর কঠোর তপস্যা করে চললেন বিরাট। জনমানবের সঙ্গে তাঁর সকল সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেছে বহুদিন আগে। তা হোক্। এতদিনে বনের পশু-

পাখিরা তাঁকে নিজেদেরই একজন বলে মেনে নিয়েছে। এখানে বিরাটের দিনগুলি সুখেই কাটছিল।

একদিন এক শিকারী ঘুরতে ঘুরতে পথ ভুলে তাঁর কুটীরের সামনে এসে উপস্থিত হল। ঋষিকে দেখে সে মুগ্ধ হল। লোকালয়ে ফিরে এসে শিকারী তাঁর মহিমার কথা প্রচার করল। খবর শুনে রাজা নিজে এলেন সেই কুটীর-অঙ্গনে। ঋষি বিরাটকে দেখে রাজা অভিভূত হলেন। তিনি তাঁকে সঙ্গে নিয়ে যাবার জন্য অনেক চেষ্টা করলেন। কিন্তু কোন ফল হ'ল না। রাজা বিফল মনে ফিরে গেলেন।

আরও কিছুদিন পরের কথা। ঐ বনের মধ্যে এক সময় একটি শবদেহের সৎকারের প্রয়োজন হয়। মানুষের সাহায্যের দরকার। তাই বিরাটকে কাছের গ্রামের দিকে এগিয়ে যেতে হয়। ঋষিকল্প বিরাটকে তাদের মধ্যে পেয়ে গ্রামবাসীরা সসম্ভ্রমে তাঁকে প্রণাম করে। বিরাট এগিয়ে চলেন। ক্রমে গ্রামের শেষ প্রান্তে এক জীর্ণ কুটীরের কাছে তিনি উপস্থিত হলেন। সেই কুটীরবাসী রমণীর ভৎর্সনাপূর্ণ দৃষ্টি লক্ষ্য করে বিরাট থমকে দাঁড়ালেন। নারীটির চোখে তিনি লক্ষ্য করলেন সেই বিস্মৃত চাউনি—মৃত অগ্রজের অভিযোগ-ভরা দৃষ্টি। এগিয়ে গিয়ে তিনি স্নিগ্ধ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন,—মা, আমি তোমার কাছে কোন অপরাধ করেছি কি?

আশ্চর্য, বিরাটের প্রশ্ন শুনে নারীটি জ্বলে ওঠে। ঝাঁঝিয়ে বলে, —জানো না, তুমি আমার কি মারাত্মক ক্ষতি করেছ, কি সর্বনাশ করেছো? আমার স্বামী ছিলেন এ অঞ্চলের একজন সেরা তাঁতি। তোমার-ই আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে কবে তিনি সংসার ত্যাগ করে গেছেন। ফলে, আজ আমি একান্ত অসহায়। আমার সংসারে উপার্জন করবার কেউ নেই। আমার তিনটি সন্তান অনাহারে পর পর মারা গেছে মর্মান্তিক ভাবে। এর জন্যে একমাত্র তুমিই দায়ী।

নারীটির উক্তি শুনে বিরাট ব্যথিত হলেন। তিনি উপলব্ধি

করলেন ঃ পৃথিবীতে থাকতে হলে সংসারকে অগ্রাহ্য করা সম্ভব নয়। কর্মের ন্যায় কর্মবিরতিও অন্যের ওপর প্রভাব বিস্তার করে। শুধু সংসার ত্যাগেই মুক্তি মেলে না। অহং-ভাব ভুলে সেবার মধ্যেই প্রকৃত মুক্তির স্বাদ পাওয়া সম্ভব। সব রকম কামনা থেকে মুক্ত হতে হবে। কামনার থেকেই সৃষ্টি হয় বিভ্রম।

পুণ্যাত্মা বিরাট তাঁর কুটীর ছেড়ে সেই গ্রামে আসার উদ্দেশ্য ভুলে গেলেন। ভুলে গেলেন তাঁর তপস্যার কথা, কুটীর-জীবন। এ ঘটনার পরের দিন তিনি রাজধানীতে ফিরে এলেন। মহারাজের কাছ থেকে বিরাট চেয়ে নিলেন তাঁর কুকুরগুলোর দেখাশুনো করার ভার। বাকি দিনগুলো তাঁর কাটল পরম তৃপ্তিতে সেই কুকুরগুলির সেবাযত্ন করে।

বিরাটের কাণ্ড দেখে ছেলেরা লজ্জায় মরে, ধর্মযাজকেরা ঘৃণায় মুখ ফেরায়। আত্মীয়দের অনেকে স্বচ্ছন্দে তাঁকে অস্বীকার করে, কেউবা ভুলে গিয়ে স্বস্তি পায়।

পুণ্যাত্মা বিরাট একদিন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। ছেলেরা কেউ মৃত পিতার পাশে এসে একবারও দাঁড়াল না। কোন পুরোহিত এলেন না; তাঁর আত্মার কল্যাণ কামনা কেউ করল না। তাঁকে একজন সাধারণ ভৃত্য হিসাবেই কবর দেওয়া হল।

দু'দিন বাদে সেই কুকুরগুলোও বিরাটকে ভুলে গেল।

ইউলিসিস

[ইংরেজী সাহিত্যের অসাধারণ লেখক জেম্‌স জয়েস্‌ (James Joyce)-এর পৃথিবীখ্যাত এপিক-ধর্মী 'ইউলিসিস' (Ulysses), ১৯২২, উপন্যাসটির কাহিনী]

আয়ার্লাণ্ড-এর ডাবলিন শহর, ১৬ই জুন, ১৯০৪ সাল—

ভোর হ'তে নগরীর ঘুম ভাঙ্গে। নগরী আবার চঞ্চল হয়ে ওঠে—চারিদিকে রুটিনমাফিক কাজের সাড়া পড়ে। সেইসঙ্গে জেগে ওঠে শহরের এক প্রান্তের পুরানো সেকেলে বাড়ির উঁচুতলার অধিবাসীরাও।

উঁচুতলার সস্তা ঘরটিতে ডাক্তারী-ছাত্র বার্ক মুলিগ্যানের ক'জন সতীর্থের সঙ্গে বাইশ বছরের শিক্ষক স্টিফেন ডেডালাসও থাকে। আর থাকে ইংরেজ তরুণ হেইন্‌স। স্টিফেন পেশায় স্কুল মাস্টার, মনে শিল্পী।

সকাল হ'তে যথারীতি নড়বড়ে সিঁড়িটি বেয়ে ভাবী ডাক্তার খোলা ছাদে গিয়ে দাড়ি কামাতে বসে। খানিক বাদে শিক্ষক স্টিফেনও পায়ে পায়ে গিয়ে হাজির হয় ছাদটির 'পরে।

স্টিফেন মুলিগ্যানের সঙ্গে কোন কথা বলে না, অদূরের শান্ত প্রবাহিণীটির দিকে শূন্য দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে থাকে।

তাকে অমনি ভাবে দাঁড়াতে দেখে দাড়ি কামাতে কামাতেই মুলিগ্যান বন্ধুকে উদ্দেশ করে বলে,—আজকের সকালটা বেশ, না? নদীটিকেও কেমন সুন্দর দেখাচ্ছে!

মুলিগ্যানের উচ্ছ্বাসে স্টিফেন কিন্তু যোগ দেয় না। তেমনি উদাস ভাবেই তাকিয়ে থাকে। মুলিগ্যান স্টিফেনের মনের খবর জানবে কি করে?

তার স্বর্গতা মা'র স্মৃতি তখন স্টিফেনের মনে ভেসে উঠেছে। দেখতে দেখতে বছর গড়িয়ে গেলেও তার স্পষ্ট মনে পড়ে, মুমূর্ষু মা'র আকুল আহ্বানে প্যারিস থেকে সে কেমন করে ছুটে গিয়েছিল।

স্টিফেন ভুলতে পারে না, মা'র অন্তিম কালের সেই করুণ মিনতি : লক্ষ্মী ছেলে, আমার আত্মার শান্তির জন্য তুই একবার গির্জায় গিয়ে প্রার্থনা কর্।

গির্জার অনুশাসনের প্রতি বিরাগের জন্য মা'র সে অনুরোধে সেদিনও স্টিফেনের মন বিদ্রোহ করে উঠেছিল। তবুও সে তাঁকে একসময় মৌন-সম্মতি জানিয়েছিল।

কিন্তু জননীকে পরোক্ষে ঐ প্রতিশ্রুতি দেওয়া সত্ত্বেও স্টিফেন আজ পর্যন্ত তাঁর সেই শেষ অনুরোধ রক্ষা করতে পারেনি। সে প্রার্থনা করেনি।

সেই কঠিন প্রতিশ্রুতি স্টিফেনের মনটাকে কুরে কুরে খাচ্ছিল। সে তার মনের দ্বিধা-দ্বন্দ্বের বেড়াটিকে ডিঙ্গাতে পারছিল না। ফলে, স্টিফেনের মনে সুখ-শান্তি ছিল না।

স্টিফেনের ঐ অশান্ত মনে আর একটি উপসর্গ হানা দেয়। ক্রমে ক্রমে সে উপলব্ধি করে, মুলিগ্যান এবং ঐ সুরাসক্ত ইংরেজ যুবকের সঙ্গে বাস করে তার জীবনটা যেন অর্থহীন, উদ্দেশ্যহীন হয়ে যাচ্ছে—যেন সে তার ব্যক্তিসত্তা হারিয়ে ফেলছে। স্টিফেন তার সমস্যার সমাধানও খুঁজে পায় না।

তাই প্রাতরাশের পর্ব শেষ করে সেই মুলিগ্যান এবং অবাঞ্ছিত সুরাসক্ত হেইনস্-এর সঙ্গে স্টিফেনকে আবার রাস্তায় বেরোতে হয়।

হেইনস্ স্টিফেনের সঙ্গে বন্ধুভাবে কথা বলতে চায়। কিন্তু গত রাত্রের তার ঐ অভব্য আচরণের কথা স্টিফেন ভুলতে পারে না। তাই সে হেইনস্-কে উপেক্ষা করে।

কি কারণে সেদিন স্টিফেনের স্কুল অর্ধেক হবার পর ছুটি হবে বলে স্থির হয়। এই সু-খবরটা ছেলেদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়তে দেরী

হয় না। ব্যাস, ছুটির গন্ধ পেয়ে তারা চঞ্চল হয়ে ওঠে—কতক্ষণে মুক্তি পাবে।

ছুটির আগের ঘণ্টা। স্টিফেনের অঙ্কের ক্লাস। সে অবাক বিস্ময়ে লক্ষ্য করে, তার এক প্রিয় ছাত্র অতি সাধারণ একটি অঙ্ক ভুল করে কেমন অদ্ভুত ভাবে তার দিকে তাকিয়ে থাকে। শিক্ষক অসহায় ছেলেটির মধ্যে ছাত্র-স্টিফেন-এর প্রতিচ্ছবি দেখে আঁৎকে ওঠে। খানিক বাদে ছুটির ঘণ্টা বাজতে স্টিফেন স্বস্তির নিঃশ্বাস নেয়।

স্কুল থেকে বেরিয়ে স্টিফেন সরাসরি সমুদ্রের দিকে পা চালায়। সমুদ্রতীরে আপন মনে বেড়াতে বেড়াতে কত কথাই না তার মানস-পটে মিছিল করে আসে।—তার ছাত্র-জীবনের স্মৃতি, পিতার উচ্ছৃঙ্খল চরিত্রের জন্য সংসারের অকথ্য দুর্দশার দুঃস্বপ্ন, ডাবলিনের দুঃসহ জীবনের কথা ; এমনি আরও কতো কি !

চলতে চলতে একটি কুকুরের কঙ্কাল দেখে স্টিফেন থমকে দাঁড়ায়। তার মনে পড়ে, ছেলেবেলায় এমনি একটি বড় কুকুরের তাড়া খেয়ে সে সেদিন কি ভীষণ ভয়টাই না পেয়েছিল।

শহরের আরেক প্রান্তে থাকে ইহুদী লিওপোলড্ ব্লুম—কাগজের বিজ্ঞাপন-সংগ্রাহক। তার একটি মাত্র মেয়ে, থাকে অন্য এক শহরে। সেখানে মেয়েটি কোন এক ফটোর দোকানে কাজ করে।

শ্রীমতী ব্লুম বা মলি টুইড্ একটি সৌখিন সংগীত-সঙ্ঘের সাধারণ শিল্পী। উত্তর-ত্রিশে পৌঁছেও মহিলাটির চটক কমেনি। এখনও তার বহু ভক্ত। বর্তমানে দলের অধিকারী ব্লাজেস বয়লান তার প্রাণপ্রতিম প্রণয়ী।

ষোল বছরের বিবাহিত জীবনে স্ত্রী'র চরিত্রটি লিওপোলডের অজানা নয়। তবুও সে প্রতিবাদ জানায় না। সে বিলক্ষণ জানে, তাতে কোন ফল হবে না, শুধু অশান্তি-ই বাড়বে। লিওপোলড্ নীরবে তাকে নিয়ে ঘর করে।

ভোর হ'তে লিওপোলড্ ব্লুমকে আড়ামোড়া দিয়ে বিছানা

ছাড়তে হয়। অনেক কাজ। আবার, নিজহাতে তাকে যথারীতি প্রাতরাশটিও তৈরী করতে হয়। শুধু নিজের জন্য নয়, বিশেষ করে স্ত্রী'র জন্যই। স্ত্রী হলেও সে যে শিল্পী, তায় গভীর রাত্রে তাকে ফিরতে হয়। সকালে উঠে এ সব হাঙ্গামা করবার তার অবকাশ কোথায়? খেতে খেতেই লিওপোলড্ মেয়ে মিলির কাছ থেকে সদ্য-পাওয়া চিঠিটি খোলে। চিঠি পড়ে তার এগারো দিনের স্বর্গত পুত্র রুডির স্মৃতি মনকে নাড়া দেয়। চিঠিটি আবার পড়তে গিয়ে সে লক্ষ্য করে, একাধিকবার একটি তরুণের কথা মিলি উল্লেখ করেছে। এবার সে চিন্তিত হয়। ভাবে, কি জানি—মিলিও বুঝি তার মা'র সেই পঙ্কিল পথেই পা বাড়াতে যাচ্ছে!

এদিকে, স্ত্রীর প্রেমে বঞ্চিত হয়ে লিওপোলড্ প্রেমের সন্ধানে তার নামটি ভাঁড়াতে দ্বিধা করে না। সে চিঠির মাধ্যমে একটি মেয়ের সঙ্গে হাল্‌কা প্রেমের স্বাদে শূন্য মন ভরাতে চেষ্টা করে। তাই সে বাড়ি থেকে বেরিয়ে প্রথমে যায় পোস্ট অফিসে, প্রণয়িনীর চিঠির সন্ধানে। লিওপোলড্ আশাহত হয় না। চিঠিটি পড়ে অজ্ঞাতসারেই একসময় গিয়ে হাজির হয় গির্জাতে।

কিন্তু গির্জার যাজকের প্রাণহীন উক্তি তার মন স্পর্শ করে না। লিওপোলড্ আবার রাস্তায় বেরিয়ে আসে। রাস্তায় পুরনো বন্ধু প্যাডি ডিগনাম-এর শবযাত্রা দেখে সে স্তম্ভিত হয়ে যায়। সে জানতে পারে বন্ধুটি সন্ন্যাস রোগে অকস্মাৎ গত হয়েছে। সেও ঐ শবযাত্রীদের দলে যোগ দেয়। কবরস্থানে পৌঁছে তার সেই ছেলে এবং বাবার কথা মনে পড়ে যায়। তার মনে পড়ে, জীবন যন্ত্রণা থেকে মুক্তির জন্যে বাবা কেমন ভাবে আত্মহত্যা করেছিলেন। মনটা তার বেদনায় ভরে ওঠে।

কিন্তু হাতে তার অনেক কাজ, সেই পুরনো শোক নিয়ে বিলাস করবার সময় কোথায়? লিওপোলড্ আর দাঁড়ায় না। সংগৃহীত বিজ্ঞাপনগুলির ছাপবার ব্যবস্থা করতে এবার কাগজের অপিসে চলে যায়। সেখানে স্টিফেনের সঙ্গে তার দেখা হয়।

স্টিফেনের সঙ্গে কোন আত্মীয়তা না থাকলেও লিওপোলড্ তার পিতৃতুল্য, তার পিতার পুরনো বন্ধু। অপ্রত্যাশিত ভাবে কাগজের অপিসে ছু'জনের মধ্যে দেখা হতেও তাদের মধ্যে কিন্তু কোন কথা হয় না।

খবরের কাগজের অপিস থেকে বেরোতে শ্রীমতী ব্রীন-এর সঙ্গে লিওপোলড্-এর দেখা হয়। শ্রীমতীকে সে বন্ধু ডিগনামের আকস্মিক মৃত্যুর খবর জানায়। ভদ্রমহিলা লিওপোলড্-কে শ্রীমতী পিয়োরক্ষয়-এর প্রসব-বেদনার কথা জানায়।

শহরের চারিদিকের প্রাকৃতিক শোভা দেখতে দেখতে লিওপোলড্ আবার চলতে থাকে। হঠাৎ তার মনে পড়ে, পুরনো খবরের কাগজগুলি একবার দেখা দরকার। সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় গ্রন্থাগারের দিকে সে এগিয়ে যায়।

গ্রন্থাগারের ভেতর এগিয়ে যেতে গিয়ে সে স্টিফেনকে এক কোণে দেখতে পায়। স্টিফেন তখন ঈষৎ উত্তেজিত। ছু'তিন জন বন্ধুর সামনে শেক্সপীয়র সম্পর্কে তার নিজস্ব মতামত আওড়াতে ব্যস্ত। এবারও তাদের ছু'জনের মধ্যে কোন কথা হয় না।

সূর্য তখন পশ্চিম আকাশে। প্রচণ্ড ক্ষুধা অনুভব করে লিওপোলড্ অদূরের একটি হোটেলের দিকে এগিয়ে যায়। খানিক বাদে তার স্ত্রী'র প্রণয়ী ব্লাজেসও সেখানে এসে এক কোণে বসে। লিওপোলড্ বুঝতে পারে না, ওর অত তাড়া কিসের! সে কি ক'রেই বা জানবে! ব্লাজেস-কে যে এক্ষুণি মলি টুইড-এর সঙ্গে দেখা করতে হবে—গোপন মিলন!

হোটেল থেকে বেরিয়ে আরও ক'টা হাতের কাজ সেরে নিয়ে সন্ধ্যার দিকে লিওপোলড্ এক শুঁড়িখানায় গিয়ে হাজির হয়। সে এক বিশ্রী পরিবেশ—প্রমত্ত লোকগুলির অকারণ অট্টহাসি, ঢলাঢলি, কোথাও বা ঝগড়া হাতাহাতি কিংবা জুয়ার কানাকানি, ফিসফাস। লিওপোলড্ সেখানে থাকতে পারে না, খানিক বাদেই একরকম তাড়া খেয়ে সেখান থেকে বেরিয়ে এসে হাঁপ ছাড়ে।

এবার লিওপোলড্ শ্রীমতী পিয়োরক্ষয়'র খোঁজে শিশু সদনে যায়। সেখান থেকে বেরিয়ে আরও দু' একজন পরিচিত লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে। তখন রাত প্রায় ন'টা বাজে। তবুও তার কাজের শেষ নেই। রাস্তায় চলতে চলতে হঠাৎ তার অসতী স্ত্রী'র কথা মনে পড়ে যায়, আত্মগ্লানিতে তার মনটা ভরে ওঠে। শূন্য মনে সে গিয়ে ঢোকে সামনের শুঁড়িখানায়।

সেখানে প্রবেশ করে লিওপোলড্-এর চক্ষুস্থির। দেখে, মুলিগ্যান এবং আরও ক'জন ডাক্তারী ছাত্রকে নিয়ে স্টিফেন এক কোণে জাঁকিয়ে বসে আছে। তার বুঝতে অসুবিধা হয় না—ওরা অনেকক্ষণ থেকেই ফুর্তি করছে—সকলেই তখন রঙ্গীন নেশায় বিভোর। বন্ধু-পুত্র স্টিফেনকে ঐ অবস্থায় দেখে লিওপোলড্-এর কিন্তু ভাল লাগে না।

সেখান থেকে বেরিয়ে স্টিফেন তার দু'ই বন্ধুর সঙ্গে বস্তি অঞ্চলের পতিতালয়ে যায়। লিওপোলড্ও তাদের অনুসরণ করে। লিওপোলড্-এর কাছে দিনান্তে অবসর যাপনের একমাত্র আশ্রয় সেই পতিতালয়। সেখানে লিওপোলড্ ভাবে তার স্ত্রী'র বিশ্বাসভঙ্গের কথা, মাতাল স্টিফেনের মনে পড়ে তার মুমূর্ষু মা'র স্মৃতি—তাঁর শেষ আকৃতি।

সেই পতিতালয় থেকে স্টিফেন বেরিয়ে আসতে দু'জন গোরা সৈন্যের সঙ্গে তার হাতাহাতি শুরু হয়। সৈন্যরা মাতাল স্টিফেনকে উত্তম-মধ্যম প্রহারে যখন জর্জরিত করছে ঠিক সেই সময় লিওপোলড্ সেখানে হাজির হয়ে তাকে উদ্ধার করে। লিওপোলড্ মধ্যরাত্রে পাঁচিল ডিঙ্গিয়ে স্টিফেনের প্রায় অচৈতন্য দেহটাকে নিজের বাড়ি নিয়ে আসে।

দরজাটা খোলবার জন্য চাবিটি খুঁজতে খুঁজতে লিওপোলড্ স্টিফেনকে বলে,—তুমি এবার ঐ মাতাল ডাক্তারী ছাত্রদের সংসর্গ ছেড়ে আমার সঙ্গে এসে বাস করো।

ঐ প্রস্তাব শুনে স্টিফেনের যেন আত্মসম্মানে ঘা পড়ে। সে রাজী

হয় না। লিওপোলড্ তখন অন্ততঃ রাত্রিটা তার সঙ্গে থাকবার জন্যে স্টিফেনকে অনুরোধ করে। কোন ফল হয় না। স্টিফেন তার আস্তানায় একলা ফিরে যায়।

ঘরে ঢুকে তার নিদ্রিতা, স্খলিতবসনা স্থূলাঙ্গী স্ত্রী'র ওপর নজর পড়াতে ঘৃণায় লিওপোলড্-এর মন ভরে ওঠে। তবুও তাকে ঐ অসতী স্ত্রী'র শয্যার এক পাশে আশ্রয় নিতে হয়।

স্ত্রী মলি টুইড্ তখন অবৈধ প্রেম আর যৌন সংসর্গের স্মৃতি-বিজড়িত সুখস্বপ্নে বিভোর। ক্লান্ত লিওপোলড্ তার পাশে শুয়ে প্রচণ্ড নাক ডাকায়—তবুও মলি টুইড্-এর সুখস্বপ্নের প্রবাহ কিন্তু বন্ধ হয় না।

প্রশান্ত প্রতীচী-প্রান্ত

[জার্মান সাহিত্যিক এরিখ মারিয়া রেমার্ক (E. M. Remarque)-এর 'অল কেয়ায়েট অন্ দি ওয়েস্টার্ন ফ্রন্ট্' (All Quiet on the Western Front), ১৯২৮, গ্রন্থটির কাহিনী।]

জার্মানীতে তখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের দামামা বেজে উঠেছে। অগ্রজদের সঙ্গে দেশের সব কিশোর এবং তরুণরাও দলে দলে সেনা-বাহিনীতে যোগ দেয়। তারাও সীমান্তের দিকে এগিয়ে যায়।

কতই বা তার বয়স ? সবে সে আঠারোতে পা দিয়েছে। সেই পল ব্যুমারও একদিন সেনাবাহিনীতে নাম লিখিয়ে তু' নম্বর কোম্পানীর সঙ্গে এসে হাজির হয় সীমান্তের এক প্রান্তে। সেই বাহিনীর আলবের্ট ক্রোপ্, ভেস্ট্যুস, ম্যুলের, ইয়াডেন, কেমেরিখ, লেএয়ার এবং কাট্সিন্সকি প্রভৃতির অনেকেই স্কুল ছেড়ে এসছে। বয়সে পল-ই সকলের ছোট। কর্পোরাল হিমেলস্টোশ্ তাদের দলপতি।

হিমেলস্টোশ ছিল বদ্‌মেজাজী এবং নিষ্ঠুর। তরুণ সহকর্মীদের নানা ভাবে কষ্ট দিয়ে সে এক বিচিত্র আনন্দ পেত। এজন্য তার বাহিনীর সৈনিকরা তাকে মোটেই পছন্দ করত না। সকলে তাকে ঘৃণার চোখে দেখত। দলপতির ওপর ইয়াডেনের রাগটা আবার একটু বেশী মাত্রায় ছিল।

বয়সে তরুণ হলেও সৈনিকরা ক্রমে জানতে পারে, তাদের দলপতির অবাঞ্ছিত আচরণের বিরুদ্ধে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে নালিশ জানিয়ে বিশেষ কিছু লাভ হবে না। তাই তারা নিজেরাই দলপতিকে উচিত শিক্ষা দেবার জন্য ষড়যন্ত্র করে। তারা সুযোগের

অপেক্ষা করতে থাকে। ক'দিন বাদে এক রাত্রে তাদের সে-সুযোগও মিলে যায়।

সে রাত্রে হিমেলস্টোশ নির্জন পথ দিয়ে একাকী মনের আনন্দে ফিরছিল। পানের মাত্রাটাও তার বোধ হয় একটু বেশী হয়েছিল। ছেলেরা অনুমান ক'রে আগে থেকেই সে-পথে একটি পাথরের ঢিপির আড়ালে লুকিয়ে তার জন্য অপেক্ষা করছিল। সঙ্গে একটি কম্বল।

ঢিপিটি পিছনে ফেলে দু' পা এগুতেই দু'টি ছেলে লাফ দিয়ে পেছন থেকে কম্বলটা দিয়ে হিমেলস্টোশকে মাথা থেকে পা পর্যন্ত ঢেকে দেয়। ব্যস্। এবার সকলে নীরবে পালা করে শুরু করে দেয়। প্রচণ্ড মারের চোটে হিমেলস্টোশ এক একবার ষাঁড়ের মত চিৎকার করে ওঠে আর সঙ্গে সঙ্গে তাকে উপুড় করে তার মুখটা মাটিতে চেপে ধরা হয়। অবশেষে তাকে দাঁড় করিয়ে প্রচণ্ড জোরে এক লাথি মারার ফলে হিমেলস্টোশ হুমড়ি খেয়ে খানার মধ্যে গড়িয়ে পড়ে। ছেলেরা ছুটে পালায়। একটু দূরে এসে সকলে একসঙ্গে অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে। খুশিতে তারা উচ্ছল হয়ে ওঠে।

সীমান্তের কাছাকাছি এসে পল্ যুদ্ধের বিভীষিকা প্রত্যক্ষ করে,—চারিদিকে শুধু বোমা আর গুলির শব্দ। তার কানে ভেসে আসে আহতদের করুণ আর্তনাদ। ট্রেঞ্চের মধ্যে কেউ বা ভয়ে শিশুর মত কান্না জুড়ে দেয়। আবার কেউ বা ভয়ে তার পাতলুন নষ্ট করে লজ্জায় মুখ ঢাকে। বিপদ একটু কমতে সবাই স্বস্তি পায়, তারা একটু চাঙ্গা হয়ে ওঠে। তখন তারা গর্তের ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে গোল হয়ে বসে গল্পগুজব করে। আলোচনা করে, যুদ্ধ শেষে কে কি করবে?

পল কিন্তু এ আলচনাচক্রে ঠিক অংশ গ্রহণ করতে পারে না। কারণ, সে জানে না—সেনাবাহিনীর বাইরে গিয়ে সে কী করতে পারে।

আইনের ভয়ে তরুণ সৈনিকরা দলপতিকে ঠিক অগ্রাহ্য করে না বটে, কিন্তু ফাঁক পেলে তাকে ঠাট্টা বিদ্রূপ করতেও তারা ছাড়ে না।

এই ভাবে তাকে একদিন অপমান করার অপরাধে ইয়াদেন-কে তিন দিন নজরবন্দী রাখার হুকুম হয়। দলপতিও কর্তৃপক্ষের ধমক থেকে রেহাই পায় না। দুষ্টু দলপতিকে অপমান করতে পারার আনন্দে ইয়াদেন কিন্তু তার শাস্তি হাসিমুখেই মেনে নেয়।

দিনের পর মাস গড়িয়ে যায়। একদিন পলের বাহিনী আরও এগিয়ে যায়। তারা এসে হাজির হয় একেবারে ফ্রণ্টে—শত্রুর মুখোমুখি।

ফ্রণ্ট তো নয় যেন একটা বিচিত্র খাঁচাকল। কখন কি ঘটে তারই অপেক্ষায় পলের দল সন্ত্রস্ত হয়ে ট্রেঞ্চের মধ্যে বসে থাকে। চারিদিকে শুধু গোলাবৃষ্টি। গোলা উড়ে এলে তারা উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ে। পল জানে ঐ একটি গোলা যে কোন মুহূর্তে তাদের ট্রেঞ্চটি নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারে। দৈবই তাদের মায়ের মত আড়ালে রাখে এবং ঐ দৈবই তাদের উদাসীন করে রাখে। তাই দুর্ভেদ্য ট্রেঞ্চের মধ্যে থেকেও কেউ গুঁড়িয়ে ধূলো হয়ে যায় কেউবা আবার খোলা মাঠের মধ্যে দশ ঘণ্টা গোলাবর্ষণের মধ্যে থাকা সত্ত্বেও তার গায়ে একটিও আঁচড় লাগে না।

আগুনের বেড়া-জাল ডিঙ্গিয়ে মাছিরও এখানে পৌঁছান সম্ভব নয়। তাই মাঝে মাঝে পলদের খাবারও পৌঁছয় না। তখন তারা কোমর-বন্ধটি আরও এঁটে দিয়ে পেটের অসহ্য ক্ষিদেকে শাসন করে।

পল এবং তার বন্ধুরা অবাক হয়ে দেখে,—কারুর মাথার খুলি হয়তো উড়ে যায়, কিন্তু কী আশ্চর্য, তবুও লোকটা বেঁচে থাকে। তারা দেখে, কোন লোকের দুটো পা-ই হয়তো উড়ে গেছে তবুও সে দৌড়োচ্ছে ; কেউ বা থেঁৎলানো হাঁটু টানতে টানতে এক হাতে ভর করে দেড় মাইল পথ হেঁচড়ে যাচ্ছে। ঝুলে-পড়া নাড়িভুঁড়ি দু'হাতে চেপে ধরে কোন লোককে হাসপাতাল পর্যন্ত হেঁটে যেতে দেখেও শেষে তারা আর অবাক হয় না।

সেখানেও সূর্য অস্ত যায়, রাত্রিও নেমে আসে। তরুণ সৈনিকদের মনে হয় সেইসঙ্গে যেন তাদের জীবন-দীপটিও নিভে যায়।

শত্রুপক্ষের গোলাবৃষ্টির বিরাম নেই। সেই গোলার আঘাতে পলদের ট্রেঞ্চগুলি বিধ্বস্ত হয়ে যায়। চারিদিক থেকে আহতদের করুণ আর্তনাদ ধ্বনিত হয়। আর্তনাদ নয়তো যেন মৃত সৈনিকদের আত্মার করুণ বিলাপ। একজন সৈনিক তো ভয় পেয়ে পাগলই হয়ে যায়।

এক সময় শত্রুর এ মারাত্মক আক্রমণের তীব্রতা কমে যেতে রাতের অন্ধকারে পল-দের বাহিনী পিছিয়ে আসে। ভোরের আলোতে দেখা যায়, বাহিনীর দেড়শত সৈনিকের মধ্যে মাত্র বত্রিশ জন কোনপ্রকারে টিকে আছে।

বিধ্বস্ত বাহিনীটিকে এবার একটু বিশ্রাম দেওয়া হয়। সেই সঙ্গে একটু আনন্দ করবারও সুযোগ পায় তারা ক'দিনের জন্য। ক্ষণিকের জন্য তারা ভুলে যায় যুদ্ধের বিভীষিকা। রাত্রের অন্ধকারেই তারা ফিরে আসে তাদের ক্যাম্পে।

পলের বরাত ভালো। সে চোদ্দ দিনের ছুটি পায়। সঙ্গে সঙ্গে সে ছুটে যায় বাড়ির দিকে—রুগ্না মা আর ছোট্ট বোনের কাছে। তাকে ফিরে পেয়ে মা বোনের সে কি আনন্দ! পল দেখল, নিজেদের ঐটুকু বরাদ্দ খাবার থেকে মা তার পছন্দ মত খাবার জমিয়ে রেখে দিয়েছেন। মায়ের মুখের দিকে তাকাতে পলের চোখে জল নেমে আসে।

গাঁয়ের লোকদের সঙ্গে পল কিন্তু ভালভাবে মিশতে পারে না। তারা জানতে চায়, এ যুদ্ধ কবে শেষ হবে, কারা জিতবে; আরও কত রকমের প্রশ্ন। এসব প্রশ্নের উত্তর পলের জানা নেই।

শুধু কি তাই? ছুটিতে এসেও সামরিক-জীবনের নিয়ম-শৃঙ্খলা থেকে পল নিষ্কৃতি পায় না। রাস্তায় একদিন এজন্য এক অফিসারের হাতে তাকে বিশ্রীভাবে লাঞ্ছিত হতে হয়।

ক্রমে পলের ছুটির মেয়াদ ফুরিয়ে আসে। কিন্তু মা বাবার দিকে তাকিয়ে তাঁদের ছেড়ে যেতে পলের মন সরে না। এক ফাঁকে বোন

আবার মা-র দুরারোগ্য ক্যান্সার রোগটির কথা পলকে জানিয়ে দেয়। তবুও পলকে নির্ধারিত সময়ে ক্যাম্পে ফিরতে হয়।

ফিরে এসে পলকে সামরিক বিদ্যা অনুশীলন করতে চার সপ্তাহের জন্য অন্যত্র যেতে হয়। শিক্ষা শেষে বোনকে নিয়ে বাবা তাকে দেখতে আসেন সেখানে। যাবার আগে বোন জানায়, মাকে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। শুনে পলের মন ব্যথায় ভরে ওঠে।

নিজের বাহিনীতে ফিরে এসে পল জানলো, ইতিমধ্যে আরও একজন বন্ধু গত হয়েছে। এবার সে আস্তে আস্তে বোনের দেওয়া খাবারের পুঁটলি খুলতে বসে। সে খাবার অতি সামান্য— উল্লেখযোগ্য কিছু নয়। সকলে তা ভাগ করে খেলো। খাবার খেয়ে তাদের সে কী আনন্দ!

ক'দিন বাদে শত্রুপক্ষের আক্রমণ আবার শুরু হ'তে পলের বাহিনীকে সীমান্তে যেতে হয়। সেখানে এক সময় পল দেখে ট্রেঞ্চের মধ্যে সে একা—দলের অন্য লোকেরা কে কোথায় আছে সে জানে না। হঠাৎ একটা অকারণ ভয় তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। সেখানে পল অসহায় ভাবে মাটি আঁকড়ে পড়ে থাকে। তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যেন মাটির সঙ্গে জুড়ে যায়। চেষ্টা করেও সে নড়তে পারে না।

আচ্ছন্নভাব কাটাতে সেখান থেকে হামাগুড়ি দিয়ে পল বেরিয়ে আসতেই শত্রুর মেসিন-গানের সামনে পড়ে যায়। চট্ করে সে পাশের একটি গর্তে আশ্রয় নেয়। সঙ্গে সঙ্গে একজন শত্রুসৈন্য তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। আত্মরক্ষার জন্য মরিয়া হয়ে পল শত্রুর বুকে ছোরা বসিয়ে দেয়।

সময় কেটে যায়। পলের মনে হয়, বুঝি এ যুগ আর কাটবে না। হঠাৎ একটা চাপা গোঙানির শব্দে পলের চমক ভাঙে। সে দেখতে পায়, আহত সৈনিকটি ধুঁকছে—তার প্রাণটা যাই-যাই করছে। লোকটির মর্মান্তিক অবস্থা দেখে পলের মন ব্যথায় ভরে ওঠে। সে ভাবে—এর পোষাকটা খুলে ফেললে এও তো তার বন্ধু

কাট্ এবং আলবের্টের মতই একজন। তখন সে সব কিছু ভুলে লেগে যায় আর্তের সেবায়। কিন্তু কোন ফল হয় না। পলের মনে অনুশোচনার আগুন জ্বালিয়ে দিয়ে একসময় লোকটি মারা যায়।

আবার সেই স্তব্ধতা পলকে গ্রাস করে। ঠিক সেই সময় একটি অস্ফুট পরিচিত কণ্ঠস্বর শুনে পল চকিত হয়ে ওঠে। তার দেহে প্রাণের স্পন্দন জাগে। ক্রমে সে শব্দটি তার কাছে হয়ে ওঠে,—প্রাণের চেয়ে, মাতৃস্নেহের চেয়েও বড়ো। এ যে তার সঙ্গীদের সাড়া।

তখন মাঠের ওপর দিয়ে যেন একটা ইস্পাতের অফুরন্ত জ্বলন্ত জাল বোনা হচ্ছিল। কাঁকড়ার মত বুকে হেঁটে পল বেরিয়ে এসে মুলার এবং কাটের দেখা পায়। তারা পলকে কিছু খাবার দেয়, দেয় সান্ত্বনা। বলে, পল, যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুসৈন্যকে মারা অপরাধ নয়, তা সৈনিকের ধর্ম।

কিছুদিন পরের ঘটনা। একটা গাঁ পাহারা দেবার জন্য পল, কাট্, মুলার, আলবের্ট এবং ইয়াদেন-কে পাঠানো হয় সেখানে। তিন সপ্তাহ কেটে যায়। হঠাৎ একদিন পল এবং আলবের্ট দু'জনে পায়ে গুলিবিদ্ধ হয়। দু'জনেই আঘাত পায়, পায় অসহ্য যন্ত্রণা। তবুও তারা ছুটে নিরাপদ জায়গায় পৌঁছায়, সেখান থেকে অনেক কষ্টে হাসপাতালে হাজির হয়।

হাসপাতালের পরিবেশ অতি জঘন্য। একটা হাসপাতাল দেখেই বোঝা যায় যুদ্ধ জিনিসটা কি। ওখানে ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীকে কিছু ঘুষ দিয়ে পল এবং আলবের্ট পাশাপাশি থাকার সুযোগ পায়।

ক্রমে পলের পায়ের ক্ষত ভাল হয়ে ওঠে। কিন্তু আলবের্টের পা'টি কেটে বাদ দিতে হয়। ক'দিন বাদে পল ক্রাচেস্-এ ভর দিয়ে হাঁটবার চেষ্টা করে, তখন আলবের্ট করুণভাবে তার দিকে তাকিয়ে থাকে। আলবের্টের সে-দৃষ্টি কিন্তু পলের ভাল লাগে না—সে দূরে সরে যায়।

হাসপাতাল থেকে ছুটি পেয়ে পল বাড়ি আসে। তখন তার মা

ছিলেন হাসপাতালে। বাড়িতে পলের মন টেকে না। ছুটি ফুরোবার আগেই পল আবার ছুটে যায় রণাঙ্গনে—সঙ্গীদের সাহচর্যে।

ছুটি থেকে ফিরে আসবার ক'দিন বাদে পল বন্ধু মুলের-কে হারায়। মারা যাবার আগে মুলের তার পকেট-বইটা পলের হাতে দেয়, আর তুলে দেয় কেমেরিখ-এর কাছ থেকে পাওয়া সুন্দর বুটজুতো জোড়া। সে জুতোর ওপর ইয়াদেনের লোলুপ দৃষ্টি পলের নজর এড়ায় না। ইয়াদেনকে পল কথা দেয়,—ক'দিন অপেক্ষা কর, যাবার আগে এ জুতো আমি তোমাকেই দিয়ে যাবো, বন্ধু।

বছর ঘুরে যায়। যুদ্ধ তবুও গড়িয়ে চলে। এ কাল যুদ্ধের বুঝি শেষ নেই। ক্রমে সৈনিকরা হতাশায় ভেঙ্গে পড়ে। তবুও তাদের লড়তে হয়। লড়া ছাড়া উপায় কি, যতদিন না মৃত্যু হয়!

জার্মান সৈন্যেরা তখন অনাহারে-অর্ধাহারে ধুঁকছে। তাদের কামানগুলো সব অকেজো হয়ে গেছে, গোলা ফুরিয়ে এসেছে, রাইফেল-গুলো যেন দেশলাইর কাঠি; সৈন্যদের বেশির ভাগই বালক মাত্র—তারা কেবল মরতেই পারে। তারা মেনে নিয়েছে, হয় গুলি খেয়ে মর, নয় হাসপাতালে যাও—সেখানে হাত পা কেটে বাদ দিয়েও যদি বাড়ি ফিরতে পার তো বুঝবে তোমার বরাত ভালো, নইলে সীমান্তে গিয়ে মৃত্যুবরণ কর।

তাদের চারিদিকে শুধু গোলা, বিষাক্ত গ্যাস, উপবাস, মৃত্যু; কালব্যাধি টাইফাস, আমাশা, জ্বর-বিকার, হাসপাতাল, মৃতের স্তূপ—এ ছাড়া তুনিয়াতে আর কি থাকতে পারে জার্মান সৈন্যরা ভাবতে পারে না।

একদিন শত্রুদের আক্রমণের ফলে তাদের সেনাপতির রক্তাক্ত দেহ মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। তবুও তাদের লড়তে হয়। যুদ্ধ চলে অবিরাম গতিতে।

বছর গড়িয়ে যায়। ১৯১৮ সালের গ্রীষ্মকাল। চারিদিকে নর-শোণিতের প্রবাহ। জার্মানরা মর্মান্তিক ভাবে হেরে চলে। শান্তি

ও সন্ধির একটা চাপা গুঞ্জন ওঠে। তখনও সামনে এগিয়ে যেতে তাদের ওপর হুকুম হয়। পলের সঙ্গীরা অসহায় ভাবে শুধু ভাবে,—কেন? কেন এ অর্থহীন যুদ্ধ শেষ হয় না?

পুরনো সঙ্গীদের মধ্যে তখন টিকে আছে—কাট্ আর পল্।

একদিন খাবার আনতে গিয়ে কাট্ পায়ে গুলিবিদ্ধ হয়ে পড়ে যায়। পল তার ক্ষত বেঁধে দিয়ে তাকে পিঠে তুলে প্রাণপণে হাস-পাতালের দিকে ছোটে। বহনের পরিশ্রমে পলের প্রাণটা বুঝি বেরিয়ে যায়। পথে একটা নিরাপদ ট্রেঞ্চ পেয়ে ওরা বিশ্রামের জন্য নামে। একটা সিগারেট টানতে টানতে পল বলে,— সেই হাঁস চুরির *কথা মনে পড়ে কাট্? তিন বছর হয়ে গেল, না?*

কাট্ জবাব দেয় না, শুধু ঘাড়টা একটু নড়ে।

হঠাৎ কাটের গলার অদ্ভুত ঘড় ঘড় শব্দ তার কানে আসতে পল লাফিয়ে উঠে হাসপাতালের দিকে ছোটে।

পল হাসপাতালে পা দিতেই একজন আর্দালি দাঁত বার করে তাকে বলে,—এত কষ্ট করে ওকে বয়ে আনবার দরকার ছিল না। শ্রান্ত পল ওর উক্তির তাৎপর্য বুঝতে পারে না। কাট্‌কে সে সন্তর্পণে মাটিতে শুইয়ে দেয়। কাট্ স্থির হয়ে শুয়ে থাকে। এবার তার ঘাড়ে হাত বুলোতে গিয়ে পল বুঝতে পারে, পথে তার অজান্তে কখন একটুকরো গোলার কুচি কাটের ঘাড়ে লেগেছিল। বিভ্রান্ত পল আর্দালির সাহায্য প্রার্থনা করে।

নির্লিপ্ত ভাবে আর্দালি পলকে জানায় তার বন্ধু মারা গেছে। তার উক্তি পলের বিশ্বাস হয় না। সে স্থির অপলক দৃষ্টিতে কাটের দিকে তাকিয়ে থাকে।

একে একে সঙ্গীরা সকলেই গত হয়েছে। কি করে এক পলই টিকে আছে। এক সময় বিষাক্ত গ্যাস টেনে নেওয়ার ফলে পল চোদ্দ দিনের বিশ্রাম পায়।

হাসপাতালে একাকী থেকে থেকে পল ক্রমে চিন্তাশীল হয়ে

ওঠে। সে ভাবে, লক্ষ লক্ষ নিরপরাধ সৈনিকের জীবন নাশে জগৎ-এর মঙ্গল কেমন করে সম্ভব?—শান্তি হয়ত একদিন ফিরে আসবে কিন্তু সৈনিক জীবনের এই দুঃখ দুর্দশার কথা তখন কে মনে রাখবে? কে দেবে তার মূল্য?

১৯১৮ সালের অক্টোবর মাস। সেদিন গোটা সীমান্ত স্তব্ধ, শান্ত। ঐ দিনকার যুদ্ধের রিপোর্টে লেখা হয়েছে,—'ইম হেবসটেন নিখট্‌স্ নয়েস' অর্থাৎ পশ্চিম সীমান্ত শান্ত।

পল তখনও সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ওঠে নি। হাসপাতালে বসে বসে সে স্মৃতির জাল বুনছিল। একসঙ্গে অনেকগুলো দুঃস্বপ্ন তার মনে ভিড় করে আসছিল। সে-স্মৃতি ভোলবার জন্য সামনের বাগানের দিকে পল সবে পা বাড়িয়েছে,—কোথা থেকে হঠাৎ একটা গুলি উড়ে এসে তাকে বিদ্ধ করে। পলের নিস্পন্দ দেহটা উল্টে দেখা গেল তার মুখে ফুটে উঠেছে অপূর্ব প্রশান্তির ব্যঞ্জনা।

শেষ পরিণতি

[ইংরেজী সাহিত্যের নিপুণ শিল্পী গ্রাহাম গ্রীন (Graham Greene)-এর 'দি হার্ট অফ দি ম্যাটার' (The Heart of the Matter), ১৯৪৮, উপন্যাসটির গল্পরূপ।]

মেজর স্কবি সেখানের কোন এক জেলার পুলিশ সুপার। ঐ পদে পনেরো বছর ধরে তিনি সুনামের সঙ্গে কাজ করছেন। এই সুনামের মূলে রয়েছে তাঁর সততা এবং দক্ষতা।

যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও জেলা শাসকের পদে তিনি কিন্তু নির্বাচিত হলেন না। জানা গেল, ঐ পদটিতে একজন নতুন লোক আসছেন। বয়সে এবং অভিজ্ঞতায় তিনি স্কবি-র চেয়ে তরুণ।

খবরটা শুনে পুলিশ সুপারের মনটা খুব দমে যায়। তাঁর মনে হল, বৃথাই তিনি এতদিন খেটে মরেছেন। জীবনটা তাঁর এখন একটা বোঝা বলে মনে হয়।

শ্রীমতী স্কবি যেন স্বামীর চেয়ে বেশী হতাশ হলেন।

এই বিদেশ বিভূঁয়ে শ্রীমতী স্কবি-র জীবন কাটত সঙ্গীহীন। স্থানীয় কোন ইংরেজ পরিবারের সঙ্গে তাঁর হৃদ্যতা ছিল না। তার ওপর তাঁদের একমাত্র সন্তানের মৃত্যুশোক তিনি আজও ভুলতে পারেন নি। স্বামীর পদোন্নতি হলে হয়ত বা তিনি মনের ঐ দুঃখ ভোলবার একটা সুযোগ পেতেন—কিছুটা শান্তি পেতেন।

ভদ্র মহিলার কবিতা পড়ার বাতিক ছিল। তাঁর সাহিত্য-প্রীতি ছিল অস্বাভাবিক। কে জানে, হয়ত তাঁর সমাজের মহিলারা তাঁকে বিশেষ করে এ কারণেই পছন্দ করতেন না। সে যাই হোক্। এমন একজন অদ্ভুত চরিত্রের মহিলার সঙ্গে মেজর স্কবি-র ঘর করতে

হচ্ছে মনে করে তাঁরা সকলে দুঃখিত। সত্যি কথা বলতে কি, এই স্কবি-দম্পতির পারিবারিক জীবন খুব সুখেরও ছিল না।

ক'দিন বাদে শ্রীমতী স্কবি স্বামীর কাছে বায়না ধরলেন,—কেপ কলোনী'তে তিনি কিছুদিনের জন্য বেড়াতে যাবেন।

—সর্বনাশ! সে পথে যে শত্রুসৈন্যেরা উন্মুখ হয়ে বসে আছে। তাদের নজর এড়িয়ে কেপ কলোনীতে নিরাপদে পোঁছনো সহজ কথা নয়।

তাছাড়া, সেখানে যেতে হলে যথেষ্ট টাকারও প্রয়োজন। আপাততঃ স্কবির হাতে অত টাকা নেই। এই তো কিছুদিন আগে স্ত্রী কোথা থেকে ঘুরে এলেন। সে যাত্রার টাকাও তাঁকে ধার করে সংগ্রহ করতে হয়েছিল। ঐ ঋণ স্কবি এখনও শোধ করে উঠতে পারেন নি।

কিন্তু শ্রীমতী নাছোড়বান্দা।

খামখেয়ালী স্ত্রীর ইচ্ছার কাছে স্কবি নিজেকে অসহায় মনে করেন। যে করে হোক্ তাঁকে টাকা যোগাড় করতে হবে।

ব্যাঙ্ক থেকে ধার পেলেন না স্কবি। অগত্যা এবার তিনি ইউসেফের কাছে এসে হাত পাতলেন। ইউসেফ ব্যবসায়ী লোক। সে শতকরা চার টাকা সুদে স্কবিকে টাকা ধার দিতে রাজী হল।

কিন্তু মুস্কিল হল, এখান থেকে স্কবি টাকা নিলে সরকারী মহলে এ নিয়ে বিশেষ বিরুদ্ধ সমালোচনা হবে। সকলেই জানত—এ শ্রেণীর ব্যবসায়ীর ব্যবসা মানে বে-আইনী নানা রকম চোরা কারবারের কারসাজী।

স্কবি অবশ্য এ কথাও জানতেন, এই বণিক সম্প্রদায় তাঁর সততার জন্য তাঁকে বিশেষ সুনজরে দেখে না। বাগে পেলে তাদের কেউ তাঁকে ছাড়বে না। তাই এদের কারুর কাছ থেকে টাকা নেওয়া অর্থ তার ফাঁদে পা বাড়ানো।

তবুও স্ত্রীর তাগিদে এ হেন ইউসেফের কাছ থেকেই শেষ পর্যন্ত স্কবিকে টাকা নিতে হল।

এদিকে আর এক নতুন সমস্যা দেখা দিল—

সম্প্রতি উলসন্ নামে এক ভদ্রলোক এসেছেন এ শহরে। নিজেকে তিনি স্থানীয় কোন ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের কেরানী বলে পরিচয় দেন।

কিন্তু স্কবি জানেন,—সেখানকার হীরা, মুক্তোর চোরা কারবারের উপর নজর রাখবার জন্য সরকার লোকটিকে গোয়েন্দা করে এখানে পাঠিয়েছে।

শুধু কি তাই ?—লোকটি এ ক'দিনের মধ্যেই তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে বড্ড বেশী ঘনিষ্ঠ ভাবে মেলামেশা করছে। স্কবি তাদের এ মেলামেশায় সন্দিগ্ধ হয়ে ওঠেন। তাঁর পারিবারিক শান্তি ক্ষুণ্ণ হয়।

ক'দিন হল শ্রীমতী স্কবি কেপ-কলোনীতে চলে গেছেন।

ইতিমধ্যে ঘটনাচক্রে স্কবি কেমন যেন হতোদ্যম হয়েছেন। সুযোগ বুঝে ইউসেফ এখন তাঁর সঙ্গে অন্তরঙ্গ হবার চেষ্টা করছে। এমন সময় চোরা কারবারী মহলে স্কবির মেলামেশা নিয়ে নানা কথা শোনা যায়। ইউসেফের কাছ থেকে তাঁর টাকা ধার নেওয়ার কথাও এখন আর কারুর অজানা নেই।

এই সময় একদিন খবর এল—সীমান্তে একটি যাত্রীবাহী ব্রিটিশ জাহাজ বিধ্বস্ত হয়ে পড়ে আছে। সেখান থেকে যাত্রীদের উদ্ধার করা প্রয়োজন। খবর পেয়ে দলবল নিয়ে স্কবি ঘটনাস্থলে গিয়ে হাজির হলেন।

দুর্গত যাত্রীদের সঙ্গে নব-বিবাহিত একজন তরুণীকেও স্কবি উদ্ধার করলেন। জানা গেল, তরুণীটির স্বামী সম্প্রতি মারা গেছেন। তিনি এখন ইংল্যাণ্ডে ফিরে যাবার জন্য উৎসুক।

স্কবির সাহায্যে শ্রীমতী রোল্ট লাইফবোটে উঠে এলেন।

এই দুঃখী মহিলাটির জন্য স্কবির কেমন মায়া হয়। স্কবি তাঁর প্রতি সহানুভূতিশীল হলেন। ক্রমে তাঁরা পরস্পর পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হন। কিন্তু বাহ্যিক ব্যবহারে উভয়েই থাকেন সতর্ক। কেউ কোন দুর্বলতা প্রকাশ পেতে দিলেন না। শ্রীমতী রোল্ট শহরে এসে আশ্রয় নিলেন কোন এক হোটেলে, স্কবি মাঝে মাঝে দেখতে যান তাঁকে। দিন যায়—

একদিন শ্রীমতী রোল্ট স্কবির পৌরুষের প্রতি কটাক্ষ করলেন। উৎসাহ পেয়ে স্কবি বাড়ি ফিরে চিঠির মাধ্যমে তাঁর গোপন প্রেম শ্রীমতীকে নিবেদন করলেন। দুঃখের বিষয় সে চিঠিটা তাঁর প্রেমিকার হাতে পৌঁছাল না, কেমন করে মাঝপথে সেটি দুষ্ট ইউসেফের হস্তগত হল। চিঠিটা উদ্ধার করবার জন্য স্কবি ইউসেফকে শুধু নগদে ঘুষই দিলেন না, তার হীরার চোরাকারবারে প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য করবেন বলেও তিনি তার কাছে প্রতিশ্রুত হলেন ; ফলে, ইউসেফের চোরা কারবার অল্পদিনেই স্ফীত হয়ে ওঠে।

গোয়েন্দা উইলসন এ ঘটনা কিছু কিছু টের পেলেন বটে, কিন্তু স্কবির বিরুদ্ধে সঠিক কিছু প্রমাণ পেলেন না।

ততদিনে শ্রীমতী রোল্ট অধৈর্য হয়ে উঠেছেন। তিনি আর অপেক্ষা করতে রাজী নন। স্কবিকে তিনি একদিন সরাসরি অনুরোধ করলেন,—তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে সব সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়ে তাঁদের বিয়েটা তাড়াতাড়ি সেরে ফেলবার জন্য।

স্কবির প্রেমিক হৃদয় এ প্রস্তাবে খুসী হয় বটে, কিন্তু তাঁর রোম্যান ক্যাথলিক মন তা সমর্থন করে না। অথচ শ্রীমতী রোল্টের সঙ্গে মধুর সম্পর্ক ছিন্ন করার কথাও তিনি ভাবতে পারেন না। সে প্রশ্ন অবান্তর। সে যেন তাঁর আত্মার আত্মীয়! তাই কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে দ্বিধা-জড়িত কণ্ঠে স্কবি প্রণয়িণীকে তাঁর অসহায় অবস্থার কথা বোঝাবার চেষ্টা করেন।

ঠিক এই সময় স্কবি স্ত্রীর চিঠিতে জানতে পারেন,—দু-এক দিনের

ভেতর তিনি কেপ কলোনী থেকে ফিরে আসছেন। সমস্যা আরও
...ল হয়। বিমূঢ় স্কবি কোন সিদ্ধান্ত খুঁজে পান না।

...বি-পত্নী ফিরে এসে স্বামীর হাবভাব দেখে সন্দিগ্ধ হয়ে ওঠেন।
স্বামী... ...তি করেন,—তাঁর সঙ্গে গির্জায় গিয়ে প্রার্থনা করে চিত্ত-
শুদ্ধি করবা...

স্কবি শ্রীম... ...রোল্টের সঙ্গে তাঁর নিগূঢ় সম্পর্ক অস্বীকার
করতে পারেন না। সম্পর্ক ছিন্ন করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব, তাই
তিনি পারেন না গির্জায় ... মিথ্যা প্রার্থনার ভান করতে। তিনি
এ মুক্তি চান না। তিনি মনে ... গির্জায় যাওয়ার চেয়ে স্ত্রীকে
সবকিছু খুলে বলা বরং শ্রেয়।

একদিকে অপরাধী মনের তীব্র অনু... ...না, তার সঙ্গে চাকুরীর
ঐ অস্বস্তিকর পরিস্থিতি, ইউসেফ জড়িত জটি... ...স্যা, এবং সবশেষে
স্বকীয়া ও পরকীয়াকে কেন্দ্র করে অন্তর্দ্বন্দ্ব,—সবকি... ...লিয়ে স্কবির
মনে তখন বিক্ষোভের ঝড় বইছিল। একসময় তিনি গি... প্রতিও
আস্থা হারিয়ে ফেললেন। শান্তির জন্য গির্জায় যাওয়া তিনি ...ন
মনে করেন।

না, এই জীবন অসহ্য! জগৎ থেকে এ অর্থহীন জীবন মুছে ফেলবার জন্য তিনি ব্যগ্র হয়ে উঠলেন। তিনি ভেবে দেখলেন, একমাত্র মৃত্যুই তাঁকে এনে দিতে পারে মুক্তি, শান্তি!

স্কবি প্রকাশ্যে জানালেন, তিনি হৃদ্‌রোগে ভুগছেন, ডাক্তারও তাঁর সব উপসর্গের কথা দেখে শুনে সে চিকিৎসা-ই আরম্ভ করলেন। কিন্তু ক্রমেই রোগের প্রকোপ বেড়ে চলল।

এমন সময় স্কবি একদিন শুনলেন, কর্তৃপক্ষের পুনর্বিবেচনায় জেলা শাসকের পদে তিনি মনোনীত হয়েছিলেন বটে, কিন্তু তাঁর বর্তমান শারীরিক অসুস্থতার জন্য তাঁকে এই নতুন দায়িত্ব দেওয়া যাচ্ছে না। নিয়তির কি নিষ্ঠুর পরিহাস!

কিন্তু স্কবি এ খবর শুনে বিচলিত হলেন না। জীবনের ওপর

এখন তাঁর কোন মোহ নেই। নীরবে তিনি মৃত্যুর প্রতীক্ষা করতে থাকেন।

মৃত্যুর পর কারুর মনে কিছুমাত্র সন্দেহ উঁকি না দেয়, সেজন্য স্কবি ইতিমধ্যে তাঁর ডায়েরীতে রোগের বিষয় বিশদভাবে লিখে ফেলেছেন। স্ত্রীর জন্যেও বিশেষ ভাববার নেই, দেশে ফিরে তাঁর জীবন বীমার টাকায় সচ্ছল ভাবেই স্ত্রীর দিন চলে যাবে।

—না, তিনি আর পারছেন না। এ জীবন সত্যই অসহ্য!

সন্ধ্যা হয়ে এলো। এবার আর একবার ওষুধ খেতে হবে তাঁকে। ওষুধের শিশিটা তাঁর হাতের কাছেই ছিল। নিজ হাতেই সেদিন তিনি ঢেলে নিলেন। স্খলিত হাতে ঢালতে গিয়ে মাত্রাটা যেন একটু বেশীই পড়ে গেল। তা হোক্—

—আঃ, আজ বড্ড ঘুম পাচ্ছে। কি আরাম! কি শান্তি!

* * *

সে ঘুম স্কবির আর ভাঙ্গল না। সকলে জানলো—তিনি হৃদ্‌রোগে মারা গেছেন।

শ্রীমতী স্কবির কিন্তু গোড়া থেকেই মনে কেমন সন্দেহ হয়েছিল। তিনি এবার গির্জার পুরোহিতকে তাঁর স্বামীর জন্য প্রায়শ্চিত্ত করবার অনুরোধ করেন। পুরোহিত স্কবির পাপ-পুণ্যের সব খবরই রাখতেন।

...ীর কথা শুনে একটু চুপ করে থেকে পুরোহিত বললেন—“স্কবিকে ... অথবা পতিত কে বলতে পারে? আর ঈশ্বরের অপার মহিমার ...ই বা কে অস্বীকার করতে পারে?”

এই বলে পুরো... স্কবির আত্মার শান্তির জন্য পবিত্র মন্ত্র উচ্চারণ করলেন।

রোমের নাগরিকা

[ফরাসী লেখক আলবার্তো মোরাভিয়া (Alberto Moravia)-র 'দি উয়োম্যান অভ্ রোম' (The Woman of Rome), ১৯৪৭, উপন্যাসটির গল্প।]

রোম নগর। ফ্যাসিস্ত রাজত্বের যুগ।

শহরের এক প্রান্তে কোন একটি সাধারণ বস্তিতে বাস করে আদ্রিয়ানা আর তার বিধবা মা। ঘরে বসে সেলাই করে দুঃখিনী মা সামান্য যা মজুরি পায় তাই দিয়ে যা হোক করে মা-মেয়ে দিন কাটায়।

ক্রমে মেয়ে বড় হয়। ওদের খরচও বাড়ে। সেলাইয়ের সামান্য আয়ে এখন আর তাদের সংসার চলতে চায় না। এই সময় আদ্রিয়ানা জানলো সে তার মায়ের অবাঞ্ছিত সন্তান।

আদ্রিয়ানার বয়স ষোল হল। তার তনু হয় পূর্ণ বিকশিত—প্রতিটি অঙ্গ সুপরিপুষ্ট। অপরূপ রূপ তার। যেন, মধ্য যুগের রোমের কোন দেবী আদ্রিয়ানার দেহে রূপান্তরিত হয়েছেন।

একদিন মেয়ের রূপযৌবনের মধ্যেই মা তার জীবনের চলার পথের অমূল্য পাথেয় আবিষ্কার করে। মা তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলে। সে ভাবে, নাই থাক্ তার সঞ্চিত অর্থ বা কোন মূলধন—এই মেয়েই আনবে তার সংসারে সচ্ছলতা, দেবে সুখ,—দূর হবে তার সকল অভাব, সব দুঃখের গ্লানি।

ক্রমে সেলাইয়ের সামান্য আয়ের জীবনের প্রতি মা ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। সে-রোজগারের অন্নে এখন আর তার ক্ষুন্নিবারণ হয় না। সে-জীবন তার কাছে হয়ে ওঠে অসহ্য। মা আজকাল বিলাসমণ্ডিত জীবনের স্বপ্ন দেখে, কখনও বা সে রঙিন কল্পনার জাল বোনে।

মেয়ের রূপে মা গরবিণী। কিন্তু সে জানে, ভদ্র সমাজে শুধু রূপের কদর হয় না, সঙ্গে চাই সামাজিক মর্যাদা। সে গৌরব থেকে সে বঞ্চিত। তাই ভাল ঘরে মেয়ের বিয়ের আশা করা বিড়ম্বনা মাত্র।

মা ভাবে, তার চেয়ে বরং ভালভাবে বাঁচবার পথ খুঁজে বার করতে হবে। সে পথের ইঙ্গিত মুহূর্তে তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে : মেয়ের রূপ বিক্রি! সে জগতে আদ্রিয়ানাকে বেশী প্রতিদ্বন্দ্বীর সম্মুখীন হতে হবে না। মায়ের বিশ্বাস, সেখানে তার মেয়ে হবে অনন্যা। সমাজের বড় বড় লোক আদ্রিয়ানার কৃপাপ্রার্থী হয়ে ভীড় জমাবে ; অর্থ আসবে প্রচুর। মা মেয়ে থাকবে সুখে।

একদিন মেয়েকে নিয়ে মা গেল কোন একটি স্টুডিয়োতে। আদ্রিয়ানা আর্টিস্টের মডেল হবে। বিনা সঙ্কোচে আদ্রিয়ানা সেখানে বিবসনা হয়। শিল্পী তার দৃষ্টি দিয়ে আদ্রিয়ানার প্রতিটি অঙ্গ খুঁটিয়ে দেখে। আদ্রিয়ানার রূপ-যৌবনের রেখা দেখে শিল্পী মুগ্ধ হয়। সে খুশি মনে আদ্রিয়ানাকে মডেল হিসেবে গ্রহণ করে। আশাতীত অগ্রিম দক্ষিণা হাতে নিয়ে মা বাড়ি ফিরে আসে।

দিন যায়। আদ্রিয়ানা কিন্তু ভবিষ্যৎ জীবনের ভিন্ন ছবি দেখে। সে স্বপ্ন দেখে—তার বিয়ে হবে। স্বামী সন্তান নিয়ে সে সুখের ঘর বাঁধতে চায়।

ক'দিন বাদে স্টুডিয়োতে যাবার পথে একদিন আদ্রিয়ানার পরিচয় হল এক ধনীর মোটর-ড্রাইভার গিনোর সঙ্গে। গিনো নীচু সমাজের লোক, তার আয় সামান্য। দেখতেও সে আকর্ষণীয় নয়। তা হোক্। গিনো বলিষ্ঠ পুরুষ। সে আদ্রিয়ানাকে বিয়ে করবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। গিনো আদ্রিয়ানার স্বপ্ন সমর্থন করেছে।

গিনোর মত একটা নীচু স্তরের লোকের সঙ্গে মেয়ের এ মেলামেশা মা সমর্থন করে না। মা মেয়েকে নিষেধ করে। কোন ফল হয় না। ক্রমে মা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। এ জন্য সে মেয়েকে প্রকাশ্যে ধিক্কার দিতেও দ্বিধা করে না, তবুও মেয়ে তার সংকল্পে অবিচল থাকে।

চতুর মা মেয়েকে একদিন উপদেশ দেয়, দরিদ্রকে বিয়ে করে জীবন নষ্ট করা বোকামি। তার চেয়ে রূপসী আদ্রিয়ানার পক্ষে রূপোপজীবিনীর ঐশ্বর্য ভোগ করা অনেক বেশী শ্রেয়।

নিরন্তর মায়ের এই প্ররোচনায় মেয়ের সরল মন ক্রমে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে ওঠে। মাঝে মাঝে গিনোর স্মৃতি আদ্রিয়ানার মনকে পীড়া দেয়। তার আশ্বাস আদ্রিয়ানা ভুলতে পারে না। সুযোগ পেলেই মার নজর এড়িয়ে সে গিনোর কাছে চলে যায়। কখনও বা গাড়িতে চেপে দু'জন চলে যায় অনেক দূরে—কোন নির্জন জায়গায়।

সেদিন সন্ধ্যায় গিনো তার মালিকের শূন্য বাড়িতে আদ্রিয়ানাকে নিমন্ত্রণ জানাল। আদ্রিয়ানা যেন এ সুযোগেরই অপেক্ষায় ছিল। খুশি মনে সে এ নিমন্ত্রণ গ্রহণ করে। গিনোর সুখ-শয্যায় প্রায় রাত কাটিয়ে সে বাড়ি ফিরে এল।

মেয়ে বাড়ি ফিরে এলে মা তাকে নিয়ে যায় ডাক্তারের কাছে। ডাক্তার মায়ের সন্দেহ সমর্থন করে। ডাক্তারের অভিমত শুনে মা হয় মর্মাহত, নির্বাক। রাগে সে ফেটে পড়ে।

আদ্রিয়ানা কিন্তু মায়ের এ রাগ গায়ে মাখে না। মনে মনে সে গিনোকেই তার ভাবী স্বামীরূপে বরণ করে নিয়েছে। এখন সেই শুভ দিনটির প্রতীক্ষায় বসে আছে আদ্রিয়ানা।

আদ্রিয়ানা জানে, তার মা এ বিয়ের প্রস্তাবে খুশি নয়। এ কথাও তার অজানা নয় যে, মা আদৌ চায় না তার বিয়ে হোক্। তবুও আদ্রিয়ানা মুখ ফুটে মাকে কোন প্রতিবাদ জানায় না। হাজার হোক মা তো।

গিসেলা আদ্রিয়ানার শুধু বান্ধবীই নয়, তার সহকর্মীও বটে। বান্ধবীও তার এ বিয়ের সাফল্যে সন্দেহ প্রকাশ করে। বান্ধবী তাকে উপদেশ দেয় সখী, বিয়ের বাসনা ত্যাগ কর। তার চেয়ে কোন ধনী প্রেমিক সংগ্রহ কর, জীবনে সুখী হবে।

কি যে বল তুমি।

হ্যাঁ গো সুন্দরি, আমি ঠিকই বলছি।—বান্ধবীর মুখে তুষ্টু হাসি।

আদ্রিয়ানার মন গিসেলার এ উপদেশ ঠিক সমর্থন করে না বটে কিন্তু তার উক্তি শুনে মনটা একটু দ্বিধাগ্রস্ত হয় বৈ কি।

ক'দিন পরের কথা। একদিন বান্ধবী গিসেলার চক্রান্তে আদ্রিয়ানা এক উচ্চপদস্থ পুলিশ কর্মচারী আস্তারিতার সঙ্গে কোন এক হোটেলে নৈশভোজে মিলিত হল। সেখানে বান্ধবীর প্ররোচনায় একসময় আস্তারিতার সঙ্গে আদ্রিয়ানাকে দ্বিধা-জড়িত পায়ে পাশের শোবার ঘরে যেতে হয়…।

লোকটি কিন্তু ঠগ্ নয়। হাজার হোক্ পুলিশ তো! জিনিস নিয়ে তার বিনিময়ে ন্যায্য মূল্য দিতে কার্পণ্য করে না। হোটেল থেকে ফেরবার সময় আস্তারিতা খুশি মনে আদ্রিয়ানার হাতে কতগুলি নোট গুঁজে দেয়।

আদ্রিয়ানার হাত একটু আড়ষ্ট হলেও ঐ দক্ষিণা থেকে সে নিজেকে বঞ্চিত করল না। অভাবিত ভাবে অতগুলো টাকা হাতে আসায় তার মনে জাগে এক অপূর্ব অনুভূতি—পুলকিত হয় তার তনু-মন।

হোটেল থেকে বেরিয়ে এসে আদ্রিয়ানা ভাবে, কত সহজে আশাতীত অর্থ উপার্জন করা যায়! দারিদ্র্য থেকে মুক্তিলাভের কি সহজ উপায়।…তবে কি মায়ের সেই উপদেশ সত্যি, হয়ত বান্ধবীর উপদেশও মিথ্যা নয়!

সুবিস্তৃত পথ দিয়ে খানিক এগিয়ে যেতে আদ্রিয়ানার সম্বিৎ ফিরে আসে। সঙ্গে সঙ্গে সে তার মনকে শাসন করে,—ছিঃ ছিঃ, তা হতে পারে না। অসম্ভব। এ ভাবনা নিতান্ত অবান্তর। দু'দিন বাদেই তো গিনোর সঙ্গে তার বিয়ে হচ্ছে। এখন সেই শুভ দিনটি স্থির করে গিনো তাকে জানাবার অপেক্ষা মাত্র।

মেয়ের বিয়ের দৃঢ় সংকল্পে মা ক্ষুণ্ণ হয়। সে খবর জেনে পুলিশ

অফিসার আস্তারিতাও রুষ্ট হয়। তাকে আদ্রিয়ানা অবহেলা করবার কারণ এবার অফিসারের বুঝতে অসুবিধা হয় না। পুলিশের মাথায় কূট বুদ্ধি খেলে যায়।

সন্ধান করে আস্তারিতা জানতে পারে, গিনো বিবাহিত। দেশের বাড়িতে তার স্ত্রী ও মেয়ে বর্তমান। এবার আস্তারিতা তার পুলিশি ফাঁদ পাততে তৎপর হয়ে ওঠে।

গিনোকে কিছুই দিতে বাকি রাখে নি আদ্রিয়ানা। তাই দয়িতের এ প্রতারণায় আদ্রিয়ানা ভেঙে পড়ে। আদ্রিয়ানা জীবনের আর কোন অবলম্বন খুঁজে পায় না। নিজেকে সে বড় অসহায় বোধ করে।

মায়ের প্ররোচনায় আদ্রিয়ানা একদিন সন্ধ্যায় ভীরু পায়ে রোমের রাজপথে এসে দাঁড়াল। সে দাঁড়াল তার রূপের পসরা নিয়ে।

আশ্চর্য, আদ্রিয়ানা প্রথম যে দিন রাস্তা থেকে তার রাতের অতিথিকে ঘরে নিয়ে এল, তার মা কিন্তু খুশি হল না। সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদল। মা কামনা করল তার মৃত্যু। সে প্রার্থনা করল ঐ নরক-জীবন থেকে মুক্তি।

এমনি করে দিন যায়। গিনোকে আদ্রিয়ানা তখনও ভোলে নি। আদ্রিয়ানার তাগিদে কোন এক সন্ধ্যায় গিনো আবার তাকে মালিকের শূন্য ভিলাতে নিয়ে এল। খুশিতে উচ্ছ্বসিত হয়ে আদ্রিয়ানা আব্দার করে—গিনো, আজ তোমার বিছানায় নয়; চল, তোমার কর্ত্রীর শোবার ঘরে, তার নরম বিছানায়।

অগত্যা গিনোকে আদ্রিয়ানার ইচ্ছা পূরণ করতে হয়। ফেরবার সময় কোন্ ফাঁকে আদ্রিয়ানা কর্ত্রীর প্রিয় একটি মূল্যবান প্রসাধন পাত্র চুপি চুপি তুলে নেয়। গিনো কিছু টের পায় না।

বাড়ি ফিরে তাঁর সাধের হারানো জিনিসটির জন্য গিন্নী ড্রাইভার গিনোর কাছে কৈফিয়ৎ চাইলেন। গিনো তো হতবাক্। অগত্যা সে কৌশলে বাড়ির ঝি-কে এজন্য দায়ী করতে দ্বিধা করে না। ফলে,

চুরির অপরাধে পুলিশ ঝিকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায়। দুঃখিনী বিনা অপরাধে কারাগারে বন্দী হল।

আদ্রিয়ানার ভক্তের ভীড় ক্রমে বেড়ে চলে। তাদের ভেতর কেউ অনভিজ্ঞ তরুণ ছাত্র, কেউ পদস্থ রাজকর্মচারী, কেউ বা খুনের ফেরারী আসামী। অতিথিরা কেউ তার পায়ের ওপর লুটিয়ে প'ড়ে তার সর্বস্ব পণ ক'রে আদ্রিয়ানার প্রেম ভিক্ষা করে, কেউ বা অর্থের পূর্ণ বিনিময় আদায় করে নেবার জন্য উন্মত্ত। ক্ষণিকের অতিথিদের উত্তাল কামনার তরঙ্গ বয়ে যায় তার দেহের ওপর দিয়ে প্রতি রাত্রে। কিন্তু সে তরঙ্গে ভেসে যায় না আদ্রিয়ানার তনু-লতা।

ক'দিন বাদে গিনোর মুখে চুরির দায়ে নিরপরাধ ঝি-র দুঃখের খবর জেনে আদ্রিয়ানার মন ব্যথিত হয়। দুঃখিনীর মুক্তির জন্য সে ব্যাকুল হয়ে ওঠে। আদ্রিয়ানা কৌশলে ঐ হারানো জিনিসটি পুলিশের হাতে পৌঁছে দিয়ে ঝি-র মুক্তির ব্যবস্থা করে স্বস্তি পায়।

আরও কিছুদিন পরের কথা। সেদিন সন্ধ্যায় গিনোকে রাস্তায় দেখে আদ্রিয়ানা আস্তে আস্তে এগিয়ে যায় তার কাছে। পুরনো প্রণয়িনীর মধুর সম্ভাষণে গিনো গলে যায়। ওরা দু'জন বাহুলগ্ন হয়ে এগিয়ে চলে আধো আলো আধো অন্ধকারের ভিতর দিয়ে।

চলার পথে এক বলিষ্ঠ পুরুষ আদ্রিয়ানার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সঙ্গে সঙ্গে ছলনাময়ী নারীর মাথায় কূট বুদ্ধি খেলে যায়। তার মুখে ফুটে ওঠে ক্রূর হাসি। গিনো তা লক্ষ্য করে না। আদ্রিয়ানা ভাবে গিনোর ওপর প্রতিশোধ নেবার এই তো সুযোগ! যেন এতদিন সে এই মুহূর্তটির জন্যই অপেক্ষা করছিল।

তারা দু'জনে মন্থর গতিতে এগিয়ে যায়। আদ্রিয়ানা হঠাৎ চিৎকার করে ওঠে,—বাঁচাও, বাঁচাও। তার এ আচরণে সরল গিনো হতভম্ব হয়।

ততক্ষণে বলিষ্ঠ পুরুষটি ছুটে আসে নারীর আকুল আহ্বানে।

তারপর আদ্রিয়ানার ইঙ্গিতে এক ঘুষিতে সে ধরাশায়ী করে গিনোকে। বেচারী গিনো আর ওঠে না।

আদ্রিয়ানা অকৃতজ্ঞ নয়। তার সেদিনের রাতের অতিথি হয়ে এল ত্রাণকর্তা সেই শক্তিমান পুরুষ, খুনের ফেরারী আসামী। তার সাহচর্যে আদ্রিয়ানার দেহমনে আনন্দের হিল্লোল বয়ে যায়।

এ ঘটনার ক'দিন বাদে। ফ্যাসি-বিরোধী তরুণ ছাত্র মিনো এল একদিন আদ্রিয়ানার অতিথি হয়ে।

মিনো আত্মপ্রেমিক, গভীর নিরাশাবাদী। তার মতে পৃথিবীতে মানুষের মূল্য নেই। সে জানায়, প্রেম এক মানসিক রোগ বিশেষ। আশ্চর্য, আদ্রিয়ানা এই অদ্ভুত তরুণটির প্রতি গভীর ভাবে অনুরক্ত হল। সে নিজেকে হারালো তার কাছে। কিন্তু তরুণ অতিথিটি দুর্জয়। ফলে, তার প্রতি আদ্রিয়ানার আকর্ষণ আরও বাড়ে।

একে সে নিরাশাবাদী, তায় আকর্ষণ-বিকর্ষণের দ্বন্দ্বের বীজ ছিল মিনোর মনে। তাই, আদ্রিয়ানার প্রেমে সে আত্মহারা হয় না। কখনও সে আদ্রিয়ানাকে বিয়ে করবার প্রতিশ্রুতি নিয়ে তার কাছে এগিয়ে আসে, আবার সঙ্গে সঙ্গে বিমর্ষ মনে দূরে সরে যায়। তবুও আদ্রিয়ানা মিনোর প্রতি দুর্বার আকর্ষণ অনুভব করে। সে মিনোকে কেন্দ্র করে কল্পনার জাল বোনে ; কখনও বা মধুর স্বপ্নে বিভোর হয়।

ঠিক এমনি সময় একদিন আদ্রিয়ানা জানল, সে মা হতে চলেছে। মা হবার আনন্দে সে উচ্ছল হয়ে ওঠে। কিন্তু খানিক বাদে তার অনাগত সন্তানের জন্মদাতার কথা মনে পড়তে আদ্রিয়ানা আঁতকে ওঠে। সে-স্মৃতির গ্লানিতে তার মন ভরে ওঠে :

—ছিঃ ছিঃ, সন্তানের পিতার পরিচয় হবে ফেরারী খুনী আসামী, পতিতার গর্ভে তার জন্ম! না, সে পরিচয় অসম্ভব, তা অসহ্য। সে তার ভবিষ্যৎ দুর্বিষহ জীবনের কথা আর ভাবতে পারে না।

এমন সময় হঠাৎ মিনোর কথা মনে পড়তে উৎফুল্ল মনে আদ্রিয়ানা উঠে যায় তার কাছে। বলে,—

মিনো, তুমি আশীর্বাদ কর। লক্ষ্মীটি, তুমি আমাকে আর ছেড়ে যেও না। আমি তোমার সন্তানের মা হতে চলেছি।

আদ্রিয়ানার উক্তি শুনে মিনো মনে মনে শিউরে ওঠে। অথচ আদ্রিয়ানার গর্ভের সন্তানের পিতৃত্ব অস্বীকার করার শক্তিও সে পায় না। মিনো হতভম্ব হয়।

পরদিন আদ্রিয়ানা মিনোকে আর খুঁজে পেল না। পরিবর্তে সে পেলো মিনোর লিখিত ছোট্ট একটি চিঠি,—

'আদ্রিয়ানা, আমার সন্ধানের জন্য তুমি বৃথা চেষ্টা করো না। আমাকে খুঁজে পাবে না। আত্মহত্যা করে আমি এ কলঙ্কিত জীবন থেকে মুক্তি পেতে যাচ্ছি! তোমার এবং আমাদের ভাবী সন্তানের ভার আমার মা-বাবার ওপর রেখে গেলাম।'

ভোর হতে আদ্রিয়ানা জানল, সত্যি সত্যিই মিনো গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেছে।

কালের স্রোতে ভেসে গেল রোমের নাগরিকার শেষ সম্বলটুকু। চিন্তায় না তার জীবনের আশার প্রদীপ।

আন্তিগোনে

[গ্রীক নাট্যকার সোফোক্লেস (Sophocles)-এর **'আন্তিগোনে'** (Antigone), খ্রীঃ পূঃ ৪৪০, নাটকটির গল্পরূপ।]

অভিশপ্ত রাজা ইডিপাস-এর দুই পুত্র—পলুনিকেস্ এবং এতেওক্লেস্। ওরা দু'জন সহোদর ভাই তো নয়, যেন পরস্পরের শত্রু। দু' ভাইয়ের ঝগড়ার শেষ নেই। তাদের চাপা আক্রোশ ক্রমে বেড়ে চলে। দু'জন-ই অবিরত সুযোগ খোঁজে, কে আগে কাকে জব্দ করবে। এমনি ভাবেই দিন যায়—

দীর্ঘদিনের তাদের ঐ চাপা আক্রোশ একদিন নগ্নরূপে প্রকাশ পায়। আসে চরম বিপর্যয়। থিবস নগরের বাইরে সেদিন পলুনিকেস্ ভাই এতেওক্লেস্-কে হঠাৎ আক্রমণ করে বসে। শুরু হয় দু'ভা[illegible] কাছে মধ্যে প্রচণ্ড লড়াই। নিয়তির লিখন! অল্প সময়ের মধ্যেই দু'ভাই-[illegible] রক্তাক্ত দেহ মাটিতে লুটিয়ে পড়ে—দু'জনের কেউ-ই আর ওঠে না।

হতভাগ্য ভাই দু'টির মামা ক্রিয়োন তখন থিবস নগরের অধিপতি। খামখেয়ালী ক্রিয়োনের অকথ্য অত্যাচারে নগরবাসীরা অতিষ্ঠ। কিন্তু প্রাণের দায়ে তাঁর সেই নিষ্ঠুর আচরণের বিরুদ্ধে কেউ কোন প্রতিবাদ জানাতে সাহস করে না, নীরবে সহ্য করে।

ক্রিয়োনের ইচ্ছায় স্বর্গত এতেওক্লেসের রাজোচিত সৎকারের ত্রুটি হয় না। কিন্তু অন্য ভাগ্নেটির বেলায় তাঁর বিরূপ মনোভাব প্রকাশ পায়। তিনি কঠিন হুকুম জারী করেন,—পলুনিকেসের শবটিকে কবর দেওয়া হবে না; সে চেষ্টা যেন কেউ না করে। সেটি যেমন আছে, ঠিক তেমনি ভাবেই সেখানে পড়ে থাকবে। হতভাগার জন্য কারুর কোন প্রকার দুঃখ-শোক প্রকাশ করাও চলবে না।

আমার এ আদেশ যে অমান্য করবে সে মৃত্যু-দণ্ডে দণ্ডিত হবে—সে যে-ই হোক না কেন।

রাজার এই অদ্ভুত আদেশের অর্থ থিবস-এর অধিবাসীরা খুঁজে পায় না। তারা স্তব্ধ হয়ে ভাবে।

হতভাগ্য ভাই দু'টির এই মর্মান্তিক মৃত্যুতে তাদের দুই সহোদরা দারুণ মর্মাহত হয়। কিন্তু পলুনিকেসের ঐ করুণ পরিণতির কথা মনে হ'তে আন্তিগোনের শোক করবারও অবকাশ থাকে না—

শোক ভুলে গিয়ে মৃত ভ্রাতার প্রতি রাজার ঐ অমানুষিক অবিচারের জন্য আন্তিগোনের মন বিদ্রোহ করে ওঠে। ভাবে, এ অসম্ভব, অসহ্য—সে কিছুতেই এই অন্যায় আদেশ মানবে না। স্থির করে, যেমন ক'রে হোক ভাইয়ের শবটিকে মাটি দেবার ব্যবস্থা তাকে করতেই হবে।

দু' বোন গোপনে আলোচনা করে। কিন্তু তারা সেই কঠিন সমস্যার কোন সমাধানে পৌঁছুতে পারে না। আন্তিগোনে গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়। তারপর এক সময় সে সোজা হয়ে বোনের মুখোমুখি বসে; তার চোখে মুখে ফুটে ওঠে দৃঢ়তার সুস্পষ্ট ছাপ।

আন্তিগোনে বোনকে জানায়,—ঠিক আছে, আমি নিজের হাতেই ভাইকে কবর দেবো, কেউ টের পাবে না; তুমি শুধু আমার সঙ্গে থাকবে, প্রয়োজনে একটু সাহায্য করবে।

বোনের দুঃসাহসিক প্রস্তাব শুনে ইস্‌মেনে ভয়ে শিউরে ওঠে। সে কম্পিত কণ্ঠে আন্তিগোনেকে রাজার অমোঘ আদেশের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। প্রিয় বোনটিকে হারাবার ভয়ে তাকে এই বিপদের ঝুঁকি না নেবার জন্য কাতর ভাবে মিনতি করে। কিন্তু কোন ফল হয় না। আন্তিগোনে তার সংকল্পে অটল থাকে।

থিবস নগরের বুকে সন্ধ্যা নেমে আসে। ক্রমে রাত হয়। চারিদিক নির্জন নিস্তব্ধ,—মাঝে মাঝে শুধু দূর থেকে প্রহরীদের পায়ের অস্পষ্ট শব্দ ভেসে আসে।

রাজকুমারী আন্তিগোনে সকল বিপদ তুচ্ছ করে ঐ রাতের অন্ধকারে একাকী বেরিয়ে যায় রাজপুরী থেকে। সতর্ক পায়ে এসে পৌঁছায় নগরের শেষ সীমান্তে। নগর-প্রাচীরটি পেরিয়ে সে থমকে দাঁড়ায়। দেখে, ভাই পলুনিকেসের শবটি পড়ে আছে মাটির 'পরে। অমনি ভাবে এতক্ষণ পড়ে থাকায় তার মুখটা হয়ে গেছে বিকৃত, ধূলিমলিন।

ভাইয়ের ঐ চেহারা দেখে অসহ্য ব্যথায় আন্তিগোনের মন ভরে ওঠে। সে নীরবে শবটির পাশে দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর শুধু একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস বেরিয়ে আসে তার বুক চিরে।

কিন্তু সেখানে দাঁড়িয়ে তার শোক করবার সময় কোথায়? সম্বিৎ ফিরে আসতে, তার কঠিন কর্তব্য শেষ করবার জন্য আন্তিগোনে তৎপর হয়।

খবরটা কিন্তু চাপা থাকে না। এক সময় ক্রিয়োন কোন একজন নগর-প্রহরীর কাছ থেকে জানতে পারে—পলুনিকেসের শবটি সেখানে নেই, কে যেন সেটিকে কবর দিয়েছে।

ক্রিয়োন ক্রোধে জ্বলে ওঠেন। তাঁর আক্রোশ গিয়ে পড়ে প্রহরীটার ওপর। তিনি রূঢ় কণ্ঠে আদেশ করেন,—এক্ষুনি সেই দুষ্কৃত-কারীকে খুঁজে বার কর, অন্যথায় তোমার গর্দান দিতে প্রস্তুত হও।

প্রহরী বেচারী প্রাণের দায়ে চেষ্টার ত্রুটি করে না। কিন্তু সে দুষ্কৃতকারীর হদিস পায় না, পায় কবরটির। অগত্যা মাটি খুঁড়ে পলুনিকেসের শবটিকে সে যথাস্থানে রেখে দেয়।

এবার প্রহরীটি তার গর্দানটি রক্ষা করার জন্য গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়। এমন সময় ঝড় ওঠে—

পলুনিকেসকে যথাযথ ভাবে কবর দিয়ে এসেও আন্তিগোনে স্বস্তি পায় না। তার মনটি খুঁৎখুঁৎ করে। ভাবে, কি জানি গুপ্তচরের অভাব তো নেই।

ঐ ঝড়ের মধ্যেই আন্তিগোনে পায়ে পায়ে কবরটির দিকে এগিয়ে যায়।···কবরটি শূন্য দেখে বুকফাটা কান্নায় আন্তিগোনে ভেঙ্গে পড়ে।

অমনি দুর্যোগে নারীর আর্তনাদ তার কানে ভেসে আসতে প্রহরী সচকিত হয়। দিক নির্ণয় করতে সে উৎকর্ণ হয়ে থাকে।

তার অনুমান মিথ্যা হয়নি। খানিকবাদে তার ম্লান মুখে হাসি ফুটে ওঠে। শিকারের সন্ধানে প্রহরীটি ছুটে যায় কবরের দিকে।

কিন্তু কবরটির কাছে পৌঁছে প্রহরী থমকে দাঁড়ায়। সে বুঝতে পারে, এই অঘটনের মূলে কে ছিলেন। তবুও সে ইতস্তত করে। অবশেষে সে তার মনের দ্বিধা-দ্বন্দ্বের বেড়া ডিঙ্গিয়ে আন্তিগোনেকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায় ক্রিয়োনের কাছে।

তুমি নিশ্চয়ই আমার হুকুম জানতে, তবুও ঐ দুঃসাহসিক কাজ কেন করতে গেলে ?—কঠিন কণ্ঠে ক্রিয়োন বন্দিনীকে প্রশ্ন করেন।

ততক্ষণে আন্তিগোনে নিজেকে সামলে নিয়েছে। নির্ভীক কণ্ঠে সে জবাব দেয়,—মহারাজ, একজন মৃত ব্যক্তিকে কবর দিয়ে আমি ঈশ্বরের আইন-শৃঙ্খলা পালন করেছি—সেটা মানুষের ধর্ম। সে-ক্ষেত্রে একজন মানুষের বিরুদ্ধ অনুশাসন নিতান্ত তুচ্ছ।

আন্তিগোনের ঐ উক্তি শুনে ক্রিয়োন জ্বলে ওঠেন। উত্তেজিত কণ্ঠে চিৎকার করে বলেন,—তোমার এত স্পর্ধা ! তোমার অপরাধের ক্ষমা নেই, কিছুতেই নয়। মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হও। ক্রোধে ক্রিয়োনের কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসে।

রাজার সেই সর্বনাশা হুকুম শুনেও আন্তিগোনে নির্বিকার ভাবে দাঁড়িয়ে থাকে। বোন ইস্‌মেনে এতক্ষণ তার পাশেই ছিল। প্রিয় বোনের আসন্ন বিপদের কথা উপলব্ধি করে সে আর স্থির থাকতে পারে না, চঞ্চল হয়ে ওঠে।

ধীরে ধীরে ইস্‌মেনে গিয়ে ক্রিয়োনের সামনে আনত মুখে দাঁড়ায়। তারপর কাতর কণ্ঠে সে বোনের অপরাধের জন্য তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে। নানা কৌশলে সে ক্রিয়োনের মনে করুণা উদ্রেক করবার চেষ্টা করে ; তাঁর পুত্র হাইমোন আন্তিগোনেকে ভালবাসে, সে তাঁর ভাবী পুত্রবধূ—সে কথা স্মরণ করিয়ে দিতেও ইস্‌মেনে দ্বিধা

করে না। তবুও কোন ফল হয় না। ক্রিয়োনের মনে এতটুকুও দয়া হয় না, তাঁর চোখে মুখে কোন ভাবান্তর হয় না।

এই দুঃসংবাদটি তার কানে পৌঁছুতে হাইমোন ছুটে আসে পিতার কাছে। সে তাঁর ঐ নির্মম আদেশ প্রত্যাহার করবার জন্য পিতাকে বিনীত ভাবে অনুরোধ করে। বলে,—সারা দেশময় আন্তিগোনের অসাধারণ জনপ্রিয়তার কথা ভুলবেন না ; মনে রাখবেন তা হলে দেশে এক ভীষণ অশান্তির সৃষ্টি হবে। আপনার এবং দেশের মঙ্গলের জন্য দয়া করে জনগণের মনোভাবের কথা স্মরণ রাখবেন…

—নগরবাসীদের আমি গ্রাহ্য করি না। তাদের মনোভাবের আমি পরোয়া করি না।

—পিতা, রাজা হ'য়ে নির্বোধের মতো এ আপনি কি সব বলছেন! ভেবে দেখুন…

পুত্র হাইমোনের কথা আর শেষ হয় না। ক্রিয়োন ক্রোধে ফেটে পড়েন। চিৎকার করে ওঠেন,—খবরদার। তোমার স্পর্ধা তো কম নয়! জেনে রাখো, তোমার চোখের সামনেই আন্তিগোনেকে মৃত্যু বরণ করতে হবে।

হাইমোন আর সেখানে দাঁড়ায় না। ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। যাবার আগে সে পিতাকে শাসিয়ে যায়,—মনে রাখবেন, আমিও আপনার বিরুদ্ধে এর প্রতিশোধ নিতে ছাড়বো না।

ক্রিয়োনের আদেশে নগরের বাইরে চার দেওয়ালের উঁচু একটি অন্ধ-কূপের মতো তৈরী হয়। সেখানে অপরাধিনী আন্তিগোনেকে তিল তিল করে হত্যা করার ব্যবস্থা হয়। পলুনিকেসের শবটি ঐ দেয়ালের বাইরে তেমনি ভাবেই পড়ে থাকে।

আন্তিগোনের প্রতি ক্রিয়োন তাঁর আদেশ প্রত্যাহার করেন না, তা অমোঘ। বন্দিনী আন্তিগোনেকে এক সময় সেই কুখ্যাত কারাগারের দিকে সশস্ত্র প্রহরীরা নিয়ে চলে। নগরবাসীরা তার শোকে কাতর। অগণিত জনতা মৌন মিছিল করে আন্তিগোনের

পিছু পিছু যায়। থিবস নগরে শোকের ছায়া নেমে আসে। তবুও রাজা ক্রিয়োনের হৃদয় এতটুকুও আর্দ্র হয় না।

সেই কূপটির ভেতর আন্তিগোনেকে ছুঁড়ে ফেলতে দেখে অসহায় জনতা হাহাকার করে ওঠে। তারপর চারিদিকে নেমে আসে এক অখণ্ড স্তব্ধতা।

থিবস নগরে তখন তাইরেসিয়াস্ নামে একজন ত্রিকালদর্শী পুরুষ বাস করতেন। বাহ্যত অন্ধ হলেও নগরের কোন ঘটনাই তাঁর অজানা থাকত না। এই প্রাচীন দৈবজ্ঞটি ছিলেন সর্বজনশ্রদ্ধেয়, রাজা ক্রিয়োনেরও।

ঐ ঘটনার ক'দিন পরে তাইরেসিয়াস্ রাজাকে জানান, তাঁর সাম্প্রতিক কার্যকলাপে ঈশ্বর রুষ্ট হয়েছেন। তিনি ক্রিয়োন্‌কে সতর্ক হতে অনুরোধ করেন। তাঁকে উপদেশ দেন,—আর কালবিলম্ব না করে পলুনিকেসের শবটিকে কবর দেওয়ার ব্যবস্থা করুন। শুধু তাই নয়, আন্তিগোনেকেও অবিলম্বে কারামুক্ত করুন। অন্যথায় আপনার একমাত্র পুত্র হাইমোনকে হারাতে হবে—তার মৃত্যু অনিবার্য।

তাঁর উক্তি শুনে ক্রিয়োন্ চিন্তিত হন। হঠাৎ তিনি উপলব্ধি করেন, তাইরেৎসিয়াসের ভবিষ্যদ্বাণী কোনদিন মিথ্যা হয়নি। এবার তাঁর সম্বিৎ ফিরে আসে। তিনি আর সময় নষ্ট করেন না—

পলুনিকেসের শবটিকে সমাধি দেবার উদ্দেশ্যে একটি স্মৃতিস্তম্ভ তাড়াতাড়ি তৈরী করবার জন্য আদেশ দিয়ে রাজা ক্রিয়োন্ নিজে ছুটে যান কুখ্যাত কারাগারটির দিকে—আন্তিগোনেকে মুক্তি দিতে।

কিন্তু ঈশ্বরের ইচ্ছা তাঁর অনুকূলে ছিল না। কূপটার কাছে পৌঁছুতে ক্রিয়োনের কানে তার ভেতর থেকে এক করুণ আর্তনাদ ভেসে আসে। পুত্রের কণ্ঠস্বর বুঝতে ক্রিয়োনের অসুবিধা হয় না। তিনি তড়িৎ বেগে কূপটার ভেতর প্রবেশ করেন।

কিন্তু ততক্ষণে সব শেষ। ঈশ্বরের ইচ্ছা প্রতিরোধ করা কি মানুষের সাধ্য!

ক্রিয়োন্ লক্ষ্য করেন, অভিমানিনী আন্তিগোনে তার কেশগুচ্ছের সাহায্যে গলায় ফাঁস দিয়ে জীবন-যন্ত্রণার হাত থেকে মুক্তি পেয়েছে। প্রণয়িনীর মৃত্যুতে পুত্র হাইমোনও গভীর শোকে মুহ্যমান। সে দৃশ্য দেখে ক্ষোভে, দুঃখে, অনুশোচনায় ক্রিয়োনের মন ভরে ওঠে।

হঠাৎ পিতার প্রতি নজর পড়তে হাইমোন্ ঘুরে দাঁড়ায়, উন্মুক্ত তরবারিটি তার শক্ত মুঠিতে ধরা। তারপর এক সময় উন্মাদের মতো ছুটে যায় তার পিতার দিকে।

ক্রিয়োন্ কিন্তু এতটুকুও বিচলিত হন না, আত্মরক্ষার কথাও ভুলে যান—তেমনি ভাবে দাঁড়িয়ে থাকেন।

হাইমোন্ ক্ষণিকের জন্য পিতার সামনে স্থির হয়ে দাঁড়ায়, তারপর চকিতে হাতের ঐ শাণিত তরবাবিটি নিজের বুকের মধ্যে আমূল বসিয়ে দিয়ে প্রণয়িনীর মরণ-সঙ্গী হয়।

ক্রিয়োন্ স্তম্ভিত। অসহ্য অন্তর্দাহ তাঁকে কাতর করে।

ওদিকে পুত্রের মৃত্যুর মর্মান্তিক খবরটি হাওয়ার আগে রাজপুরীতে পৌঁছে যায়। মহারাণী প্রাণপ্রতিম পুত্র বিয়োগের আঘাত সইতে পারেন না, আত্মহত্যা করেন।

কিছুক্ষণ বাদে মৃত পুত্রকে নিয়ে নগরে প্রবেশ করে ক্রিয়োন্ তাঁর স্ত্রী'র নিষ্ঠুর মৃত্যুর কথা জানতে পান। গভীর আত্মগ্লানিতে তাঁর মন ভরে ওঠে। এখন আর বেঁচে থাকা তাঁর কাছে মনে হয় নিতান্ত অর্থহীন।

সেই বিড়ম্বিত জীবনের অসহ্য যন্ত্রণার হাত থেকে মুক্তির প্রয়াসে ক্রিয়োন্ স্বেচ্ছায় নির্বাসিত জীবন বরণ করেন।

থিবস নগরের শেষ অত্যাচারী রাজা ক্রিয়োন্ জীবনের বাকী দিনগুলি কাটিয়েছিলেন দারুণ মনস্তাপে…তাঁর পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে।

লেখক-পরিচিতি

সংকলিত গ্রন্থগুলির ক্রম অনুসারে মূল লেখকদের সংক্ষিপ্ত জীবনী বিন্যস্ত করা হয়েছে।

হোমর,

৮৫০ খ্রীঃ পূঃ

বিশ্ববিখ্যাত দুই মহাকাব্য **'ইলিঅ্যাড'** এবং **'ওডিসি'**র স্রষ্টা মহাকবি হোমর (Homer)-এর ব্যক্তি জীবন কিছুটা অস্পষ্ট। পণ্ডিতদের গবেষণার ফলে যেটুকু তথ্য পাওয়া যায় তা থেকে আমরা জানতে পারি—সম্ভবত হোমর ৮৫০ খ্রীঃ পূঃ অথবা ট্রোজান যুদ্ধের চার শত বছর পরে জন্মগ্রহণ করেন। গ্রীক কবি বলে তিনি পরিচিত হলেও তাঁর পূর্বপুরুষরা এশিয়াবাসী ছিলেন। তিনি ছিলেন জন্মান্ধ।
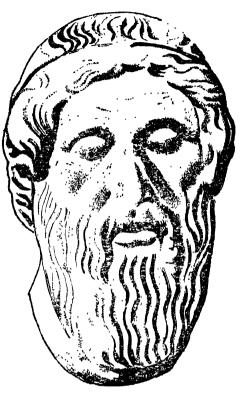
তাঁর জন্মস্থান আজও পণ্ডিতদের গবেষণার বিষয়। একটি দু'টি নয়, সাত সাতটি দেশ—স্মার্ণা, গিয়োজ, কলোফন, সালামিস, রোডস্, অ্যানগস এবং এথেন্স—প্রত্যেকটি দেশই হোমরের জন্মস্থান বলে দাবী করে।

যে মহাকাব্য দু'টির জন্য তিনি অমর হয়ে আছেন সে দু'টির একটিও তাঁর স্বলিখিত নয়। স্থান হ'তে স্থানান্তরে ঘুরে হোমর তা আবৃত্তি করতেন; প্রাচীন কাহিনীর ঐ ঘটনাবলী তাঁর কণ্ঠে মূর্ত হয়ে উঠত যা ছিল শাশ্বত প্রাণবন্ত। তাঁর ঐ কালজয়ী কাব্যগাথা পুরুষানুক্রমে লোকমুখে গীত হয়ে ক্রমে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

ট্রয় নগরের কাহিনী এবং তার সংশ্লিষ্ট ঘটনাবলী হোমরের কাব্যের প্রধান উপাদান। তাঁর কাব্য-কাহিনী শ্রুতি এবং স্মৃতি আশ্রিত বলে ঐতিহাসিক তথ্যের উপাদান সম্বলিত। এই ঐতিহাসিক তথ্য বাদ দিলেও উক্ত কাব্য দু'টির মধ্যে এমন একটি চিরন্তন সত্যগ্রাহী রূপ আছে যা মানব সংস্কৃতি ভাণ্ডারে চিরদিন অম্লান হয়ে থাকবে। হয়ত ঐ কারণে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময়ে তাঁর রচনার অনুসরণ এবং অনুকরণ আমরা প্রত্যক্ষ করি।

হোমর শুধু এই কালজয়ী চির-অম্লান **ইলিঅ্যাড** (Iliad, the)-এর স্রষ্টাই নন, তিনি ইউরোপীয় কাব্যের জনকও বটে। হেরোডটাসের মতে হোমর গ্রীস দেশের প্রচলিত ধর্মীয় প্রথার প্রবর্তক এবং প্লেটোর ভাষায় তিনি গ্রীসদেশের শিক্ষার উৎস এবং সর্বকালের মহাকবি।

ইস্কাইলাস্,
৫২৫-৪৫৬ খ্রীঃ পূঃ

যে গ্রীক ট্র্যাজেডির ব্যাপ্তি এবং গভীরতা আজও বিশ্বের নাট্য-সাহিত্যের প্রেরণার আকর তার প্রথম উন্মেষ দেখা যায় ইস্কাইলাস্ (Aeschylus) - এ র রচনায় ; গ্রীক নাটক সৃষ্টির গৌরবও তাঁরই প্রাপ্য। উঁচু দরের একজন কবি বলেও ইস্কাইলাসের খ্যাতি কম ছিল না।
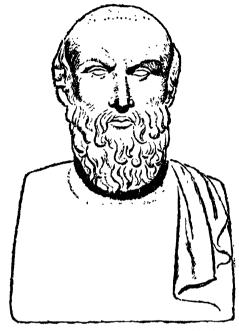
ইলিয়ুসিস্ নগরে তাঁর জন্ম। তাঁর পিতা ইউফোরিয়ন সম্ভবতঃ এথেন্সের শেষ রাজা কডরাসের বংশধর ছিলেন। ইস্কাইলাসের ব্যক্তিজীবনের তথ্য বিশেষ কিছু পাওয়া যায় না। তবে পারস্যের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার সংগ্রামে তিনি সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিলেন ; ম্যারাথন এবং সালামিসের যুদ্ধে তিনি বিশেষ কৃতিত্বেরও পরিচয় দিয়েছিলেন।

ঠিক কবে থেকে তাঁর ভেতর সাহিত্যের বীজ অঙ্কুরিত হয়েছিল বা তিনি নাটক লিখতে শুরু করেছিলেন, বলা শক্ত। সে সময় গ্রীস দেশে বিয়োগান্তক নাটক রচনার প্রতিযোগিতা প্রচলিত ছিল। খ্রীঃ পূঃ ৪৯৯-তে ইস্কাইলাস প্রথম সেই প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করেন এবং ৪৮৫ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে প্রথম স্থান অধিকার করে তিনি পুরস্কৃত হন। উত্তরকালে তিনি তেরটি পুরস্কার লাভ করেছিলেন। কিন্তু একবার সোফোক্লেস-এর নাটক তাঁর চেয়ে শ্রেষ্ঠতর বিবেচিত হওয়ায় মনের দুঃখে তিনি স্বদেশ ত্যাগ করেন। সম্ভবতঃ

তিনি আর কোনদিন এথেন্সে ফিরে আসেননি এবং সিসিলির গেলা অঞ্চলে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

গ্রীসের পুরাণ এবং উপকথা থেকেই তিনি প্রধানতঃ প্রেরণা পেয়েছিলেন। ট্র্যাজেডিতে কোরাসের বাহুল্য, সংলাপের আধিক্য এবং বিস্তৃত বিবরণের প্রবণতা বর্জন করে তিনিই সেখানে প্রথম ঘটনার প্রবর্তন করেছিলেন। নাটকে পোশাক, দৃশ্য এবং মুখোসের প্রবর্তকও ইস্কাইলাস।

তাঁর রচিত প্রায় সত্তর খানা নাটকের মধ্যে মাত্র সাতটির সন্ধান পাওয়া যায়, বাকীগুলো সব কালের অতলে তলিয়ে গেছে।

অভিশপ্ত রাজপুরী (The House of Atreus) তাঁর শ্রেষ্ঠ অবদান। এই নাটকটি তিনটি নাটকের সমষ্টি—Agamemnon, The Libation-Bearers এবং The Furies। ৪৫৮ খ্রীঃপূঃ-এ নাটকটি মঞ্চস্থ হ'তে ইস্কাইলাস্ প্রথম পুরস্কার পেয়েছিলেন।

সোফোক্লেস,
৪৯৫-৪০৫ খ্রীঃ পূঃ

এথেন্সের শহরতলী কোলনাস্-এ গ্রীক-নাট্যকার সোফোক্লেস (Sophocles) জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতা একজন ধনী ব্যবসায়ী ছিলেন। তাই তাঁর ছেলেবেলা থেকে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ভেতর কাটে এবং তিনি ভালভাবে লেখাপড়ার সুযোগ পান।

সোফোক্লেস শুধু সুদর্শন-ই ছিলেন না, নৃত্য এবং গীতেও বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। তাই ৪৮০ খ্রীঃ পূঃ পারসিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের বিজয় উৎসবে পনের বছরের তরুণ সোফোক্লেস একটি সংগীত-গোষ্ঠীকে পরিচালনা করবার জন্য নির্বাচিত হয়েছিলেন।

অভিনেতা হবার তাঁর স্বপ্ন ছিলো। স্বলিখিত নাটকের অভিনয়ে তিনি দু'বার অবতীর্ণও হয়েছিলেন। কিন্তু কণ্ঠস্বর দুর্বল থাকার দরুণ সার্থক নট হবার আশা ত্যাগ করে নাটক রচনায় পুরোপুরি আত্মনিয়োগ করেন। শতাধিক বিয়োগান্ত নাটক তিনি সৃষ্টি করেছেন বলে জানা যায় বটে কিন্তু তার ভেতর সাতটির বেশী সন্ধান পাওয়া যায় না।

সে সময় এথেন্সের রঙ্গমঞ্চে সোফোক্লেসের নাটক ছিল সর্বজনপ্রিয়। ৪৬৮ খ্রীঃ পূঃ-এ নাটক রচনার প্রতিযোগিতায় শক্তিমান পূর্বসূরী ইস্কাইলাসকে পরাজিত করে তিনি প্রথম পুরস্কার লাভ করেছিলেন। উত্তরকালে তিনি অন্যূন বিশবার ঐ দুর্লভ পুরস্কার লাভের গৌরব অর্জন করেন।

৪৪০ খ্রীঃ পূঃ তাঁর নাটক **আন্তিগোনে** (Antigone) মঞ্চস্থ হ'লে এক আলোড়নের সৃষ্টি হয়। তাঁর নাটকটির সাফল্যের স্বীকৃতি হিসাবে ঐ বছর স্যামোদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে দশ জনের ভেতর সোফোক্লেসও একজন সেনাপতি হিসাবে নির্বাচিত হয়েছিলেন।

তাঁর অন্যান্য নাটকের মধ্যে 'ঈডিপাস', 'ইলেক্ট্রা' এবং 'অ্যাজাক্স' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। নাট্যসাহিত্যে ঈডিপাস একটি অনবদ্য সৃষ্টি।

জানা যায়, শেষ বয়সে তাঁর এক পুত্র স্বার্থসিদ্ধির জন্য হীন চক্রান্ত করে সোফোক্লেসের নামে অপবাদ রটাবার চেষ্টা করেঃ প্রচার করে, তাঁর মস্তিষ্ক-বিকৃতি হয়েছে। কিন্তু বৃদ্ধ সোফোক্লেস তাঁর শেষ-লেখা নাটকের অংশবিশেষ জনসাধারণের সামনে উদাত্ত কণ্ঠে নির্ভুল আবৃত্তি করে পুত্রের সেই অভিযোগ মিথ্যা বলে প্রমাণ করেন।

এউরিপিদেস্

৪৮০-৪০৬ খ্রীঃ পূঃ

বিশ্ববিশ্রুত গ্রীক বিয়োগান্ত নাট্যকার ত্রয়ীর সর্বকনিষ্ঠ এউরি-পিদেস্ (Euripides) গ্রীসের অন্তর্গত অ্যাটি-কায় জন্মগ্রহণ করেন। কৈশোরে প্রডিয়াসের নিকট শারীরিক ব্যায়াম-চর্চা এবং যৌবনে অ্যানাক্সাগোরাসের কাছে তিনি দর্শনশাস্ত্রে শিক্ষা লাভ করেন। গোড়াতে অনেকে ভেবেছিলেন হয়তো এউরিপিদেস্ পেশাদার মল্লবীর অথবা চিত্রকরের বৃত্তি গ্রহণ করবেন। কিন্তু সকলের জল্পনাকে মিথ্যা করে তিনি এক সময় রঙ্গমঞ্চের জন্য নাটক লিখতে শুরু করেন।

মাত্র আঠারো বছর বয়সে তাঁর প্রথম নাটকটি গ্রীসবাসীদের হাতে তুলে দেন। ৪৪১ খ্রীঃ পূঃ-এ বাৎসরিক নাটক প্রতিযোগিতায় তিনি প্রথম পুরস্কারটি লাভ করেন। তারপর একাধিক বার ঐ পুরস্কারের গৌরব তিনি অর্জন করেন। ৪০৮ খ্রীঃ পূঃ-এ শেষ বারের মতো তাঁর রচিত 'ওরেস্টস' (Orestes) নাটকটির জন্য এউরিপিদেস্ পুরস্কৃত হন।

তাঁর জীবনের অধিকাংশ সময় সালামিস্-এ অতিবাহিত হয়। প্রখ্যাত দার্শনিক সক্রেতিসের সঙ্গে এউরিপিদেসের আজীবন অন্তরঙ্গ বন্ধুত্ব ছিল। তাঁর গুণমুগ্ধ সক্রেতিস্ এউরিপিদেসের রচিত প্রতিটি নাটকের অভিনয়ে উপস্থিত থাকতেন।

কোন এক সময় একটি বিশেষ দার্শনিক মতবাদের অনুগামী হবার ফলে নির্যাতনের আশঙ্কায় তিনি এথেন্স নগর ত্যাগ করে ম্যাসিডনে গিয়ে আশ্রয় নেন। তাঁর বাকি জীবন রাজা অ্যারচেলাস্-এর আতিথ্যে কাটে। এউরিপিদেসের মৃত্যু-সংবাদ এথেন্সে পৌঁছুলে সারা নগরে শোকের ছায়া নেমে আসে। শোকবিহ্বল জনতা তাঁর মরদেহ এথেন্স নগরে সমাধিস্থ করবার জন্য আবেদন করেন।

ম্যাসিডনের রাজা কিন্তু সে আবেদন গ্রাহ্য করেন না। তখন স্বর্গত এউরিপিদেসের সম্মানার্থে এথেন্সবাসীরা রাজপথে তাঁর উদ্দেশ্যে একটি স্মৃতিস্তম্ভ তৈরী করেন। সেখানে লিখে রাখেন,— গোটা গ্রীসদেশ তাঁর স্মৃতিসৌধ, ম্যাসিডনের মাটিতে শুধু তাঁর অস্থি ক'খানাই রাখা হয়েছে।

তাঁর রচিত ৯২টি নাটকের মধ্যে মাত্র আঠারোটির সন্ধান পাওয়া যায়। **মিডিয়া** (Medea) নাটকটি তাঁর শ্রেষ্ঠ অবদান, রচনাকাল ৪৩১ খ্রীঃ পূঃ।

আরিস্তোফানেস্,
৪৪৮-৩৮৫ খ্রীঃ পূঃ

কমেডির অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রবক্তা প্রখ্যাত গ্রীক নাট্যকার আরিস্তোফানেস্ (Aristophanes)-এর ব্যক্তিগত জীবনের তথ্য বিশেষ জানা যায় না; যেটুকু জানা সম্ভব তা তাঁর রচিত নাটকের মধ্যে ছড়িয়ে আছে।

তাঁর পিতা ফিলিপাস এথেন্স নগরের অধিবাসী ছিলেন বটে কিন্তু তিনি ছিলেন প্যানডিওনিস্ নামক উপজাতির বংশোদ্ভব। উত্তরাধিকার সূত্রে অ্যাজিনা দ্বীপে আরিস্তোফানেস্ এবং তাঁর পিতা কিছু সম্পত্তি লাভ করেছিলেন।

সুদীর্ঘ চল্লিশ বছরের সাহিত্য জীবনে তিনি প্রায় অনুরূপ সংখ্যক মিলনান্তক বা হাস্যরসাত্মক নাটক রচনা করেছেন। অবশ্য তাঁর রচিত নাটকগুলোর মধ্যে এগারটির বেশী আজ আমাদের লভ্য নয়।

প্রকৃতিতে তিনি রক্ষণশীল ছিলেন। তাই এথেন্সের নবজাগরণ তাঁর মনঃপূত ছিল না। গণতন্ত্রের আদর্শেও তাঁর বিশ্বাস ছিল না। সোফিস্টদের ধর্মীয় এবং নৈতিক আদর্শ তাঁর মনে কোন সাড়া জাগাতে পারেনি; তাঁর কাছে তা ছিল অপাঙক্তেয়।

কবি হিসাবেও আরিস্তোফানেসের খ্যাতি কম ছিল না। প্লেটো তাঁর কাব্য প্রতিভায় মুগ্ধ হয়েছিলেন এবং তাঁকে মাধুর্যের প্রতিমূর্তি বলে মনে করতেন।

মেঘ (The Clouds, 423 B. C.) তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ অবদান। তাঁর অন্যান্য নাটকের মধ্যে Bird এবং Frogs বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

গিওভান্নি বোক্কাচো
১৩১৩-'৭৫

ইতালি-র প্রখ্যাত ঔপন্যাসিক এবং কবি গিওভান্নি বোক্কাচো (Giovanni Boccaccio) প্যারিসে জন্মগ্রহণ করেন তাঁর মা ছিলেন ফরাসী মহিলা, পিতা ছিলেন ফ্লোরেন্সের ব্যবসায়ী।

পিতার ইচ্ছানুযায়ী বাল্যকালেই লেখাপড়ায় ইস্তফা দিয়ে ব্যবসায়ে যোগ দেবার জন্য তাঁকে নেপলস্-এ যেতে হয়। এখানে থাকাকালীন তিনি হিউম্যানিস্টদের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হন। এবং এখানেই বোক্কাচো অ্যাঞ্জনের রাজকুমারী মারিয়ার প্রতি অনুরক্ত হন। উত্তরকালে প্রণয়িনী মারিয়া 'ফিয়ামেট্রা' নামে তাঁর বহু গল্প এবং উপন্যাসে বিশেষ স্থান পায় এবং চরিত্রটি পাঠকগণের মনে গভীর রেখাপাত করে।

১৩৪০ সালে পিতার আহ্বানে তাঁকে ফ্লোরেন্সে ফিরে আসতে হয়। কিন্তু ১৩৪৫ সালে পিতা দ্বিতীয়বার বিবাহ করাতে তিনি নেপলসে ফিরে যান। তিন বছর পরে পিতার মৃত্যু হ'লে তিনি ফ্লোরেন্সে আবার ফিরে আসেন।

এই সময় পেত্রার্কের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয় এবং অল্পদিনের মধ্যে দু'জনের মধ্যে নিবিড় বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। এই বন্ধুত্বের ফলে বোক্কাচোর মানসিক পরিগঠনের ওপর পেত্রার্কের বৈদগ্ধ্যের বিশেষ প্রভাব পড়ে। আজীবন এই দুই লেখকের সৌহার্দ্য অক্ষুণ্ণ ছিল। ফ্লোরেন্সের রাজনৈতিক এবং সামাজিক সমস্যাগুলি সমাধানের জন্যেও বোক্কাচোকে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতে দেখা যায়।

১৩৬২ সালে আধ্যাত্মিক মনোভাবে এক বিরাট পরিবর্তনের ফলে জাগতিক সব কিছুর প্রতি বোক্কাচোর নিস্পৃহতা দেখা দেয়, সাহিত্যচর্চার প্রতিও। ফলে, সাহিত্য-প্রচেষ্টা মুছে ফেলবার জন্য তিনি উদ্যত হন। বন্ধু পেত্রার্কের হস্তক্ষেপের ফলে ঐ সংকট থেকে তিনি মুক্তি পান।

প্রধানতঃ তাঁর গল্পশতক—**ত্রয়ী** (Decameron)-কে কেন্দ্র করে বোক্কাচো বিশ্বসাহিত্যে অমর হয়ে আছেন। গ্রন্থটি তাঁর পাঁচ বছরের সাধনার ফল। ১৩৪৮ সালে ফ্লোরেন্সে প্লেগের প্রচণ্ড মহামারী থেকে বোক্কাচো গ্রন্থটি লেখবার প্রেরণা পেয়েছিলেন।

নিঃসন্দেহে তিনি ছিলেন ইতালির নবজাগরণের অন্যতম উদ্গাতা। আধুনিক সাহিত্যেও বোক্কাচো'র স্থান কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।

ফ্রাঁসোয়া রাবেলে
১৪৯০-১৫৫৩

ব্যঙ্গরসের প্রখ্যাত লেখক ফ্রাঁসোয়া রাবেলে (Francois Rabelais) ফ্রান্সের সিনন শহরে জন্মগ্রহণ করেন। প্যারিস শহরে তিনি লোকান্তরিত হন।

১৫১৯ সালে ফন্টেনি লা কামতে'র মিশনারী বিদ্যালয়ে তিনি ভর্তি হন। এখানে অধ্যয়ন কালে রাবেলে প্রচণ্ড উৎসাহ নিয়ে গ্রীক, ল্যাটিন, ইতালিয়ান, জার্মান, স্প্যানিস, আরবী ইত্যাদি বহু ভাষা আয়ত্ত করেন। ১৫৩০ সালে সাহিত্যে স্নাতক উপাধি লাভ করবার অল্পকাল পরে চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষার জন্য আত্মনিয়োগ করেন। ১৫৩৭ সালে ডাক্তারি ডিগ্রি লাভ করবার পর সে-বিদ্যার শিক্ষক হিসাবে নিযুক্ত হন। এর পাঁচ বছর আগে লায়নস্ শহরের হাসপাতালে চিকিৎসক হিসাবে থাকাকালীন আইন এবং স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের ওপর তাঁর কতগুলো রচনা প্রকাশিত হয়। ডাক্তার রাবেলে ১৫৪৬ সালে জীবিকার জন্য মেটিজে স্থায়ীভাবে বাস করতে স্থির করেন। কিন্তু সাহিত্যের নেশায় তিনি ডাক্তারী পেশা ক্রমে ছেড়ে দেন।

বিজ্ঞান বিষয়ে তাঁর রচনাবলী আজ বিস্মৃতির অতলে কিন্তু তাঁর উপন্যাসমালা **গার্গান্টুয়া ও প্যান্টাগ্রুয়েল** (Gargantua and Pantagruel) আজও বিশ্বসাহিত্যে হাস্যরসাত্মক ও অদ্ভুত রসাত্মক সৃষ্টি হিসাবে অম্লান হয়ে আছে। পাঁচ খণ্ডে পরিকল্পিত উপন্যাসটির শেষ খণ্ড পাণ্ডুলিপি আকারেই রয়ে গেছে।

তাঁর জীবন নিরবচ্ছিন্ন সুখের এবং পূর্ণনির্দোষ ছিল। উপার্জিত অর্থের অনেকটা তিনি আর্তের সেবা এবং সংস্কৃতির বিস্তারের জন্য অকাতরে ব্যয় করেন। সমাজ-সেবায়ও তাঁর অবদান কম ছিল না।

তবুও তাঁর লেখার বিরুদ্ধে ধর্মদ্রোহিতা এবং নাস্তিকতাবাদের অভিযোগ শোনা যায়। কিন্তু এ অভিযোগ ভিত্তিহীন এবং উদ্দেশ্য-প্রণোদিত।

মিগুয়েল স্থ
কারভানটেস
[থেরভানতেস্]
সাভেদ্রা,
১৫৪৭-১৬১৬

স্পেনের মাদ্রিদ শহরে এক অভিজাত পরিবারে সাভেদ্রা (Miguel de Cerventes Saavadra) জন্মগ্রহণ করেন। সালামান্কা এবং মাদ্রিদে তিনি শিক্ষা লাভ করেন। ছেলেবেলা থেকেই কবিতার প্রতি গভীর অনুরাগ বশতঃ—সনেট, ব্যালাড, এলিজি প্রভৃতি রচনায় গোড়াতে তাঁর প্রচুর সময় অতিবাহিত হয়। 'ফিলেনা' কাব্য গাঁথাটিও সে সময় সৃষ্টি হয়।

১৫৭০ সালে কলোন্নার নেতৃত্বে তুর্কি এবং আফ্রিকার বিরুদ্ধে তিনি যুদ্ধ করেন; লেপান্তোর যুদ্ধে বাঁ হাতখানি চিরতরে হারান। পরবর্তী কালে তিনি স্পেনের রাজার সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়ে শ্রেষ্ঠ সৈনিকের গৌরব অর্জন করেন।

তাঁর সৈনিক জীবনে এক সময় চরম বিপর্যয় আসে। সময়টা ১৫৭৫ সাল। শত্রুর হাতে বন্দী হয়ে আলজিরিয়াতে সাভেদ্রা ক্রীতদাস হিসাবে বিক্রীত হন। সাত বছর তাঁকে সেই লাঞ্ছিত জীবন ভুগতে হয়। তারপর বন্ধু এবং আত্মীয়দের সৌজন্যে তাঁদের সম্পত্তিবিক্রয়-লব্ধ অর্থের বিনিময়ে তিনি মুক্তি পান। কিন্তু ফিরে এসে তিনি আবার তাঁর বাহিনীতে যোগ দেন।

১৫৮৩ সালে সৈন্যবাহিনী থেকে অবসর গ্রহণ করে সাভেদ্রা সাহিত্য চর্চায় পুরোপুরি ভাবে আত্মনিয়োগ করেন। পরের বছর তাঁর পল্লীগাথা "গ্যালাটি" প্রকাশিত হয়। শেভিলে থাকাকালীন মঞ্চের জন্যও প্রচুর রচনা করেন।

১৫৮৬ সাল পর্যন্ত মাদ্রিদে থাকাকালীন ভাগ্যবিড়ম্বনা তাঁকে কম সইতে হয়নি। তখন জীবিকার জন্য প্রধানতঃ কলম এবং বিয়েতে লব্ধ পণের অর্থের ওপর তাঁকে নির্ভর করতে হ'তো।

কিন্তু নাটক রচনা থেকে আশানুরূপ উপার্জন না হওয়ায় ভাগ্যের সন্ধানে সাভেদ্রাকে সামান্য বেতনে নানা প্রকার নগণ্য চাকুরি নিতে হয়—করসংগ্রাহক এবং মাল সরবরাহকের সহকর্মী হিসাবে।

কিন্তু অসৎ সহকর্মীদের দুর্নীতির জন্য তাঁর লাঞ্ছনার সীমা ছিল না। চুরির অপরাধে ১৫৮৭-১৬০৩ সালের মধ্যে সাভেদ্রাকে দু' দু'বার কারা-জীবনের দুর্ভোগ সইতে হয়েছে।

তবে সেই কারাজীবনেই **ডন কুইক্সোট** [কিখোতে] (Don Quixote de la Mancha) অমর গ্রন্থটির পরিকল্পনা তাঁর মাথায় এসেছিল।

জেলে এবং হোটেলে বসে এই অসাধারণ গ্রন্থটি সাভেদ্রা শেষ করেন। ১৬০৫ সালে প্রথম পর্বটি প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর খ্যাতি সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে; দশ বছর পরে দ্বিতীয় পর্বটি প্রকাশিত হলে তিনি খ্যাতির শিখরে ওঠেন। এই গ্রন্থটিই সাভেদ্রাকে দিয়েছে বিশ্বসাহিত্যে স্থায়ী আসনের গৌরব।

উইলিয়ম সেক্‌স্‌পীয়র, ১৫৬৪-১৬১৬

কালগত হয়েও বিশ্ব-সাহিত্যে যাঁর নাম আজও সবচেয়ে প্রোজ্জ্বল মহিমান্বিত তিনি উইলিয়ম সেকস্‌পীয়র (William Shakespeare) ছাড়া আর কেউ নন। তাঁর ব্যক্তিজীবন কিছুটা অস্পষ্ট। গবেষকগণের অনুশীলনের ফলে জানা যায়—১৫৬৪ সালের তেইশে এপ্রিল আভনের তীরে স্ট্রাটফোর্ড শহরে তাঁর জন্ম হয়। তাঁর পূর্বপুরুষদের পেশা ছিল চাষাবাদ, পিতা পৌরসভায় কাজ করতেন। তাঁর জন্মের অব্যবহিত পরেই সেখানে মহামারী প্লেগের প্রাদুর্ভাব হয়।

অন্যান্য ভাইবোনদের সঙ্গে বালক উইলিয়ম পল্লীর অবৈতনিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। ল্যাটিন গ্রামার ও সাহিত্য, এবং প্রাচীন ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যের সঙ্গে তিনি পরিচিত হন। পড়ার প্রতি তাঁর আগ্রহ ছিল অপরিসীম। কিন্তু পিতার ইচ্ছায় মাত্র তেরো বছর বয়সে উইলিয়মের বিদ্যাচর্চায় ছেদ পড়ে। ঐ কিশোর বয়সেই তাঁকে কাজে নামতে হয়।

অল্পদিনের মধ্যেই সে জীবন তাঁর কাছে বিষময় হয়ে ওঠে, সমবয়সী বন্ধুদের মুক্ত জীবনধারা তাঁকে আকর্ষণ করে। কর্মক্লান্তির হাত থেকে মুক্তি পাবার উদ্দেশ্যে তিনি মাঝে মাঝে দূরদূরান্তে চলে যান। এমন সময় তিনি বিয়ে করেন। ক্রমে ক্রমে তিনি দু'টি কন্যা এবং একটি পুত্রের জনক হলেন। তবুও সেই একঘেয়ে নীরস জীবনের ক্লান্তি থেকে তিনি মুক্তি পান না। মাঝে মাঝেই ঐ গতানুগতিক জীবনধারার বিরুদ্ধে তাঁর মন বিদ্রোহ করে ওঠে।

তাই ভাগ্যের সন্ধানে তেইশ বছরের তরুণ উইলিয়ম একদিন লণ্ডনের উদ্দেশে যাত্রা করেন। বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতায় অজ্ঞ, পুঁজি এবং শিক্ষা ছিল নগণ্য; স্নুতরাং নতুন পরিবেশে তিনি দিশেহারা হন। জীবিকার জন্য অনেক কষ্টে মঞ্চের অভিনেতাদের ঘোড়াগুলো দেখাশুনো করার একটা কাজ যা হোক করে জুটিয়ে নেন। ক্রমে ঐ কর্তাদের সৌজন্যে উইলিয়ম ছোটখাট দু'একটা চরিত্রে অভিনয় করার স্নুযোগ পান। তারপর নাটকের পাণ্ডুলিপি, অনুলিপি, পুনর্লিখন, পরিবর্তন ইত্যাদি কাজে আত্মনিয়োগের ফলে তাঁর সুপ্ত প্রতিভা ধীরে ধীরে বিকশিত হ'তে থাকে।

তাঁর প্রথম স্মৃষ্টি "চতুর্থ হেনরী"। রচনাকাল ১৫৯১ সাল হলেও ছ'বছর বাদে এটি প্রকাশিত হয়। তাঁর সাহিত্য-সাধনা শুরু হয় ১৫৯২ সালে; সেই থেকে পরপর স্মৃষ্টি হ'তে থাকে অনন্যসাধারণ নাটক—যা তাঁকে এনে দেয় আশাতীত খ্যাতি, প্রতিপত্তি এবং অর্থ। ক্রমে তিনি নাট্যজগতে শিরোমণির গৌরব অর্জন করেন। রাণী এলিজাবেথও তাঁকে সম্মান দেখাতে দ্বিধা করেননি এবং রাজসভাতে উইলিয়মের নাটক সমাদরে অভিনীত হয়েছে।

শেষ বয়সে অর্থাৎ ১৬১১ সালের পর মানসিক অশান্তি আর ভগ্ন স্বাস্থ্যের জন্য তিনি আর লিখতে পারেননি। উইলিয়ম সেকসপীয়র সম্বন্ধে শেষ কথা বলে কিছু নেই; মানব সভ্যতার শেষ দিন পর্যন্ত তাঁর রচনা অম্লান হয়ে থাকবে।

অনেকের মতে **হ্যামলেট** (Hamlet) তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ অবদান। সেকসপীয়রের নিজের মতেও। এটির রচনাকাল ১৫৯৩ খ্রীষ্টাব্দ।

মলিয়ের,

১৬২২-'৭৩

আধুনিক যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কমেডি রচয়িতা মলিয়ের (Moliere), আসল নাম ছিল—জ্যঁা ব্যাপতিস্তে পকেলিন (Jean Baptiste Poquelin)। প্যারিসে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন ব্যবসায়ী।

আইন-বিদ্যায় উচ্চ শিক্ষা লাভ করলেও সে-বিদ্যা বা ব্যবসা তাঁকে আকর্ষণ করেনি ; গোড়া থেকেই নাটকের প্রতি ঝোঁক ছিল ; অভিনেতা হবার ছিল তাঁর তীব্র বাসনা। তাই একুশ বছর বয়সে ক'জন বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে গড়ে তুললেন একটি নাট্যসংস্থা, তারপর মঞ্চে অবতীর্ণ হলেন। কিন্তু ব্যর্থ হলেন।

প্যাবিসের নাট্যামোদীদের কাছে তাঁর এই প্রথম প্রচেষ্টা সাড়া জাগাতে না পারলেও মলিয়ের হতাশ হলেন না। দলটি নিয়ে তিনি পল্লী অঞ্চলে এবং শহরের উপকণ্ঠে অভিনয় করে প্রচুর খ্যাতি অর্জন করে আবার প্যারিসে ফিরে আসেন।

১৬৬৮ সালে দ্বিতীয় বার প্যারিসের রঙ্গমঞ্চে দলবল নিয়ে নামলেন। এবার তাঁর মন ভরে গেল দর্শকবৃন্দের খুশির উচ্ছ্বাসে। তারপর তিনি পর পর কতগুলো বিয়োগান্ত নাটক তাদের উপহার দেন। তাঁর পৃষ্ঠ-পোষকতায় শহরে একটি স্থায়ী মঞ্চ প্রতিষ্ঠা হতেও দেরী হ'লো না।

পরের বছর প্রকাশিত তাঁর রচিত—'Les Precienses Ridicules' নাটকটিতে তিনি সমকালীন ভাষা, পোশাক এবং প্রচলিত আচরণের ওপর

বিদ্রূপের কষাঘাত হেনেছেন। নাটকটি শুধু তাঁর খ্যাতিকেই সুদূরপ্রসারিত করেনি, সামাজিক কুসংস্কার দূর করতেও এটির অবদান কম নয়।

উত্তরকালে ইতালি এবং স্পেন-এর সাহিত্য থেকে তাঁর সাহিত্য-প্রচেষ্টায় মলিয়ের প্রভূত প্রেরণা পেয়েছিলেন। ১৬৭৩ সাল পর্যন্ত প্রতি বছর তিনি অন্যূন এক বা একাধিক উঁচুদরের নাটক রচনা করেছেন।

বিড়াল-তপস্বী (Tar Tuffe) প্রকাশিত হবার পর ক'বছর এটির অভিনয় নিষিদ্ধ ছিল।

চতুর্দশ লুইস তাঁর গুণমুগ্ধ ছিলেন। পরিচালক হিসাবে তিনি রাজার কাছ থেকে অবসর-ভাতা পেয়েছিলেন।

মৃত্যুর পর আর্চবিশপ ধর্মদ্রোহের অভিযোগে তাঁকে সমাধিস্থ করতে আপত্তি তোলেন। হয়ত 'তারতিফ' এর মূলে ছিল। কিন্তু রাজার হস্তক্ষেপে সে অভিযোগ টেকে না, স্বর্গত মলিয়ের সশ্রদ্ধ সমাধি পান।

ড্যানিয়েল ডিফো

১৬৬০-১৭৩১

ইংরেজী সাহিত্যে ড্যানিয়েল ডিফো-ই (Daniel Defoe) একমাত্র সাহিত্যিক যিনি ষাট বছর বয়সে একটি কাহিনী রচনা করেই বিশ্ব-সাহিত্যের দরবারে স্থায়ী আসন লাভ করবার গৌরব লাভ করেছিলেন। তাঁর সেই অমর সৃষ্টি—**রবিনসন ক্রুসো** (Robinson Crusoe) আধুনিক য়ুরোপীয় সাহিত্যের প্রথম উপন্যাসও বটে।

লণ্ডনের এই পথ-বিলাসী বালকটিকে সবাই জানত 'ড্যানিয়েল ফো' নামে। স্কুল-জীবনে তিনি স্বাক্ষর করতেন D. Foe; কিন্তু উত্তরকালে বংশমর্যাদার প্রশ্ন উঠতে তিনি পদবীটি রূপান্তরিত করে নেন।

পিতা জেম্‌স্‌ ধর্মবিশ্বাসে ছিলেন ডিসেণ্টার অর্থাৎ চার্চ অব ইংলণ্ডের বিরুদ্ধবাদী, পেশায় ব্যবসায়ী। পিতার ইচ্ছা অনুযায়ী প্রোটেস্টান্ট পাদ্রি হওয়ার জন্য যে সব শিক্ষার প্রয়োজন, তা সবকিছুই অর্জন করলেন। কিন্তু শিক্ষান্তে তিনি স্থির করলেন, ব্যবসা করবেন—পাদ্রি হবেন না। তখন তাঁর বয়স একুশ।

ব্যবসায়ে সাফল্য লাভ করলেন। সেই সঙ্গে তিনি রাজনৈতিক প্যাম্‌-ফ্লেট লিখতে শুরু করেন। এই সময় তিনি বিয়ে করেন। বিয়ের অল্প-কাল পর থেকে শুরু হয় ডিফো'র বিচিত্র-জীবন ধারা—

অত্যাচারী সরকারের বিরুদ্ধে ডিউক অব মনমাউথের পক্ষ অবলম্বন করে সশস্ত্র বিদ্রোহে যোগ দিতে তিনি দ্বিধা করেন না। পরাজয়ের পর

গ্রেফ্তার এড়াবার জন্য দেশ ছেড়ে বছর তিনেক নানা জায়গায় তাঁকে পালিয়ে বেড়াতে হয়।

দেশে ফিরে আবার ব্যবসায় নামলেন। নানা প্রকারের। জমি, গেঞ্জি, কাপড়, ইঁট ও টালি—আরও কত জিনিসের। কিন্তু রাজনীতির প্রতি বিশেষ ঝোঁক থাকার ফলে ব্যবসায়ে সাফল্য হল না। এক বছরের মধ্যে ডিফো'কে দেউলিয়া বলে ঘোষণা করা হ'ল। বিপদ কি এক ?

অল্প কিছুদিন বাদে, ১৭০৩ সালের দোসরা জানুয়ারি। 'দি সর্‌টেস্ট ওয়ে উইদ দি ডিসেণ্টারস্' লেখার অভিযোগে তাঁর নামে গ্রেফ্তারের পরোয়ানা বের হয়। তিনি আত্মগোপন করে আত্মীয়-স্বজনের কাছে সাহায্য চাইলেন। তাঁর এই বিপদে কিন্তু কেউ এগিয়ে এলেন না। চার পাঁচ মাস বাদে ডিফো ধরা পড়লেন।

বিচারে ডিফো'কে তিন দিন পিলরিতে দাঁড়াবার নির্দেশ দেওয়া হয়। কত বন্দী এই পিলরিতে দাঁড়িয়ে কৌতূহলী দর্শকের হাতে মৃত্যু বরণ করেছে, কতজন বা চিরদিনের জন্য পঙ্গু হয়েছে। কিন্তু আশ্চর্য, ডিফো'কে তারা কেউ কোন প্রকার লাঞ্ছনা করে নি। তারা বন্দী ডিফো'কে অভিনন্দন জানিয়েছিল।

মুক্তিলাভের পর লেখাকে তিনি পেশা হিসাবে গ্রহণ করেন। ডিফো বই লিখেছেন অন্যূন আড়াইশ'। কিন্তু আজ 'রবিনসন ক্রুসো', 'মল ফ্ল্যাণ্ডার্স' এবং 'এ জার্নাল অব দি প্লেগ ইয়ার' ছাড়া সবই বিস্মৃত-প্রায়।

বইয়ের বিক্রয়লব্ধ অর্থ প্রচুর হলেও তিনি তা ভোগ করতে পারেন নি। পাওনাদাররা তা নিয়ে যেতো।

জীবনে তাঁর শান্তি ছিল না, সুখও না। পরিবার থেকে দূরে দূরে তাঁকে পালিয়ে বেড়াতে হ'ত—পাওনাদারদের ভয়ে। সেই অবস্থাতেই তিনি লিখতেন। লিখেছেন প্রায় জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত। নিঃসঙ্গ ডিফো শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন এক হোটেলে। তখন তাঁর কাছে কেউই ছিল না—স্ত্রী, পুত্র, আত্মীয়স্বজন কেউ না।

জোনাথান সুইফ্‌ট্‌, ১৬৬৭-১৭৪৫

ইংরেজী সাহিত্যের দিক্‌পাল জোনাথান সুইফ্‌ট্‌ (Jonathan Swift) আয়র্ল্যাণ্ডের ডাবলিন শহরে জন্মগ্রহণ করেন। কাকার আর্থিক সহায়তায় কিলকেনি বিদ্যালয়ে এবং ডাবলিনের ট্রিনিটি কলেজে শিক্ষালাভ করেন। ছাত্র হিসাবে অবশ্য তিনি মেধাবী ছিলেন না।

শিক্ষান্তে তিনি প্রখ্যাত রাজনীতিবিদ্‌ স্যার উইলিয়াম টেম্পল-এর প্রাইভেট সেক্রেটারী রূপে কর্মজীবন শুরু করেন। স্যার উইলিয়াম ছিলেন তখনকার সমাজের একজন উঁচু স্তম্ভ, পণ্ডিত ব্যক্তি এবং শিল্পরসিক—জোনাথানের মা'র দূরসম্পর্কীয় আত্মীয়। সে সময়কার সাহিত্যের শিরোমণি জন ড্রাইডেন-এর সঙ্গেও জোনাথানের আত্মীয়তা ছিল।

১৬৯৭ সাল। তখন ক্লাসিক বনাম আধুনিক সাহিত্যকে কেন্দ্র করে বাগ্‌বিতণ্ডার ঝড় বইছিল। এই সময় ক্লাসিকের ঐতিহ্যকে সমর্থন করে জোনাথানের 'দি ব্যাট্‌ল অব দি বুকস্‌' গ্রন্থটি আত্মপ্রকাশ করে—এটিই তাঁর প্রথম উল্লেখযোগ্য অবদান।

তাঁর কর্মস্থল অ্যায়র্ল্যাণ্ডে ছিল এবং সেখানে নানা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত থাকলেও জোনাথান অধিকাংশ সময় কাটাতেন লণ্ডন শহরে। এখান থেকেই তিনি খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। শুধু সাহিত্যচর্চাই করতেন না—টোরী পার্টির দুই প্রখ্যাত নেতা লর্ড অক্সফোর্ড এবং লর্ড বোলিং-এর পরামর্শদাতাও তিনি ছিলেন।

১৭১৪ কাজের নূতন দায়িত্ব নিয়ে ডাবলিন শহরে এলে জোনাথানকে আয়র্ল্যাণ্ডের রাজনীতি বিশেষ ভাবে আকর্ষণ করে। তখন তিনি অনেক পুস্তিকা লেখেন। পরে এগুলো "ড্রেপারস্ লেটারস্" নামে প্রকাশিত হয়। তাঁর রচিত "টেল অব এ ট্যাব"-ও বিশেষ প্রশংসার দাবী রাখে। তবে নিঃসন্দেহে **গলিভার-এর ভ্রমণ-কাহিনী** (Guilliver's Travels) তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা, আজও অম্লান হয়ে আছে।

খুব সম্ভবতঃ জোনাথান কোনদিন বিয়ে করেন নি।

কর্মজীবনে অধিকাংশ সময় মাথার অসহ্য যন্ত্রণায় তিনি কষ্ট পেয়েছেন। শেষ জীবনে মস্তিষ্কবিকৃতি আশংকা করে জোনাথান তাঁর সমস্ত সম্পত্তি একটি উন্মাদ আশ্রম গড়ে তোলবার জন্য দান করেন।

লিখেছেন তিনি প্রচুর। তবে বেশীর ভাগই বেনামে প্রকাশিত হয়েছে। এমনকি বিশ্ববিখ্যাত সংকলিত গ্রন্থটিও 'স্যামুয়েল গলিভার' ছদ্মনামে প্রকাশিত হয়েছিল, তাঁর নিজের নামে নয়। তবে এই গ্রন্থটির বিক্রয়লব্ধ অর্থ থেকে তিনি বঞ্চিত হননি, প্রচুর পেয়েছিলেন।

উপার্জিত অর্থের এক-তৃতীয়াংশ জোনাথান আর্তের সেবায় দান করেছেন, বাকীটা উন্মাদগণের কল্যাণের জন্য রেখে যান।

যোহন ভোল্ফ্‌গাঙ্‌ ফন্‌ গ্যেটে, ১৭৪৯-১৮৩২

যে ক'জন মনীষীর জন্য পৃথিবী গৌরবান্বিত, জার্মানীর শ্রেষ্ঠ লেখক, কবি ও নাট্যকার যোহান ভোল্‌ফ্‌গাঙ্‌ ফন্‌ গ্যেটে (J. W. Von Goethe) নিঃসন্দেহে তাঁদের মধ্যে অন্যতম প্রধান। ফ্রাঙ্কফুর্টে তাঁর জন্ম।

পিতার ইচ্ছানুসারে ষোল বছর বয়সে লিপজিগ্‌-য়ে তিনি আইন পড়তে শুরু করেন। কিন্তু এই পেশাদারী বিদ্যা তাঁর মনে সাড়া জাগাতে পারে না। ক্রমে সংগীত, শিল্প ও সাহিত্যের প্রতি তরুণ গ্যেটের প্রগাঢ় অনুরাগ জন্মে, কিন্তু এ সব বিষয়ে অত্যধিক পড়ার চাপে কিছুদিনের মধ্যে তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়ে। ফলে, সাময়িক ভাবে লেখাপড়া তাঁকে স্থগিত রাখতে হয়।

পরে স্ট্রাটবার্গে আবার তাঁর শিক্ষা-জীবন শুরু হয় পূর্ণোদ্যমে। সম্ভবতঃ এখানেই নাটক লেখার তাঁর চেতনা জাগে এবং ঐ অল্প বয়সেই Gotz নাটকটি লেখার পরিকল্পনা করেন। ব্যক্তিগত জীবনে প্রেমের উন্মেষও হয় এই জায়গায়। সুন্দরী ফ্রেড্রিক ব্রিয়নের প্রতি তিনি অনুরক্ত হন। পরবর্তী কালে এই নারীর প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগের কথা কয়েকটি গীতিকাব্য এবং বহু রচনায় তিনি ব্যক্ত করেছেন।

ওয়েজলারে গ্যেটে আইন ব্যবসা শুরু করেন। কিন্তু সুন্দরী শার্লটি বাফের প্রেমে উদ্বুদ্ধ হ'য়ে নানা ঘটনার আবর্তে পড়ে জীবন-যন্ত্রণার হাত থেকে মুক্তির উদ্দেশ্যে এক সময় আত্মহত্যার উদ্যোগ করেন। ঐ ঘটনার প্রতিক্রিয়া আমরা দেখতে পাই তাঁর "Sorrows of Werther" গ্রন্থটিতে।

১৭৭১-'৭৫ সাল গ্যেটের সৃষ্টিশীল প্রতিভার সফল রূপায়ণে সমৃদ্ধ। এই সময় তাঁর বহু এবং বিচিত্র নাট্যসম্ভারের সৃষ্টি। এবং এ সময়েই তিনি **'ফাউস্ত'** কাব্য-নাটকটি লিখতে শুরু করেন।

১৭৭৫ সালে ডিউক কার্ল আগস্ট-এর নিমন্ত্রণে গ্যেটে জার্মান সাহিত্য এবং সংগীতের তীর্থক্ষেত্র ভাইমের শহরে আসেন এবং মৃত্যু পর্যন্ত এখানেই তিনি বাস করেন। রাষ্ট্রমন্ত্রী, রাষ্ট্রীয় নাট্যবিভাগের অধিকর্তা এবং আরো বহু দায়িত্বশীল পদ তিনি অলংকৃত করেন।

১৭৮৬ সালে তাঁর ইতালি-ভ্রমণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁর অনবদ্য নাটক "এগমন্ট"-এর সৃষ্টি ওখানেই হয়। চার বছর বাদে 'ফাউস্ত'-এর অংশবিশেষ আত্মপ্রকাশ করে; যদিও প্রথম পর্বটি পুরোপুরি ১৮০৯ সালে প্রকাশিত হয়ে বিশ্বসাহিত্যে এক অভূতপূর্ব আলোড়নের সৃষ্টি করে।

প্রায় বাইশ বছর বয়সে তিনি **ফাউস্ত** (Faust) রচনা শুরু করেন। প্রথম পর্বটি শেষ হয় তাঁর একান্ন বছর বয়সে; দ্বিতীয় পর্বটির রচনা পঞ্চাশ বছরে আরম্ভ ক'রে তিরাশি বছর বয়সে মৃত্যুর ক' বছর আগে গ্যেটে সমাপ্ত করেন। এ কাব্যগ্রন্থটি শুধু জার্মান সাহিত্যে নয়, পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্য-কীর্তি বলেই স্বীকৃত।

জেন অস্টেন,
১৭৭৫-১৮১৭

জেন অস্টেন (Jane Austen) নিঃসন্দেহে ইংরেজী সাহিত্যে প্রথম সফল মহিলা ঔপন্যাসিক। তাঁর পিতা কোন এক পাদরী প্রতিষ্ঠানের রেকটর ছিলেন। শ্রীমতী অস্টেনের জীবনের প্রথম পঁচিশ বছর ষ্টিভেনটনের শান্ত পরিবেশে অতিবাহিত হয়। তাই তাঁর রচনাতে এখানকার প্রভাব তিনি এড়াতে পারেননি, অনেক ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায়।

তিনি শুধু ডঃ জনসনের লেখার গুণমুগ্ধ পাঠিকা ছিলেন না, রিচার্ডসন, কাউপার, ক্র্যাবে প্রভৃতি লেখকদের রচনাও তাঁর ওপর প্রভাব বিস্তার করেছিল। তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনা **অহমিকা** (Pride and Prejudice) মাত্র একুশবছর বয়সের সৃষ্টি। অবশ্য 'সেন্স অ্যাণ্ড সেনসিবিলিটি' পরে প্রকাশিত হলেও এটিই তাঁর প্রথম রচনা।

কর্মজীবন থেকে পিতা অবসর গ্রহণ করলে শ্রীমতী অস্টেন পিতামাতার সঙ্গে হ্যাম্পশায়ারে চলে যান, পরবর্তী উপন্যাসগুলো তিনি এখানেই রচনা করেন, মোট লিখিত ছ'খানা উপন্যাসের মধ্যে তাঁর জীবদ্দশায় চারখানি প্রকাশিত হয়। শেষ উপন্যাসটি রচনার সময় ক্ষয়রোগে আক্রান্ত হ'য়ে শ্রীমতী অস্টেন মারা যান।

তাঁর লেখার প্রধান বৈশিষ্ট্য—সংযম এবং পরিমিতিবোধ ; চরিত্রগুলো জীবন্ত এবং বাস্তব। সাধারণ মানুষের চিন্তাধারা, কর্তব্য কর্মের গতানুগতিকতা এবং প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থা এবং ন্যায়-নীতিবোধ—এগুলো তাঁর লেখার সীমিত পরিবেশে জীবন্ত এবং ভাস্বর হয়ে উঠেছে।

বালজাক,

১৭৯৯-১৮৫০

উনিশ বছরের তরুণ ছেলেটির প্রতি তার পিতার কঠিন নির্দেশ : দু' বছরের মধ্যে বই লিখে অর্থ উপার্জন করতে হবে, নইলে তাকে আবার ফিরে যেতে হবে বিশ্ববিদ্যালয়ের সেই নিরানন্দ গণ্ডির মধ্যে।

ছেলেটি বিলক্ষণ জানে, তার মতো অখ্যাত, অনভিজ্ঞের পক্ষে এ কী শক্ত পরীক্ষা! তবুও সে দমে না—

চারমাসের অক্লান্ত পরিশ্রমে ক্রমওয়েলের জীবনী অবলম্বন করে বালজাক (H. De Balzac) শেষ করলেন একটি কাব্য-নাটক। তাঁর মুখে এই নাটকটি শুনে সাহিত্যরসিক আত্মীয় বন্ধুরা এক কথায় বললেন,—রচনাটি পুড়িয়ে ফেল। তিনি কিন্তু তবুও হাল ছাড়েন না।

দু' বছর পূর্ণ হ'তে তখন মাত্র দেড় মাস বাকী। ওদিকে সাহিত্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করার বাসনা দুর্জয়। ঐ অল্প সময়ের মধ্যে তিনি শেষ করলেন একটি উপন্যাস। প্রকাশক পাওয়া গেল। বালজাক কিছু অর্থও লাভ করলেন। পেলেন তিনি বাঁচবার স্বাদ। এবার শুরু হ'ল তাঁর সাহিত্য-জীবন।

বিদ্যালয়ের নিয়মানুবর্তিতায় তাঁর মন বিদ্রোহ করত। গতানুগতিক শিক্ষারীতিতে তিনি ছিলেন বীতশ্রদ্ধ। এ জন্য ছাত্রজীবনে তাঁকে কম বিড়ম্বনা সইতে হয়নি। পিতামাতার কাছেও তিনি স্নেহ-ভালবাসা পাননি। তাঁদের কাছ থেকে পেয়েছিলেন শুধু অবজ্ঞা আর অনাদর।

তাঁর ব্যক্তি-এবং সাহিত্য-জীবনে প্রৌঢ়া মাদাম দ্য বার্নি'র অখণ্ড প্রভাব উল্লেখযোগ্য। তিনি ছিলেন বালজাকের সৃষ্টির অন্যতম প্রেরণা। মাদাম শুধু তাঁর জৈব প্রবৃত্তিই পরিতৃপ্ত করেন নি, বাল্‌জাককে এনেও দিয়েছিলেন আত্মবিশ্বাস।

স্বভাবে বালজাক ছিলেন অত্যন্ত বেহিসেবী, বেপরোয়া। তাই তাঁর বইয়ের বিক্রয়লব্ধ অর্থ প্রচুর পরিমাণে হাতে এলেও তিনি কখনও ঋণমুক্ত হতে পারেন নি।

দেনার চাপে মহৎ সাহিত্য রচনা করা অসম্ভব উপলব্ধি করে বালজাক নানা উপায়ে অর্থ-উপার্জনের চেষ্টা করেন। কিন্তু সব ব্যবসাতে আশাহত হ'তে তিনি আবার সাহিত্যে পুরোপুরি আত্মনিয়োগ করেন।

এবার দান্তের ডিভাইন কমেডির অনুকরণে তিনি তাঁর 'হিউম্যান কমেডি'-র পরিকল্পনা করেন। বিশ্বসাহিত্যে দুঃসাহসিকতম পরিকল্পনা। এটি ১৩৮ খানা উপন্যাসে সম্পূর্ণ হবার কথা ছিল কিন্তু এক শত'র বেশী তিনি শেষ করে যেতে পারেননি। ঐ উপন্যাসমালার অন্তর্ভুক্ত গোরিও (Father Goriot) একটি অনবদ্য সৃষ্টি।

ফরাসী সাহিত্যের দিক্‌পাল বালজাক রিয়ালিজ্‌মের গুরু ছিলেন। রোমান্টিক ঔপন্যাসিকদের প্রতি তিনি বীতশ্রদ্ধ ছিলেন। ভিক্তর য়ুগো'র রচনা পড়ে তিনি আনন্দ পেতেন।

আলেকজাণ্ডার ডুমা, ১৮০২-'৭০

প্রখ্যাত ফরাসী নাট্যকার এবং ঔপন্যাসিক আলেকজাণ্ডার ডুমা (Alexander Dumas) শহরের উপকণ্ঠে জন্মগ্রহণ করেন। সেখানে দারিদ্র্যের মধ্যে তাঁর শৈশব এবং কৈশোরের দিনগুলো কাটে।

একুশ বছর বয়সে ভাগ্যের সন্ধানে তিনি প্যারিস শহরে এসে হাজির হন। কিন্তু প্রথমে তাঁকে ভাগ্যের বিড়ম্বনা কম সইতে হয়নি। তখন তাঁর অন্তরে সাহিত্যের তাগিদ, কিন্তু পেটের ক্ষুধা দুর্জয়। জীবিকার জন্য অগত্যা তিনি সামান্য বেতনে একটি কেরাণীর চাকুরি নিলেন।

পেটের ক্ষুধা কিছুটা শান্ত হ'তে তিনি নাটক লিখতে শুরু করেন। তাঁর প্রথম রচনা—'তৃতীয় হেনরী' ১৮২৯ সালে প্রকাশিত হ'লে প্রভূত খ্যাতি লাভ করলেন; রচনাটি শহরে জনপ্রিয় হ'ল।

এরপর ডুমা সুইজারল্যাণ্ডে কিছুদিনের জন্য বেড়াতে যান। কিন্তু তাঁর লেখনীর বিরাম নেই। সেখানে থাকাকালীন তাঁর ভ্রমণ-কাহিনী কোন এক সাময়িক পত্রিকাতে ধারাবাহিক প্রকাশিত হতে থাকে। অগণিত পাঠক তাঁর সেই রচনায় চমৎকৃত হন। তাঁর নাম চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। এমন সময় তাঁর অনবদ্য সৃষ্টি—**কাউণ্ট-অব মণ্টেক্রিস্টো** (Count of Monte Christo) প্রকাশিত হ'লে সারা দুনিয়া ডুমা'র প্রতি কৌতূহলী হয়ে ওঠে। এর পর "থ্রি মাস্‌কেটিয়ার্স" আত্মপ্রকাশ করলে বিশ্বসাহিত্যের দরবারে তাঁর আসন দৃঢ় হয়।

উত্তরকালে ডুমা ছোটগল্প লেখায় আত্মনিয়োগ করেন এবং কিছু সহকারী নিয়োগ করেন—তাঁর বহু রচনা তিনি নিজেই প্রকাশ করেন।

ডুমা'র জীবন বৈচিত্র্যময়। ১৮৬০ সালে গ্যারিবল্ডীর নেতৃত্বে তিনি মনের আনন্দে সৈন্যবাহিনীতে যোগ দেন। তখন যথার্সবস্ব হারিয়ে তিনি প্রায় নিঃস্ব হন।

সুদিনে ডুমা বছরে পঞ্চাশ হাজারেরও বেশী ডলার উপার্জন করেছেন। কিন্তু মৃত্যুর সময় তাঁর কিছুই ছিল না। প্রথম যৌবনে প্যারিসে এসে তাঁকে যে অর্থকষ্ট ভোগ করতে হয়েছিল মৃত্যুর সময় লব্ধপ্রতিষ্ঠিত ডুমা ততোধিক কষ্ট পেয়েছিলেন।

ভিক্তর হিউগো,
১৮০২-'৮৫

ভিক্তর হিউগো (Victor Hugo) স্বদেশে রোমান্টিক কবি হিসাবে প্রখ্যাত, আমেরিকায় তাঁর প্রসিদ্ধি ঔপন্যাসিক বলে। কিন্তু নাটক লেখাতেও তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন এবং সমসাময়িক কালে সে জন্য তাঁর খ্যাতিও কম ছিল না ; যদিও আজ "হারনানী' নাটকটি ছাড়া বাকী সবগুলো গবেষকগণের আলোচনার বিষয়।

তাঁর জন্ম বেসানকো'তে। পিতা যোসেফ নেপোলিয়নের সেনাবাহিনীতে একজন পদস্থ অফিসার ছিলেন। তিনি ছিলেন বিলাসিতাপ্রিয় উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতির।

পিতার সঙ্গে এলবা-তে কিছুকাল কাটাবার পর বালক ভিক্তরকে স্পেনে যেতে হয়। তাঁর পিতা তখন স্পেনের রাজ্যপাল। রাজ্যপালের সেই বিরাট প্রাসাদে তাঁকে নিঃসঙ্গ দিন কাটাতে হ'তো।

বাল্যকালেই কবিতার প্রতি তাঁর বিশেষ ঝোঁক দেখা যায়। মাত্র পনেরো বছর বয়সে তাঁর রচনা ফরাসী একাডমীতে বিশেষ স্বীকৃতি লাভ করে। এবং সতেরো বছরে ভিক্তর একাডেমী অব ফ্লোরাল গেমস-এর প্রথম পুরস্কারটি পান। তাঁর প্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে দু'বছর বাদে অষ্টাদশ লুই ভিক্তরকে রাজকীয় সম্মানে ভূষিত করেন। পঁচিশ বছরে পৌঁছুতে ভিক্তর তরুণ কবিদের মধ্যমণির গৌরব অর্জন করেন। ১৮২২ সালে তাঁর রচিত কবিতা গুচ্ছ গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশিত হয়।

উল্লেখযোগ্য উপার্জন তখনও তিনি করেন না, অন্ততঃ পরিবার প্রতিপালন করবার মতো নয়। এমন সময় প্রতিবেশী সুন্দরী আদলে

ফাউচারের প্রতি ভিক্তর অনুরক্ত হন। পিতামাতা পুত্রের এ বিয়ের ইচ্ছার বিরুদ্ধে আপত্তি তোলেন। কিন্তু তাঁর মা'র মৃত্যুর পর ওদিকে সরকার থেকে একটি বৃত্তি পেতে এ বিয়েতে ভিক্তরের আর কোন বাধা থাকে না। বিয়ের সাত বছরের মধ্যে তাঁরা পাঁচটি সন্তান লাভ করেন।

তাঁর প্রথম নাটক "ক্রমওয়েল" মঞ্চে সাফল্য লাভ করতে না পারলেও সমালোচকগণের কাছ থেকে ভিক্তর যথেষ্ট প্রশংসা পেয়েছিলেন।

১৮৩১ সালে তাঁর 'হাঞ্চব্যাক অব নোটরডম্' প্রকাশিত হলে ভিক্তর ফরাসী একাডেমীতে সদস্য পদে মনোনিত হন। তারপর ধর্মোপদেষ্টা পদে অধিষ্ঠিত হ'তে তাঁর প্রভাব ফরাসী সমাজ-জীবনের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে।

যৌবনে রাজতন্ত্রের সমর্থক হলেও উত্তরকালে গণতন্ত্রের প্রতি তাঁর আকর্ষণ লক্ষ্য করা যায় এবং তৃতীয় নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে যোগ দিতেও তিনি দ্বিধা করেননি। এজন্য তাঁকে পরবর্তী কালে উনিশ বছরের নির্বাসিত জীবনের লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয়েছিল। এই নির্বাসন-কালেই রচিত হয় তাঁর অমর সৃষ্টি—**ভাগ্যহারা** (Le Miserables)—ঐ শতাব্দীর সর্বাধিক বিক্রীত উপন্যাস।

১৮৭০ সালে রাজশক্তির পতনের পর তিনি প্যারিসে ফিরে আসেন এবং জনগণের কাছ থেকে বিপুল অভিনন্দন লাভ করেন।

উইলিয়াম মেকপীস্ থ্যাকারে,
১৮১১-'৬৩

ইংরেজী সাহিত্যের দিক্‌পাল উইলিয়াম মেকপীস্ থ্যাকারে (W. M. Thackeray) কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা এখানে উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী ছিলেন।

বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে থ্যাকারে শিক্ষা লাভ করেন। কিন্তু সাহিত্যের তাগিদে শেষ পর্যন্ত ডিগ্রি লাভ আর হয়ে ওঠেনি। টেনিসন, ফিট্‌জিরাল্ড প্রভৃতি প্রথিতযশা অনেক সাহিত্যিকের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব ছিল; মহাকবি গ্যেটের সংস্পর্শেও তিনি এসেছিলেন।

গোড়াতে থ্যাকারে আইনবৃত্তি শুরু করেছিলেন। কিন্তু তা তাঁর স্বভাবের পরিপন্থী ছিল বলে সাংবাদিকতায় তিনি মনোনিবেশ করেন। 'ফ্রেজারস্ ম্যাগাজিন' এবং 'দি টাইমস্' পত্রিকায় নিয়মিত ভাবে তাঁর প্রবন্ধ প্রকাশিত হতে থাকে।

তাঁর বিবাহিত জীবন সুখের হয়নি। স্ত্রী উন্মাদ হতে ১৮৪০ সালে তাঁদের বিবাহ-বিচ্ছেদ হয়। এর ফলশ্রুতি—তাঁর অনেক রচনায় কারুণ্যের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়।

সমাজের প্রতিপত্তিশালীদের মধ্যে কোন দুর্বলতা লক্ষ্য করলেই তাঁর লেখনী সক্রিয় হ'য়ে উঠত। স্কটের মতো ব্যক্তিপূজার সমর্থক তিনি ছিলেন না। বিভিন্ন স্তরের সামাজিক দোষগুণ বর্ণনায় থ্যাকারে ছিলেন নিপুণ

লেখক। সংকীর্ণতা এবং স্বার্থপরতা সম্বন্ধে তিনি ছিলেন ক্ষমাহীন। মানব চরিত্র সম্বন্ধে থ্যাকরের জ্ঞানও প্রগাঢ় ছিল।

তাঁর রচনায় হয়তো গভীর ভাবদ্যোতক জীবন-সমীক্ষা আমরা পাই না। কিন্তু সমসাময়িক ঘটনার ওপর লঘু পরিহাসোচ্ছল বর্ণনায় তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত।

অনূ্যন ত্রিশখানা বই থ্যাকারে লিখেছেন। **ছলনার মেলা** (Vanity Fair) তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ অবদান। নায়কহীন এই উপন্যাসটি ইংরেজী সাহিত্যে এক দুঃসাহসিক প্রচেষ্টা। যদি তাঁর আর কোন রচনা নাও থাকতো—উক্ত গ্রন্থটিতে যে বিরাট পটভূমিকার ওপর গতায়ু সমাজের বাহ্যিক আড়ম্বরের পরিচয় তিনি দিয়েছেন সেজন্যই থ্যাকারে বিশ্বসাহিত্যে অমর হয়ে থাকতেন।

চার্লস ডিকেনস্‌,
১৮১২-'৭০

প্রখ্যাত ইংরেজ সাহিত্যিক চার্লস ডিকেনস্‌ (Charles Dickens)-এর বাল্যকাল কঠোর দারিদ্র্যের মধ্য দিয়ে কাটে। এ জন্য শিক্ষায়তনের শিক্ষা থেকে তিনি বঞ্চিত হন—নিয়মিত ভাবে লেখাপড়া করতে পারেন নি। পাওনাদারদের নিষ্ঠুর তাড়নায় তাঁর পিতাকে লণ্ডনের সস্তা পল্লীতে দিনের পর দিন গা ঢাকা দিযে থাকতে হয়েছে। তবুও তিনি নিষ্কৃতি পান নি। ডিকেনস্‌-এর বয়স তখন ন' বছর। তাই ঐ অল্প বয়সেই ভাগ্যবিড়ম্বিত বালক ডিকেনস্‌কে উপার্জনের জন্য সন্ধান করতে হয়। বাল্যকালের অভাবক্লিষ্ট জীবনের মর্মান্তিক স্মৃতি এবং লণ্ডনের পথে পথে ঘুরে ঐ বয়সে তিনি যে কঠোর বাস্তবতার অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন উত্তরকালে তাঁর রচনায় তা উদ্ভাসিত হয়েছে।

কিছুদিন পর পিতার আর্থিক অবস্থার একটু পরিবর্তন হতে চার্লস একটি বিদ্যালয়ে ভর্তি হন—জ্ঞানার্জনের জন্য নয়, পেশাদারী শিক্ষা লাভের জন্য। দু' বছর সর্টহ্যাণ্ড শিক্ষার পর দু'টি পত্রিকাতে রিপোর্টারের কাজে যোগ দেন। অল্পদিনের মধ্যে চার্লস সাংবাদিক হিসাবে সুনাম অর্জন করলেন। কিন্তু তাঁর ভেতরের শক্তিকে পূর্ণ বিকশিত করবার জন্য তিনি ভিন্ন পথ খুঁজতে থাকেন। রঙ্গমঞ্চ তাঁকে আকর্ষণ করে। অভিনয় ক'রে আংশিক সাফল্য লাভ করেন, কিছু সুনামও। কিন্তু অন্যের কল্পনাকে আবৃত্তি করার চাইতে নিজের ভাবনাকে বাস্তবে রূপ দেবার জন্য চার্লস মনঃস্থির করেন। শুরু হয় তাঁর নিরবচ্ছিন্ন সাহিত্য সাধনা।

১৮৩৫ সালে তাঁর একটি ধারাবাহিক রচনার অংশবিশেষ ‘মরনিং ক্রনিকেল’-এ প্রকাশিত হ’লে অগণিত পাঠকের দৃষ্টি তিনি আকর্ষণ করেন। পরের বছর তাঁর বিখ্যাত ‘পিক্‌উইক্‌ পেপারস্‌’ প্রকাশিত হ’তে সাহিত্যের দরবারে চার্লস্‌ স্থায়ী আসন লাভ করেন। তারপর তিনি পাঠকগণকে একে একে উপহার দিলেন অমর উপন্যাস রাজি। **ডেভিড্‌ কপারফিল্ড** (David Copperfield) তাঁর একটি বিশেষ অবদান। এর পাতায় পাতায় চার্লসের বাল্যকালের মর্মান্তিক অভিজ্ঞতার ব্যঞ্জনা ফুটে উঠেছে।

১৮৪২ সালে আমেরিকা ভ্রমণ করে সেখানকার জীবনযাত্রার ওপর ব্যঙ্গাত্মক রচনা লেখেন ‘আমেরিকান নোটস্‌’। তিন বছর বাদে ইতালি থেকে বেরিয়ে এসে ‘ডেইলি নিউজ’ পত্রিকার সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। কিন্তু ‘পিকচারস্‌ ফ্রম ইতালি’ গ্রন্থটি লেখবার তাগিদে তিনি উক্ত সম্পাদকের পদটি ছেড়ে দেন।

ভাগ্য পরিবর্তনের পর গৃহসুখের আশায় ভালবেসে চার্লস—‘মর্নিং ক্রনিকেল’ পত্রিকার ব্যবস্থাপকের কন্যা সুন্দরী ক্যাথারিনকে বিয়ে করেন। কিন্তু তাঁর বিবাহিত-জীবন সুখের হয় না। ক্রমে দু’জনের মধ্যে মতান্তর গুরুতর হ’তে পারস্পরিক সম্মতিতে তাঁদের বিবাহবিচ্ছেদ হয়।

তারপর এক দুর্ঘটনায় তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়ে। ভগ্ন স্বাস্থ্য, স্নায়বিক দুর্বলতায় ক্লিষ্ট তায় অনিদ্রা ব্যাধির যন্ত্রণা। তবুও তিনি তাঁর গুণ-মুগ্ধ পাঠকবৃন্দকে ভুলতে পারেন না—তাই হাতের কলমটিও তিনি ছাড়তে নারাজ।

এমনি এক বিনিদ্র-রাত্রে প্রিয় লেখনীটি হাতে নিয়ে লেখক সেদিন চোখ বুজলেন। পরম প্রশান্তি। চার্লস ডিকেনস্‌ আর চোখ খুললেন না।

চার্লস্ রীড্,
১৮১৪-'৮৪

ইংলণ্ডের অক্‌সফোর্ড-শায়ারে এক বর্ধিষ্ণু জমিদার পরিবারে চার্লস রীড (Charles Reade) জন্মগ্রহণ করেন। এগারোটি ভাইবোনের মধ্যে তিনি ছিলেন সর্বকনিষ্ঠ। অগ্রজদের মতো তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা পাবলিক স্কুলে হয়নি, হয়েছিল গৃহশিক্ষকের কাছে। এজন্য তাঁর ব্যক্তিগত আচরণে এবং শিক্ষায় অনেক ত্রুটি থেকে যায়। ফলে, উচ্চশিক্ষার জন্য অকস্‌ফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করতে চার্লসকে অনেক অসুবিধা ভোগ করতে হয়; সতীর্থদের সঙ্গে সহজ ভাবে মেলামেশা করতেও তিনি সংকোচ বোধ করতেন। এখানকার শিক্ষান্তে তিনি লণ্ডনে এসে আইন পড়েন। আইন পাশ করে ১৮৪৩ সালে বারে যোগ দেন কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই আইন ব্যবসার প্রতি তাঁর মনে অনীহা জাগে।

এ সময়টা তাঁর অর্থের সচ্ছলতা ছিল তাই ভবিষ্যতের জন্য কোন দুশ্চিন্তা চার্লসের মনে প্রশ্রয় পায় নি। মনের আনন্দে য়ুরোপের নানা দেশ ভ্রমণে তিনি বেরিয়ে পড়েন।

১৮৪৯ সালে লণ্ডনে ফিরে এসে তিনি সাহিত্যচর্চায় মন দেন। নাট্যসাহিত্যে। 'দি লেডিজ ব্যাটেল' তাঁর প্রথম মঞ্চসফল নাটক। দু'-বছরের মধ্যে পর পর আরও পাঁচটি নাটক তিনি উপহার দিলেন। ক্রমে নাট্যজগতের বহু জ্ঞানী-গুণী লোকের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব হয়। এঁদের মধ্যে

প্রখ্যাতা অভিনেত্রী লরা সেম্যুর তাঁর জীবনে গভীর প্রভাব বিস্তার করে। তাঁরই পরামর্শে চার্লস এক সময় উপন্যাস লিখতে শুরু করেন। তাঁর প্রথম উপন্যাস—"ইট ইজ নেভার টু লেট টু মেণ্ড"। এটির সাফল্যের পর থেকে উপন্যাসে তিনি সম্পূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করেন। **সংসার ও সন্ন্যাস** (The Cloister and the Hearth) উপন্যাসটি তাঁর শ্রেষ্ঠ অবদান। ১৮৬১ সালে প্রকাশিত হলে গ্রন্থটির জনপ্রিয়তায় অভিভূত হয়ে চার্লস এটিকে চারখণ্ডে—ঘটনাবহুল উপন্যাস-মালায় রূপায়িত করেন।

সম্ভবতঃ বন্ধু ডিকেন্সের প্রভাবে তিনি ঐতিহাসিক রোমান্সের পরিবর্তে সমস্যাপ্রধান উপন্যাস রচনায় মন দিয়েছিলেন। চার্লস রীড প্রায় বিশটি নাটক এবং সমসংখ্যক উপন্যাসের রচয়িতা।

ইভান তুর্গেনেভ,
১৮১৮-'৮৩

ক্লাসিক-যুগের পর রুশ সাহিত্যে যে স্বর্ণ যুগের সূচনা হয় তার অন্যতম নিয়ামক ছিলেন ইভান তুর্গেনেভ (Ivan Turgeniev)। তাঁর মাতা পেত্রোনোভা ছিলেন প্রভুত্বপরায়ণা, রুক্ষমেজাজের আর পিতা ছিলেন নিতান্ত আত্মসুখী। তাই বাল্যকাল ইভানের সুখের ছিল না। পিতা-মাতার স্নেহে বঞ্চিত বালক ইভানের হৃদয়ের বেদনা উত্তরকালে তাঁর অনেক রচনায় প্রতিফলিত হয়েছে। তাঁর বিদ্যাভ্যাস শুরু হয় মস্কো শহরে এবং উচ্চশিক্ষা পান বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে। সম্ভ্রান্ত বংশে জন্মগ্রহণের ফলে বালক তুর্গেনেভ ঐ বয়সেই বাড়িতে ভালো গ্রন্থাগারের সুযোগের সঙ্গে পাঠেরও প্রচুর অবকাশ পেয়েছিলেন। এ থেকে তাঁর জ্ঞানার্জনের পথ সুগম হয়েছিল।

স্নেহ-বঞ্চিত বালক তুর্গেনেভের চিত্ত স্বাভাবিক ভাগেই বঞ্চিত মানুষের প্রতি অন্তরে অন্তরে দরদী হয়ে উঠেছিল। তাই স্বরাষ্ট্র দপ্তরে প্রথমে চাকুরী নিয়ে ভূমি দাস প্রথার বিরুদ্ধে তিনি এক রিপোর্ট পেশ করেন। তাঁর অভিমতে সরকার তুর্গেনেভের প্রতি বিরূপ হয়। ফলে, তিনি চাকুরীটি হারালেন।

তখন তিনি সাহিত্য চর্চায় আত্মনিয়োগ করেন। কিন্তু তাতে পেট ভরে না। ক্রমে তাঁর অর্থকষ্ট প্রকট হয়ে ওঠে। মা'র ইচ্ছানুসারে বিয়ে না করার দরুণ এই সময় মা তাঁকে মাসহারা থেকে বঞ্চিত করেন।

তাঁর এই দুর্দিনে প্রখ্যাতা অপেরা গায়িকা পলিনার সঙ্গে তুর্গেনেভের পরিচয় হয়। ক্রমে দু'জনের মধ্যে নিবিড় বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। উত্তর কালে তাঁর কয়েকটি ছোট গল্পে এবং নাটকে শ্রীমতী পলিনার ছবি দেখতে পাওয়া যায়।

মা'র মৃত্যুর পর তুর্গেনেভের অর্থকষ্ট দূর হয়। উত্তরাধিকার সূত্রে তিনি প্রচুর বিত্তের মালিক হন। এবার ক্ষমতা লাভ করে তিনি ভূমি-দাসগণকে তাদের গ্লানিকর জীবন থেকে মুক্তি দেন। কিন্তু তাঁর এ সহৃদয়তা সরকার সুনজরে দেখে না। তারপর গোগলের মৃত্যুর পর তুর্গেনেভ যে শ্রদ্ধাঞ্জলি লেখেন সেটিকে উপলক্ষ করে তাঁকে গ্রেফ্‌তার করা হয়। আঠারো মাস অন্তরীণ-জীবনের লাঞ্ছনা ভোগ করার পর তিনি মুক্তি পান।

সাহিত্য-জগতে ছদ্মনামে একটি কবিতা-গ্রন্থের ('মেরিনা') মাধ্যমে তুর্গেনেভ প্রথম আত্মপ্রকাশ করেন, ১৮৪৩ সালে। তারপর দীর্ঘ একত্রিশ বছরের অক্লান্ত সাধনার ফলপ্রসূ হিসাবে তিনি আমাদের বহু এবং বিচিত্র রচনা উপহার দিয়েছেন। **অনাবাদী জমি** (Virgin Soil) তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ অবদান—বিশ্বসাহিত্য-ভাণ্ডারে একটি অমূল্য রত্ন।

বহু দুঃস্থ সাহিত্যিককে তিনি নানা ভাবে সাহায্য করেছেন। মোপাঁসা এবং জোলার বই রুশ-ভাষায় অনুবাদের ব্যবস্থা করায় এঁরাও তুর্গেনেভের কাছে ঋণী। গোটা য়ুরোপের সাহিত্যিক সমাজেই তাঁর বিশেষ সমাদর ছিল। তিনি ছিলেন সে সময়কার অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখক, রুশ লেখকগণের মধ্যে অগ্রগণ্য। জীবনের শেষদিকে অক্‌স্‌ফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সাদরে সাহিত্যাচার্য উপাধিতে ভূষিত করেন।

ফিওদর মিখাইলোভিচ্ দস্তোয়েভস্কি, ১৮২১-'৮১

যে দু'জন মহারথীর সাধনায় রুশ সাহিত্য বিশ্বসাহিত্যের দরবারে শ্রেষ্ঠত্বের গৌরব অর্জন করেছে, ফিওদর মিখাইলোভিচ্ দস্তোয়েভস্কি (F. M. Dostoevsky) তাঁদের মধ্যে অন্যতম। অনেকের মতে তিনিই শ্রেষ্ঠ রুশ ঔপন্যাসিক, উপন্যাসের আধুনিক রূপের পথিকৃৎ। আধুনিক অস্তিত্ববাদ বা 'এক্‌জিস্টেনশিয়ালিজম'-এর উদ্‌গাতাও দস্তোয়েভ্‌স্কি। তাঁর জটিল সৃষ্টি ও জীবন-বোধ দস্তোয়েভ্‌স্কিকে আধুনিক মানুষের কাছে রুশ সাহিত্যের সর্বাধিক আলোচ্য লেখক করে তুলেছে।

তাঁর পিতা মিখাইল ছিলেন মস্কোর পৌর দাতব্য হাসপাতালের ডাক্তার। ঐ হাসপাতালের সংলগ্ন বাসস্থলেই দস্তোয়েভ্‌স্কি জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু শিক্ষা-জীবন থেকে তিনি ছিলেন পীতর্সবুর্গ শহরে।

পিতা মিখাইল ছিলেন দুর্বিনীত, ক্রুদ্ধ, লম্পট এবং দুর্দমনীয় প্রকৃতির। তাঁর অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে ভূমিদাসরা একদিন এই অভিজাত-প্রভুকে নির্মম ভাবে হত্যা করে নিষ্কৃতি পায়। পুত্র ফিওদর তখন পীতর্সবুর্গের সামরিক পূর্ত বিদ্যালয়ের ছাত্র (১৮৩৮-'৪৩)। এই হত্যাকাণ্ড পুত্রের মনে গভীর রেখাপাত করে; এক অপরাধ-প্রবণতা তাঁর সত্তাকে আচ্ছন্ন করে।

শৈশব থেকেই সাহিত্যের প্রতি তাঁর ঝোঁক ছিল। পিতার কঠিন আদেশেই তাঁকে ইঞ্জিনীয়ারিং পড়তে হয়েছিল। পাশ করে সরকারী নকশা

বিভাগের কাজে যোগ দিলেন। কিন্তু অল্প ক'দিন বাদে সে চাকুরি ত্যাগ ক'রে সাহিত্য-সাধনায় আত্মনিয়োগ করলেন।

গোড়াতে ভাড়াটে লেখক হিসাবে বালজাকের রচনা থেকে কিছু অনুবাদ করেন। ১৮৪৫ সালে তাঁর প্রথম উপন্যাস—"গরিব মানুষ" প্রকাশিত হলে সুধীসমাজে সমাদৃত হ'য়, সমালোচকগণের কাছ থেকে স্বীকৃতি পায়।

১৮৪৮ সালে পীতর্সবুর্গের নৈরাজ্যবাদী 'পেত্রোশেভ্স্কি চক্র'-এর একজন বলে দস্তোয়েভ্স্কি গ্রেফতার হলেন। সরকার-নিষিদ্ধ বই পড়ার অপরাধ আর কি? বিচারে প্রাণদণ্ডের আদেশ হয়। কিন্তু বধ্যভূমিতে উপস্থিত হবার পর মকুব হয়, পরিবর্তে আট বছরের জন্য তিনি নির্বাসিত হন। এই প্রাণদণ্ড-অভিনয়ের ক্রূরতার প্রতিক্রিয়া তিনি এড়াতে পারেন নি, পরবর্তী কালে তাঁর মৃগীরোগের প্রকোপ বেড়ে যায়। নির্বাসিত জীবনের প্রথম চার বছর দস্তোয়েভ্স্কিকে সিবিরিয়ার ওমস্ক কারাগারে কাটাতে হয়েছিল।

বন্দী জীবনের শেষ ভাগে তাঁর দুঃখের প্রলেপ হিসাবে এক ক্ষয়রোগগ্রস্তা বিধবা নারী দস্তোয়েভ্স্কির সামনে এলো। মারিয়া। তিনি তাকে বিয়ে করলেন। শ্রীমতী বেশীদিন বাঁচেনি।

নরক-জীবন থেকে মুক্তি পেয়ে ফিরে এলেন তিনি পীতর্সবুর্গ শহরে-ই। ১৮৬১ সাল থেকে নতুন উদ্যমে শুরু হলো দস্তোয়েভ্স্কির সাহিত্য-সাধনা। পর পর প্রকাশিত হল তাঁর অসাধারণ উপন্যাস-সম্ভার—'অবমানিত ও লাঞ্ছিত' এবং 'প্রেতপুরী'। ততদিনে তিনি সুপ্রতিষ্ঠিত। কিন্তু মারিয়াকে ভুলতে পারেন নি। শূন্য মনকে জুয়া আর মদের নেশায় ভরে রাখবার চেষ্টা করেন। ঋণে দিশেহারা। সেই দেনা পরিশোধের জন্য মাত্র ছাব্বিশ দিনে স্টেনোগ্রাফারের সাহায্যে শেষ করলেন "গ্যামব্লার"। পরে এই তরুণী স্টেনোগ্রাফার অ্যানাকে তিনি বিয়ে করেন। অ্যানা তাঁর অর্ধেক বয়সী। তবুও যে অসুস্থ চিন্তায় তিনি প্রতিনিয়ত ভুগতেন, জাগতিক সব কিছু তাঁর মনে হতো অর্থহীন, বিষাদময়—অ্যানার প্রেমে তা দূর হয়। তাঁর বিক্ষুব্ধ জীবনের অবসান হয়।

তাঁর এই সুস্থ শান্ত জীবনে সৃষ্টি হয়—**কারামাজভ ভ্রাতৃগণ** (The Brothers Karamazov)—দস্তোয়েভ্স্কির প্রতিভার শ্রেষ্ঠতম বিকাশ, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ দশখানা উপন্যাসের মধ্যে নিঃসন্দেহে অন্যতম। যদিও কথা-শিল্পের বিচারে "অপরাধ ও শাস্তি" তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি বলে অনেকে মনে করেন।

গুস্তভ ফ্লোবেয়ার,
১৮২১-'৮০

ঔপন্যাসিক গুস্তভ ফ্লোবেয়ার (Gustave Flaubert) ফরাসী সাহিত্যে একটি নতুন ধারার প্রবর্তক।
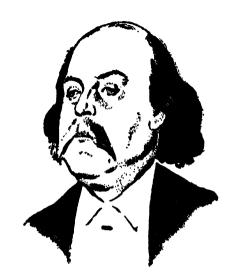
উনবিংশ শতাব্দীতে যে দু'জন ফরাসী সাহিত্যিক বিশ্বসাহিত্যে গৌরবময় স্থান অধিকার করেছিলেন, ফ্লোবেয়ার তার মধ্যে অন্যতম। অপর জন—বালজাক। বালজাকের প্রভাব ততো সুদূরপ্রসারিত ছিল না। কিন্তু ফ্লোবেয়ারের প্রভাব দেশের গণ্ডী ছাড়িয়ে ইংরেজী এবং অন্যান্য সাহিত্যেও সহজ ভাবে বিস্তার করেছিল। জোলা প্রমুখ দিকপাল ফরাসী সাহিত্যিকগণও তাঁর প্রভাব এড়াতে পারেন নি।

তাঁর পিতা একজন বিশিষ্ট চিকিৎসক ছিলেন। ফ্লোবেয়ার চিকিৎসা এবং আইন দু'টি বিদ্যাই আয়ত্ত করেছিলেন। কিন্তু বাস্তব জীবনে তিনি সে পথে পা মাড়ান নি। শিক্ষান্তে স্থির করেন সাহিত্য সেবায় আত্মনিয়োগ করবেন। তাই অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য ফ্লোবেয়ার বিদেশ ভ্রমণে বেরিয়ে পড়েন।

দীর্ঘকাল প্রাচ্য দেশ পরিক্রমা করে প্যারিসে ফিরে আসেন। তারপর ছ' বছরের অক্লান্ত পরিশ্রম আর ভ্রমণ-লব্ধ-অভিজ্ঞতা ও সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণের ফলশ্রুতি হিসাবে **মাদাম বোভারী** (Madame Bovary)-র সৃষ্টি হয়। ১৮৫৭ সালে উক্ত উপন্যাসটি ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হতে চারিদিকে এক আলোড়নের সৃষ্টি হয়। অশ্লীলতার অভিযোগে লেখক ফ্লোবেয়ার

এবং প্রকাশক অভিযুক্ত হন। কিন্তু সাময়িক। এটি তাঁর শ্রেষ্ঠ সাহিত্য-কীর্তি।

এরপর টিউনিশিয়া থেকে বেড়িয়ে এসে ফ্লোবেয়ার বিখ্যাত ঐতিহাসিক উপন্যাস "স্যালাম্বো" লিখতে উদ্বুদ্ধ হন। গ্রন্থটি ১৮৬২ সালে প্রকাশিত হ'লে তাঁর প্রতিষ্ঠা আরও দৃঢ় হয়।

হেনরিক ইবসেন,
১৮২৮-১৯০৬

নরওয়ের ছোট্ট শহর স্কিয়েনে হেনরিক ইবসেন (Henrik Ibsen) জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা অবস্থাপন্ন ব্যবসায়ী ছিলেন। কিন্তু এক বিপর্যয়ে সেই ব্যবসা নষ্ট হ'তে তাঁর বাল্য এবং কৈশোর কঠোর দারিদ্র্যের মধ্যে অতিবাহিত হয়।

বিদ্যালয়ে প্রাথমিক শিক্ষার পর ঐ বালক বয়েসেই অর্থোপার্জনে তাঁকে মন দিতে হয়। এক ওষুধের দোকানে শিক্ষানবীশ হিসাবে কাজ শুরু করলেন। কিন্তু পেট ভ'রে খাবার সংস্থানও তাতে হ'তো না। ক্ষুধার তাড়না থেকে রেহাই পাবার জন্য বই পড়ে সময় কাটাবার চেষ্টা করতেন। এই মর্মান্তিক অভিজ্ঞতা পরবর্তী জীবনে তাঁর লেখার উপকরণ হয়েছিল।

এমন সময় এক বন্ধুর অনুরোধে অনেক কষ্ট স্বীকার করে উচ্চ শিক্ষার জন্য ক্রিশ্চিয়ানা শহরে যান। পরীক্ষার ফল ভাল হ'ল না। কিন্তু বড় শহরে এসে শ্রমিক সমস্যা, সাধারণ লোকের দুঃখ-দুর্দশা এবং সামাজিক দুর্নীতি প্রত্যক্ষ ক'রে মানসিক উৎকর্ষ লাভ করলেন।

ঐতিহাসিক পটভূমিকায় রচিত তাঁর প্রথম নাটক 'ক্যাটিলিন' বন্ধুর সাহায্যে প্রকাশিত হয়। কিন্তু বিক্রী হ'ল না। পরের নাটকটি আংশিক সাফল্যমণ্ডিত। এর বছর পাঁচেক পরে এক থিয়েটারের ম্যানেজারের কাজ করতে করতে লিখিত 'লেডিইঙ্গার' নাটকটি দর্শকগণের মনে তাঁকে

স্থায়ী আসন দেয়। আইসল্যাণ্ডের কাহিনী নিয়ে রচিত 'দি ভাইকিওস অ্যাট হেলগেল্যাণ্ড' তাঁর প্রথম যুগের নাটকগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

অর্থকষ্টের লাঞ্ছনা ভুলে থাকবার জন্য মদ ধরলেন। ঘুরে বেড়ালেন নানা জায়গায়—ডেনমার্ক, জার্মানী এবং রোম-য়ে। রোমে থাকাকালীন লিখলেন 'ব্রাণ্ড' এবং আর একটি কাব্যনাটক।

প্রতিদ্বন্দ্বী নাট্যকার বিয়ারসন প্রকাশক জুটিয়ে দিলেন। 'ব্রাণ্ড' প্রকাশিত হ'লে ইবসেনের ভাগ্য-পরিবর্তন ঘটে—তাঁর দুর্গতির দিন শেষ হয়।

তারপর ১৮৬৬ সালে সরকার তাঁকে আজীবন বৃত্তি মঞ্জুর করায় ইবসেন নিশ্চিন্ত মনে সাহিত্য সেবায় আত্মনিয়োগ করেন।

পুতুল-খেলা ঘর (A Doll's House) ইবসেনের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য-কীর্তি, সবচেয়ে জনপ্রিয় নাটক। গোড়াতে এটির অভিনয় কিছুদিনের জন্য নিষিদ্ধ ছিল। তাঁর 'গোস্ট' নাটকটি আজও অম্লান হ'য়ে আছে। এ ছাড়া 'দি ওয়াইল্ড ডাক' এবং 'হেড্ডা গ্যাবলার'-ও বিশেষ প্রশংসার দাবী রাখে।

নাটকে বাস্তবতার প্রবর্তন ইবসেনের শ্রেষ্ঠ অবদান। কিন্তু বাস্তবতাই তাঁর নাটকের সর্বস্ব নয়, এর সঙ্গে এক গভীর মমতা এবং আদর্শবাদের সমন্বয় তাঁর নাটকগুলিকে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছে।

লেভ্ তলস্তয়,
১৮২৮-১৯১০

বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক ও রুশ সাহিত্যের সর্ব শ্রেষ্ঠ পুরুষ লেভ্ নিকোলায়েভিচ তলস্তয় (Lev Nikolayevich Tolstoy) রাশিয়ার ইয়াস্‌নায়া পলিয়ানায় জন্মগ্রহণ করেন। বিখ্যাত অভিজাত গোষ্ঠীর সন্তান।

আঠারো মাস বয়সে তিনি মা'কে হারান, সাত বছর বয়সে পিতারও মৃত্যু হয়। জন্মসূত্রে তৎকালীন অভিজাত সমাজের সব ব্যভিচারে লিপ্ত থাকলেও তলস্তয় অন্তরে অনুভব করতেন আত্মসন্ধানের প্রবল ঔৎসুক্য। 'শৈশব' ও 'বাল্যের' ডায়েরিতে ও 'স্মৃতিকথায়' এ সময়কার স্মৃতি তলস্তয় রেখে গেছেন।

কাজান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শিক্ষা লাভ করেন। তরুণ তলস্তয় অভিজাত বংশীয় যুবকদের মতো যথারীতি প্রমোদ-ব্যসন ও উচ্ছৃঙ্খলতাদিতে লিপ্ত হ'য়ে অর্থকষ্টে পড়েন। সেই অভাবের তাড়নায় পীতর্সবুর্গে সৈন্যবিভাগে অফিসার পদে যোগ দেন। ককেশাস-এ কিছুকাল সৈন্যাধ্যক্ষ হিসাবে কাটান। তাঁর সেই অভিজ্ঞতা প্রসিদ্ধ 'কসাক' গল্পটিতে পাওয়া যায়। পরে ক্রিমিয়ার যুদ্ধেও তিনি যান—সে অভিজ্ঞতার স্বাক্ষর 'সেভস্তোপোলের' গল্প-তিনটিতে আছে। সামরিক বিভাগ থেকে অবসর নিয়ে তিনি গ্রামের কৃষকদের শিক্ষাদানের ব্রত গ্রহণ করেন।

য়ুরোপের শিল্পবিপ্লবের ফলে তখন চতুর্দিক প্লাবিত, তাতে প্রভাবিত না হ'য়ে তলস্তয় চাইলেন ভূমি-সংস্কার। চাষী-ভাইদের সঙ্গে একাত্ম হ'য়ে গেলেন ক্ষেতখামারের কাজে, কর্মের খাতিরে নানা জায়গায় যেতে হলেও ইয়াস্‌নায়া পলিয়ানা-ই ছিল তাঁর সাধনার পীঠস্থান।

১৮৬২ সালে সোফিয়া আন্দ্রেয়েভ্‌নাকে বিয়ে করেন। বিবাহিত-জীবন তাঁর সুখের হয়নি। দাম্পত্য জীবনের মর্মান্তিক পরিণতিতে—১৯১০ সালে বৃদ্ধ তলস্তয়কে সেই লাঞ্ছিত জীবন থেকে অব্যাহতি পেতে গৃহত্যাগ করতে হয়েছিল। তাঁর মৃত্যুকালেও শ্রীমতী সোফিয়া তলস্তয়ের কাছে যেতে পারেন নি।

তলস্তয়ের ব্যক্তিসত্তা ছিল দ্বিধাবিভক্ত। একদিকে জৈব প্রবৃত্তির উদ্দাম প্রকাশ, অন্যদিকে নীতিবোধের অনুপ্রেরণা। এই দুইয়ের উদ্বেল আবর্তে তাঁর গার্হস্থ্য এবং দাম্পত্য জীবন জটিলতা এবং আস্বাচ্ছন্দ্যে ভরে গিয়েছিল।

তিনখানা নাটক—'অন্ধকারের প্রতাপ,' 'শিক্ষার ফল' এবং 'জীবিত শব' ছাড়া তাঁর নিজের জীবনাদর্শ এবং শিল্পাদর্শ 'আমার জবানবন্দী' এবং 'শিল্প কি' গ্রন্থ দু'টিতে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। 'অ্যানা কারেনিনা' তাঁর একটি অনবদ্য উপন্যাস। **যুদ্ধ ও শান্তি** (War and Peace) তাঁর শ্রেষ্ঠ অবদান—বিশ্বসাহিত্যে দশখানা উপন্যাসের মধ্যে এটি অন্যতম। তাঁর এ উপন্যাস দু'টি সর্বকালের অমূল্য রত্ন।

গাব্রিএলে দান্নুনৎসিও,
১৮৬৩-১৯৩৮

ইতালিয় সাহিত্যের অন্যতম দিক্‌পাল গাব্রিএলে দান্নুনৎসিও (Gabriele D'Annunzio)-র প্রতিভার বিকাশ কাব্যের মাধ্যমে শুরু হয়। তাঁর জীবন বৈচিত্র্যময়। ষোল বছর বয়সে তাঁর কবিখ্যাতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং কুড়ি বছরে ব্যক্তিজীবনে প্রেমের উন্মেষ হয়। এক দুর্দমনীয় হৃদয়বৃত্তি নিয়ে কর্ম থেকে কর্মান্তরে তিনি নিয়ত ছুটে বেড়িয়েছেন।

অতি সাধারণ চেহারা, কুশ্রীও বলা যায়, অথচ গাব্রিএলের ব্যক্তিত্বে এমন একটা সম্মোহিনী শক্তি ছিল যার জন্য মুহূর্তের মধ্যে তিনি যে-কোন মেয়ের হৃদয় জয় করতে পারতেন। তাঁর প্রতি মুগ্ধ হ'য়ে অভিজাত পরিবারের কন্যা মারিয়া পিতামাতার সব বাধা-নিষেধ তুচ্ছ করে গাব্রিএলের অনুগামিনী হলেন। কিন্তু কয়েকটি সন্তানের জনক হবার পর তিনি আবার বেরিয়ে পড়লেন নতুনের সন্ধানে।

এবার বিখ্যাত অভিনেত্রী এলিওনোরার সান্নিধ্যে এলেন গাব্রিএলে। তাঁর সুপ্ত নাট্য-প্রতিভার বিকাশ হ'ল। প্রণয়িনীর উৎসাহ এবং আর্থিক সাহায্যে একের পর এক নাটক লিখলেন নতুন উদ্যমে। কিছুদিন বাদে শ্রীমতী এলিওনোরা উপলব্ধি করেন, সাহিত্যিকের কাছে তার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে। সুতরাং তাদের ঐ জীবনে যবনিকা পড়ে।

গাব্রিএলে ছিলেন চরম বিলাসী। এতদিন তাঁর ঐ বিলাস-মণ্ডিত জীবনের খরচ শ্রীমতী এলিওনোরা চালাতেন। ক্রমে তাঁর দেনার পরিমাণ

আকাশ-ছোঁয়া হয়ে দাঁড়ায়। তবুও তাঁর হুঁশ হয় না। ফলে সরকার তাঁকে এক সময় দেউলিয়া বলে ঘোষণা করে।

১৮৯৮ সালে গাব্রিএলের রাজনৈতিক জীবনের শুরু হয়। ডেপুটি হ'য়ে পার্লামেন্টে যোগ দেন। এক সময় এক দৈনিক কাগজের সম্পাদকের সঙ্গে দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে একটি আঙ্গুল হারাতে তিনি দীর্ঘকালের জন্য রাজনীতি থেকে অবসর গ্রহণ করেন।

প্রথম মহাযুদ্ধ। দেশের ডাকে তিনি যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। সরকারের অনুরোধে কবিতা লিখে, বক্তৃতা দিয়ে জনসাধারণকে তিনি উদ্বুদ্ধ করে তুললেন। তারপর মসী ছেড়ে অসি ধরলেন, যুদ্ধে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করলেন ; পদাতিক, অশ্বারোহী এবং বিমান বাহিনী, সব ক'টি বিভাগেই তিনি বিশেষ যোগ্যতার সঙ্গে যুদ্ধ পরিচালনা করেছেন। নিজের জীবন তুচ্ছ ক'রে কয়েকটি যুগান্তকারী বিমান অভিযানে গাব্রিএলে মুখ্য অংশ গ্রহণ করেন। ফলে বাঁ চোখে তিনি আঘাত পান। তাঁর সামরিক দক্ষতায় মুগ্ধ হয়ে মুসোলিনি গাব্রিএলেকে অভিনন্দন জানান—সমগ্র ইতালিতে এক উন্মাদনার সৃষ্টি করেন গাব্রিএলে।

মৃত্যুর জয় (Triumph of Death) গাব্রিএলের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য-কীর্তি। উপন্যাসটি প্রকাশিত হ'লে অশ্লীল বলে তিনি অখ্যাত হলেন। কিন্তু তাঁর পাঠক-সংখ্যা হয় অপরিমিত এবং অচিন্তিতপূর্ব জনপ্রিয়তা অর্জন করেন।

তাঁর রচনা দু'টি বিশিষ্ট ধারায় চিহ্নিত : রাজনৈতিক চেতনাদীপ্ত এক শ্রেণীর রচনায় ইতালির নবজাগরণের প্রতিধ্বনি সুস্পষ্ট—অন্যটি রোমান্টিক আকুতির ব্যঞ্জনায় উদ্ভাসিত। ঐ রচনার প্রাণ-ধর্মিতা দেশের গণ্ডী ছাড়িয়ে বহুদূরপ্রসারিত।

টমাস্ হারডি,
১৮৪০-১৯২৮

শিশুটি মাতৃগর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হ'তে সকলে তাকে মৃত বলেই ধরে নিল। কিন্তু অভিজ্ঞ ধাত্রীটি তাদের সেই সিদ্ধান্ত মানতে রাজী নয়। ধাত্রীটির এক প্রবল ঝাঁকুনিতে শিশুটির প্রাণের স্পন্দন শুরু হয়। উত্তরকালে ঐ শিশুটি ইংরেজী সাহিত্যের একজন দিক্‌পাল বলে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। টমাস হারডি (Thomas Hardy)।

বাল্যকালে হারডি'র সঙ্গীতের ওপর প্রবল আকর্ষণ ছিল এবং কয়েকটি গ্রামীণ সঙ্গীতানুষ্ঠানে অংশগ্রহণও করেছিলেন। বিদ্যালয়ে যাওয়া-আসার পথে একটি সুন্দর উপত্যকা অতিক্রম করার সময় প্রকৃতির সঙ্গে তাঁর নিবিড় সান্নিধ্য ঘটে। তারপর উচ্চ বিদ্যালয়ে পাঠকালে জীবন এবং প্রকৃতি সম্বন্ধে তাঁর গভীর চিন্তার উন্মেষ হয়। ষোল বছর বয়সে তিনি স্নাতক উপাধি লাভ করেন।

অবসর সময়ে কবি উইলিয়ম বার্ণেসের কাছে হারডি যেতেন। তাঁর সান্নিধ্যে গিয়ে তিনি মানসিক স্থৈর্য এবং ভারসাম্য অর্জন করেন। হোরেস্ মোলের কাছে গ্রীক ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষা করার সময় হারডি সাহিত্য ব্রতে দীক্ষিত হন। সাহিত্য-গুরুর দুঃখভারাক্রান্ত জীবনের প্রভাব হারডি এড়াতে পারেন নি।

বাইশ বছর বয়সে লণ্ডনে স্থাপত্যবিদ্যা এবং সাহিত্যচর্চা যুগ্মভাবে শুরু হয়। স্যার আর্থার ব্লুমফিল্ডের অধীনে স্থাপত্যবিদ্যা শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে অবসর সময়ে হারডি হাকস্‌লি ও মিলের রচনার সঙ্গে অন্তরঙ্গ পরিচয় লাভ

করেন। এই সময় স্থাপত্যের ওপর একটি মনোজ্ঞ প্রবন্ধ লিখে তিনি পুরস্কৃত হন এবং সুধীজনের স্বীকৃতি পান। তখন তাঁর কিছু কবিতাও প্রকাশিত হয়।

কিন্তু স্বাস্থ্যের অবনতি হ'তে হারডিকে তাঁর জন্মস্থান বক্‌হাম্পটনে ফিরে যেতে হয়। স্বাস্থ্যের উন্নতি হ'তে তখন তিনি দ্বিগুণ উৎসাহে সাহিত্য চর্চায় আত্মনিয়োগ করেন। শ্রীমতী এমা ল্যাভিনিয়া'র সাহায্যে অল্প দিনের মধ্যে তাঁর 'ডেসপারেট রেমেডি' উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়। ১৮৭৪ সালে এমা'র সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়।

তাঁর তৃতীয় উপন্যাস 'আণ্ডার দি গ্রীনউড্ ট্রী" প্রকাশিত হ'তে তিনি প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। পরের বছর "ফার ফ্রম দি ম্যাডিং ক্রাউড" প্রকাশিত হ'তে হারডি সুনামের শিখরে ওঠেন।

স্ত্রী'র ইচ্ছায় ১৮৭৪ সালে হারডি আবার লণ্ডনে ফিরে আসেন। এখানেই সৃষ্টি হয় তাঁর শ্রেষ্ঠ সাহিত্য কীর্তি—**টেস** (Tess of the d'Urbervilles)। উপন্যাসটি হারডিকে অপ্রত্যাশিত খ্যাতি ও অর্থ দুই এনে দেয়।

অকস্‌ফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে 'ডি-লিট্' এবং রাজদরবার 'অর্ডার অফ্ মেরিট' উপাধিতে ভূষিত করেন।

হারডির জীবন দর্শনের মূল কথা—মানুষ এক উদাসীন নিষ্ঠুর নিয়তির হাতে ক্রীড়নক মাত্র। তাঁর কাছে প্রকৃতি জড় পদার্থ মাত্র নয়; হারডির উপন্যাসে প্রকৃতি জীবন্ত চরিত্র হিসাবে মূর্ত হয়ে উঠেছে।

এমিল জোলা,

১৮৪০-১৯০২

প্রখ্যাত ফরাসী ঔপন্যাসিক এমিল জোলা (Emile Zola) প্যারিসে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর মা ছিলেন ইতালিয় মহিলা। প্যারিসের 'এইক্স' এবং 'সেণ্ট লুই' থেকে শিক্ষা লাভ করেন

সাংবাদিক হিসাবে তাঁর সাহিত্য-জীবন শুরু হয়। ১৮৬৪ সালে একটি ছোটগল্প গ্রন্থ (Contes a Ninon) প্রকাশিত হ'তে তিনি পাঠকমণ্ডলীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এই গ্রন্থটি জোলার জীবনে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কারণ, এটি শুধু তাঁকে খ্যাতি দেয়নি—তাঁকে প্রচুর অর্থও দিয়েছিল। ফলে, তিনি অর্থকষ্টের হাত থেকে মুক্তি পেয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, এ সাফল্যের পর তিনি লেখাকে পেশা হিসাবে গ্রহণ করতে দৃঢ় সংকল্প করেন।

উত্তর কালে জোলা ঔপন্যাসিক হিসাবে প্রসিদ্ধি লাভ করলেও গোড়াতে তাঁকে আমরা সমালোচক হিসাবে দেখতে পাই।

১৮৬৭ সালে প্রকাশিত তাঁর উপন্যাস—"থেরেসে র‍্যাকুইন" এক নতুন সাহিত্যধারার পথিকৃৎ হিসাবে জোলাকে প্রতিষ্ঠা এনে দেয়। পরবর্তী রচনা একটি উপন্যাসমালা—একই পরিবারভুক্ত বিভিন্ন ব্যক্তির কর্ম ও ভাগ্য-কেন্দ্রিক। এই উপন্যাসমালার অন্তর্ভুক্ত "দি বেলি অফ প্যারিস," ১৮৭৪, বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

জোলার জীবনের শেষের দিকের রচনার মধ্যে এই গ্রন্থে সংকলিত—**অঙ্কুর** (Germinal), ১৮৮৫, তাঁর শ্রেষ্ঠ অবদান। 'লা টেরে'ও বিশেষ প্রশংসার দাবী রাখে।

প্রখ্যাত নাট্যকার ইবসেনের সঙ্গে জোলার নামও স্মরণীয়। ইবসেন তাঁর নাটকে যে বাস্তবতার প্রবর্তন করেছেন—গদ্যসাহিত্যে জোলা তার সার্থক স্রষ্টা।

১৮৯৪ সালে তাঁর রচিত 'জাকুজ' (J'acuse ; ইং অনু: I condemn) প্রকাশিত হ'লে জোলা'র সাহিত্য-খ্যাতি আরও বিস্তৃতি লাভ করে। এটি একটি চিঠি—ক্যাপ্টেন ড্রেফাসের বিচারের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ। এজন্য তাঁকে এক বছরের নির্বাসন দণ্ড বরণ করতে হয়।

ক'মাস ইংলণ্ডে কাটিয়ে ১৮৯৯ সালে তিনি স্বদেশে ফিরে আসেন। বিষাক্ত গ্যাসের প্রতিক্রিয়ায় জোলার মর্মান্তিক ভাবে মৃত্যু হয়।

সাহিত্যে বাস্তবতার প্রবর্তক হিসাবে সমগ্র বিশ্বের শ্রদ্ধা তিনি পেয়েছেন। প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে অসীম সাহসের সঙ্গে তিনি দৃঢ়ভাবে উক্ত ধারা সাহিত্যে প্রবর্তন করে গেছেন।

ও'হেনরী,

১৮৬২-১৯১০

আমেরিকার অন্যতম শ্রেষ্ঠ গল্পলেখক ও'হেনরী'র আসল নাম উইলিয়ম সিড্‌নী পোর্টার (William Sydney Porter)। পিতা চিকিৎসক ছিলেন। মাত্র তিন বছর বয়সে ও'হেনরী মা'কে হারান। পনর বছরের কিশোর উইলিয়মকে বিদ্যালয় ত্যাগ ক'রে ভাগ্যের সন্ধানে বেরোতে হয়।

প্রথমে কাকার ওষুধের দোকানে প্রায় পাঁচ বছর কাজ করেন। তারপর ১৮৮২ সালে স্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্য উইলিয়ম টেকসাসে যান এবং দু' বছর সেখানে থাকাকালীন তিনি ফরাসী, জার্মান এবং স্প্যানিশ ভাষা আয়ত্ত করেন। উত্তর জীবনে এখানকার শিক্ষা এবং অভিজ্ঞতা দ্বারা তিনি বিশেষ উপকৃত হন।

এর পরের অধ্যায়, অস্টিনে দশ বছর বৈচিত্র্যময় কর্মজীবন। বুককিপার, সাধারণ কেরানী, ড্রাফট্‌সম্যান ইত্যাদি নানা কর্মের মধ্যে সেখানে উইলিয়মের দিন কাটে।

১৮৮৭ সালের জুলাই মাস। এই সময় রোমান্টিক আতিশয্যের মধ্যে তিনি বিয়ে করেন।

১৮৯৪ সালে ব্রাণে-র ক্ষয়িষ্ণু 'ইকোনোক্লাস্ট' পত্রিকাটির নতুন নামকরণ করে ('রোলিং স্টোন') নতুন আঙ্গিকে পত্রিকাটির সম্পাদন ও প্রকাশের দায়িত্ব নেন। কিন্তু এক বছর পরে পত্রিকাটির প্রাক্তন মালিক উইলিয়ামের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেন। এরপর তিনি আবার গল্প লেখায় মন দেন এবং টেক্‌সাসের নানা পত্রিকায় সেগুলি প্রকাশিত হয়।

এই সময় অস্টিন থেকে তাঁর নামে সমন জারী করা হয়। সেখানে ব্যাঙ্কে চাকুরি করার সময় উক্ত ব্যাঙ্কের তহবিলের হিসাব গোলমাল করার

অভিযোগের বিচারে পাঁচ বছরের কারাদণ্ডে উইলিয়ম দণ্ডিত হলেন। আসলে তিনি নির্দোষ ছিলেন। তাঁর সদ্‌ব্যবহারের জন্য পরে অবশ্য ঐ দণ্ডের মেয়াদ দু'বছর মকুব করা হয়েছিলো। 'এ রিট্রিভড্ রিফরমেশন'-এর ভাবধারা তিনি একজন সহ-কয়েদীর কাছ থেকে পেয়েছিলেন। এটি পরে 'অ্যালিয়াস্ জিমি ভ্যালেনটাইন' নামে একটি সার্থক নাটকে রূপান্তরিত হয়েছিল। জেলে বসেও নানা ছদ্মনামে তিনি কতগুলো প্রথম শ্রেণীর গল্প লিখেছিলেন।

তাঁর প্রচলিত নামটি কিছুটা রহস্যময়। সম্ভবতঃ জেলের প্রহরী ওরীন হেনরী-র নাম থেকে উইলিয়ম ও'হেনরী নামটি গ্রহণ করেছিলেন এবং এই নামেই তিনি প্রসিদ্ধ।

তিনি অন্যূন ছ'শ' মৌলিক গল্পের স্রষ্টা। **উপহার** (Gift of Magi) ও'হেনরী'র একটি অনবদ্য সৃষ্টি।

সম্পাদক, প্রকাশক এবং দ্বিতীয় স্ত্রী শ্রীমতী সারা লিণ্ডসে কোল্‌ম্যান তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। আটচল্লিশ বছর বয়সে ক্ষয় রোগে ও'হেনরী-র মৃত্যু হয়।

ম্যাক্সিম গোর্কি,
১৮৬৮-১৯৩৬

গোর্কি-র আসল নাম আলেক্সি ম্যাকসিমোভিচ পেশ্‌কফ্‌ (Alexei Maximovich Peshkov)। শিশু বয়সে পিতৃবিয়োগ হ'তে মা পুনরায় বিয়ে করেন। শিশু গোর্কি মাতাল মাতামহের অত্যাচার সয়ে বড় হতে থাকেন। পাঁচ মাস মাত্র প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়বার সুযোগ পেয়েছিলেন। তারপর আট বছরে পৌঁছুতে জীবিকার সন্ধানে তাঁকে বেরোতে হয়।

ভাগ্যের সন্ধানে ভোল্‌গা উপত্যকায় ঘুরতে ঘুরতে গোর্কি এক সময় জর্জিয়া অঞ্চলে এসে উপস্থিত হন। হতাশায় তিনি গুলি করে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন। ঐ গুলিতে মরলেন না, কিন্তু শ্বাসযন্ত্রটি ক্ষতিগ্রস্ত হল। তবু তিনি ভেঙ্গে পড়েন নি। গভীর মানবতাবোধে উদ্বুদ্ধ হলেন আর বিচিত্র অভিজ্ঞতা-ভরা জীবনটা তাঁর সাহিত্যের উৎস হ'ল।

১৮৯২ সালে তিনি সাহিত্যে প্রথম আত্মপ্রকাশ করেন স্বনামে নয়, ছদ্মনামে। জর্জিয়ার 'কাভ্‌কাস্‌' নামক পত্রিকায় একটি লেখা পাঠালেন—তাতে তিনি স্বাক্ষর করলেন 'ম্যাক্সিম গোর্কি'। গোর্কি কথার অর্থ 'তিক্ত'। উত্তরকালে তাঁর আসল নাম লোকে ভুলে গেল, এ নামটি হ'ল বিশ্ববিখ্যাত।

১৮৯৩ সালে এক সহৃদয় বন্ধুর সাহায্যে সংবাদপত্রে তিনি একটি চাকুরি পেলেন। দু'বছর বাদে 'চেলকাস্‌' নামে তাঁর একটি বড় গল্প প্রকাশিত হয়। ১৮৯৮ সালে তাঁর প্রথম গল্পগ্রন্থ প্রকাশিত হ'তে লক্ষাধিক কপি বিক্রী হয়। ক্রমে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে সাহিত্যের দরবারে তিনি শুধু সুপ্রতিষ্ঠিতই হলেন না, তাঁর নামে জনসাধারণ উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকত।

১৯০১-এ গোর্কির রচিত 'নাদ্‌নে' বা 'নীচের মানুষ' নাটকটি অভিনয় হ'তে মস্কো শহরের আর্ট থিয়েটারে লোক ভেঙ্গে পড়ে।

কিন্তু জনতা যখন গোর্কির নামে উন্মাদ, পুলিশ তখন তাঁর ওপর খড়্গহস্ত। স্বভাবতঃ তাঁর নাটকের অভিনয় নিষিদ্ধ হয়। তারপর বিপ্লবের ঝড় শুরু হ'তে পীতর্সবুর্গের কুখ্যাত কারাগারে গোর্কি বন্দী হন।

দেশ-বিদেশের জনতার দাবীতে গোর্কি মুক্তি পাবার পর যান আমেরিকাতে। সেখানে বেশীদিন ভাল না লাগাতে ফিরে এসে ইতালির কাপ্রি দ্বীপের স্বাস্থ্যনিবাসে বাস করতে স্থির করেন। ১৯০৭ থেকে ১৯১৩ পর্যন্ত তিনি এখানকার বাড়িতে কাটান। এখানে থাকাকালীনই তাঁর বিশ্ববিখ্যাত উপন্যাস—**মা** (Mother) প্রকাশিত হয়। এটি তাঁর শ্রেষ্ঠ অবদান। গ্রন্থটি পড়ে লেনিনও বিশেষ মুগ্ধ হয়েছিলেন।

কমিউনিস্ট্‌দের বিরোধী হলেও গোর্কি তাঁদের পত্রপত্রিকাতেও লিখতেন।

'ফোমা গর্‌দেয়েভ' আর একটি অনবদ্য সৃষ্টি। 'স্মৃতিকথা' ও 'ডায়ারির নোট্‌স্‌' এক হিসাবে গোর্কির অপূর্ব সৃষ্টি। তাঁর রচনার উপাদান প্রধানতঃ আপন জীবন ও অভিজ্ঞতা থেকে সংগৃহীত। দেশের রিক্ততা, দারিদ্র্য ও নিষ্ঠুরতা গোর্কির প্রায় সব লেখাতে বিস্তৃত।

গোর্কিকে দিয়েই সোভিয়েত সাহিত্যের শুরু। তাঁর সাহিত্য-কর্মের মাধ্যমে-ই সোভিয়েত সংস্কৃতিরও বীজ অঙ্কুরিত হয়েছিল।

মার্সেল প্রুস্ত,

১৮৭১-১৯২২

প্যারিসের শহরতলীতে মার্সেল প্রুস্ত (Marcel Proust) জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্মের অল্প কিছুদিন আগে জার্মান এবং ভার্সাইলিস্ সৈন্যবাহিনী প্যারিসের ওপর প্রচণ্ডভাবে বোমা বর্ষণ করে। ঐ সময় তাঁর চিকিৎসক পিতা এক রোগির বাড়িতে যাবার পথে গুরুতর ভাবে আহত হন। তাঁর অসুস্থা জননীকে তখন দারুণ অশান্তি এবং উদ্বেগের মধ্যে নিরন্তর দিন কাটাতে হ'তো। তাই গর্ভের সন্তানটি জননীর মনের ঐ প্রতিক্রিয়ার বিষফল এড়াতে পারে নি—শিশুটির দেহ-মনে সেই অশুভ প্রভাব বিস্তার লাভ করেছিল। উচ্চশিক্ষিতা সুন্দরী ইহুদী জননী তাঁর সবটুকু স্নেহ-ভালবাসা উজাড় করে রুগ্ন সন্তানটিকে প্রতিপালন করেন।

পিতা-মাতার সতর্ক নজর মিথ্যা করে ন' বছরের বালক মার্সেল একদিন বিকালে বেরিয়ে বাড়ি ফিরবার পথে দারুণ শ্বাসকষ্টে আক্রান্ত হন। সে যাত্রায় বেঁচে গেলেন। কিন্তু তার মারাত্মক প্রতিক্রিয়া থেকে মুক্তি পেলেন না—সারা জীবন প্রায় পঙ্গু অবস্থায় মার্সেলকে কাটাতে হয়।

ভগ্ন স্বাস্থ্যের জন্য নিয়মিত ভাবে বিদ্যালয়ের শিক্ষা পান নি। কিন্তু তাঁর চেষ্টার ত্রুটি ছিল না। বিদ্যালয়ের একজন সহৃদয় শিক্ষকের সৌজন্যে মার্সেল সেণ্ট সীমনের স্মৃতিকথার পরিচয় লাভ করেন। ফলে, চিন্তাশীল বালক সপ্তদশ শতাব্দীর আড়ম্বরময় ফরাসী দেশের প্রতি কৌতূহলী হন।

আঠার বছর বয়সে সৈন্য বিভাগের ডাকে তাঁকে সাড়া দিতে হয়। সামরিক শিক্ষান্তে অরলিন্সে ছিয়াত্তরতম পদাতিক বাহিনীর সঙ্গে মার্সেল যুক্ত হন।

আইন শিক্ষায় আশাহত হলেও দর্শন এবং মনোবিজ্ঞানে মার্সেল ব্যুৎপত্তি লাভ করেছিলেন। ১৮৯২ সালে সরবোন থেকে তিনি স্নাতক হন।

১৯০৬ সালে তাঁর জীবনে একটা বিরাট পরিবর্তন আসে। ফলে, তার গতিটা একবারে পাল্টে যায়। সহসা সমাজের সংকীর্ণতা, কৃত্রিমতা এবং হীনতা উপলব্ধি করে তাঁর মন বিতৃষ্ণায় ভরে ওঠে। মার্সেলের মনে এক আলোড়নের সৃষ্টি হয়। পার্থিব সব কিছুর ওপর মার্সেলের মনে এক গভীর অনীহা জাগে। তিনি স্থির করেন, সব কিছুর থেকে দূরে থেকে তিনি সাহিত্য চর্চায় পুরোপুরি আত্মনিয়োগ করবেন। তখন তাঁর বয়স পঁয়ত্রিশ। পরপর পিতা-মাতাকে হারিয়ে মনের অস্থিরতায় কিছুদিন এদিক ওদিক ঘুরে বেড়ালেন। কিন্তু শূন্য মন ভরে না—তেমনি হাহাকার থেকে যায়।

তারপর বিশ্বের সব কিছু ভুলে গিয়ে নিজেকে বন্দী করলেন একটি ছোট ফ্লাট বাড়িতে। বাইরের সব সম্পর্কের থেকে তিনি নিজেকে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন করে শুরু করলেন সাহিত্য সাধনা। তাঁর দীর্ঘ সতর বছরের নিঃসঙ্গ জীবনের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফল স্বরূপ বিশ্বসাহিত্য পেল এ যুগের শ্রেষ্ঠ উপন্যাসমালা—**স্মৃতিচারণ** (Remembrance of things past)। সাত বছরের পরিশ্রমের পর প্রথম পর্ব—'সোয়ানস্ ওয়ে', ১৯১৩, প্রকাশিত হয়; তার ছ' বছর বাদে দ্বিতীয় পর্ব 'উইদিন এ বাডিং গ্রোভ' প্রকাশিত হলে তিনি পুরস্কৃত হন। ঐ ফ্লাট বাড়ি থেকে তিনি ক্বচিৎ বাইরে যেতেন এবং গেলেও সাধারণত গভীর রাত্রে এবং তাও খুব অল্প সময়ের জন্য। মৃত্যুর দিন পর্যন্ত মার্সেল এই উপন্যাসটি পরিমার্জন করেছেন।

যোহান বোয়ার,
১৮৭২—

নরওয়েজীয় সাহিত্যের দিক্‌পাল প্রখ্যাত ঔপন্যাসিক এবং নাট্যকার যোহান বোয়ার (Johan Bojer)-এর জন্মের ইতিহাস বড়ই করুণ। তাঁর পালক পিতার আর্থিক অবস্থা সচ্ছল ছিল না। সুতরাং শৈশবে বিদ্যালয়ের শিক্ষা থেকে তিনি বঞ্চিত হন। বিদ্যালয়ে সামান্য শিক্ষার পর আঠার বছর বয়সে বোয়ার সামরিক অবৈতনিক বিদ্যালয়ে যোগ দেন। তিন বছর সেখানে কাটানোর পর জীবিকার সন্ধানে তাঁকে নানা কাজে ঘুরতে হয়—মৎস্য ব্যবসায়ে, বিজ্ঞাপনের এজেণ্ট পদে কখনও বা সেলস্‌ম্যান হিসাবে।

১৮৯৬ সালে তাঁর রচিত 'এ প্রসেশন' উপন্যাসটি প্রকাশিত হবার পর বোয়ারের ভাগ্যপরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। তখন তাঁর বয়স চব্বিশ। উপন্যাসটির আশাতীত সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে সাহিত্য-চর্চায় পুরোপুরি আত্ম-নিয়োগ করতে তিনি স্থির করেন।

বিবিধ বিষয়ে তিনি প্রচুর পড়াশুনো করেছেন এবং এখনও করেন। তাঁর রচনা নতুন ভাবনায় সঞ্জীবিত ও সমৃদ্ধ। **পরম-তৃষা** (The Great Hunger, 1919) উপন্যাসটি তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা। মূল গ্রন্থটি (Den Store Hunger) ১৯১৬ সালে প্রকাশিত হয়। ব্রেথওয়েট গ্রন্থটি সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন যে ব্যাপ্তি এবং গভীরতার দিক থেকে এটি গ্রীক ট্রাজেডির সঙ্গে তুলনীয়। রবীন্দ্রনাথ এবং পৃথিবীর অন্যান্য শ্রেষ্ঠ মনীষিগণ বোয়ারের রচনার ভূয়সী প্রংশসা করে গেছেন।

সমরসেট মম,
১৮৭৪-১৯৬৫

ইংরেজী সাহিত্যের প্রখ্যাত লেখক উইলিয়ম সমরসেট মম্ (William Somerset Maugham) প্যারিস শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তখন তাঁর পিতা সেখানকার ব্রিটিশ দূতাবাসের সলিসিটার। দশ বছর বয়স পর্যন্ত তিনি সেখানেই ছিলেন। তারপর পিতার মৃত্যুর পর চলে আসেন ইংলণ্ডে। পরে হাইডেলবারগ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়া শেষ হ'তে তাঁর সাধ হয়, ডাক্তারি পড়বেন। অনেক বিপর্যয়ের মধ্যে ডাক্তারি এক সময় পাশ করলেন।

কিন্তু বিশ বছর বয়সে স্থির করেন, লেখা পেশা হিসাবে গ্রহণ করবেন। কিছু কিছু রচনা প্রকাশিত হ'লো। কিন্তু আশানুরূপ সাফল্য লাভ না করে নিজের শক্তি ও ধৈর্যের ওপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে ওঠেন।

এই সময় তাঁর নাটক 'লেডি ফ্রেডারিক' মঞ্চস্থ হয়। নাটকটির সাফল্য মমের মনে জাগায় প্রেরণা—সূচিত হয় তাঁর সাহিত্য-সাধনায় সুদৃঢ় পদক্ষেপ। **বন্ধন** (Of Human Bondage) উপন্যাসটি মম-কে এনে দেয় বিশ্বসাহিত্যে স্থায়ী স্বীকৃতি। গ্রন্থটি লেখকের ব্যক্তিজীবনের দহন, যন্ত্রণা, সংশয় আর কঠিন সংগ্রামের কাহিনী। মমের মতেও এটি-ই তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা। তাঁর প্রথম উপন্যাস—'লিজা অব ল্যামবেথ', ১৮৯৭।

একচল্লিশ বছর বয়সে 'প্রেমে পড়ার বিভ্রাট এড়াবার জন্য' বিয়ে করে সংসারী হবার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু বারো বছর পরে স্ত্রীর সঙ্গে তিক্ততার মধ্যে বিবাহবিচ্ছেদ করে তিনি স্বস্তির নিঃশ্বাস নেন।

প্রথম মহাযুদ্ধে অ্যাম্বুলেন্স বাহিনীতে মম যোগ দিয়েছিলেন। কিছুকাল গোয়েন্দা বিভাগেও কাজ করেছেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধেও তিনি নীরব দর্শক ছিলেন না। সরকারের অধীনে তথ্য দফতরে প্যারিসে কাজ করেছিলেন।

'শিল্পের জন্যই শিল্প' এই নীতিতে তিনি বিশ্বাস করতেন না—'জীবনের জন্য শিল্প' এই নীতিতে মম উদ্বুদ্ধ ছিলেন। এটি ছিল তাঁর কাছে একটি কল্যাণময় প্রেরণা।

ত্রিশটি উপন্যাস এবং সমসংখ্যক নাটক এবং অজস্র ছোটগল্পের স্রষ্টা মম। তাঁকে ইংলিশ মোপাশাঁ বলে অভিহিত করা হয়। তাঁর বিখ্যাত 'রেজার্স এজ' ভারতীয় বেদান্ত দর্শনের মূলসূত্রকে অবলম্বন করে লিখিত। 'পয়েন্ট অব ভিউ' গ্রন্থটি ১৯৩৬ সালে মহর্ষি রমণের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাতের রেখাচিত্রে প্রোজ্জ্বল।

দীর্ঘকাল সাহিত্য-চর্চা করে শুধু বিশ্বজোড়া খ্যাতি-ই মম পাননি, প্রচুর অর্থও পেয়েছেন। তেমনি দু'হাতে দানও করেছেন। লেখকদের পুরস্কৃত করার জন্যও তিনি একটি অর্থভাণ্ডার রেখে গেছেন।

মম কোন সভায় যেতেন না,—কলম ছাড়া দ্বিতীয় কোন হাতিয়ারে তিনি বিশ্বাস করতেন না।

স্টেফান ৎসভাইক
১৮৮১-১৯৪২

জার্মান সাহিত্যের দিক্‌পাল স্টেফান ৎসভাইক (Stefan Zweig) ভিয়েনা নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। ভিয়েনা তখন য়ুরোপের শিল্পী, সাহিত্যিক এবং বৈজ্ঞানিকদের মিলনতীর্থ ছিল।

তিনি ছিলেন অবস্থাপন্ন পরিবারের সন্তান। তাই স্কুল ও বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন এবং সাহিত্য-চর্চা নিয়ে নিরুদ্বিগ্ন মনে দিন কাটাবার সুযোগ পেয়েছিলেন। স্কুলে পড়বার সময় থেকেই তাঁর শিল্পী ও সাহিত্যিকগণের সম্বন্ধে গভীর কৌতূহল ছিল এবং তখন থেকেই তিনি ছদ্মনামে লিখতে শুরু করেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ শেষ হ'তে য়ুরোপের সর্বত্র ৎসভাইক ঘুরে বেড়িয়ে বিভিন্ন দেশের সংস্কৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হন। ফলে, গোটা য়ুরোপকে তিনি মাতৃভুমি বলে গ্রহণ করেন।

বিখ্যাত লেখকদের পাণ্ডুলিপি সংগ্রহে তাঁর অদম্য উৎসাহ ছিল। ৎসভাইকের ব্যক্তিগত সংগ্রহশালায় রোলাঁ, রিলকে, ক্লদেল, গোর্কি, ফ্রয়েড প্রভৃতি সাহিত্যিকগণের পাণ্ডুলিপি ছিল।

উনিশ বছর বয়সে তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'রুপোলী সুতো' বের হয়। কিন্তু কবিতাগুলো তেমন উঁচুস্তরের ছিল না। নিজের ক্ষমতা সম্বন্ধে ৎসভাইক নিজেও সন্দিহান ছিলেন।

কিন্তু সৃষ্টির প্রেরণায় তখন তিনি উদ্বেল, তাই প্রথমে অনুবাদের সহজ পথ ৎসভাইক বেছে নেন। বিভিন্ন ভাষায় যে সব বিখ্যাত রচনা চারিদিকে ছড়িয়ে ছিল তা অনুবাদ করে জার্মান ভাষা ও সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করলেন; অন্য দেশের সাহিত্যিকদের সঙ্গে পরিচিতির ফলে জার্মানভাষীদের মনের প্রসার বাড়ল।

কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হ'তে অনুবাদের মাধ্যমে তাঁর সাংস্কৃতিক যোগাযোগের প্রচেষ্টা বন্ধ হয়। কিছুদিন ভিয়েনার যুদ্ধদপ্তরে কাজ করবার পর ৎসভাইক যুদ্ধ-বিদ্বেষী হয়ে ওঠেন। স্বপ্ন-ভঙ্গের বেদনা ৎসভাইককে দিল মৌলিক সৃষ্টির প্রেরণা। তিনি লিখলেন "জেরেমিয়া"। যুদ্ধক্লিষ্ট য়ুরোপে নাটকটি আশ্চর্য ভাবে আলোড়ন সৃষ্টি করল।

চরিতকার হিসাবে ৎসভাইক ছিলেন অভিজাত শ্রেণীর। পৃথিবীর বহু মনীষীর জীবন-চরিত তিনি লিখেছেন। তাঁর আত্মচরিত (The world of yesterday) বিশ্বসাহিত্যে একটি উজ্জ্বল রত্ন। য়ুরোপের প্রতি কর্তব্যবোধ তাঁকে জীবনী রচনায় উদ্বুদ্ধ করেছিল।

তিনি গল্প উপন্যাস লিখেছেন সৃষ্টির আনন্দে। তাঁর প্রথম গল্পসংগ্রহ 'প্রথম অভিজ্ঞতা', ১৯১১। কিন্তু ১৯২২ সনে 'অ্যামক' প্রকাশিত না হওয়া পর্যন্ত তাঁর প্রতিভার সম্যক পরিচয় পাওয়া সম্ভব হয়নি। তাঁর উপন্যাসটিও (Beware of Pity, 1939) বিশেষ প্রশংসার দাবী রাখে।

ৎসভাইক প্রাচ্য ভ্রমণের পথে ভারতে এসেছিলেন। প্রাচীন ভারতের আকর্ষণ তিনি এড়াতে পারেন নি। ভারতের পটভূমিকায় রচিত **বিরাট** (Virata) তাঁর একটি অনবদ্য সৃষ্টি।

তিনি ছিলেন প্রবল আশাবাদী। কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে হিটলারের নিষ্ঠুর পীড়ন প্রত্যক্ষ করে ৎসভাইক নিরাশাবাদী হয়ে ওঠেন। অস্বস্তিকর আতঙ্ক এড়াবার জন্য দেশ ছাড়লেন। কিন্তু শান্তি পেলেন না। তিলে তিলে আত্মার অপমৃত্যু সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যা করে জীবন-যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেলেন।

জেমস্ জয়েস,
১৮৮২-১৯৪১

বিশ্ববিখ্যাত আইরিশ ঔপন্যাসিক জেমস্ জয়েস শৈশব থেকেই পিতার গর্বের সন্তান ছিলেন। পিতার ষোল সতের সন্তানের মধ্যে জেমস ছিলেন সর্বজ্যেষ্ঠ। তাঁর মা ছিলেন পতিব্রতা রমণী, রোমান ক্যাথলিক চার্চের বিশেষ অনুগতা এবং একজন চমৎকার পিয়ানো বাজিয়ে।

ছ' বছরের অনুভূতিপ্রবণ বালক জেমস জেসুইটদের সেরা বিদ্যালয়ে প্রেরিত হন এবং সেখানে তাঁর জীবনের তিনটি অবিস্মরণীয় বছর অতিবাহিত করেন।

মাত্র ন' বছর বয়সে পিতৃবন্ধুর মুখে পার্নেল সম্বন্ধে আলোচনা শুনে তিনি টিম হেলি'র ওপর একটি মনোজ্ঞ প্রবন্ধ রচনা করেন, যেটি তাঁর পিতা পরে প্যামফ্লেট আকারে প্রকাশ করেন। ঐ পুস্তিকাটি এখন বিলুপ্ত।

১৮৯১ সনে পিতার আর্থিক অসচ্ছলতার দরুণ জেমস-এর বিদ্যালয়ের শিক্ষায় ছেদ পড়ে। বাড়িতে তাঁকে দু' বছর বসে কাটাতে হয়। তারপর পিতার চেষ্টায় ডাবলিনের বেলভেডিয়ার কলেজে বিনা বেতনে জেমস আবার পড়তে শুরু করেন। পনের বছর বয়স পর্যন্ত তিনি এই শিক্ষায়তনে বিদ্যাচর্চা করেন। এবং তখন থেকেই রচনা লিখতে জেমস সিদ্ধহস্ত। এই

সময় 'ইউলিসিস'-এর ওপর একটি রচনা (My favourite hero) লিখে জেমস পুরস্কৃত হয়েছিলেন।

ছাত্র হিসাবে মেধাবী বলে জেমস-এর বিশেষ সুখ্যাতি ছিল। নানা বিষয়ে তিনি গভীর ভাবে পড়াশুনো করতেন। ল্যাটিন, ইতালি এবং ফরাসী ভাষা তিনি ঐ বয়সে আয়ত্ত করেছিলেন। নাট্যকার ইবসেনের রচনার সঙ্গে পরিচয় লাভের আগ্রহে নরওয়ের ভাষাটিও জেমস শিখে নেন। তিনি কবিতা লিখতেন এবং ল্যাটিন রচনা থেকে অনুবাদও করেন। জেমস শুধু লেখাপড়াতেই অগ্রণী ছিলেন না—শিক্ষায়তনের পাণ্ডাও ছিলেন।

১৯০২ সনের অক্টোবর মাস। স্নাতক উপাধি লাভ ক'রে জেমস ভাগ্যের সন্ধানে প্যারিসের উদ্দেশে যাত্রা করেন। ঐ বিদেশ বিভূঁয়ে জেমসের সম্বল মাত্র—ডাবলিনের মেয়রের কাছ থেকে একটি সাধারণ পরিচয়-পত্র, এক স্টার্লিং এবং কয়েকটি স্বরচিত কবিতা। জীবিকার জন্য তিনি পথে পথে ঘুরে বেড়ান, কোন দিন বা অনাহারে দিন কাটান। এমনি ভাবে বছর গড়িয়ে যায়।

তাঁর মা তখন শয্যাশায়ী। অন্তিমকাল। জেমস ছুটে আসেন মা'র কাছে। তিল তিল করে তাঁর মা জেমসের চোখের ওপর নিঃশেষ হন—চারমাস বাদে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে মুক্তি পান।

১৯০৪ সনে জেমস আবার ঘর ছাড়েন। ক্লিফটন স্কুলের শিক্ষকের পদ গ্রহণ করেন। এখানকার শিক্ষক-জীবনের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে 'ইউলিসিস'-এর রচনা অনেকটা সমৃদ্ধ।

ঐ বছর অক্টোবর মাসে জেমস বিয়ে করে বার্ষিক আশি স্টার্লিং বেতনে একটি শিক্ষকের পদে অস্ট্রিয়াতে চলে যান। এবং এখানেই তিনি তাঁর বিশ্ববিখ্যাত **ইউলিসিস্** (Ulysses) রচনা করেন। গ্রন্থটির পরিকল্পনা ১৯০৬ সনে তাঁর মাথায় এলেও জেমস্ সেটি লেখেন ১৯১৪-তে।

শেষ জীবনে জেমস প্যারিস এবং সুইজারল্যাণ্ডে সপরিবারে বাস করেন। তাঁর আয়ের অনেকটা রুগ্না কন্যার চিকিৎসার জন্য খরচ হতো। অন্যূন দশ বার চোখে অস্ত্রোপচারের ফলে জেমস দীর্ঘ বছর প্রায় দৃষ্টিহীন ছিলেন। কিন্তু তবুও তাঁর লেখার বিরাম ছিল না—তখন তিনি বড় বড় হরফে আস্তে আস্তে লিখতেন।

এরিখ মারিয়া রেমার্ক

১৮৯৭—

মাত্র একটি বই লিখে বিশ্ববিখ্যাত হয়েছেন এমন লেখকের দৃষ্টান্ত বিশ্ব-সাহিত্যে বিরল—নিঃসন্দেহে জার্মান ঔপন্যাসিক এরিখ মারিয়া রেমার্ক (Erich Maria Remarque) সেই সীমিত সাহিত্যিকদের মধ্যে অন্যতম।

রেমার্কের পূর্বপুরুষগণ ফরাসীদেশীয়। ফরাসী বিপ্লবের পর তাঁরা রাইনল্যাণ্ডে এসে স্থায়ীভাবে বাস করেন। ওয়েস্টফেলিয়াতে রেমার্ক জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা বই বাঁধাইয়ের কাজ করতেন এবং পরিবারটি রোমান ক্যাথলিক ধর্মাবলম্বী ছিলেন।

রেমার্ক কৈশোরে শারীরিক ব্যায়াম-বিদ্যায় ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। তখন তিনি আঠার বছরের নবীন যুবক। এই সময় য়ুরোপে যুদ্ধের দামামা বেজে ওঠে। স্কুল ছেড়ে রেমার্ক-কে যুদ্ধে যোগ দিতে হয়। তাঁকে ছুটে যেতে হয় সীমান্তে।

ঐ যুদ্ধে তাঁর সমস্ত বন্ধুরা মারা যান। তাঁর অনুপস্থিতিতে রুগ্না মা'র মৃত্যু হয়। দৈববলে সে যুদ্ধে রেমার্ক প্রাণে বাঁচেন। কিন্তু পাঁচ বার তিনি আহত হয়েছিলেন; শেষ বারের আঘাতটি হয়েছিল মারাত্মক।

সেনাবিভাগ থেকে অবসর গ্রহণ করবার পর তিনি শিক্ষকের কাজ গ্রহণ করেন। কিন্তু এক বছরের মধ্যে ঐ কাজে তাঁর মনে গভীর বিতৃষ্ণা জাগে। চাকুরী ছেড়ে দিয়ে কিছুদিন কবরে পাথর কাটার কাজ করেন।

তারপর বার্লিনে অল্পদিনের জন্য মোটর ড্রাইভারের কাজ। এরপর একটি সুইস মোটর কোম্পানীর পত্রিকাতে ভাড়াটে লেখক হিসাবে কাজ করেন।

আরও কিছুদিন পর তাঁকে একটি ক্রীড়া পত্রিকার সহ-সম্পাদক হিসাবে আমরা দেখতে পাই।

১৯২৯ সন। তাঁর যুদ্ধের অভিজ্ঞতাকে কেন্দ্র করে রেমার্ক সৃষ্টি করলেন তাঁর অমর উপন্যাস—**প্রশান্ত প্রতীচী-প্রান্ত**: "ইম্ হেবসৃটেন নিথ্‌টস্ নয়েস" (ইং অনুঃ All Quiet on the Western Front)। প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকে এক অভূতপূর্ব আলোড়ন সৃষ্টি হ'ল। প্রথম বছরে জার্মানীতে ১,২০০,০০০ কপি বিক্রী হয়। বছর না ঘুরতে অন্যূন বাইশটি ভাষায় উপন্যাসটি অনূদিত হয়। সেই সঙ্গে রেমার্ক পান বিশ্বসাহিত্যে স্থায়ী আসন।

প্রচার-বিমুখ রেমার্ক নির্বিঘ্ন জীবন যাপনের জন্য সুইজারল্যাণ্ডে একটি বাড়ি তৈরী করেন। কারণ, স্বদেশে তাঁর ফিরে যাবার উপায় ছিল না। নাৎসীরা ক্ষমতায় এসে রেমার্কের জার্মান নাগরিকত্ব অস্বীকার করে।

১৯৪৭ সালে রেমার্ক যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্ব বরণ করেন। সেই থেকে তিনি বছরের কিছু সময় নিউইয়র্কের বাড়িতেও কাটান।

১৯৩২ সনে তাঁর প্রথম বিবাহ বিচ্ছেদ হ'তে ছ'বছর বাদে রেমার্ক আবার বিয়ে করেন।

তাঁর সখের মধ্যে কুকুর পোষা এবং সঙ্গীত চর্চা উল্লেখযোগ্য। অন্যান্য বইয়ের ভেতর—Arch of Triumph ; Spark of Life এবং A time to love and a time to die প্রশংসার দাবী রাখে।

গ্রাহাম গ্রীন,

১৯০৪—

ইংরেজী সাহিত্যের অন্যতম কৃতী ঔপন্যাসিক গ্রাহাম গ্রীন (Graham Greene) হার্টফোর্ড-শায়ারের বার্কহ্যামস্টেডে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা বার্কহ্যামস্টেড বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। অক্সফোর্ডের ব্যালিয়াল কলেজে শিক্ষান্তে 'লণ্ডন টাইমস্' পত্রিকার সহ-সম্পাদক পদে যোগ দেন (১৯২৬-'৩০)

আমেরিকা এবং মেক্সিকোতে অনেকবার বেড়াতে যান। এক সময় মেক্সিকোতে দীর্ঘদিন তিনি বাস করেছিলেন। মেক্সিকোর পটভূমিকায় তাঁর কয়েকটি বই রচিত হয়েছে।

'স্পেকটেটর' পত্রিকার চিত্র-সমালোচক হিসাবেও গ্রীন ক'বছর কাজ করেছেন, ১৯৩৫-'৩৯। এর আগে 'দি ওল্ড স্কুল' নামে তাঁর স্মৃতিকথা ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়েছে।

রোমান ক্যাথলিক চার্চের সঙ্গে যুক্ত থাকার ফলে তাঁর অধিকাংশ রচনা সেই ধর্মীয় মতবাদে প্রোজ্জ্বল। গ্রীন ক্যাথলিক মতবাদের একজন সার্থক প্রবক্তা।

মনোবিশ্লেষণে তাঁর গভীর প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। ধর্মীয় নীতিবোধের প্রতি মানুষের অবচেতন মনের যে সম্পর্ক তার রহস্য উদ্‌ঘাটনে তিনি সিদ্ধহস্ত।

ব্যক্তিজীবনে দু'জন সাহিত্যিকের প্রভাব তিনি স্বীকার করেন,—একজন

গোয়েন্দা কাহিনীর লেখক স্বর্গত জন বুচানন, অপরজন ক্যাথলিক ঔপন্যাসিক ফ্রঁাসোয়া মোরিয়াক।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে তিনি পররাষ্ট্র দপ্তরে কাজ করেন; ১৯৪২-'৪৩ সনে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কাজের দায়িত্ব নিয়ে গ্রীনকে পশ্চিম আফ্রিকাতে যেতে হয়েছিল।

১৯৫২ সন। ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য পুরস্কার গ্রহণ করবার জন্য গ্রীন যুক্তরাষ্ট্রে আহূত হয়েছিলেন। কিন্তু অল্প কিছুদিনের জন্য হলেও বহুকাল পূর্বে তিনি কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে যুক্ত থাকার অজুহাতে যুক্তরাষ্ট্রের স্বরাষ্ট্র বিভাগ তঁার ভিসা মঞ্জুর করতে গড়িমসি করে। ঐ বছরের শেষের দিকে আমেরিকায় দীর্ঘদিন ভ্রমণের উদ্দেশ্যে গ্রীন ভিসার আবেদন করতে তখন তা মঞ্জুর হ'তে দেরী হয় না। কিন্তু গ্রীন ঐ অনুমতি ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেন। পুরস্কারটি নিতে তিনি আর যুক্তরাষ্ট্রে যান না।

ইন্দোচায়নার যুদ্ধের বিবরণ প্রচারের জন্য ১৯৫৪ সনে 'নিউ রিপাবলিক্' পত্রিকার বিশেষ প্রতিনিধি হিসাবে গ্রীনকে সেখানে যেতে হয়েছিল। বর্তমানে তিনি লণ্ডন শহরের অধিবাসী।

শেষ পরিণতি (Heart of the matter) তঁার একটি অনবদ্য সৃষ্টি। অন্যান্য রচনার মধ্যে—'এণ্ড অব দি অ্যাফেয়ার', 'বেসমেণ্ট রুম,' 'পাওয়ার অ্যাণ্ড দি গ্লোরি' বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

আলবার্তো মোরাভিয়া, ১৯০৭—

যুদ্ধোত্তর যুগে ইতালিয় সাহিত্য ফ্যাসিস্ত বন্ধন মুক্তির আনন্দে উজ্জ্বল, প্রাণের স্পন্দনে স্পন্দিত, জনপ্রিয়। এর কৃতিত্ব অনেকটা আলবার্তো মোরাভিয়া (Alberto Moravia)-র।

তাঁর আসল নাম Alberto Picherle; কিন্তু ছদ্মনামের অবগুণ্ঠনে পিতৃদত্ত নামটি ঘনিষ্ঠ মহল ছাড়া বড় কেউ জানে না।

মোরাভিয়া রোম নগরে জন্মগ্রহণ করেন। ন' থেকে প্রায় কুড়ি বছর পর্যন্ত ক্রমাগত অসুখে ভোগার দরুণ মোরাভিয়ার পক্ষে বিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া সম্ভব হয়নি। ষোল বছর বয়সে একটি স্বাস্থ্যাবাসে তাঁকে যেতে হয়। সেখানে একটি ভালো গ্রন্থাগার থাকায় নানা বিষয়ে প্রচুর পড়ার সুযোগ পান। সেই সময় ফরাসী, জার্মান এবং ইংরেজী ভাষা তিনি আয়ত্ত করেন। এইখানেই সতেরো বছর বয়সে তিনি প্রথমে লিখতে শুরু করেন—তাঁর প্রথম উপন্যাস 'The Indifferent ones'.

ইতালির দু'টি নামকরা সংবাদপত্রের বৈদেশিক সংবাদদাতা হিসাবে মোরাভিয়ার কর্মজীবন শুরু হয়। এবং কর্মোপলক্ষে লণ্ডন, প্যারিস এবং অন্যান্য বহুস্থানে তিনি ঘুরেছেন।

ফাসিস্ত আমলের শেষের দিকে মোরাভিয়ার রচনা নিষিদ্ধ হয়। ফলে, মোরাভিয়া ছদ্মনামে লিখতে শুরু করেন। ইতালি জার্মান অধিকারে আসবার পর থেকে ১৯৪৪ সনের মে মাস পর্যন্ত মোরাভিয়াকে পাহাড়-পর্বতে এবং বনে-জঙ্গলে আত্মগোপন করে বেড়াতে হয়।

মোরাভিয়া প্রত্যহ নিয়মিতভাবে অন্তত: দু'-তিন ঘণ্টা লিখে থাকেন। তাঁর মতে: মানুষের কাজ ও জীবন দুই-ই থাকা আবশ্যক, জীবন অর্থ অবসর; অবসর না পেলে কোন মানুষেরই চরিত্র গঠন হয় না।

প্রসঙ্গত:, মোরাভিয়ার স্ত্রী—এলসা মোরান্তেও ইতালির একজন খ্যাতনাম্নী লেখিকা।

মোরাভিয়া প্রথম শ্রেণীর গল্পকার; এমন হৃদয়গ্রাহী করে গল্প বলবার ক্ষমতা বর্তমান য়ুরোপের কম লেখকেরই আছে। তিনি বস্তুতান্ত্রিক লেখক। বঞ্চিত উপেক্ষিতের প্রতি তাঁর গভীর মমতা, অগাধ স্নেহানুভূতি। মোরাভিয়া এখনও লিখছেন; তাঁর মনটি এখনও সৃষ্টিধর্মী।

রোমের নাগরিকা (The woman of Rome) মোরাভিয়ার শ্রেষ্ঠ সাহিত্য-কীর্তি। এটি তিনি দৈনিক পাঁচ পৃষ্ঠা করে একশ' দিনে শেষ করেছেন। তাঁর অন্যান্য রচনার মধ্যে—Conjugal Love, A ghost at Noon এবং The Conformist উল্লেখযোগ্য।